# বাংলা নাটকের ইতিহাস


অজিতকুমার ঘোষ, এম, এ

অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

প্রাক্তন অধ্যাপক, যশোহর মাইকেল মধুসূদন কলেজ









জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
রথযাত্রা, ১৩৬২
মূল্য দশ টাকা মাত্র

কল্পনা প্রেস লিমিটেড, ৯, শিবনারায়ণ
দাস লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল কর্তৃক মুদ্রিত

পিতৃদেবের শ্রীচরণে—

*'Drama is a copy of life, a mirror of custom, a reflection of truth'.*

*—Cicero*

# দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'বাংলা নাটকের ইতিহাসে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ঠিক নয় বৎসর পূর্বে যখন ইহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তখন মনে অনেক দ্বিধা ও আশঙ্কাই ছিল। বাংলা নাটকের কোন উল্লেখযোগ্য সমালোচনা ছিল না বলিয়াই এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু রসিক ও বিদগ্ধসমাজে ইহা কতখানি সমাদর লাভ করিতে পারিবে সে সম্বন্ধে সংশয়ও ছিল প্রচুর। আমার অশেষ সৌভাগ্য, যে প্রশংসা আমি আশা করি নাই, এ গ্রন্থ তাহাই আমাকে আনিয়া দিয়াছে। সেজন্য আজ আমি দূরের ও নিকটের ছাত্র ও শিক্ষক, পাঠক ও পণ্ডিত সকলকেই আমার কৃতজ্ঞচিত্তের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থ-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে বি. এ ও এম. এ পরীক্ষার পাঠ্যতালিকায় অনুমোদিত গ্রন্থরূপে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। আজও পর্যন্ত ইহা বি. এ. পরীক্ষায় অনুমোদিত রহিয়াছে, অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ও বি. এ ও এম. এ. পরীক্ষার জন্য ইহাকে অনুমোদন করিয়াছেন। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই।

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে প্রথমেই একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা না করিয়া পারিতেছি না। ব্যক্তিগত হইলেও তাহা আমার ব্যক্তিসত্তার মর্মতলে চিরন্তন ক্ষত হইয়া জ্বলিতেছে, সুতরাং তাহা উল্লেখ না করিয়া আমার উপায় নাই। এ বই প্রকাশিত হইবার কয়েক মাস পরেই আমার পূজনীয় পিতৃদেব মহাশয় সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার মাঝে শোচনীয় মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যু আমাদের বিধ্বস্ত পারিবারিক জীবনের এক অবিস্মৃত দুঃস্বপ্ন হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার অবিচ্ছিন্ন উৎসাহ ও অক্লান্ত অনুপ্রাণনা না পাইলে হয়তো এ বই কোন দিনই প্রকাশ করিতে পারিতাম না। আজ ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় তাঁহার স্মৃতি আমার সকল আনন্দকে নিরানন্দ বেদনায় ভরিয়া তুলিতেছে। শোকার্তচিত্তে আজ তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

আধুনিক কালে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য অতি দ্রুত রসসমৃদ্ধ বিস্তৃতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা আনন্দের কথা। এ বই প্রকাশের পরে কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, যথা—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত' মন্মথমোহন বসুর 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'; সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়ের 'দৃশ্যকাব্য পরিচয়,' হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'বাংলা নাটক' এবং কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস'। ইঁহারা সকলেই বিচক্ষণ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক এবং ইঁহাদের মতামতও বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত বিচার্য; কিন্তু একমাত্র শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ব্যতীত আর কেহই আমার বইয়ের নাম উল্লেখ করেন নাই। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার বইয়ের ভূমিকায় আমার এ বইয়ের প্রশংসা করিয়াছেন, এজন্য অবশ্য আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করিয়াছি। অন্যান্য অনেকের বইতেই আমার বইয়ের মতামত লইয়া নানা আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদের অবতারণা করা হইয়াছে, অথচ দুঃখের বিষয় আমার কিংবা আমার বইয়ের নাম উল্লেখমাত্র করা হয় নাই। আমার মনে হয়, যখন আমরা কোন বিষয়ে আলোচনা ও মন্তব্য করি তখন সে সম্বন্ধে পূর্ববর্তী লেখকদের বক্তব্যও সুস্পষ্টভাবে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করা উচিত; তাহা হইলে পাঠক নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কোন্ মত যুক্তিসহ ও গ্রহণীয় তাহা স্থির করিতে পারেন। আমি আমার বইতে এই পথই গ্রহণ করিয়াছি, সেজন্য এ পর্যন্ত বাংলা নাটক ও নাট্যকার সম্বন্ধে যে সব উল্লেখযোগ্য আলোচনা হইয়াছে তাহাদের কোনটাই বোধহয় উল্লেখ করিতে আমি ভুলি নাই। বর্তমানে বাংলা নাটক ও নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা নানা প্রকার বিচার ও আলোচনায় নিরত আছেন তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। তাঁহার সঙ্গে আমার প্রায় প্রতিদিনই নাটকের তত্ত্ব ও রস লইয়া প্রবল সংঘাত ঘটিয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সংঘাতের ফলে আমাদের পারস্পরিক অন্তর-বন্ধনটি দৃঢ়তর হইয়া উঠে। আমরা উভয়েই পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করিয়া নাটকের আলোচনা পথে অগ্রসর হইতেছি, সুতরাং এ বইয়ের ভূমিকায় তাঁহার প্রতি আমার ঋণ স্বীকার না করিয়া পারি না।

আলোচ্য দ্বিতীয় সংস্করণের আকার প্রথম সংস্করণের প্রায় দ্বিগুণ। দ্বিতীয় সংস্করণের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নে লিখিত হইল—

১। নাটক ও নাট্যকার সম্বন্ধে প্রথম সংস্করণে যে-সব আলোচনা ছিল তাহাদের অনেক স্থলেই সম্পূর্ণ নূতন ও বহুবিস্তৃত আলোচনা সংযোজিত হইয়াছে।

২। প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য নাটকগুলি লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।

৩। আধুনিক নাটক ও নাট্য-আন্দোলন সম্বন্ধে নানা মৌলিক ও তথ্যপূর্ণ বিষয় লিখিত হইয়াছে।

৪। সাঙ্কেতিকতা ও রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

৫। পরিশিষ্টে বাংলা নাটক, নাট্যশালা ও নাট্য-সমালোচনা সম্বন্ধে মৌলিক প্রবন্ধসমূহ সংযোজিত হইয়াছে।

৬। সম্পূর্ণ নূতন রীতিতে বাংলা নাটকের যুগবিভাগ ও বিষয়বিভাগ করা হইয়াছে।

৭। সমাজ-আন্দোলনের পটভূমিতে সমাজচেতনার সূত্র অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ নাট্য-যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

উপরিলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে আকার ও প্রকারের দিক দিয়া এই দ্বিতীয় সংস্করণকে বোধ হয় অনায়াসে একখানি নূতন গ্রন্থই বলা যায়।

আলোচ্য সংস্করণের প্রকাশ-সম্পর্কে অনেকের কাছেই আমার ঋণ স্বীকার করা প্রয়োজন। যাঁহারা অনুক্ষণ নানা উৎসাহ ও উপদেশ দিয়া এ গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি। আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি-ভবনের সহকর্মিগণ, বিশেষভাবে অগ্রজ-প্রতিম জগদীশ ভট্টাচার্যের কাছে যে প্রেরণা ও উৎসাহ পাইয়াছি তাহা আমি কোনদিন ভুলিব না। নানা গ্রন্থাগারের কর্মিগণ প্রসন্নচিত্তে আমার নানা বইয়ের দাবী যেভাবে পূরণ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের কাছে আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনাদিবাবু এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজ গ্রন্থাগারের শ্রীসলিলকুমার ঘোষ ও শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে চাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত মহাশয় কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পড়িতে দিয়া আমার উপকার করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুহ মহাশয় এ বইয়ের প্রকাশ ব্যাপারে অনেক সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার কাছেও আমি গভীর ঋণ স্বীকার করিতেছি। 'জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্সে'র অধিকর্তা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাশ বিশেষ আগ্রহের সহিত এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ও কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাকে আমার কৃতজ্ঞ অন্তরের অজস্র সাধুবাদ জানাইতেছি। পরিশেষে কল্পনা প্রেসের অন্যতম পরিচালক শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডলকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এ বইয়ের সুচারু মুদ্রণের জন্য তিনি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। ইতি—

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ
কলিকাতা।
১লা আষাঢ়, ১৩৬২
ইং—১৬ই জুন, ১৯৫৫

বিনত নিবেদক—
**অজিতকুমার ঘোষ**

# প্রথম সংস্করণের নিবেদন

বাংলা রঙ্গালয় সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু বাংলা নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে এ যাবত ধারাবাহিক এবং বিস্তৃত আলোচনা হয় নাই। অধ্যাপনা কালে এই অভাব বোধ করিয়াছি, অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মুখেও বাংলা নাট্য-সমালোচনা গ্রন্থের অভাব বশত তাহাদের অসুবিধার কথা শুনিয়াছি। আলোচ্য পুস্তক প্রণয়নের পরিকল্পনা যাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলাম তাঁহারা সকলেই আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়াছেন। কিন্তু লিখিতে আরম্ভ করিয়াই আমার কার্যের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিলাম। একে তো সমগ্র নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা দুরূহ ব্যাপার, ইহার জন্য অশেষ সতর্কতা এবং বিশেষ দায়িত্বশীলতার প্রয়োজন; তদুপরি বর্তমানে বাংলা নাট্যাবলী একত্রে সংগ্রহ করাও এক দুঃসাধ্য কর্ম। অনেক নাট্যকারের নাটকসমূহ এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, সেই সব নাটক জোগাড় করিতে আমাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। বহু জায়গা হইতে বহুতর ক্লেশ স্বীকার করিয়া তবে নাটকসমূহ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

আলোচ্য পুস্তকের নাম দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে ইহাতে সমুদয় নাট্যকারের ইতিহাস নিবদ্ধ হইয়াছে তবে ভুল হইবে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামক গ্রন্থের মধ্যে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন আমিও তাহা অনুসরণ করিয়াছি; অর্থাৎ, বিস্তৃত এবং বিশ্লেষণপূর্ণ আলোচনার জন্য আমি কেবল প্রথমশ্রেণীর নাট্যকারদের মধ্যে আমার সমালোচনা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছি। শ্রীকুমারবাবুর ভাষা ও সমালোচনা-রীতির প্রভাবও এই গ্রন্থে লক্ষিত হইবে। প্রথমশ্রেণীর নাট্যকারদের আলোচনা দ্বারা আমি বাংলা নাটকের ইতিহাসের মূল ধারা ও গতিগুলির পরিচয় দেখাইতে পারিয়াছি বলিয়াই আমার বিশ্বাস। অবশ্য দুই একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার হয়তো আমার ইতিহাস হইতে বাদ গিয়াছেন। তবে আমার মনে হয়, আমার ইতিহাস-বহির্ভূত কোনো নাট্যকারই প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারেন না। যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের সমস্ত নাট্যকারদের সন্ধান লইতে উৎসুক তাঁহারা আমার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড) পড়িলে উপকৃত হইবেন।

সকলেই লক্ষ্য করিবেন যে এই গ্রন্থে আমি সর্বত্র পাশ্চাত্য সমালোচনার মানদণ্ডে নাটকসমূহের আলোচনা করিয়াছি, প্রাচ্য অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসারী আলোচনা করি নাই, অবশ্য ইহাতে আমার অধিকারও নাই। পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলেই বাংলা নাটকের জন্ম; সুতরাং, এই নাটক বিশ্লেষণে পাশ্চাত্য রীতি প্রয়োগ করাই বিধেয় বলিয়া মনে করি। নাটকের আলোচনার জন্য বহু প্রসিদ্ধ সমালোচনা-গ্রন্থ আমাকে পড়িতে হইয়াছে, পাদ-টীকায় সেই সব গ্রন্থের নাম আমি উল্লেখ করিয়াছি। উপরন্তু সর্বশেষে একটি গ্রন্থ-পঞ্জী

সন্নিবেশ করিয়া আমার ঋণ স্বীকার করিয়াছি। অধ্যাপক নিকলের 'The Theory of Drama' আমার সমালোচনা-রীতির মূল ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি। নাট্যকারগণ এবং তাঁহাদের রচিত নাট্যাবলীর ঐতিহাসিক ক্রমিকতা সম্বন্ধে আমি ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। সমালোচনা সম্বন্ধে আমি যথাসম্ভব নিরপেক্ষ পথ অনুসরণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। কোনো স্থলে বিশেষ পক্ষপাতিত্বের দ্বারা চালিত হই নাই বলিয়াই আমার ধারণা। অনেক নাট্যকার সম্বন্ধে প্রাথমিক এবং স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়াছি, জীবিত নাট্যকারদের সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছি। হয়তো অনেক স্থলে আমার সমালোচনা ঠিক হয় নাই, হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচারে ভুল করিয়াছি, অক্ষমতা ও অর্বাচীনতা বশত হয়তো বহু জায়গায় সাহসিক মন্তব্য করিয়া বসিয়াছি, সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন।

গ্রন্থের বিষয়-বিভাগ সম্বন্ধে দুই একটি ব্যাখ্যামূলক কথা বলা প্রয়োজন। এ রকম বিষয়-বিভাগ অভিনব সন্দেহ নাই, এবং সুধী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ব্যক্তিগণ ইহা কিভাবে গ্রহণ করেন তাহা জানিতে আমি বিশেষ উৎসুক। নাটকের ইতিহাসকে আমি পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট এক খানা নাটকরূপে কল্পনা করিয়াছি। প্রাগাধুনিক নাটক সাধারণত পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত থাকিত। এই পাচ অঙ্কের মধ্যে নাটকের ক্রিয়ার ( action ) পাঁচ প্রকার বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকিত, যথা —Exposition, Growth or Development, Climax, Fall, Catastrophe or Denouement। প্রথম অঙ্কে নাট্যকার ক্রিয়ার বীজ বপন করিয়া ইহার ভবিষ্যৎ গতির আভাস জানাইয়া দেন, দ্বিতীয় অঙ্কে নাটকীয় ঘটনা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, তৃতীয় অঙ্কে নাট্যকলার চরমোৎকর্ষ—উচ্ছ্বসিত ভাবের প্রবল সংঘাতে দর্শকের মন আবেগকম্পমান হইয়া উঠে, চতুর্থ অঙ্কে ঘটনার আবেগ ও দ্রুততার পতন এবং শেষ অঙ্কে প্রত্যাশিত মিলন অথবা বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। নাটকের পঞ্চাঙ্ক ব্যতীত আর একটি অঙ্গও কোনো কোনো নাটকে থাকে, ইহাকে প্রস্তাবনা ( Prologue ) বলা হয়। নাটকের গোড়ায় সংস্থিত হইয়া ইহা নাট্কীয় বিষয়বস্তুর পূর্বাভাস জানাইয়া দেয়। বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাসের মূল ধারাকে নাটকের ক্রিয়ারূপে মনে করিয়া ইহার অন্তর্গত বিভিন্ন যুগ ও গতিকে এক একটি অঙ্করূপে আমি দেখাইয়াছি। কোনো কোনো স্থলে গর্ভাঙ্ক সন্নিবেশ করিয়া সূক্ষ্মতর বিভাগ দেখাইয়াছি।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে অনেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ; তাঁহাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় যথাক্রমে গ্রন্থের মুখবন্ধ ও পরিচায়িকা লিখিয়া গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইঁহারা দুইজনেই আমার ভক্তিভাজন অধ্যাপক, সুতরাং ইঁহাদের প্রতি আমার ঋণ চিরকালের, সামান্য স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ করা যাইবে না। সুকুমারবাবু বরাবর এই পুস্তক সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহ ও উপদেশ

দিয়াছেন, তাঁহার স্নেহ লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। পূজনীয় পিতৃদেব মহাশয় নিরবচ্ছিন্নভাবে তাগিদ ও উৎসাহ না দিলে হয়তো গ্রন্থপ্রকাশে বিলম্ব ঘটিত, তাঁহাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যাঁহারা পুস্তক দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। দৌলতপুর কলেজের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক গোপাল-চন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাকে অনেক বই পড়িবার সুযোগ দিয়াছেন। যশোহরের বিশিষ্ট নাট্যানুরাগী স্বর্গত অপূর্বকুমার দাশগুপ্ত বহু আধুনিক নাটক পড়িতে দিয়াছিলেন। যে সব সহকর্মী আমাকে এই গ্রন্থ রচনা করিতে উৎসাহ দিয়াছেন তাঁহাদিগকেও আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার ভগ্নী শ্রীমতী বেলা ঘোষ এবং ছাত্রী শ্রীমতী গৌরী দাশগুপ্তা পুস্তকের পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া দিয়াছেন, ইঁহাদের কাছেও আমি ঋণ স্বীকার করিতেছি। শৈলেন প্রেসের শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মণ্ডল আমার অনেক প্রকার খেয়াল ও উপদ্রব সহ্য করিয়া মুদ্রণ বিষয়ে আন্তরিকতা দেখাইয়াছেন।

অশেষ পরিশ্রম সহকারে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি। যদি ইহা যথার্থই ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়ক হয়, এবং সুধীজনের সমাদর লাভ করিতে পারে তবেই পরিশ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব। গ্রন্থ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার নির্দেশ ও মতামত ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে। ইতি—

মাইকেল মধুসূদন কলেজ
যশোহর
১।৬।৪৬

বিনত নিবেদক—
শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ

# সূচীপত্র

## অবতরণিকা



## প্রস্তাবনা



## প্রথম অঙ্ক



### প্রথম গর্ভাঙ্ক (ক)



### প্রথম গর্ভাঙ্ক (খ)



### দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

( মাইকেল-দীনবন্ধু পর্ব )



### তৃতীয় গর্ভাঙ্ক



## দ্বিতীয় অঙ্ক

### প্রথম গর্ভাঙ্ক

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক



# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম গর্ভাঙ্ক



## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক



# চতুর্থ অঙ্ক



# পরিশিষ্ট

# অবতরণিকা

## নাটকের উৎপত্তি

অনুকরণ করিবার সহজাত প্রবৃত্তি হইতে নাটকের উৎপত্তি। মানুষ অপরের কথা, ভাব ও ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া পুনরায় তাহা নকল করিতে ভালোবাসে। এই প্রবৃত্তি আদিম, অসভ্য মানুষ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। অসভ্য লোকদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নাটকের জন্ম হয় নাই বটে, কিন্তু তাহারাও সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়া তাহাদের অনুকরণ-প্রচেষ্টাকে রূপায়িত করিয়া তুলিত। নৃত্য মানুষের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম কলা। আদিম সমাজে নৃত্যের মধ্য দিয়া লোকে ধর্মভাব এবং হৃদয়ভাব প্রকাশ করিত,১ সমস্ত প্রকার ক্রিয়া-কর্ম অনুষ্ঠানে এই নৃত্যের প্রচলন ছিল।২ সঙ্গীত তাল এবং সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া এই নৃত্যের উদ্বোধনেই সাহায্য করিত। এই সঙ্গীতসম্বলিত ভাবপ্রকাশক নৃত্যই ক্রমে ক্রমে নাটকের অভিনয়ে পরিণতি লাভ করে। ভারতীয় নাটকের উৎপত্তিও এই নৃত্য হইতে হইয়াছে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। 'নৃৎ' ধাতু হইতে 'নাটক' এই কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নৃত্য হইতে ভারতীয় নাটকের জন্ম—এই মত Oldenberg প্রভৃতির সহিত Keith সাহেবও পোষণ করিয়াছেন।৩

প্রাচীনকালে ধর্মসাধনা এবং কলাচর্চা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। ধর্মসাধনার বিচিত্র প্রকার ও উপায়ের মধ্য দিয়া বিভিন্ন কলার বিকাশ ঘটিত। নাট্যকলার উদ্ভবও এই ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে হইয়াছিল। গ্রীসদেশে Dionysus দেবতার পূজায় যে সঙ্গীতের (Dithyramb song) প্রচলন ছিল তাহা হইতে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি এবং ঐ দেবতার উৎসবে হাস্যপরিহাসযুক্ত শোভাযাত্রা ও সঙ্গীত (Phallic song) হইতে কমেডির সৃষ্টি। ভারতীয় নাটকের মূলও প্রাচীন ধর্মের মধ্যে নিহিত। কথিত আছে ব্রহ্মা নাট্যবেদ নামক পঞ্চম বেদ প্রণয়ন করেন। চতুর্বেদ হইতে নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি এই নূতন

১। Dancing is the primitive expression alike of religion and of love—of religion from the earliest times we know of and of love from a period long anterior to the coming of man,

The art of dancing—*Selected Essays* by Havelock Ellis, p. 180.

২। For all the solemn occasions of life, bridals and for funerals, for seed time and harvest, for war and for peace, for all these things there were dances'. *Ibid*, p. 131.

৩। 'Hence the doctrine which has the approval of Oldenberg and which finds the origin of the drama in the sacred dance, of course, accompanied by gesture of pantomic character, combined with song, and later enriched by dialogue, this would give rise to the drama. *Sanskrit Drama*, p. 26.

বেদ সৃষ্টি করেন।১ ব্রহ্মা এই বেদ তাঁহার শিষ্য ভরতমুনিকে শিক্ষা দেন। ভরতের দ্বারা নাট্যবেদ জগতে প্রচার লাভ করে।

ভারতীয় নাটকের ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে বৈদিক সময় হইতে আলোচনা করিতে হইবে। বেদের অনেক স্তোত্র কথোপকথনের আকারে রচিত। এই সব স্তোত্রই নৃত্যগীতের সহিত যুক্ত হইয়া নিয়মানুবদ্ধ নাটকে পরিণতি লাভ করিয়াছিল অনেকে ইহা অনুমান করেন।২ বৈদিক যুগের পর রামায়ণ এবং মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের অনেক স্থলে নাটকের উল্লেখ দেখা যায়।৩ ইহাতে ধারণা হয় তৎকালে নাটক ও নাটকের অভিনয় প্রচলিত ছিল। তবে রামায়ণ এবং মহাভারতের পরেই যে নাটকের যথার্থ এবং পূর্ণাবয়ব বিকাশ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অধ্যাপক কিথ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে রামায়ণ এবং মহাভারতের অংশবিশেষের আবৃত্তি হইতে ক্রমে ক্রমে নাটকের উদ্ভব হয়।৪ পরবর্তী নাট্যসাহিত্যের উপর মহাকাব্য দুইখানির প্রভাব যে বিশেষ কার্যকর হইয়াছিল তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভাস, ভবভূতি প্রভৃতি নাট্যকার রামায়ণের প্রতি তাঁহাদের ঋণ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রামায়ণের কুশ এবং লব হইতে নাটকের ভূমিকা বুঝাইতে কুশীলব এই কথাটির প্রচলন হইয়া আসিতেছে।

## সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস

সংস্কৃত নাটকের সূচনা কবে হইয়াছিল তাহা লইয়া নানা মতভেদ আছে। কিছুকাল পূর্বে ভাসের নাট্যাবলী আবিষ্কৃত হওয়ার পরে অনেকে তাঁহাকে খৃঃ পূঃ তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীর নাট্যকার বলিয়া মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ডাঃকিথ এবং উইণ্টারনিৎস প্রভৃতি বিশারদগণ কিন্তু ভাসকে অশ্বঘোষের পরবর্তী বলিয়াছেন। যাহা হউক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে যে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব এবং বিকাশ হইয়াছিল এই সম্বন্ধে মতানৈক্য কম। প্রথম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত নাটকের গৌরবময় বিকাশ চলিয়াছিল।

১। 'In order to prepare this Natyaveda or Gandharva Veda ( Gan-dharva or dharma, Gan or Song being its chief component ), Brahma is said to have taken the elements of recitation from the Rig-Veda, four kinds of acting or the art of mimicry from the Yayurveda, songs from the Samaveda, and emotions, passions, and sentiments from the Atharvaveda'. *The Indian Stage* by H. N. Das Gupta, p. 3.

২। 'These hymns were combined with the dances in the festivals of the gods, which soon assumed a more or less conventional form. Thus, from the union of dance and song, to which were afterwards added narrative recitation, and first sung then spoken dialogue, was gradually evolved the acted drama.

***Encyclopaedia Britannica*** **( Cambridge Edition).**

৩। *The Indian Stage*—পৃঃ ২৬-২৯ দ্রষ্টব্য।

৪। ......'There is abundant evidence of the strong influence on the development of the drama exercised by the recitation of the epics.'

সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের মধ্যে ভারতীয় সাহিত্য-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিরাজমান রহিয়াছে।১

সংস্কৃত নাটকের অসাধারণ উৎকর্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াও একথা মনে না করিয়া পারা যায় না যে, এই নাট্যসাহিত্যের বিকাশ ও আবেদন অতি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। জাতির ভাব ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করাই যদি নাটকের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে এই নাট্যসাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্য বলা চলে না। দেশের সর্বসাধারণের হৃদয়ের সহিত ইহার কোনো সচল যোগাযোগ ছিল না।২ সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি বুদ্ধিজীবী বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দ্বারাই হইয়াছিল। এই সব অধ্যাত্মনিমগ্নচিত্ত, বাস্তববিমুখ, জ্ঞানীকুলর্ষভ ব্রাহ্মণদের বিশিষ্ট মত ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা এই নাটকের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল।৩ অন্য কোনো শ্রেণী ও বর্ণের প্রভাব ইহাতে আশ্রয় লাভ করিতে পারে নাই। নাটক প্রণয়নের পর ইহার অভিনয়ও মুষ্টিমেয় অভিজাত ব্যক্তির সম্মুখে হইত। গ্রীসদেশে উন্মুক্ত আকাশতলে ত্রিশ হাজার দর্শক সমবেত হইয়া যেমন মানবজীবনের নিগূঢ় সমস্যাসকল দেখিতে পারিত, ভারতে গণসাধারণের তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। ভারতের রঙ্গালয়ের কথা চিন্তা করিলে ঐশ্বর্য জাঁকজমকের এক অপরূপ তরঙ্গলীলা চোখের সম্মুখে খেলিতে থাকে। সুদৃশ্য, সুসজ্জিত গৃহে রত্ন-সিংহাসনে পরিপূর্ণ মর্যাদায় সভাপতি অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন। অন্তঃপুরের রমণীবৃন্দ, সভাসদগণ, রাজন্যবর্গ এবং বিপ্রকুল চতুর্দিকে যথাযোগ্য স্থানে আসীন—সর্বত্র অটল গাম্ভীর্য রাজকীয় আভিজাত্যের সহিত সঙ্গতি স্থাপন করিয়া অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। ইহার মধ্যে দেশের সর্বসাধারণের সহজ প্রবেশাধিকার ছিল না,৪ থাকা সম্ভবও নহে। সুতরাং দেশের বৃহত্তর মানব সম্প্রদায় যে তাহাদের নাট্যরসভোগেচ্ছাকে তৃপ্ত করিতে পারিত না তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। সংস্কৃত নাটক এত বেশী অলঙ্কারপূর্ণ ও কবিত্বসমৃদ্ধ হইবার কারণ—ইহা কতিপয় নির্বাচিত জ্ঞানী এবং রসজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্যই লিখিত হইত, দেশের অধিকাংশ অশিক্ষিত সাধারণ লোকের কথা নাট্যকার চিন্তা করিতেন না।

১। ডাঃ কিথের মত উল্লেখযোগ্য—'The Sanskrit drama may legitimately be regarded as the highest product of Indian poetry and as summing up in itself the final conception of literary art achieved by the very self-conscious creators of Indian literature.'
*Sanskrit Drama*, p. 276..

২। The Indian drama cannot be described as national in the broadest and highest sense of the word; it is in short, the drama of a literary class, though as such it exhibits many of the noblest and most refined, as well as of the most characteristic, features of Hindu religion and civilization.' *Encyclopaedia Britannica* ( Cambridge Edition ).

৩। Thd drama bears, therefore, essential trace of its connexion with the Brahmins. They were idealist in outlook, capable of large generalizations, but regardless of accuracy in detail, and to create a realistic drama was wholly incompatible with their temperament.' *Sanskrit Drama* by Keith, p. 276.

৪। ডাঃ কিথ বলিয়াছেন শূদ্রদের জন্য আসন নির্দিষ্ট থাকিলেও, ইহারা সম্ভবতঃ রাজ অনুগ্রহজীবী সামান্য শূদ্র সম্প্রদায় ছিল—'The rules regarding the play-house contemplate the presence of the Sudra, but that is a vague term, and may apply to a very restricted class of royal hangers on.' *Sanskrit Drama*, p. 379.

একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত নাটকের প্রণয়ন এবং অভিনয় চলিয়াছিল। ইহার পরে মুসলমানদের দ্বারা ভারত বিজিত হইলে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিলোপ ঘটে। অবশ্য পূর্ব হইতেই ইহার অবনতির সূচনা হইয়াছিল। সংস্কৃত নাটকের বিকাশ মুষ্টিমেয় জনসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ইহার ভাষার সহিত লোকের কথ্য ভাষার পার্থক্য উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছিল বলিয়াই ইহার পুষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল।

সংস্কৃত নাটকের সৃষ্টি এবং অভিনয় রাজাদের অনুগ্রহ এবং আনুকূল্যে হইয়া আসিয়াছিল। সেই রাজাদের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে নাটকেরও স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। সমগ্র মুসলমান রাজত্বে নাটকের পুনর্বিকাশ এবং রঙ্গালয়ের পুষ্টি হয় নাই। মুসলমানগণ নাট্যকলা ও অভিনয়-প্রথার ঘোর বিরোধী। পৃথিবীর কোথাও তাঁহারা নাটকের উদ্ভাবন করিতে সাহায্য করেন নাই।১ শিক্ষা এবং আমোদের এই শ্রেষ্ঠ উপায়টী তাঁহাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। মুসলমানদের আগমনে বাংলা সাহিত্যের অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।২ তাঁহারা বাংলা ভাষা চর্চায় এবং বাংলা সাহিত্য প্রণয়নে অশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা নাটকের বিরোধী ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের আমলে নাটকের বিকাশ হয় নাই। কিন্তু নাট্যরস উপভোগ করিবার চিরন্তন ইচ্ছা মানুষের মনে বাস করিতেছে। যে কোন উপায়েই হউক সে এই ইচ্ছাকে তৃপ্ত করিবেই। নাট্য ভারতী রাজদরবার হইতে নির্বাসিত হইলেন বটে, কিন্তু সাধারণের হৃদ্‌শতদলে তাঁহার আসন লাভ হইল। তবে রাজকীয় আনুকূল্য না পাইলে বহু ব্যয়সাধ্য নাট্যালয় স্থাপিত হইতে পারে না এবং সমৃদ্ধ, সুনিয়মাবদ্ধ নাটকেরও উৎপত্তি সম্ভব নহে। সুতরাং দেশের লোক রঙ্গশালা এবং নাটক পাইল না বটে, কিন্তু অন্য আর এক অতি সহজ ও সুলভ উপায়ে তাহারা নাট্যরস ভোগ করিতে সক্ষম হইল। যাত্রার প্রসার এইভাবেই হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের মধ্যেও দেশের সর্বসাধারণ নিজেদের যে প্রাণের প্রতিধ্বনি শুনিতে পায় নাই, এতদিন পরে সেই রাজসম্মান-বঞ্চিত, ধূলামাটি-চর্চিত যাত্রার মধ্যে তাহা শুনিতে পাইল। উন্মত্ত আগ্রহে তাহারা ইহা বরণ করিয়া লইল।

## যাত্রা

### ( ক ) উৎপত্তি ও বিকাশ

যাত্রা কথাটি অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। অতীতে কোন দেবতার লীলা উপলক্ষে লোকেরা এক জায়গা হইতে অন্য আর এক জায়গায় গমন করিয়া নাচ গানের সঙ্গে সেই দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিত। ইহাই যাত্রা নামে অভিহিত ছিল। সুতরাং

১। Generally, indeed. we know of no Mahomedan nation that has accomplished, anything in dramatic poetry, or even had any notion of it.'

*Dramatic Art and Literature* by Schlegel. p. 34.

২। 'আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।'

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন (ষষ্ঠ সং), পৃঃ ১১৫।

প্রথমত যাত্রা বলিতে উৎসব উপলক্ষে গমন এই ব্যাপারটি অপরিহার্য ছিল। কালক্রমে কোন স্থানে গমন না করিয়া একই স্থানে বসিয়া দেবলীলা অভিনয় করা হইত। এইভাবে দেবযাত্রা অভিনেতব্য যাত্রারূপ লাভ করে।

দেবতার সম্মুখে নৃত্যগীতাদির প্রচলন বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদের কালে যজ্ঞস্থলে আনন্দবিধানের জন্য গান, বংশদণ্ড হস্তে নৃত্য, স্তব, বন্দনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত। পৌরাণিক যুগে দেবতার স্নান-উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও উৎসবের প্রচলন হইল।১ বৌদ্ধযুগে রথোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। ফাহিয়ানের বর্ণনায় জানা যায় যে, জ্যৈষ্ঠ মাসের ৮ই তারিখে বিভিন্ন সুসজ্জিত রথে বুদ্ধাদিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া রাজপথে শোভাযাত্রা সহকারে সেই রথগুলি টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত। শোভাযাত্রার মধ্যে নৃত্যগীত ও ক্রীড়াকৌতুকাদি অনুষ্ঠিত হইত। বহুদূর হইতে অগণিত নরনারী এই রথযাত্রা উৎসব দেখিতে সমবেত হইত। বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ন ক্রমে ক্রমে মূর্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং বুদ্ধের বামপার্শ্বে ধর্ম স্ত্রীবেশে উপবেশন করিলেন ও সঙ্ঘ পুরুষবেশে তাঁহার দক্ষিণ স্থান গ্রহণ করিলেন। এই ত্রিমূর্তিই জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রায় পরিণত হইয়াছেন। বৌদ্ধরথযাত্রা জগন্নাথদেবের রথযাত্রায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের পর বঙ্গদেশে শৈব ও সূর্য পূজার প্রচার হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন সৌরোৎসব সর্বাপেক্ষা আদি উৎসব এবং এই উৎসব হইতে অন্যান্য উৎসবের উৎপত্তি হইয়াছে।২ সূর্যদেবতা অতি প্রাচীন কালেই শিবঠাকুরে রূপান্তরিত হইয়া যান।৩ এই শিবঠাকুরের উৎসব বহুকাল ধরিয়া বিচিত্ররূপে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, সনৎকুমার সংহিতা, বায়বীয় সংহিতা ইত্যাদি পুরাণে নৃত্যগীতাদিসহ শিব-শক্তির উৎসবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। 'ফাল্গুনমাসে শিবের মহোৎসব, চৈত্রমাসে দোলোৎসব এবং বৈশাখে শিবের পুষ্পমহালয় উপলক্ষে শোভাযাত্রা বিধি দেখা যায়।৪ ধর্মসংহিতায় শিবের সম্মুখে নৃত্যগীত ও হাস্য-কৌতুকের বর্ণনা রহিয়াছে।৫

শিবোৎসবের ধারা ও প্রকৃতি আলোচনা করিলে প্রাচীন গ্রীক দেবতা Dionysus এর সঙ্গে আমাদের শিবঠাকুরের আশ্চর্য মিল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। শিব যে অনার্য সমাজ হইতে আসিয়াছেন তাহা পণ্ডিতদের আলোচনা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি।

---

১। বৈদিক সমাজের যজ্ঞান্তে স্নান উৎসবের অনুষ্ঠান লইয়া একটা শোভাযাত্রা বাহির করিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই, ক্রমে সেই 'অবিভৃথ' স্নান ব্যাপার লইয়া রাজারা যথেষ্ট শোভাযাত্রা ও উৎসবের আয়োজন করিলেন। পল্লীসমাজ ধীরে ধীরে এই প্রকার শোভাযাত্রা বিবিধ উৎসবের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিবে।
আদ্যের গম্ভীরা—হরিদাস পালিত, পৃঃ ১৫৭।

২। 'বাস্তবিক প্রায় সকল প্রাচীন উৎসবেরই আদি ভিত্তি সৌরোৎসব। সূর্যের যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল উৎসব হইত এবং উহাদের প্রধান অঙ্গ নাট্যাভিনয় ছিল বলিয়া নাট্যাভিনয়ের নাম 'যাত্রা' হইয়াছে।'
বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—মন্মথ মোহন বসু, পৃঃ ৪১

৩। ঐ, পৃঃ ৪১ দ্রষ্টব্য।

৪। আদ্যের গম্ভীরা, পৃঃ ২৮৭।

৫। 'রুদ্রং গায়ন্তি নৃত্যন্তি সর্বাঃ কপটমাতরঃ।
কাচিদ্ গায়ন্তি নৃত্যন্তি রময়ন্তি হসন্তি চ॥ ধর্মসংহিতা, ৫৫।

কালক্রমে আর্যসমাজে তিনি যতই আর্যরূপ লাভ করুন না কেন লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁহার আদি অনার্যরূপ অবিকৃতরূপে চলিয়া আসিয়াছে। শিবের ছড়া, শিবায়ন, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে তাঁহার এই অনার্য গ্রাম্য রূপই পরিস্ফুট হইয়াছে।

শিবঠাকুর শস্যোৎপাদক কৃষক-দেবতা।১ গ্রামের কৃষক নরনারী আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়া তাঁহাকেই বন্দনা জানাইত। গ্রীকদেবতা Dionysusও এরূপ একজন গ্রাম্য শস্য-দেবতা।২ শিবের ন্যায় Dionysusও লিঙ্গমূর্তিতে পূজিত হইতেন। শিব গঞ্জিকা ও সিদ্ধিসেবী, Dionysusও আসবদেবতা। Dionysusএর শীতকালীন উৎসব হইতে কমেডি,৩ এবং বসন্তকালীন উৎসব হইতে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি।৪ শিবোৎসব হইতেও ক্রমে ক্রমে নাটক ও যাত্রার উদ্ভব হইয়াছিল এ অনুমান অসঙ্গত নহে।৫

শিবোৎসব বর্তমানে গম্ভীরা বা গাজন উৎসবে পরিণত হইয়াছে। গম্ভীরা উৎসবে নৃত্যগীত, শোভাযাত্রা ও সাজসজ্জাসহকারে নানা রঙতামাসা দেখান হইয়া থাকে। গম্ভীরা-মণ্ডপে ভূত, প্রেত, রাম লক্ষ্মণ, হনুমান, শিবদুর্গা, বুড়াবুড়ী নৃত্য ইত্যাদি কৌতুককর অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এই সব অনুষ্ঠানে নানাপ্রকার মুখা বা মুখোস ব্যবহৃত হয়। 'হনুমান-মুখা-অনুষ্ঠান গম্ভীরা উৎসবের এক প্রধান আমোদ-অঙ্গ। নৃত্য-গীত ও হাস্যকৌতুকপূর্ণ এই গম্ভীরা-উৎসবের মধ্যে যাত্রার আদি উপাদান নিহিত রহিয়াছে এই ধারণা অমূলক নহে।

মঙ্গলগান, লোকসঙ্গীত, পালাগান প্রভৃতির মধ্যে যাত্রার অঙ্কুর বিদ্যমান ছিল। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে নৃত্য ও গীতোৎসবের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্য-গুলিতে ধর্মপূজা উপলক্ষে গীতবাদ্য ও নৃত্যানুষ্ঠানের বিবরণ নিবদ্ধ রহিয়াছে।৬ মঙ্গলচণ্ডীর পূজাতেও নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল। 'চামর, মন্দিরা, খোল, তানপুরা লইয়া মঙ্গলচণ্ডীর গান হইত। মূলগায়েন, দোহারগণ ও বায়েন এই গীতের প্রধান অঙ্গ ছিল। মূলগায়েন ও দোহারগণ মন্দিরা লইয়া তালে তালে নাচিত এবং গান গাহিত।৭ মনসার ভাসান ও খোল

১। একটি গম্ভীরা গানে কৃষক শিবের কৃষিকর্মের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—
বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভুমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিবঠাকুর বুনিলেন কার্পাস॥

২। As to the attributes of Dionysus, he was essentially, in the original conception, a rural god—the god of trees, and fruits, and vegetable produce of various kinds.'

*The Tragic Drama of the Greeks* by A. E. Haigh (Oxford). p. 5.

৩। The winter festivals are associated with the birth of comedy.

*Ibid*, p. 13.

৪। The tragic drama on the other hand is to be traced back to the spring festivals of Dionysus, p. 13.

৫। 'আমাদের দেশে যে শিবোৎসব উপলক্ষেই নাটকের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা শিবঠাকুরের নটরাজ, নটেশ, নটনাথ, মহানট, আদিনট, প্রভৃতি নাম হইতেই বেশ বুঝা যায়।—বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃঃ ৯।

৬। 'পুজকে প্রণাম খাটে পদ্য বাদ্য গীত নাটে
যোগ যজ্ঞে জাগিল যামিনী।' —ঘনরামের ধর্মমঙ্গল।

৭। আদ্যের গম্ভীরা, পৃঃ ৩০২।

মন্দিরা লইয়া পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে গাওয়া হয়। এই ভাসান গানের গায়কগণ বেহুলা-লখিন্দর কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রের অনুরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আসরে নাচিয়া গাহিয়া থাকে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' কৃষ্ণলীলার আদি নাট্যরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। এই কাব্যগুলির গান ও সংলাপ হইতে পরবর্তী কালের যাত্রাগানের যে প্রেরণা আসিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ঝুমুর ও ধামালী গানেও লৌকিক নৃত্যগীতের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে।১ এই সব নৃত্যগীতের প্রভাব যে যাত্রার উপর বিস্তৃত হইয়াছিল তাহাও অনুমান করা চলে। রামায়ণ মহাভারত হইতে বিভিন্ন করুণ ও হাস্যমূলক ঘটনা অবলম্বন করিয়া লৌকিক গান ও অভিনয়ের ধারাও বহু প্রাচীন কাল হইতে বাঙালী জনগণের মানসক্ষেত্রকে রসপ্লাবিত করিয়া আসিয়াছে।

মঙ্গলগান ও রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পূর্বে পাঁচালী ছন্দে গীত হইত। পাঁচালীর দুই অঙ্গ—গান ও ছড়া বা পয়ার।২ গানের মুখটুকু ধ্রুব বা স্থিরপদ আর বাকিটুকু অন্তরা। ছড়া বা বর্ণনাময় অংশ গায়ক দ্রুত আবৃত্তি করিয়া যাইত। মূল গায়কের ডান হাতে মন্দিরা, বাম হাতে চামর ও পায়ে নূপুর থাকিত। তাহার সহিত দোহার ও মৃদঙ্গবাদকও থাকিত। প্রথমত পাঁচালীর মধ্যে একজন মূল গায়ক গান করিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পাঁচালীর প্রসার ও পালাগানের দীর্ঘতার ফলে একজনের স্থলে দুই বা ততোধিক গায়ক ও অভিনেতার আমদানী হইতে লাগিল। এইভাবে পাঁচালীর বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি ঘটিতেছিল এবং কালক্রমে এই পাঁচালী হইতেই জনপ্রিয় যাত্রা-গানের উদ্ভব হইল।৩ উনবিংশ শতাব্দীতে নব্য পাঁচালীর জন্ম হইয়াছে। এই পাঁচালীর ধারা উদ্ভূত হইয়াছে কীর্তন গান হইতে।

যাত্রার উদ্ভব ও বিকাশ কি ভাবে হইয়াছে উপরে তাহার আলোচনা করা হইল। বাংলা যাত্রার আদি উপাদান কোথায় কোথায় নিহিত ছিল তাহাও উল্লেখ করা

১। একটি ঝুমর গানের পরিচয় দেওয়া যাক। মানিনী রাধিকা কোপ করিয়া বলিতেছেন—

'ছুঁয়োনা ছুঁয়ো না কপট আমারে পাপিনী সম্ভোগ করেছে তোমারে
ধিক হে নিঠুর কালা।
শুনহে অশুচি! উচ্ছিষ্টেতে রুচি,
না করে ব্রজেন্দ্র বালা হে॥

অনুতপ্ত কৃষ্ণ অনুতাপ করিয়া বলিতেছেন—

'তোমা বিনে বিধুমুখি! চারিদিকে শূন্য দেখি
প্রাণ বিরহে জ্বালায় রে।
ফুলশরে হানে হিয়া পরে মোরে জোরে মদনায় রে॥'

ঝুমর রসমঞ্জরী—ভবপ্রীতানন্দ ওঝা।

২। 'পাঁচালীতে গান থাকে ও ছড়া বা পয়ার থাকে। ইহাতেই সাধারণ ভাষায় বলে, খানিক তার রাগ রাগিণী আর খানিক তার মুখজবানী।' —'জয়দেব', অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

৩। 'পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব।'

—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং)—ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৫৫৯।

৪। 'পাঁচালীর সহিত কীর্তন গানের তফাৎ হইতেছে যে পাঁচালীতে গায়ন অঙ্গভঙ্গি করিত, কখনো কখনো পাত্রপাত্রীর সাজও সাজিত এবং মধ্যে মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা করিত। —ঐ, পৃঃ ৯৫৯॥

হইয়াছে। চৈতন্যদেবের পূর্বে যে যাত্রার অভিনয় হইত তাহার প্রমাণ আমরা চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে পাইয়াছি। তবে এই যাত্রা কিরূপ ছিল তাহা ভালভাবে জানিবার উপায় নাই। নাটকের অনুকরণে এই যাত্রার উদ্ভব হইয়াছিল এবং সম্ভবত কীর্তন ও কবিগানের প্রচারের ফলে ইহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

মহাপ্রভু প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুত্থানের পূর্বে আমাদের দেশে যেমন শাক্তধর্ম প্রভাবশালী ছিল, তেমনি এই ধর্মের মহিমাজ্ঞাপক শক্তিযাত্রাসমূহ দেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল।১ মহাপ্রভুর সময়ে বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রা দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে থাকে। এই কৃষ্ণযাত্রাসমূহ সর্বসাধারণের প্রাণরসের সহিত যুক্ত হইয়া দেশের জাতীয় অনুষ্ঠানের রূপ লাভ করে। গীতিমূলক, ভক্তিরসাত্মক বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারা পুষ্ট হইয়াছিল বলিয়া যাত্রার মধ্যে গান এবং ভক্তিরসের আধিক্য পরিলক্ষিত। অবশ্য এই গান ও ভক্তির আতিশয্য যাত্রার নাটকীয় উপাদান গড়িয়া উঠার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হইয়াছিল বটে,২ কিন্তু সঙ্গীতরসলিপ্সু ভক্তিভাবাপ্লুত জনগণ এই যাত্রাকে তাহাদের মনোভাবের পোষক বলিয়া বরণ করিয়া লইল।

বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু স্বয়ং যাত্রাগানের অনুষ্ঠান করিতেন। 'চৈতন্য মঙ্গল' এবং 'চৈতন্য ভাগবতে' আছে যে চন্দ্রশেখরের গৃহে তিনি সপারিষদ কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। 'চৈতন্য চরিতামৃতে' আছে যে তিনি শ্রীবাস আচার্য্যের গৃহে একদিন কৃষ্ণলীলা প্রকট করেন। নীলাচলে থাকিবার সময়েও তিনি অহোরাত্র নৃত্যগীত অভিনয়ে বিভোর থাকিতেন। চৈতন্যদেবের এইরূপ অভিনয়লীলা দর্শনেই কিছু পরবর্তী কালে যে বৈষ্ণব গোস্বামীগণ সংস্কৃত ভাষায় নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন এই ধারণা অমূলক নহে।৩ রূপ গোস্বামী, কবিকর্ণপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবদের নাটকসমূহ বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাদের ব্যাপক অভিনয় ও প্রভাব কখনও দেখা যায় নাই। সুতরাং বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের মূল্য বেশি নয়।

মহাপ্রভুর পরে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যাত্রাকে 'কালীয় দমন' এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হইত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে এই যাত্রা বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। আদি যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে শিশুরাম, পরমানন্দ অধিকারী, সুদাম অধিকারী প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ। তবে এই সব যাত্রাওয়ালাদের যাত্রার কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বর্তমান নাই।

---

১। 'The ancient Jatras that were prevalent in Bengal were about the cult of Sakti worship, and dealt mainly with the death of Sambhu, Nisambhu, or of other Asuras'. *The Indian Stage* (Vol. 1) by H. N. Das Gupta, p. 112.

২। The influence of Baisnabism therefore, was hardly favourable to the development of the inherent dramatic elements of the Jatra; on the other hand it cherished its musical peculiarities, [developed its melodramatic tendency, and emphasised its religious predilections.

*Bengali literature in the 19th. century* by Dr. S. K. De, pp. 449-450.

৩। 'যদিও আমরা চৈতন্যের সমসাময়িক বা তদভিনীত কোন-নাটকের নিদর্শন পাই নাই, তথাপি বলিতে পারি যে, শ্রীচৈতন্যের প্রাণোন্মাদকর কৃষ্ণলীলা-গীতির অভিনয় সন্দর্শন করিয়া বা তদ্বিবরণ অবগত হইয়া তৎপরবর্তী বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ নাটক রচনা করিতে মনোযোগী হন।' যাত্রা—বিশ্বকোষ।

## ( খ ) কালীয়দমন

কালীয়দমন যাত্রার১ প্রবর্তন করেন শিশুরাম। জয়দেবের জন্মভূমি বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে শিশুরামের বাসস্থান ছিল। বাংলা সন ১১৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে শিশুরাম বিদ্যমান ছিলেন। শিশুরামের শিষ্য ছিলেন পরমানন্দ অধিকারী। বীরভূম জেলার অন্তর্গত 'রামবাটী' গ্রামে পরমানন্দ বাস করিতেন। পরমানন্দ তাঁহার যাত্রায় ব্যাসদেবকে আমদানী করিয়া কিছু বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গবন্দনার পর কিছুক্ষণ ব্যাসদেবের রসিকতা চলিত। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ, নারদমুনি অথবা কোন গোপী আসিয়া তাঁহার সহিত যে আলাপ সুরু করিতেন তাহা হইতেই কোন্ পালার অভিনয় হইবে তাহা জানা যাইত। পরমানন্দের পর শ্রীদাম-সুবলের যাত্রা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। শ্রীদাম-সুবলের শিষ্য ছিলেন বদন। তিনি হাওড়ার নিকটবর্ত্তী শালকিয়া গ্রামে বাস করিতেন। কৃষ্ণপ্রেমিক ভাববিভোর বদন কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিতে করিতে ভাবাশ্রুধারায় ভাসিয়া যাইতেন। দান, মান ও মাথুর লইয়া বদনের যাত্রার পালা গঠিত হইয়াছিল। লোচন অধিকারীর 'অক্রূর সংবাদ' ও 'নিমাইসন্ন্যাসও' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

বদন ও লোচনের পর গোবিন্দ অধিকারী যাত্রাগানে সারা বাংলা দেশের মধ্যে এক প্রবল উন্মাদনা আনয়ন করেন। গোবিন্দ দূতী সাজিয়া স্বয়ং গানের আসরে দেখা দিতেন। তিনি নৌকাবিলাস পালার প্রথম রচয়িতা। নৌকাবিলাস বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। গোবিন্দ অধিকারী দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কাটোয়া নিবাসী পীতাম্বর অধিকারী ও শ্রীরামপুর বাসী রাধাকৃষ্ণ দাস যাত্রাগান রচনা করিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণ দানখণ্ড পালা যোগ করিয়া খুবই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। গোবিন্দ অধিকারীর শিষ্য নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ও প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ছিলেন।২ গোবিন্দের দলে শিক্ষা লাভ করিয়া পরে তিনি নিজেই স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। নীলকণ্ঠের অপর দুই ভাই শ্রীকণ্ঠ ও সিতিকণ্ঠও যাত্রাগান করিতেন। নীলকণ্ঠ কয়েকদিন ধরিয়া মান ও মাথুরলীলা গাহিতেন। কংসবধ, চণ্ডালিনী উদ্ধার, যযাতির যজ্ঞ প্রভৃতি কয়েকটি পালাও তিনি রচনা করেন। তিনি ভক্তহৃদয় স্বভাবকবি ছিলেন।

গোবিন্দ অধিকারীর সমসাময়িক আর দুইজন যাত্রা-রচয়িতার অসামান্য প্রভাব ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন—একজন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অপরজন মধুসূদন কান। কৃষ্ণকমল পূর্ববঙ্গের অধিবাসী না হইলেও পূর্ববঙ্গের যাত্রাগানের উপর তাঁহার প্রভাব অসাধারণ। তাঁহার রাই উন্মাদিনী, স্বপ্নবিলাস, বিচিত্র বিলাস প্রভৃতি পালাগান পূর্ববঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতাকে ভাবের বন্যায় প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল। ভাববিহ্বলা,

---

১। 'প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে কীর্তন, মঙ্গলগান ও ঝুমুর মিশাইয়া নাটকের অনুসরণে বর্তমান কালীয়দমন যাত্রার সৃষ্টি হয়।'

কালীয়দমন যাত্রা ও নীলকণ্ঠ—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ( শারদীয় যুগান্তর, ১৩৫৯ )

২। নীলকণ্ঠ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৩৫৯ সালের শারদীয় যুগান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

বিরহাতুরা রাধার যে চিত্র তিনি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা অশ্রুকরুণ বাঙালীর হৃদয়ে চির-অঙ্কিত হইয়া আছে।

মধুসূদন কানের ঢপ-কীর্ত্তন তৎকালীন জনচিত্তে বিশেষ রুচিকর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি 'অক্রূর সংবাদ', 'কলঙ্কভঞ্জন', 'মাথুর', 'প্রভাস' প্রভৃতি পালা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'মাথুর' পালার একটি পদ উদ্ধৃত হইতেছে—

কোন্ গুণে আর কর হে গুণ্ গুণ্
রে নিগুর্ণ অলি।
এগুণে যে বাড়ে আগুন,
আমরা দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলি।
যার গুণেতে তুমি গুণী, হারায়েছি সেইগুণী,
সদা মরি সে আগুনি,
আবার কি গুণগুণ শুনালি॥

মধুসূদন বিনে ভৃঙ্গ হতেছে বিহ্বল,
মধুসূদন বিনে মধুর আশা ত বিফল,
তবে কেন মধুকর, বৃথা মধু মধু কর,
যাওনা কেন মধুপুর সেখানে মধু সকলি॥

ও ভৃঙ্গ ত্রিভঙ্গ বিনে সকলি বিগুণ,
যে ছিল অতি নিগুর্ণ বেড়েছে তার গুণ,
আমরা সব হয়েছি নিগুর্ণ
কেবল বৃদ্ধি বিচ্ছেদ—আগুন,
সূদন কয় জুড়াবে আগুন যদি এসেন বনমালী॥

কৃষ্ণযাত্রা তৎকালে অধিক প্রচলিত হইলেও রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, মনসার ভাসান-যাত্রা প্রভৃতিও কিছু কিছু প্রচলিত ছিল। বাঁকুড়ার অন্তর্গত রামজীবনপুরবাসী আনন্দ ও জয়চন্দ্র অধিকারীর 'রামযাত্রা' ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভের 'চণ্ডীযাত্রা' এবং লাউসেন বড়ালের 'মনসার ভাসান' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তখনকার যাত্রার মধ্যে বেশভূষার কোন নিখুঁত পারিপাট্য ছিল না। 'সাজের মধ্যে কৃষ্ণের পীতধড়া ও চূড়া এবং যশোমতী বৃন্দাদি সখী ও গোপবালকগণের পরিধেয় একটী রঙ্গিন কাপড়ের ঘেরাটোপ (কতকাংশে চোগার মত), তাহার সম্মুখের দুই পার্শ্বে পেশওয়াজের ন্যায় জরির পাড় বসান থাকিত'।[১] বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে খোল, করতাল ও বেহালা ব্যবহৃত হইত। অভিনয়ের সময় সর্বত্রই একটা সুর থাকিত।

১। বিশ্বকোষ।

## ( গ ) সখের দল

কালীয়দমন যাত্রার পরে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সখের যাত্রাদলের প্রচলন হইল। এই নূতন যাত্রার মধ্যে ক্রমে ক্রমে নাটকীয় উপাদান প্রবেশ করিতে লাগিল। দেবকাহিনী বর্জ্জন করিয়া মানবীয় কাহিনী অবলম্বনের দিকে এই যাত্রার প্রবণতা দেখা গেল। মানবীয় কাহিনীর মধ্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীই যাত্রাওয়ালাদের মধে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। বিদ্যাসুন্দর যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে খেমটা নাচ প্রবর্তিত হয়। বিদ্যা, মালিনী, রাধা, সীতা, রাম, কৃষ্ণ, কেহই নাচের আসরে বাদ পড়িতেন না। অশ্লীল ও রুচিবিগর্হিত সঙ্গীত ও হাবভাব এই যাত্রাগানের অঙ্গ ছিল।

বরাহনগরের ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রথম বিদ্যাসুন্দর দল গঠন করেন। ঠাকুরদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্প্রদায়ের ঢুলী রামধন মিস্ত্রী নূতন দল গঠন করেন। ইহার পর প্যারীমোহনের বেলতলার দল প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। এই দল প্রথমে 'নলদময়ন্তী' ও পরে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় করে।

প্যারীমোহনের যাত্রার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অনেকেই বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ে উদ্‌যোগী হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। নবীনচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের বহু দৃশ্য চিত্রায়িত করিয়া দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। নাটকীয় দৃশ্যের অনুকূল আবহ শব্দ সৃষ্টি করিয়া তিনি অভিনয়ে বাস্তবতা আনিয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয়-ধারার প্রবর্তন করেন।

ইহার পর গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের নাম করিতে হয়। গোপাল প্রথমে সখের দল আরম্ভ করিলেও শেষকালে তাঁগার দল পেশাদারী হইয়া উঠে। কাশীনাথ নামক একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ও নর্তক গোপালের দলে ছিল। সমসাময়িক চুটকীরসের খরিদ্দারদের কাছে গোপালের গানের কাটতি ছিল অজস্র।

গোপালের শিষ্য কৈলাসচন্দ্র বারুইয়ের যাত্রাদলও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালে কবিদের হাতে স্বভাববর্ণনা কিরূপ হাল্কা ও হাস্যকর হইয়া উঠিত তাহার একটি দৃষ্টান্ত কৈলাসের রচনা হইতে দেওয়া যাইতেছে—

'গা তোলরে নিশা অবসান প্রাণ।
বাঁশবনে ডাকে কাক, মালী কাটে কপিশাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।'

এই সব প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ছাড়া আরও বহুতর খ্যাত ও অখ্যাত যাত্রাওয়ালা বিদ্যাসুন্দর পালার অভিনয় করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পেশাদারী দলও গঠন করিয়াছিলেন। যাত্রার পরবর্তী পর্বের নাম অপেরা বা গীতাভিনয়। সেই পর্বের ধারা বর্তমান কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

## ( ঘ ) যাত্রার বিকৃতি

ভারতচন্দ্রের পরে আমাদের সাহিত্যের ধারা বিকৃত এবং নিম্ন রুচির খাতে বহিতে

লাগিল। মুসলমান রাজত্বের অবসান হইয়াছে, অথচ ইংরাজ শাসনও দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। রাজ্যের মধ্যে অরাজকতা, সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং লোকের মনে শৈথিল্য এবং অনাস্থা বাস করিতেছে। এই রকম অবস্থার মধ্যে কোনো স্থায়ী প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সাহিত্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, এবং ভারতচন্দ্রের পরে সেই কারণেই বহুদিন পর্যন্ত কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের অভ্যুদয় হয় নাই। অথচ দেশের লোকের রসপিপাসা বর্তমান, তাহাই মিটাইযার জন্য এই সময়ে কবি, পাঁচালী, তর্জা, আফ আখড়াই এবং যাত্রা প্রভৃতি গানের ব্যাপক চর্চা হইতে লাগিল। এই সব গানের রচয়িতারা ভারতচন্দ্রের সাহিত্য-আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ গুরুর কবিত্বশক্তি, এবং রচনানৈপুণ্য তাহাদের মধ্যে ছিল না, কিন্তু গুরুর অশ্লীলতা অবাধ এবং অপরিমিত প্রশ্রয় পাইয়া তাহাদের সাহিত্যের হাট জমাইয়া রাখিল। নিম্নরুচিগ্রস্ত দর্শকবৃন্দও এই বিকৃত রস-প্রবাহে মনের আনন্দে সাঁতার কাটিতে লাগিল। রুচি এবং শালীনতার লেশটুকু পর্যন্ত তাহারা নির্বিকার চিত্তে নির্বাসন দিয়াছিল। তখনকার যাত্রাও সাহিত্যের এই সর্বাঙ্গীন বিকৃত অশ্লীলতার সহিত যোগ রক্ষা করিয়াছিল। শিথিল কাহিনী অবলম্বন করিয়া দুর্বল অভিনয়ের মধ্য দিয়া যাত্রাওয়ালারা লোকের ইতর প্রবৃত্তির বিকৃত পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া চলিল। কিন্তু ইহা নিঃশেষের পূর্বলক্ষণ। দেশের লোক চিরকাল এই ধরণের অস্বাভাবিক রস গ্রহণ করে না। ইংরাজ প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রুচির সংস্পর্শে আসিয়া দেশের লোকের চাহিদা ও রসবোধ ক্রমে ক্রমে বদলাইতে লাগিল। মার্জিত এবং উন্নত আমোদ উপভোগের ইচ্ছা তাহাদের মনে জন্মিতে লাগিল। থিয়েটার এবং নাটকের মধ্যে সেই ইচ্ছা চরিতার্থ হইল। সেই ইতিহাস আমরা পরে আলোচনা করিব।

### ( ঙ ) অপেরা বা গীতাভিনয়

রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা এবং নাটকের অভিনয় সুরু হইবার পরে যাত্রার জনপ্রিয়তা কমিয়া গেল, অথচ একেবারে লুপ্ত হইল না। নাট্যশালা স্থাপন বহু আয়াস এবং ব্যয়সাধ্য ছিল, সকলের দ্বারা এবং সর্বত্র ইহা সম্ভব ছিল না। তখন রঙ্গমঞ্চে-অভিনীত নাটকের অনুকরণে এক নূতন ধরণের যাত্রার উদ্ভব হইল। এই যাত্রার মধ্যে সুসমঞ্জস কাহিনী, এবং নাটকের ন্যায় অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ সবই ছিল। তবে ইহা প্রকাশ্য স্থানে দৃশ্যপট-বিরহিত হইয়া অভিনীত হইত, এবং ইহাতে সঙ্গীতের আধিক্য লক্ষ্য করা যাইত। এই নূতন প্রকৃতি-বিশিষ্ট যাত্রা অপেরা বা গীতাভিনয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।[১] বর্তমানেও এই জাতীয় যাত্রার অভিনয়ই দেশের মধ্যে হইয়া থাকে।

---

১। ইংরেজি stage বা রঙ্গমঞ্চের অভিনবতা বাঙ্গালা নাটকে জনপ্রিয়তার প্রথম এবং প্রধান হেতু। অথচ রঙ্গমঞ্চ খাড়া করিতে যে পরিমাণ অর্থ ও সামর্থ্য প্রয়োজন তাহা সর্বত্র সব সময় সুলভ ছিল না। এই অসুবিধা এড়াইবার জন্যই নূতন পদ্ধতির যাত্রার সৃষ্টি হইল, এই যাত্রা গান নাটক অভিনয়-পদ্ধতিরই অনুরূপ, কেবল রঙ্গমঞ্চ নাই এবং সঙ্গীতের বাহুল্য আছে। দৃশ্যপট প্রভৃতির অভাবের ক্ষতিপূরণ হইত দীর্ঘ স্বগত অথবা প্রকাশ্য উক্তি দ্বারা। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের গোড়ায় নূতন যাত্রা-পদ্ধতির—গীতাভিনয়ের প্রবর্তন হইল।
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ( ২য় খণ্ড )—ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১০৭।

## (চ) যাত্রার বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব

বহুকাল পূর্বে যাত্রার প্রচলন হইয়াছিল, অথচ এখন পর্যন্তও ইহা একেবারে লুপ্ত হইল না। নানা সময়ে নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া ইহা এখনো টি'কিয়া রহিয়াছে, অথচ ইহার দুই আধুনিক প্রতিদ্বন্দ্বী—আভিজাত্যগর্বিত থিয়েটার এবং যন্ত্রচালিত সিনেমা ইহা অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী। ইহাতে মনে হয় আমাদের দেশের সত্যকার জাতীয় আনন্দ বিতরণ করিতে পারিয়াছে যাত্রা; থিয়েটার নয়, সিনেমাও নয়। মুষ্টিমেয় শহরবাসীর কথা বলিতেছি না, দেশের যে সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে অগণিত নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমজীবিদের দ্বারা—তাহারা আজও পর্যন্ত তাহাদের প্রাণরসের সন্ধান পাইতেছে এই যাত্রার মধ্যে। আজও দেখিতে পাই কোনো উৎসব বা ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে তীর্থযাত্রীর আগ্রহ লইয়া দূর দূরান্তর হইতে কাতারে কাতারে লোক আসিয়া জড় হইতেছে। বাধাবিঘ্ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিছুতেই তাহাদের উৎসাহ দমিত হইতেছে না। স্বল্পালোকিত বিস্তীর্ণ মাঠ বা ময়দানে অনাবৃত আকাশ তলে সহস্র সহস্র দর্শক প্রতীক্ষা-ব্যাকুল চিত্তে অবিচলিত ধৈর্যে অভিনয় দেখিয়া যাইতেছে। অভিনেতাদের মধ্যে অধিকাংশ তাহাদেরই মত নিরক্ষর—তাহাদের উচ্চারণ অশুদ্ধ, কণ্ঠস্বর কৃত্রিম, অঙ্গভঙ্গি হাস্যকর, সাজসজ্জা অসঙ্গত—অথচ দর্শকদের বিন্দুমাত্র অভিযোগ কিংবা নালিশ নাই। গায়কদের বিকৃত সুরের ডুয়েট গান শুনিয়া তাহারা হর্ষধ্বনি করিয়া ওঠে, এবং অভিনেতা করুণ রসের স্থলে গলা ফাটাইয়া রৌদ্র রসাত্মক অভিনয় করিলে তাহারা করতালির দ্বারা সম্বর্ধনা জানায়। এইরূপ অনবদ্য অভিনয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহারা দেখিয়া যায়। এতটুকু ক্লান্তি, এতটুকু বিরক্তি নাই। শিক্ষিত সভ্যতাভিমানী সমাজ এই সব যাত্রাওয়ালা এবং দর্শকদিগকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করিতে পারেন, কিন্তু যাহার সহিত এত অধিক সংখ্যক লোকের অন্তরের যোগাযোগ রহিয়াছে তাহার মূল্য ও প্রভাব একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

যাত্রা আমাদের দেশে এত জনপ্রিয় হইবার কারণ, ইহাতে কোনো বিশেষ ধর্মভাবের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া দেখান হয়। আমাদের দেশের সাধারণ লোক ধর্মপ্রাণ। ভক্তি-রসাত্মক উপাখ্যান অপেক্ষা তাহাদের কাছে প্রিয়তর আর কিছুই নাই। সেজন্য যাত্রা তাহাদের মর্মস্থানে আবেদন জানাইয়াছে। নাটকে কোনো বিশেষ কাহিনী অবলম্বন করিয়া ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া চরিত্রগুলিকে বিকশিত করিয়া তোলা হয়, কিন্তু যাত্রার পাত্রপাত্রীদের পরিণতি নিজেদের চিন্তা এবং কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, সেখানে সব কিছুই অলৌকিক দেবলীলার দ্বারা নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। সেজন্য যাত্রায় কোনো চরিত্র-প্রাধান্য কিংবা ঘটনার স্বাধীন গতি লক্ষ্য করা যায় না। সঙ্গীতের অপরিমিত আতিশয্য যাত্রার আর একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য। সঙ্গীতের সুরে ভাববিহ্বল চিত্ত অধিকতর তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, সেজন্য ইহাতে সঙ্গীতের এত প্রাধান্য। প্রত্যেক যাত্রার মধ্যে একটী চরিত্র অবধারিত

রূপে থাকিবে, সে বিবেক। এই বিবেকের কাজ গ্রীক নাটকের কোরাসের অনুরূপ।১ কোরাসের ন্যায় সে কাহিনীর সহিত যুক্ত না থাকিয়াও অভিনয়ে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। সে পাত্রপাত্রীর ভিতরকার মনের সন্ধান রাখে, কোনো চরিত্র মনের মধ্যে ষড়যন্ত্র অথবা সঙ্কল্প করিলে সে তাহা ব্যক্ত করিয়া তাহাকে তত্ত্বকথা শুনাইয়া দেয়। দর্শকদের সহানুভূতির সহিত তাহার সচল যোগ বিদ্যমান। থিয়েটারের তুলনায় যাত্রায় রস ফুটাইয়া তোলার প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে কোন পশ্চাদ্বর্তী দৃশ্যপট এবং পার্শ্ববর্তী আচ্ছাদন নাই। থিয়েটারের-মধ্যে আকস্মিক আগমন এবং নিষ্ক্রমণের যে সুযোগ আছে, এবং যেভাবে অভিনেতা নিজেকে যখন ইচ্ছা প্রকাশিত অথবা গুপ্ত করিতে পারে তাহাতে দর্শকদের মনে সহজেই বিভ্রম ( illusion ) জন্মিয়া যায়। কিন্তু যাত্রায় চতুর্দিক অনাবৃত ও উন্মুক্ত। সেখানে অভিনেতা যেন দর্শকদেরই মধ্যস্থ একজন। কখন যে তাহাদের মধ্য হইতে কে উঠিয়া অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিবে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অধুনা বাংলা দেশে যাত্রা অভিনয়ের সময় পাত্র পাত্রীগণ সাজঘর হইতে রঙ্গভূমিতে পদার্পণ করে। কিন্তু প্রাচীন কালে তাহারা সকলে সর্বক্ষণ আসরে বসিয়া থাকিত, এবং যখন যাহার অভিনয় করিয়া যাইত। হিন্দুস্থানীদের মধ্যে এই প্রথা এখনো বর্তমান রহিয়াছে।২

আমাদের দেশের যাত্রার উৎপত্তি ও বিকাশের সহিত ইংরাজী নাটকের ইতিহাসের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। যাত্রার ন্যায় ইংরাজী নাটকও ধর্মভাবকে আশ্রয় করিয়া জন্ম লইয়াছিল। এই ধর্মমূলক নাটক Mystery এবং Miracle নামে খ্যাত।৩ শাস্ত্রে বর্ণিত কাহিনী অবলম্বনে Mystery এবং মহাপুরুষদের জীবন অবলম্বনে Miracle রচিত হইত। প্রথম এই নাটকগুলি গীর্জায় এবং পরে বাজারে অভিনীত হইত। কিছুকাল পরে এই সব নাটক Morality এবং Interlude নামক নাটকে পরিণতি লাভ করে। অবশেষে Tragedy এবং Comedyর উদ্ভব হয়। Mystery এবং Miracle যেমন ক্রমে ক্রমে খাঁটি নাটক Tragedy ও Comedyতে রূপান্তরিত হইয়াছিল, আমাদের যাত্রা সেইভাবে পূর্ণাঙ্গ নাটকে পরিণত হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় নাই কেন সেই প্রশ্ন আমাদের মনে উত্থিত হয়। ইহার উত্তর ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় তাঁহার Bengali Literature in the 19th Century' নামক গ্রন্থে সুন্দরভাবে দিয়াছেন। পূর্বেই

---

১। গ্রীক কোরাস সম্বন্ধে W. M. Dixon তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ '*Tragedy*'তে বলিয়াছেন।

This band of singers—who employed an archaic dialect, who were remotely connected with the persons on the stage, were neither sharers in the action nor yet spectators only, witnesses who were present at the most private interviews, knew all and might have interfered at the most critical moments yet did not, observers who embroidered the text of the action with a running commentary or interrupted it by lyrical outbursts', p. 53.

২। 'যাত্রা'—বিশ্বকোষ।

৩। 'Mystery is applied to the stories taken from the scripture narrative, while Miracles are plays dealing with incidents in the lives of Saints and Martyrs.'

*History of English Literature* by A. Compton-Rickett, p.60.

বলা হইয়াছে যাত্রার মধ্যে দর্শকবৃন্দ কোনো মানবীয় সমস্যার অবতারণা দেখিতে চাহিত না, ইহাতে তাহাদের ধর্মবোধ উদ্বোধিত হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হইত। সেজন্য যাত্রায় কখনো কোনো নাটকীয় ক্রিয়া ('action) এবং সুসমঞ্জস কাহিনী সৃজন করিতে কেহই মনোযোগী হয় নাই, সঙ্গীতকেই ইহার প্রধান অঙ্গ করিয়া রাখিয়াছিল। ধর্মমোহ এবং শাস্ত্রানুগত্য হইতে মুক্ত হইয়া জগৎ এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিতে না পারিলে সাহিত্যের স্বাধীন বিকাশ ঘটিতে পারে না।১ আমাদের দেশের লোকেরা তাহা পারে নাই বলিয়া বস্তুনিষ্ঠ নাটক জন্মে নাই। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শ আমাদের চিরদিনকার আদর্শ ও সংস্কার বদলাইয়া গেল, এবং তখনি প্রথম বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল জাত হইল। মাত্র তখন হইতেই নাটকের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং বাংলা নাটকের বয়স এই মাত্র একশত বৎসর। এই সময়কার ইতিহাসই বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হইবে।

## বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস

সহস্র বৎসর পূর্বে নাট্যশালায় যে প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছিল তাহাই পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল। সহস্র বৎসর ধরিয়া নাট্যভারতীর মুখশ্রী অন্ধকারে অবগুণ্ঠিত হইয়া ছিল, নব আলোকস্পর্শে সেই অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে খসিয়া পড়িল। সেদিন দেশী ও বিদেশী নাট্যামোদী যাঁহারাই নাট্যশালার এই প্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন বাংলা নাটকের ইতিহাসে তাঁহারা চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বিকৃত যাত্রারসের নিস্তরঙ্গ স্রোতে যে জাতি এতদিন গা ঢালিয়া দিয়াছিল, নাট্যশালার নবোচ্ছ্বসিত রসধারা তাহাদিগকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। এই রসধারা বিদেশী মৃত্তিকা হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। কিন্তু ভাবোন্মত বাঙালী সেদিন সহজেই ইহাকে প্রাণের মধ্যে বরণ করিয়া লইল।

যিনি সর্বপ্রথম নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন তিনি হইলেন হেরাসিম লেবেডেফ নামে একজন রুষদেশবাসী বিদেশী। তিনি Bengally Theatre নামে একটি নাট্যশালা স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে অভিনয়ের উদ্দেশে তাঁহার ভাষা-শিক্ষক গোলকনাথ দাসের দ্বারা Disguise ও Love is the Best Doctor নামক দুইখানি ইংরাজী প্রহসনের বাংলা অনুবাদ করাইলেন। প্রহসন দুইখানির মধ্যে বাঙালী দর্শকের

১। 'The prevalence of the rigoristic (sanyas) ideal and the natural prominence given to Sattvik over the Rajasik qualities fostered an indifference to mundane activities and an absorption in supermundane affairs which materially hampered free expansion of art, science and literature of the nation.

*Bengali literature in the 19th. Century* by Dr. S. K. De, p. 446.

রুচি অনুযায়ী অনেক দৃশ্য ও চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছিল।১ Disguise এর বাংলা অনুবাদ অভিনীত হইয়াছিল। সম্ভবত ইহাই প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক (১৭৯৫—২৭শে নভেম্বর)।

বিদেশাগত ইংরাজদের দ্বারা কয়েকটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল সাঁস্নুসি রঙ্গালয়। অবশ্য তাহার পূর্বেও চৌরঙ্গী থিয়েটার স্থাপিত হইয়াছিল, তবে এই রঙ্গালয়ে সাধারণ বাঙালী দর্শকের যাতায়াত ছিল না।২ সাঁস্নুসি রঙ্গালয়ে হোরেস হেমান উইলসন প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ইংরাজ অভিনয় করিতেন। ইহার অনেক পরে বিভিন্ন স্কুল কলেজে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত করিয়া যে সব অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল অনেক ইংরাজ সেগুলির পরিচালনা ও শিক্ষাদানে নিযুক্ত ছিলেন। ডেভিড হেয়ার একাডেমিতে অভিনীত 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' ও ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে অভিনীত 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' ও 'চতুর্থ হেনরীর' অভিনয় হইয়াছিল। এই সব নাট্যাভিনয় ইংরাজী-শিক্ষিত লোকেদের প্রশংসা উদ্রেক করিল, নাট্যশালার প্রতি নাট্যামোদী লোকেদের আগ্রহ উদ্দীপিত করিল, কিন্তু আপামর জনসাধারণের মনে পরিতৃপ্তি সঞ্চার করিতে পারিল না। ইংরাজী নাটকের ভাষা তাহাদের রসসম্ভোগে প্রধান বাধা হইয়া রহিল। বাঙালী কবে বাংলা নাটকের অভিনয় দ্বারা দেশের হৃদয় মাতাইয়া তুলিবে জনসাধারণ তাহার দিকে সাগ্রহে তাকাইয়া ছিল।

নাট্যশালা স্থাপনের চেষ্টা শুধু কেবল ইংরাজদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না, নাট্যপ্রিয় ধনশালী বাঙালীও এবিষয়ে বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়া উঠিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারই বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। ইহাতে জুলিয়াস সিজর ও উইলসন অনূদিত উত্তররামচরিতের অভিনয় হয়। বাঙালী পরিচালিত নাট্যশালায় প্রথম যে বাংলা নাটকের অভিনয় হয় তাহার নাম হইল 'বিদ্যাসুন্দর'। নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালায় নাটকখানি অভিনীত হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তাহা হইল নন্দকুমার রায় 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'। আশুতোষ দেব বা সাতুবাবুর বাড়িতে ইহার অভিনয় হয়। বাংলা নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালার প্রতি অনুরাগ ক্রমে ক্রমে ব্যাপক হইতে লাগিল এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ নাট্যশালা স্থাপনায় সচেষ্ট হইলেন এবং

---

১। লেবেডেফ তাঁহার 'A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects' গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন—

'I translated too English dramatic pieces, namely—'The Disguise', and 'Love is the Best Doctor' into the Bengali language, and having observed that the Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense, however purely expressed—I therefore fixed on those plays and which were most pleasantly filled up with a group of watchmen, chokey-dars; savoyards canera; thieves, ghoonia, lawyers, gumosta and amongst the rest a corps of petty plunderers.

২। মাইকেল মধুসূদনের জীবন চরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ ২০৯।

অল্পকালের মধ্যেই কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইল। তাহাদের মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য বাংলা নাটকের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল এবং ক্রমে ক্রমে বাংলা সাহিত্যের অভিনয়ে নাট্যকারগণ আসিয়া আসন গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইতে বাংলা নাটকের জন্মলাভের ইহাই হইল অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের জন্ম-সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল কিন্তু তাহার প্রকৃত জন্ম হইয়াছিল বহু পরে। লেবেডেফ ও নবীনচন্দ্র বসু ব্যতীত প্রথম দিকে কেহই বাংলা নাটকের অভিনয় দেখাইতে সাহস করেন নাই। বিদেশাগত নাট্যশালা বিদেশী নাটকেরই অভিনয়-স্থল হইয়া ছিল বহু কাল পর্য্যন্ত। এই সব নাটকের অভিনয় বাঙালী জনগণের নাট্য-তৃষ্ণা উদ্দীপিত করিল মাত্র, পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না। অথচ যাত্রা, হাফ আখড়াই, কবি, পাঁচালী প্রভৃতি দ্বারাও সেই তৃষ্ণা আর নিবারিত হইতে পারে না; কারণ ঐ সব নাট্যগীতের রসবিকৃতির জন্য উহাদের প্রতি একটি ঘৃণা ব্যাপক আকারে সমাজমনের মধ্যে সঞ্চিত হইতেছিল। সুতরাং নাটক চাই এবং সে নাটক বাংলা হওয়া দরকার। জনচিত্তের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা বাংলা নাটকের এক প্রবল প্রেরণা আনিয়া দিল এবং তাহারই ফলে বাংলা নাটকের আত্মপ্রকাশে আর বিলম্ব রহিল না।১ অবশ্য বাংলা নাটকের প্রাথমিক পর্যায়ে তাহার আত্মনির্ভরশীল রূপ আমরা দেখি না এবং তাহা দেখিতে প্রত্যাশাও করি না। সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহার আত্মবিশ্বাস আসিয়াছিল এবং যেদিন সে স্বাধীনভাবে চলিতে সুরু করিল সেদিন হইতে তাহার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইল।

১। In the absence of original Bengali plays they proceeded, influenced as they were by the charm of the English performances, to meet their want by enacting plays in English. But it hardly satisfied the 'dramatic appetite' of the general public, for it was all Greek to them. They had already imbibed an inordinate taste for the theatrical amusements and naturally looked forward to being entertained by appropriate plays written in their own language.'

*The Bengali Theatre*—S. P. Mookerjee, Calcutta Review (1924).

# প্রস্তাবনা

মধুসূদনের পূর্বে বাংলা নাটকের যথার্থ এবং পরিপূর্ণ রূপ দেখা যায় নাই। তাঁহার পূর্ব পর্যন্ত যে সব নাটক রচিত হইয়াছিল, সেইগুলিকে নাটক না বলিয়া নাটকের আভাস বলাই সঙ্গত। সেই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম প্রসিদ্ধ। অবশ্য ইঁহাদের নাটক কোনো অভিনব মৌলিকত্বের দাবী করিতে পারে না। সংস্কৃত সূতিকাগৃহের চিহ্ন ইহাদের অঙ্গে সুপরিস্ফুট। ইঁহারা ভোরের আকাশের ক্ষণস্থায়ী রক্তিমচ্ছটা মাত্র! সূর্যোদয়ের পর হইতেই ইঁহাদের অস্তিত্ব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য নাট্যধারার প্রস্তাবনায় ইঁহাদের একমাত্র স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে।

# অনুবাদ-যুগ

## ( হরচন্দ্র—কালীপ্রসন্ন—রামনারায়ণ )

অনুবাদক নাট্যকারদের দ্বারাই বাংলা নাটকের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরাজি ও সংস্কৃত উভয় প্রকার নাটকেরই অনুবাদ হইয়াছিল বটে কিন্তু অনুবাদ-যুগে ইংরাজি নাটকের কোন লক্ষণীয় প্রভাব বাংলা নাটকের উপর পতিত হয় নাই, ইংরাজি নাটক হইতে অনূদিত নাটকের সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত নাটকের রীতি ও আদর্শই এই সময় অনূদিত বাংলা নাট্যসাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। শুধু কেবল ভাষা নয়, আঙ্গিক ও ভাবচেতনার দিক দিয়াও নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাট্যধারাকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের অনুবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাবানুবাদ হইত এবং স্থানে স্থানে তাঁহারা যে দুই একটি স্বকপোলকল্পিত চরিত্র ও ঘটনা ঢুকাইয়া দিতেন না তাহাও নহে। অনুবাদক নাট্যকারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন।

### (১) হরচন্দ্র ঘোষ

অনুবাদকের মধ্যে প্রথমেই হরচন্দ্র ঘোষের নাম করা উচিত। হরচন্দ্রের প্রায় সব নাটকই কোনো না কোনো গ্রন্থের অনুবাদ। সুতরাং কাহিনীর দিক দিয়া মৌলিকতা দাবি করিবার তাঁহার কিছুই নাই। তাঁহার নাটকের ভাষা সংস্কৃত শব্দে আড়ষ্ট এবং নান্দী, সূত্রধার প্রভৃতি সংস্কৃত রীতিও ইহাতে আছে। দৃশ্যের স্থলে তিনি অঙ্গ এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন।

তাঁহার প্রথম নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫২) শেক্‌স্‌পীয়ারের 'Merchant of Venice' নাটকের ভাবানুবাদ। নাটকরে মধ্যে তিনি গদ্য ও পদ্য উভয় ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি দুই একটি নূতন চরিত্র আমদানী করিয়াছেন, এবং মূল নাটকের কোনো কোনো চরিত্রকে একটু নূতন ভাবে দেখাইয়াছেন।

'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৮) হরচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক। নাটকখানির ইংরাজী মুখবন্ধে লেখক বলিয়াছেন যে তিনি বিশেষ যত্নের সহিত ইহার বিষয়-বস্তু নির্বাচন করিয়াছেন এবং ইহার জন্য তিনি কোন শ্রমের ক্রুটি করেন নাই।১ তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে,'কৌরব

১। It now remains for me to add that the subject upon which I have written is of great interest, and the change which has been carefully introduced in it, being altogether new, and agreeable to the approved taste of the modern literati of the country, and no pains and expense having been spared to render the work useful, and acceptable, I indulge in the hope that it will meet with the approbation of the reader. —Preface.

বিয়োগে'র ন্যায় অনাটকীয় নাটক বাংলা সাহিত্যে আর একখানিও আছে কিনা সন্দেহ। নাট্যকার বলিয়াছেন যে ইংরাজী নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে তিনি তাঁহার নাটকখানি রচনা করিয়াছেন ১। কিন্তু একমাত্র পঞ্চাঙ্ক বিভাগ ব্যতীত ইংরাজী নাটকের কোন রীতিই ইহার মধ্যে নাই। সংলাপের স্বাভাবিকতা, গতিবেগ, ক্রিয়াদ্বন্দ্ব প্রভৃতি কিছুই ইহাতে নাই। একান্ত দুরূহ সংস্কৃত বাক্যের বিষম ভারে ইহার সংলাপ নিষ্প্রাণ আড়ষ্টতায় আবদ্ধ। সংলাপ সম্পূর্ণ বর্ণনাত্মক, মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি মহাভারতের বাংলা গদ্য অনুবাদ শুনিতেছি। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর হইতে আরম্ভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয় প্রভৃতির বজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্যন্ত ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তু সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। পঞ্চ পাণ্ডবতনয়ের হত্যায় পাণ্ডবগণের বিলাপ এবং কৌরবগণের মৃত্যুতে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কৌরব বধূদের খেদই নাটকের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রকাশভঙ্গি ও নাট্যকৌশলের দুর্বলতায় দুঃখশোকের অত্যধিক আতিশয্যও মর্ম পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে নাই। চরিত্রাঙ্কনে লেখকের অক্ষমতার জন্য কোন চরিত্রই সজীব রসমূর্তি লাভ করিতে পারে নাই।

হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটকের নাম 'চারুমুখ চিত্তহরা' (১৮৬৪)। ইহা 'Romeo and Juliet'এর অনুবাদ। এই নাটকখানাও তিনি দেশীয় লোকের রুচি অনুযায়ী মূল হইতে কিছু কিছু অদল বদল করিয়াছিলেন, এবং নাটকের সংযোগস্থল ভারতবর্ষে দেখাইয়াছেন। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী করিবার জন্য তিনি ইহাতে কথ্য ভাষা প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁহার সর্বশেষ নাটক 'রজত গিরি নন্দিনী' (১৮৭৪) ব্রহ্মদেশের এক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া প্রণয়ন করেন। নাটক হিসাবে ইহার কোনো উৎকর্ষ নাই।

হরচন্দ্রের কোনো নাটক অভিনীত হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে কোনো প্রমাণ নাই। কোন নাট্যমঞ্চের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও তাঁহার ছিল না। সুতরাং তাঁহার নাট্যাবলীও দেশের মধ্যে কোনো সাড়া ও প্রভাব আনিতে পারে নাই।২ বাংলা নাটকের ইতিহাসে তাঁহার মূল্য বেশি নহে।

১। একারণ আমি ঐ মহাগ্রন্থের কিয়দংশ এতাবতা রাজা দুর্যোধনের উরু ভাঙ্গাবধি ও অন্ধ রাজাদির বজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপূর্ব বৃত্তান্ত সুমার্জিত সাধু ভাষায় বহুলাংশ গদ্য ছন্দে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্য প্রবন্ধে ইংলণ্ডীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে রচনা করিয়া 'কৌরব বিয়োগ নাটক' এই আখ্যা দানে প্রকাশ করিলাম। —ভূমিকা

২। 'As there is no evidence of his works having ever been staged, he could have no practical influence on the theatre of the country except in the sense of having created a taste among the readers of his works'.

*Western Influence in Bengal Literature* by P. R. Sen, P. 225.

## (২) কালীপ্রসন্ন সিংহ

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব কৃতবিদ্য, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লোক বাঙালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বস্তুত একাধারে এরকম সর্বগুণান্বিত লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। অতি অল্প বয়সে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপূর্ব সাহিত্য-প্রতিভা, অতুলনীয় বদান্যতা এবং অশেষ সহৃদয়তাগুণে তিনি সকলের প্রশংসা এবং শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি হয়তো খুব উৎকৃষ্ট মৌলিক নাটক রচনা করেন নাই, কিন্তু তবুও নাটকের ইতিহাসে তাঁহার সম্মানিত স্থান আছে। কারণ রঙ্গালয় স্থাপন এবং বাংলা নাটকের অভিনয়ে এবং উৎসাহদানে তিনি ভবিষ্য নাট্যকারদের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।১

কালীপ্রসন্নের প্রথম নাট্য রচনা 'বাবু' নামক একখানি প্রহসন। ইহা কোথাও অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। রামনারায়ণ 'বেণীসংহার' অনুবাদ করিবার পর তিনিও একখানা সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করিতে মনস্থ করেন, এবং 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭) বাংলায় রূপান্তরিত করেন। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে ইহার অভিনয় হয়, এবং নাট্যকার নিজে পুরূরবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। নাট্যকার মূলের হুবহু অনুবাদ করিতে যাইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কারণ সংস্কৃত নাটকের দীর্ঘ উক্তি, উচ্ছ্বাস এবং কাব্যময়তা বাংলা নাটকে কৃত্রিম হইয়াছে।

'সাবিত্রী-সত্যবান' (১৮৫৮) নাট্যকারের মৌলিক রচনা। 'মহাভারতীয় বনপর্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানের সাবিত্রী-চরিত হইতে কেবল মর্মমাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে।' এই নাটকের মধ্যে ইংরাজী এবং সংস্কৃত উভয় নাট্যরীতিই অনুসরণ করা হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের তরল উচ্ছ্বাস এবং দীর্ঘ খেদ ও বিলাপ নাট্যকার বর্জন করিতে পারেন নাই। নাটকের চরিত্রসৃষ্টিও সরস ও প্রাণময় নয়।২

১। 'যে নাটকের দ্বারা সহজে সাধারণ্যে লোকশিক্ষা বিস্তৃত করা যায়, যে নাটকের অভিনয় দ্বারা জাতিকে উন্নত করা যায়, সেই নাটকের দ্বারা বঙ্গভাষাকে পুষ্ট করিবার জন্য কালীপ্রসন্ন যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত।'

কালীপ্রসন্ন সিংহ—মন্মথ নাথ ঘোষ, পৃঃ ৯২।

২। 'কথাবস্তু চিত্তাকর্ষক ভাবে গ্রথিত হইলেও নাটকখানি খুব উঁচু দরের নহে। দৃশ্যগুলি স্বল্পায়তন, ক্ষিপ্রগতি ও অবান্তর বিষয়ের বাহুল্য-বর্জিত, কিন্তু চরিত্রাঙ্কন বেশ স্পষ্ট বা পরিস্ফুট হয় নাই। গ্রন্থকার পুস্তকগত নায়ক নায়িকার আদর্শের আশ্রয় লইয়াছেন, জীবন্ত চিত্র আঁকিতে পারেন নাই।'

কালীপ্রসন্ন সিংহ ও তাঁহার নাট্যাবলী—ডাঃ সুশীল কুমার দে, প্রবাসী—আষাঢ় (১৩৩৮)

'মালতী মাধব' ( ১৮৫৮ ) ভবভূতির প্রসিদ্ধ নাটকের অনুবাদ। অবশ্য ইহা অবিকল অনুবাদ নহে।১ ইহা চার কাণ্ড ও বার অঙ্কে সমাপ্ত। নাটকটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে ইহার ভাষা।২ নির্ভুল চলিত ভাষায় যে ইহা আদ্যোপান্ত রচিত শুধু তাহাই নহে, সংস্কৃত ভাষার সন্ধি সমাস অলঙ্কারযুক্ত ভারগ্রস্ত আড়ষ্টতা হইতেও ইহা সর্বাংশে মুক্ত। অবশ্য 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র লেখকের পক্ষে এই ভাষা আশ্চর্য ও অভিনব নহে।

অনুবাদক নাট্যকারদের মধ্যে রামনারায়ণের কৃতিত্বও অনেকখানি, তবে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইয়াছে অন্যত্র—মৌলিক সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে। সেজন্য তাঁহার নাটকের আলোচনা পরে করা হইবে।

## মৌলিক নাটকের সূচনা
## ( কীর্তিবিলাস-ভদ্রার্জুন )

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাথমিক পর্বে 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুনে'র বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। ইহারাই হইল বাংলা নাটকের আত্মপ্রতিষ্ঠার গৌরবান্বিত পথিকৃৎ। দুর্বল হউক, দরিদ্র হউক, ইহারা যে অনুবাদের পরবশ্যতা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল তাহাই ইহাদের অসীম শক্তি ও অমেয় সম্পদ। এই দুইখানি নাটকই পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসরণ করিয়া লিখিত। তৎকালে যে নাটকগুলি রচিত হইয়াছিল সেগুলি প্রায় সবই সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী লিখিত। সুতরাং তৎকালীন প্রচলিত রীতি অতিক্রম করিয়া বিদেশী রীতিতে নাটক রচনার প্রচেষ্টা সাহসিক মৌলিকতা সন্দেহ নাই। বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ রূপ যে পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ অবলম্বন করিবে তাহার সূচনা আমরা এই নাটক দুইখানির মধ্যে পাই।

### কীর্তিবিলাস নাটক (১৮৫২)

প্রাথমিক নাটকগুলির মধ্যে 'কীর্তিবিলাসে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'কীর্তিবিলাস' বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিয়োগান্তক নাটক। তখনও বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য নাটকের ধারা প্রবর্তিত হয় নাই। তৎকালীন লেখকবৃন্দ সংস্কৃত নাটকের রীতি নিজেদের অপূর্ণাঙ্গ নাটকগুলির মধ্যে অক্ষমভাবে অনুবর্তন করিতেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বিষাদান্ত নাটক নিষিদ্ধ বলিয়া এই নিষেধ ভাঙিবার দুঃসাহস তখনও বাংলা নাটকে আসে নাই।

---

১। নাট্যকার 'বিজ্ঞাপনে' বলিয়াছেন—'বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের অবিকল লালিত্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা নিরর্থক, কারণ অবিকল অনুবাদিত গ্রন্থ সহজেই পাঠ করিতে ঘৃণা বোধ হয়। বিশেষতঃ প্রত্যেক পদের বাঙ্গালা অর্থ ও শব্দানুকরণে যথার্থ ভাব সংরক্ষণ করা কাহারও সাধ্য নহে।'

২। নাটকের ভাষা সম্বন্ধে নাট্যকার লিখিয়াছেন—'মদ্রচিত মৎপ্রণীত ও মদনুবাদিত অন্য অন্য নাটক হইতে মালতী মাধবের ভাষারও প্রভেদ হইয়াছে, কারণ অভিনয়ার্হ নাটক সকল ইদানিন্তন যে ভাষায় লিখিত হইতেছে আমিও সেইরূপ অবলম্বন করিয়া ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ করণ মানসে সচেষ্ট ছিলাম'।

—বিজ্ঞাপন।

সেই সময় লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত সংস্কৃত নাটকের অন্যায় আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। প্রচলিত নাট্যধারা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তিনি তাঁহার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এক কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। নাটকের ভূমিকায় যে কৈফিয়ত তিনি দিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রাচ্য নাট্যরীতি বর্জন করিয়া পাশ্চাত্য নাট্যরীতি পোষণ করিয়াছেন। ভূমিকায় নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা তিনি করিয়াছেন তাহা নানা দিক দিয়া অত্যন্ত মূল্যবান। লেখক যে অ্যারিস্টটলের Poetics পড়িয়াছিলেন তাহা তাঁহার আলোচনা হইতে জানা যায়। ট্র্যাজেডি আমাদিগকে দুঃখে অভিভূত করিলেও ইহা আমাদের চিত্তে এক অনির্বাচ্য মহৎ অনুভূতি জাগ্রত করে। ট্র্যাজেডির এই আনন্দজনকতা সম্বন্ধে নাট্যকার বলিয়াছেন—

অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে। অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, একারণ সেক্‌সপীয়ার নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন—

আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত ঐ শোক প্রয়াসী।১

যাঁহারা জীবনে মিলনের আনন্দই কেবল দেখেন, বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করেন না তাঁহারা জীবনকে অতি সামান্য ভাবেই বুঝিয়াছেন। মানুষের জীবনে যেমন সুখ আছে, তেমনি দুঃখও আছে, বোধহয় অনেক বেশি পরিমাণেই আছে। এই দুঃখের সার্থক রূপায়ণ যাঁহার রচনায় পরিস্ফুট হইয়াছে তিনিই তো সতিকার জীবন-রসিক ও সত্যদ্রষ্টা।২ লেখকের মত উদ্ধৃত করা হইল—

'ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন, যে ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার সময়ে তাহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাহি। ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তি মাত্র। জীবন ধারণ করিলেই ইষ্ট অনিষ্ট উভয়েরি ভোগী হইতে হইবে, ধার্মিক হইলেই যে আপদগ্রস্ত হইতে হইবে না, এমত নহে।'

১। ট্র্যাজেডি কেন আনন্দ দেয় সে সম্বন্ধে F. L. Lucas তাঁহার 'Tragedy' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। Lucas বলিয়াছেন, 'So the essence of tragedy reduces itself to this—the pleasure we take in a rendering of life both serious and true. It must be serious, whether or no it has incidentally comic relief. It must seem to matter, or the experience would belong to a different category and need a different name. And it must also seem true, or it wil not move us. It may be good for us, but that is not why we go to it......And, again tragedy may teach us to live more wisely, but that is not why we go to it, we go to have the experience, not to use it.

Tragedy by Lucas, p. 54-55.

২। Life is a comedy to those that think but a tragedy to those that feel'.

নাট্যাদর্শ সম্বন্ধে লেখকের সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় আমরা পাইলাম। সেই আদর্শ তিনি তাঁহার নাটকে কতখানি প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাই এখন আমাদের বিচার্য। কিন্তু নাটকখানি পড়িলেই সকলেরই মনে হইবে যে, লেখক যতবড় পণ্ডিত ছিলেন ততবড় স্রষ্টা ছিলেন না। তাঁহার মন ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যও ছিল না। কারণ ভূমিকায় যে সংস্কৃত নাটকের প্রতিবাদ তিনি করিয়াছেন নাটকে বোধ হয় অজ্ঞাতসারে তাহারই প্রতি আনুগত্য দেখাইয়া ফেলিয়াছেন। অবশ্য পাশ্চাত্য নাটকের ন্যায় 'কীর্তিবিলাস'ও পঞ্চাঙ্ক নাটক।১ কিন্তু সংস্কৃত নাটক অনুযায়ী আলোচ্য নাটকের গোড়ায় 'নান্দী' ও 'নান্দ্যতে সূত্রধার' রহিয়াছে। লেখকের ভাষা ও রচনারীতিও সংস্কৃতের ভারে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হইয়াছে। নাটকের মধ্যে যে সব অলঙ্কারসমৃদ্ধ সুদীর্ঘ খেদোক্তি রহিয়াছে সেগুলি সংস্কৃত নাটকের প্রভাবই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে।২

লেখকের গদ্যের মধ্যে যেমন আড়ম্বর পদ্যের মধ্যে আবার তেমনি চাপল্য। জায়গায় জায়গায় গুরু ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি যে পদ্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহা দ্বারা গুরু ভাব তো প্রকাশ পায়ই নাই, বরঞ্চ লঘু চাপল্যে ভাবের অধোগতি হইয়াছে। মরিবার সময়েও নায়িকা সৌদামিনীর মুখে পয়ারের ছড়া—

কামিনীর কোমল প্রাণে সহেনা যাতনা।
যে জানে সে জানে কেমন প্রেমের লাঞ্ছনা।

এই কবিতা পাঠকের মনে মৃত্যুজনিত বেদনা উদ্রেক করিতে পারে কি? লেখকের পদ্য পয়ারের নিগড়ে বাঁধা, সুতরাং সেই পদ্যের মধ্য দিয়া কি করিয়া গভীর দুঃখময় ভাব প্রকাশ করা সম্ভব? তৎকালে যাত্রা-পাঁচালীর মধ্যে যে অলঙ্কার-পঙ্কিল মরানদীর স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল লেখকের রচনায় তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।৩

১। প্রতি অঙ্কের অন্তর্গত দৃশ্যের নামের স্থলে লেখক 'অভিনয়' এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন।

২। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, রাজপুত্র তাঁহার মৃত বধূর জন্য বিলাপ করিতেছেন—

"অদ্য তোমার প্রিয় বদন দেখিতে পাইব তাহা স্বপ্নের অগোচর। হাঃ কি দর্শন করিতেছি—সমীরণ দ্বারা লপন বসন বারবার উন্মোচন হওয়াতে জ্যোতিরিঙ্গণ অবলোকন করিতেছি। প্রিয়ে গাত্রোত্থান করহ—উদ্বিগ্ন-চিত্তা হইয়া গত রজনী জাগরণপূর্বক শরীরের জড়তা এবং আলস্য জন্মিয়াছে। হে প্রাণাধিকে, আমার প্রমুখাৎ হৃদয় প্রফুল্ল হইবে—গাত্রোত্থান করহ, শোকাকুল হইয়া অকূল নিদ্রাসাগরে মগ্না—গাত্রোত্থান করহ—বিশ্লেষ আশঙ্কায় জ্ঞানশূন্য হইয়াছ" ইত্যাদি রামচন্দ্র অথবা পুরূরবার বিলাপ বলিয়া মনে হয় না কি?

৩। যমক-অনুপ্রাসের বাহুল্য তৎকালে যাত্রা-পাঁচালীর মধ্যে দেখা যাইত, আলোচ্য নাটকেও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে—

সই, রাখিব প্রাণ কেমনে।
দেশান্তরে থাকে কান্ত, সদা ভাবি মনে মনে।
নিঠুর নির্দয় কান্ত, আসিবেনা একান্ত, হইল মোর প্রাণান্ত, যাতনা সহে না প্রাণে।

সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার-কাহিনী অবলম্বন করিয়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। শীত-বসন্তের রূপকথায় বিমাতার নিষ্ঠুরতা বর্ণিত হইয়াছে। বিজয়-বসন্তের কাহিনী লইয়া বহু যাত্রা ও নাটক লেখা হইয়াছে, অমৃতলাল বসুর নাটকখানি তন্মধ্যে প্রধান। আলোচ্য নাটকেও কুৎসিত সপত্নী-পুত্র বিদ্বেষ এবং তাহারই নিষ্ঠুর পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখক ট্র্যাজেডি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেজন্য নাটকের শেষে সুলভ মিলন এবং গতানুগতিক ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়-দৃশ্য দেখান নাই। তথাপি ইহা না বলিয়া উপায় নাই যে, নাট্যকার দুঃখময় বিষয়বস্তু সুনিপুণ ভাবে ব্যবহার ও বিন্যাস করিয়া ইহাকে নাট্যরসোত্তীর্ণ করিতে পারেন নাই। বিষাদাত্মক পরিণতি মাত্রই আমাদের মন অভিভূত করিতে পারে না। এই পরিণতি সম্ভাব্য কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া অনিবার্য হইয়া উঠিলেই ইহা আমাদের অন্তর দ্রবীভূত করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আলোচ্য নাটকে কার্য-কারণের শৃঙ্খলা নাই, ঘটনাসূত্রের সংলগ্নতা কিংবা ক্রমবিবর্তনশীলতা নাই। রাজপুত্রের প্রতি রাজমহিষীর বিদ্বেষভাব এমনভাবে বিশ্লেষিত হয় নাই যাহাতে মহিষী সপত্নী পুত্রের প্রতি ভয়ঙ্কর অপরাধ আরোপ করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিতে চাহিবে। লালসাময়ী মহিষীর প্রণয়-লালসা দেখানো হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা প্রাণনাথের প্রতি, রাজপুত্রের প্রতি নহে। সুতরাং রাজপুত্রের পক্ষ হইতে কোন প্রত্যাখ্যান অথবা অপমান এবং তজ্জনিত প্রতিহিংসা-বৃত্তির স্ফুরণের কোন কারণই ঘটে নাই। সেজন্য তাহার পক্ষে রাজপুত্রের জীবন-নাশের এতখানি হিংস্র আয়োজন অকারণ ও অবিশ্বাস্য হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এই আয়োজনেরও কোন পরিণতি নাই। কারণ পরিশেষে অনুতপ্ত মহারাজ মৃত্যুশয্যায় রাজকুমারের সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছিলেন (কি ভাবে তাঁহার সন্দেহের নিরসন ঘটিল এবং তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন তাহা অবশ্য নাটকের মধ্যে দেখানো হয় নাই।) ইহার পরে রাজপুত্র-বধূ ও রাজপুত্রের মৃত্যুও অনেকটা অকারণ ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। রাজপুত্রের দ্বারা প্রাণনাথের হত্যাও এ রকম নিতান্ত অহেতুক ও বিসদৃশ ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাণনাথকে বারবার অত্যন্ত নীচাশয় ও দুষ্কর্মকারী বলা হইয়াছে। কিন্তু লাম্পট্য-দোষ ব্যতীত তাহার আর কোন অনিষ্টকারিতা নাটকের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। সুতরাং তাহাকে হত্যা করাতে রাজপুত্রের চরিত্রের কোন বীরত্ব কিংবা গৌরবের প্রকাশ হয় নাই।

## ভদ্রার্জুন (১৮৫২)

'ভদ্রার্জুন' শুধু প্রথম নাটক নহে, ইহা প্রথম সার্থক নাটক। ইহার পরে বহু নাটক রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ নাটক নহে, সংলাপ-যুক্ত রচনা মাত্র। কিন্তু 'ভদ্রার্জুন' সে ধরণের নাটক নহে। কাহিনীর সুসংহত ক্রিয়াশীল গতি, নাটকীয় কৌতূহল ও আবেগের সঞ্চার এবং সংলাপের আড়ম্বরহীন স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যের ফলে ইহা প্রকৃতই নাট্যপদবাচ্য হইয়া উঠিয়াছে। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, তিনি ইউরোপীয় আদর্শ

অনুসরণ করিয়া নাটকখানি রচনা করিয়াছেন।১ 'ভদ্রার্জুনে'র পরে বহু নাট্যকার পাশ্চাত্য নাট্যপ্রথা অনুসরণ করিয়া নাট্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহাদের অনেকেই ( এমন কি স্বয়ং মাইকেল পর্যন্ত ) বোধ হয় অজ্ঞাতসারেই সংলাপ ও আঙ্গিকে সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তারাচরণ তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। আলোচ্য নাটকের মধ্যে সংস্কৃত প্রভাব একেবারে নাই বলিলেই হয়। লেখক পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী তাঁহার নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে এবং প্রত্যেক অঙ্ক আবার কয়টি দৃশ্যে ( লেখক দৃশ্যের স্থলে 'সংযোগ-স্থল' নামটি ব্যবহার করিয়াছেন ) বিভক্ত করিয়াছেন। নাটকের একটি 'আভাস' ( প্রস্তাবনা —Prologue ) রহিয়াছে। নাটকের সংলাপে গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ রহিয়াছে। গদ্য সাধুভাষায় রচিত হইলেও খুবই সরল ও উপযোগী। পদ্য রচনা পয়ার ও ত্রিপদীতে বিভক্ত। বাংলা মহাভারতের পদ্যের সহিত ইহার মিল আছে। জায়গায় জায়গায় কবিগানের যোটকের ন্যায় বিভিন্ন চরিত্রের কথার মধ্যে অন্ত্য মিল লক্ষিত হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল—

বসুদেব—এতদ্ব্যতীত আর কিসের ভাবনা।
রোহিণী—তুমি যেন এ কথার কিছুই জান না॥
বসু—আর কি জানিতে হবে স্পষ্ট করি বল।
রোহি—রহস্যে নাহিক কাম যাও মেনে চল॥
বসু—কি কথায় রহস্য পাইলে তুমি টের।
রোহি—তোমার নাহিক দোষ মম ভাগ্য ফের॥
বসু—তোমাদের কথা আমি বুঝিতে অক্ষম।
রোহি—তোমারে কি দিব দোষ আমাদেরি ভ্রম॥
বসু—ছন্দোযুক্ত বাক্য ছাড় কহ করি স্পষ্ট।
রোহি—সমান ভাবিও মনে সকলের কষ্ট॥
বসু—সকলের ক্লেশ আমি দেখি সম ভাবে।
রোহি—তাহাই দেখিলে পর সব টের পাবে॥
বসু—আমি এ রহস্য বাক্যের মধ্যে নাই।
আনন্দেতে থাক আমি বাহিরেতে যাই॥

—( ২য় অঙ্ক, ১ম সংযোগস্থল )

কবিগানের যমক-অনুপ্রাস ও শ্লেষপ্রিয়তার প্রভাবও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

১। "এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনা স্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইয়োরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনায় নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক-সম্মত কয়েকজন নাট্যকারের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই ; যথা—প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধর ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি।"

অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা-হরণই নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। নাটকের কাহিনী দ্রুত-ঘটমান ঘটনারাশির মধ্য দিয়া বিকাশ ও পরিণতি লাভ করিয়া এক ঘনীভূত রস-চমৎকারিত্বের উৎপাদন করিয়াছে। অসংলগ্ন ও অবান্তর ঘটনার উত্তাপে সেই রস ফিকে হইতে পারে নাই। প্রথম অঙ্কে যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের আগমন এবং তাঁহারই কূট চক্রান্তে অর্জুনের বার বৎসরের জন্য রাজ্যত্যাগ। দ্বিতীয় অঙ্কে সুভদ্রার বিবাহের উদ্‌যোগ এবং বলরাম কর্তৃক দুর্যোধনের সহিত ভগ্নীর বিবাহের আয়োজন। তৃতীয় অঙ্কে প্রভাসতীর্থে অর্জুনের আগমন, সুভদ্রা ও অর্জুনের পারস্পরিক পূর্বরাগ এবং সত্যভামার সহায়তায় গান্ধর্ব-বিবাহ। চতুর্থ অঙ্কে নারদ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া দুর্যোধনের বরবেশে দ্বারকায় যাত্রা। পঞ্চম অঙ্কে সুভদ্রা-হরণ, কৌরবদের অপমান এবং বলরামের ক্ষোভ। নাট্যকার যে পরিশেষে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সকলের মধ্যেই একটা সুলভ মিলন ঘটাইয়া দিলেন না, অভিমান-ক্ষুব্ধ বলরামের অসন্তুষ্ট অনুযোগ-বাক্যের একটা প্রদাহ রাখিয়া গেলেন, ইহাতে তাঁহার নাটক প্রাণময় বাস্তবধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারত হইতে কাহিনী গ্রহণ করিলেও লেখক বাংলার স্বভাব-ধর্মের তুলিকায় রঞ্জিত করিয়া তাহাদিগকে আধুনিক বাঙালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারের দুশ্চিন্তা, অন্তঃপুরিকাদের প্রবাদ-সংস্কারাশ্রিত আলাপ, বিবাহের প্রথা ও স্ত্রী-আচার ইত্যাদি বিষয়ে বাঙালী-সমাজের বাস্তব পরিবেশ নাটকের মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা পাঠক ও দর্শকের কাছে অত্যন্ত আগ্রহ ও আমোদ-প্রদ হইতে পারিয়াছে সন্দেহ নাই।

# প্রথম অঙ্ক

## বাংলা নাটকের আদি পর্ব

উনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলিত হইবার পর বাংলা নাটক যখন আত্মপ্রকাশ করিল তখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া নিজের মনের কথা বলিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। তাহার কথাবার্তা, হাবভাব সব ছিল নিষ্প্রাণ পুত্তলিকার মত—সে চালিত হইত এক অদৃশ্য হস্তধৃত রজ্জু দ্বারা। সে হস্ত হয় কালিদাসের আর না হয় শেক্সপীয়ারের। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাহার মনে এই শুভবুদ্ধির উদয় হইল যে, দেহের মধ্যে যে প্রাণটি থাকে সেই প্রাণটি যদি নিজের না হয় তবে দেহের কান্তি ফোটে না, আয়ুও বাড়ে না। সেজন্য নিজের প্রাণের সন্ধান করিতে সে প্রবৃত্ত হইল।

যেদিন অনুবর্তনের সোজা রাস্তাটি পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টির জটিল পথে চলিতে বাংলা নাটক আরম্ভ করিল সেদিন হইতে সমাজের ভাববিপ্লব তাহার অন্তর্দেশ আলোড়িত করিয়া তুলিল। সমাজের বিভিন্ন প্রকার জাগ্রত মানস-চেতনার গতি ও সংঘাত বাংলা নাটকে রূপায়িত হইয়া উঠিল। নাটকের মধ্যে যে চেতনা মূর্ত হইতে লাগিল তাহার স্বরূপ জানিতে গেলে তৎকালীন বাংলা সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বাংলার সমাজের নবজন্ম হইতেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাতে তাহার পুরাতন নির্মোক খসিয়া পড়িতেছিল এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে এক নব-বলদৃপ্ত জাতক আত্মপ্রকাশ করিতেছিল—হাতে তাহার বিদ্রোহের শাণিত তলোয়ার এবং দৃষ্টি অনাগত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। প্রাচীন-বিলাসী সাবধানীর দল তাহার গতি রুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। কারণ স্বল্প-কালের মধ্যেই সীমিত অনল দাবানলের আকার ধারণ করিয়াছিল। মেকলে ও বেন্টিঙ্কের যুগ্ম চেষ্টায় ইংরাজি শিক্ষা এদেশে মূল প্রোথিত করিল। রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার তাহার মূলে জলসিঞ্চন করিলেন। হিন্দু কলেজ হইতে স্বাধীন চিন্তার ধারা দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল—নবযুগের সক্রেটিস হইয়া উঠিলেন ডিরোজিও। ডিরোজিওর শিষ্যগণ আগুন লইয়া খেলা আরম্ভ করিলেন, আগুনের ফুলকি ছড়াইয়া দিলেন প্রাচীন সমাজের বুকে। সমাজের আর্তনাদ তাহাদের বধির কর্ণে প্রবেশ করিল না। এদিকে রামমোহন রায়ের অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্মধর্ম প্রাচীন ধর্মের মাঝে আনিয়া দিল প্রবল বিক্ষোভ। ব্রাহ্মরা শুধু ধর্মের মধ্যে তাঁহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন না। সমাজের দূষিত ব্যাধিসমূহ দূর করিবার জন্য তাহার বুকেও ছুরি চালাইলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আর একজন মহাপুরুষ সমাজের কর্ণধার হইলেন, হাতে তাঁহার বজ্রের শক্তি এবং বুকে মত্ত হস্তীর বল। তাঁহাকে বাধা দিতে আসিল সমাজের সম্মিলিত প্রবল শক্তি, কিন্তু সেই

শক্তি নস্যাৎ করিয়া নিজের একেশ্বর সংগ্রাম তিনি জয়যুক্ত করিলেন—বিধবা বিবাহ আইন পাশ হইল এবং বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে সমাজের জনমত জাগ্রত হইয়া উঠিল।

বাংলার রাজনৈতিক গগনও সেদিন ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে আগুন নির্বাপিত হইল বটে, কিন্তু আগুন লাগিয়াছিল সমাজের অন্তরতম প্রদেশে। সেই অগ্নিজ্বালায় পরাধীন সমাজ ফোঁসাইতে আরম্ভ করিল। ঠিক সেই সময়েই বাংলার এক প্রান্তে প্রথম গণ-উত্থান দেখা দিল। দরিদ্র, উপায়হীন কৃষকগণ এতকাল নীলকরদের হাতে যে কোড়ার আঘাত পাইতেছিল অত্যাচারের চরম সীমায় আসিয়া একদিন তাহারা উদ্ধত মুষ্টিতে সেই কোড়া চাপিয়া ধরিল এবং তাহা ঘুরাইয়া অত্যাচারীর পৃষ্ঠদেশে উত্তোলন করিল। সেদিন সর্বহারার দল বিপ্লবের প্রথম অগ্নিদীক্ষা লাভ করিল।

বাংলার সমাজধর্ম ও রাজনীতির এই ভাববিপ্লুত অবস্থায় প্রথম যুগের বাঙালী নাট্যকারদের আবির্ভাব। সমাজের নবজাগ্রত ভাবতরঙ্গ অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁহাদের নাটকের মধ্যে সংক্রামিত হইল। যাঁহারা নবীন ভাব-আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন তাঁহারা কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে ছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের শক্তিসামর্থ্যও খুব বেশি ছিল না। সেজন্য তাঁহাদের লিখিত নাটক পরবর্তীকালে তাঁহাদের পরিচয় বহন করিতে পারে নাই। কিন্তু যাঁহারা ছিলেন সংস্কার ও প্রগতির ধারক তাঁহাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী সেদিন উড্ডীন হইল, তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত শেল সমাজের বুকে প্রবেশ করিল।

বিধবা-বিবাহ আন্দোলন ছিল তৎকালে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবশালী—প্রথম যুগের নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই বিধবা-বিবাহের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। এবিষয়ে পথিকৃৎ হইলেন উমেশচন্দ্র মিত্র। তাঁহার 'বিধবা-বিবাহ নাটক' করুণরসে সমাজের পাষাণ-হৃদয় গলাইতে চাহিল। 'চপলাচিত্তচাপল্যে'র মধ্যে লেখক যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় বিধবার বিবাহ দিয়া সমস্যার উপর একেবারে যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। দুঃসাহস বটে, পঁচাত্তর বৎসর পরে শরৎচন্দ্রও এতখানি সাহস দেখাইতে পারেন নাই। সমস্যাটির বিপজ্জনক সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করিলেন শ্রীশিমুয়েল পিরবক্স তাঁহার 'বিধবা বিবাহ নাটকে'। মনোমোহন বসুর ন্যায় প্রাচীনপন্থী নাট্যকারও বিধবা-বিবাহ সমর্থন না করিয়া পারেন নাই। তাঁহার 'আনন্দময় নাটকে' ইহার সাক্ষ্য মিলিবে।

বহুবিবাহ ও সপত্নী-সমস্যা লইয়া তৎকালে অনেকগুলি নাটক লিখিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে ছিল করুণরসের আবেদন এবং অপরগুলিতে ছিল কৌতুকরসের আঘাত। বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিষাদান্ত নাটক 'কীর্তিবিলাস' এই সমস্যা লইয়াই লিখিত। 'নব-নাটকে' নাটুকে রামনারায়ণ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গব্যঙ্গের আসর ছাড়িয়া দুঃখ-বেদনার দরিয়ায় হাবুডুবু খাইয়াছেন। তবে তিনি হাসির বুঁদ ছাড়িয়াছেন 'উভয়-সঙ্কটে'। মনোমোহন বসু তাঁহার 'প্রণয় পরীক্ষা নাটকে' সপত্নী বিদ্বেষের এক ভীষণ পরিণতি দেখাইয়াছেন, অবশ্য সমস্যার ভীষণতা দেখাইতে যাইয়া নাটকের নাটকত্ব যে

তিনি অনেক ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সপত্নী সমস্যার সরসতম বর্ণনা পাই আমরা তৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার দীনবন্ধুর নাটক 'জামাই বারিকে'। আজ পর্যন্ত ইহা অপেক্ষা অধিকতর হাস্যরসাত্মক নাটক বোধ হয় লেখা হয় নাই।

শিক্ষিত জনমত একদিকে যেমন বিধবা-বিবাহের প্রতি অনুকূল হইয়া উঠিতেছিল, অন্যদিকে তেমনি বাল্যবিবাহের দিকে প্রতিকূল হইয়া পড়িতেছিল। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রবলতম প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল 'সম্বন্ধ-সমাধি নাটকে'। শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের 'বাল্য-বিবাহ নাটক', রামচন্দ্র দত্তের 'বাল্যবিবাহ' এবং শ্যামাচরণ শ্রীমানীর 'বাল্যবিবাহ' নাটকের নামও উল্লেখযোগ্য। কুলীন রামনারায়ণ আঘাত করিলেন কৌলীন্যপ্রথাকে। রামনারায়ণ শিখাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শিখাতে বাঁধা ছিল বিদ্যুৎ। কৌলীন্যপ্রথার দোষ উল্লিখিত হইয়াছে বিচ্ছিন্নভাবে আর একটি প্রহসনে, তাহার নাম 'কলিকৌতুক নাটক'।

প্রাচীন ধনশালী, প্রভুত্বকামী সমাজের বিকৃতি ও ব্যাধি অনেক নাট্যকারের নির্মম খোঁচায় বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সম্মান ও সম্পত্তির সুযোগ লইয়া যাহারা ইন্দ্রিয়-বিলাসে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহারা শাস্তি পাইল অনেক নাট্যকারের হাতে। রামনারায়ণ 'চক্ষুদান' ও 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' নামক প্রহসন দুইখানির মধ্যে কৌতুকের আঘাতে লাম্পট্য-দোষ শোধন করিতে চাহিলেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'এর মধ্যেও মাইকেল ব্যঙ্গের চাবুক চালাইলেন। তবে এবিষয়েও সেরা শিল্পী হইলেন দীনবন্ধু মিত্র। তাঁহার জলধর ও রাজীবলোচন বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হইয়া আছে।

অনেক নাট্যকার নব্যভাবাপন্ন আদর্শবাদী চরিত্র অঙ্কন করিলেন। তবে মজার ব্যাপার এই যে, তাঁহারা যাহাদের নিন্দা করিলেন তাহারা হইল জীবন্ত আর যাহাদের প্রশংসা করিতে চাহিলেন তাহারা হইয়া পড়িল কৃত্রিম পুত্তলিকা। স্বয়ং দীনবন্ধু পর্যন্ত শিক্ষিত, আলোকপন্থী চরিত্রকে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার ললিত ও লীলাবতী নিষ্প্রাণ আদর্শের প্রতীকমাত্র। 'নবনাটকে'র সুবোধ ও সুধীরও নীতিকথার শুষ্ক বাণ্ডিল মাত্র, নাটকীয় সরস চরিত্র নহে। 'প্রণয় পরীক্ষা'র শান্তশীল এবং সরলাও অনেক ভালো ভালো করুণ কথা বলিয়াছে বটে তবে রক্তমাংসের স্বাভাবিক মূর্তি হইতে পারে নাই।

প্রাচীন সমাজের বিকৃতি নাট্যকারদের হাতে কঠোর আঘাত পাইলেও নব্য সমাজের অধোগতিও যে একেবারে নিস্তার পাইয়াছে তাহা নহে। ইয়ংবেঙ্গলের কালাপাহাড়-গুলিকে সম্বৃত করা প্রয়োজন হইয়াছিল। সর্বপ্রথম আগাইয়া আসিলেন ইয়ংবেঙ্গলের সর্বপ্রধান পাণ্ডা মাইকেল মধুসূদন। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে বোধ হয় তিনি আত্মঘাতী হইতে চাহিলেন। কেবলমাত্র প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যিকই এরূপ নির্দয়ভাবে আত্ম-সমালোচনা করিতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়েও পুনরায় পুরস্কার দিতে হয় দীনবন্ধুকে। তাঁহার 'সধবার একাদশী' কমেডি না ট্র্যাজেডি? বলা শক্ত। তবে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নাটক বাংলা সাহিত্যে আর লেখা হইয়াছে কিনা জানি না।

রাজনৈতিক চেতনা তখনও ব্যাপকভাবে নাটকে রূপায়িত হইতে পারে নাই। তবে তখন এমন একখানি নাটক রচিত হইয়াছিল যাহা সুদূর ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করিয়াছিল। একখানি নাটক যে এতখানি সমাজ-বিপ্লব জাগাইয়া তুলিতে পারে তাহা পূর্বে ও পরে কখনও আমরা দেখি নাই। দীনবন্ধু 'নীলদর্পণে'র মধ্যে গণবিদ্রোহের পাঞ্চজন্য ধ্বনিত করিলেন। সেই ধ্বনি দিকদিগন্তরে বিকীর্ণ হইয়া শোষিত, মুক্তিকামী জনগণকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিল। তাহারা অত্যাচারের অমানিশার পরে পূর্বপ্রান্তে আশার রক্তিম লিখা দেখিতে পাইল।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক (ক)

### সামাজিক নক্সা নাটক

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা লইয়া অনেক নাটক রচিত হইয়াছিল। বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, বাল্যবিবাহ, দুশ্চরিত্রতা এই সমস্যাগুলিই প্রধানত তৎকালীন নাট্যকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং নবজাগ্রত সংস্কার-প্রেরণার দ্বারা যে তাঁহারা চালিত হইয়াছিলেন সেই পরিচয় তাঁহাদের নাটকের মধ্যে সুচিহ্নিত। বস্তুত নাট্যশিল্প অপেক্ষা সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যই যে তাঁহাদের মনে অধিকতর প্রবল ছিল তাহার প্রমাণ অতি সহজেই তাঁহাদের যে কোন নাটকে মিলিবে। কারণ প্রায় সব নাটকেই নাটকীয় সংঘাত ও চরিত্র-সৃষ্টি অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ সামাজিক তত্ত্ব ও মতবাদই অত্যধিক আতিশয্য লাভ করিয়াছে। এই সব নাটকের প্রচার ও প্রভাব বেশি ছিল না, আজ ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহারা সাহিত্যক্ষেত্রে সমাজ-প্রগতির অবিসংবাদী সাক্ষী। আজিকার প্রগতি-সাহিত্যের মূল ইহাদের মধ্যেই অন্বেষণ করিতে হইবে।

কিন্তু এই সব নাটকের বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নবীনত্ব থাকলেও ইহাদের শিল্পরীতি ও রচনাভঙ্গি প্রাচীনত্বের গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারে নাই। নান্দী-সূত্রধার নটী ইত্যাদির মধ্য দিয়া অধিকাংশ নাটকের আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাদের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ এবং সংলাপের দীর্ঘতা ও উচ্ছ্বাসময়তা প্রভৃতির দিক দিয়াও ইহারা সংস্কৃত নাটকের ধারা অনুসরণ করিয়াছে। তবে সমস্যার বিষাদময়তা দেখাইবার জন্য নাট্যকারগণ অনেকগুলি নাটকের পরিণতি বিয়োগান্তক করিয়া তুলিয়াছেন। 'বিধবা-বিবাহ নাটক', 'সপত্নী নাটক', 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' প্রভৃতি নাটকের কথা এ প্রসঙ্গে মনে হইবে। সংস্কৃত নাটকের মিলনান্তক পরিণতির সহিত এই সব নাটকের পরিণতির কোন মিল নাই। এই সব নাটকের ঘটনাস্থল পল্লীগ্রাম। সেজন্য দৃশ্যভূমি ও চরিত্রগুলির মধ্যে বাংলার খাঁটি পল্লীরস সঞ্চারিত হইয়াছে। কলিকাতার নাগর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব ইহাদের মধ্যে

আসে নাই। পরবর্তীকালে সামাজিক নাটকের পরিবেশ প্রধানত কলিকাতার সমাজকেই অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। অবশ্য দীনবন্ধুর পরবর্তী সামাজিক নাটকের কথাই আমি বলিতেছি। পল্লীর পুকুরঘাট, ছায়াঢাকা পথ; কামিনীকণ্ঠ-কলিত অন্তঃপুর ও তাম্রকুট-ধূমাচ্ছন্ন চণ্ডীমণ্ডপের দৃশ্য দ্বারা এমন একটি অকৃত্রিম পরিবেশ এই নাটকগুলির মধ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে যাহা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর বাংলা নাটকে আমরা বেশি দেখি নাই। এই নক্সা-নাটকগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের মধ্যে বিষাদ-গম্ভীর করুণ রস অপেক্ষা লঘু-চপল হাস্যরসই অধিক স্বাভাবিক হইয়া ফুটিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে তৎকালীন নাটকের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। করুণরসাত্মক গম্ভীর দৃশ্য অঙ্কন করিতে যাইয়া নাট্যকারগণ তাঁহাদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিকে এমন আড়ষ্ট ও ভারগ্রস্ত করিয়া ফেলিতেন যে তাহার ফলে নাটকের প্রাণশক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া যাইত। কিন্তু লঘু ও হাল্কা ভাবের অবতারণায় তাঁহারা অতখানি মনোযোগ ও গুরুত্ব দিতেন না বলিয়াই তাহা সরস প্রাণবত্তায় এমন স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।

নিম্নে কয়েকখানি নাটকের আলোচনা করা গেল। দুই একখানি প্রসিদ্ধ নাটক সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া তাহাদের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা গেল না।

॥ কলিকৌতুক নাটক (১৮৫৮)॥ বিভিন্ন যুগে কলি ও তাহার সঙ্গীদের পাপ-প্রভাবে পৃথিবীর যে কিরূপ অবনতি ও দুর্গতি ঘটিয়াছিল তাহাই নাটকের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে পরীক্ষিতের কাহিনী। দ্বিতীয় অঙ্কে বুদ্ধের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-বিদ্রোহ। তৃতীয় অঙ্কে কামদেবের সর্বময় প্রভাব। চতুর্থ অঙ্কে আদিশূরের কাহিনী ও বল্লালের জন্মবৃত্তান্ত। কৌলীন্য-প্রথার প্রচারও ইহাতে রহিয়াছে। পঞ্চম অঙ্কে শ্রীচৈতন্যদেবের বৃত্তান্ত, ম্লেচ্ছপ্রভাব ও পাশ্চাত্যগামী যুবকসমাজের বিকৃতি প্রভৃতি বর্ণিত হইরাছে। আদ্যোপান্ত কলি ও তাহার সহকারীদের কুপ্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। নাটকের গোড়ায় সংস্কৃত প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু বইয়ের ভাষার মধ্যে সচল স্বাভাবিক কথ্য ভাষার প্রাধান্য রহিয়াছে। Mystery ও Miracle Playর ন্যায় কলি, ধর্ম,অধর্ম প্রভৃতির মধ্যে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ঘটনার সঙ্গতি ও সংলগ্নতা মোটেই নাই। দীর্ঘ পয়ারের দৌরাত্ম্য এখানেও আছে।

॥ চার ইয়ারে তীর্থ যাত্রা (১৮৫৮)॥ এক মদখোর,এক আফিংখোর, এক গুলিখোর ও এক গাঁজাখোর এই চার নেশাখোর ইয়ারের দুর্গতি আলোচ্য নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে অনুতপ্ত ও দুর্দশাপন্ন ইয়ারগণ বৃন্দাবন গমন করিয়া সৎভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহা নাট্যকাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নহে, সেজন্য নাটকের নাম অর্থহীন। সংস্কৃত রীতিতে নাটকের আরম্ভ, পয়ার ও ত্রিপদীর বানে নাট্যসংঘাত ভাসিয়া গিয়াছে। ঘটক গৌরদাস বাবাজীর চরিত্র সর্বাপেক্ষা জীবন্ত।

॥ সপত্নী নাটক (১৮৫৮) ॥ কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করিয়া নাট্যকার নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য নাটকে ঘটনাবিন্যাস ও নাটকীয় সংহতি কিছুই নাই। পয়ারের দৌরাত্ম্য ও দীর্ঘ খেদোক্তির বাহুল্য ইহাকে অত্যন্ত একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর করিয়া তুলিয়াছে। তবে একথা সত্য যে, নাট্যকার একশত বৎসর পূর্বেকার বাঙালী পরিবার-জীবনের সমস্যা আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন। নায়িকা সৌদামিনী বাংলা-সমাজের চিরলাঞ্ছিতা গৃহ-বধূর একটি নিখুঁত বেদনা-করুণ চিত্র। স্বামীকে বুকভরা ভালোবাসা দান করিয়া সে বিনিময়ে পাইল সপত্নী-যন্ত্রণা। ধর্মসাধনা করিতে যাইয়া সে দেখিল, গুরু ভক্তির মন্ত্র অপেক্ষা প্রেমের তন্ত্র শিক্ষা দিতে অধিক উৎসুক। তারপর জটিলা কুটিলার ন্যায় শাশুড়ী ননদিনীর নিত্য অত্যাচার তো আছেই। তাহার ভাগ্যহীন জীবনের এই নিরুপায় নির্বাক বেদনা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে।

॥ বিধবা বিরহ নাটক—শিমুয়েল পিরবক্স (১৮৬০) ॥ নাটকের নায়িকা মনোমোহিনী যুবতী বিধবা। অনঙ্গের শরাঘাতে তাহার হৃদয় জর্জরিত, অথচ চারিদিকে নিষেধের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। তাহার পিতা অতিবৃদ্ধ হইয়াও একটির পর একটি নারীর সর্বনাশ করিতেছেন, কিন্তু সমাজের বিধান সেখানে সহিষ্ণু। আর যত বাধা নিষেধ কি বিধবাদের বেলাতেই? মনোমোহিনী বেশি দিন আর নিজেকে রক্ষা করিতে পারিল না। একদিন তাহার শূন্য হৃদয়ের দ্বারে শ্যামের বাঁশি বাজিয়া উঠিল। হাড়ির ছেলে, কিন্তু হাড়ি, ডোম বিচার করিবার ক্ষমতা এখন তাহার নাই। বামা নামক নষ্টচরিত্রা ঝিয়ের দ্বারা সে তাহার প্রেমাস্পদ নঙ্গরার সহিত মিলিত হইল। সুন্দরের মতই নঙ্গরা গোপনে মনোমোহিনীর ঘরে আসিয়া প্রেমের লীলা চালাইল। অবশেষে মনোমোহিনী অন্তঃসত্ত্বা হইয়া নঙ্গরার সহিত গৃহত্যাগ করে। দুঃখে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া তাহার পিতামাতাও ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যান। যাইবার সময় পিতা একখানি লিপি টাঙ্গাইয়া রাখিয়া যান। তাহাতে লেখা ছিল, 'হে দেববংশ হিন্দুলোকেরা তোমরা আমার স্বজাতীয় লোক, এইজন্য তোমাদের নিকটে আমার নিবেদন এই যদি কুলশীল জাতি মান রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর তবে শীঘ্র যাহাতে বিধবাদের পুনর্বিবাহ হয় এমন চেষ্টা কর।'

বিধবা-বিবাহের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া নাটকখানি রচিত বলিয়া সমস্যার বীভৎস বাস্তবতার দিকটি নাট্যকার অসঙ্কোচে উন্মোচন করিতে চাহিয়াছেন। সেজন্য রুচির দিক চাহিয়া তিনি কোন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত অথবা সহনীয় কাহিনীর অবতারণা করিতে চাহেন নাই। সমাজের নিষ্ঠুর বিধানের ফলে তাহার তলায় তলায় দুর্নীতি ও বিকৃতির পঙ্ক কিভাবে জমিয়া উঠিতেছে তাহাই তিনি দুঃসহ বাস্তব চিত্রের মধ্য দিয়া দেখাইয়াছেন।

॥ বাল্যোদ্বাহ নাটক (১৮৬০) ॥ শ্যামাচরণ শ্রীমানি রচিত 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' বাল্যবিবাহের অশেষ কুফল প্রদর্শনের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত।১ কিন্তু উদ্দেশ্য যেখানে

১। নাট্যকারের উক্তি উল্লেখযোগ্য—'এক্ষণে বাল্যোদ্বাহ নিবন্ধন অস্মদ্দেশে যে সমস্ত অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে তাহার কিঞ্চিৎও যদিস্যাৎ এই নাটকে কীর্তিত হইয়া থাকে তাহা হইলে অভীষ্ট ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ বিবেচনায় পরম সন্তোষানুভব করিব। 'বিজ্ঞাপন'

উৎকট হইয়া উঠে সেখানে শিল্পের বিকৃতি ঘটা স্বাভাবিক। আলোচ্য নাটকেও সেই বিকৃতি আমরা লক্ষ্য করি। সুধীর চরিত্রটি সম্ভবত নাট্যকারের মুখপাত্র। দীর্ঘ খেদোক্তিপূর্ণ বক্তৃতা ছাড়া তাহার দ্বারা নাটকীয় কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই। বস্তুত সুধীর ও ধনহীন মহদাশয় এই দুইটি চরিত্রের মুখে বাল্যবিবাহের যে সব দোষ ও দুঃখ উল্লিখিত হইতে দেখা যায় নাটকের কাহিনীর মধ্য দিয়া সেগুলির কোন সার্থক রূপায়ণ হয় নাই। বিদ্যাহীনের বিষভক্ষণ এবং বলহীন ও গোপালের মৃত্যু ঘটাইয়া নাট্যকার নাটকে যে বিষাদান্তক সুর আনিয়াছেন তাহা বাল্যবিবাহেরই অনিবার্য পরিণাম মনে করা সত্যই শক্ত। নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলির নামকরণ খুবই কৌতুকাবহ। নামের মধ্যেই বিশেষ বিশেষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আভাসিত হইয়াছে; যথা—বলহীন ধনাঢ্য, স্বার্থপর ঢোল, অর্জনস্পৃহ ভট্টাচার্য, লজ্জাহীন স্ত্রৈণ, রঙ্গিণী, চতুরা, বিলাসিনী ইত্যাদি। এরূপ নামকরণ সুস্পষ্টরূপে রামনারায়ণের 'কুলীনকুল সর্বস্বে'র প্রভাব সূচনা করিতেছে।১

॥ বাল্যবিবাহ—রামচন্দ্র দত্ত ॥ প্রথম যুগের নাট্যকারদের মধ্যে যে সমাজ-সংস্কার-মনোবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল আলোচ্য নাটক তাহারই একটি স্মারকমাত্র। বাল্যবিবাহের কুফল দেখাইবার জন্যই বোধ হয় লেখক নাটকখানি লিখিয়াছেন এবং ইহার বিষাদান্তক পরিণতি দেখাইয়া তিনি সম্ভবত সমস্যার আঘাতে আমাদের হৃদয়কে বিচলিত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তু অন্য একটি ভাব অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙালী-ঘরে স্বামী ও শাশুড়ী দ্বারা নিগৃহীতা বধূর প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতি এতই প্রবল ছিল যে, তাহার আচরণের বিসদৃশতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না। সেজন্যই ভুষণের সহিত বিবাহিতা বধূ সরলার অবৈধ প্রণয় তাঁহার কাছে অপরিমিত প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে। বস্তুত সরলার নিরুপায় দুঃখভোগ অপেক্ষা তাহার দুর্দম প্রণয়-লালসাই নাটকের মধ্যে অনেক বেশি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভূষণ ও সরলার প্রণয় কোন সামাজিক বাধার ফলে দ্বন্দ্ব-জটিল নয়, ইহা বাধা-বন্ধনহীন রোমান্টিক উচ্ছ্বাসে তরল। সরলার শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হইল সাংসারিক দুঃখ-নির্যাতন ভোগের ফলে নয়, রোমান্টিক প্রণয়-সুলভ ভ্রান্তি বশত। সুতরাং তাহার মৃত্যু বাঙালী বধূর করুণ সমস্যা আমাদের মনে জাগরূক করে না, ইহা চিরন্তন প্রণয়-বিষাদিনী জুলিয়েটের সমস্যাই উপস্থাপিত করে। তবে যেভাবে এই মৃত্যু ঘটানো হইয়াছে তাহা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি হাস্যকর। নাট্যকারের বিষাদান্তক পরিণাম একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। নাটকের মধ্যে ইতরামি, মাতলামি, হিন্দী-বাত ও ইংরাজি বকুনি অনেক কিছু পাঁচ মিশালি উপাদানই রহিয়াছে, তবে সেগুলি নাটকখানিকে কেবল উদ্দেশ্যহীন করিয়াছে, সরস করিতে পারে নাই।

১। নাটকের একস্থলে 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র উল্লেখ আছে—'কুলিনকুলসর্বস্ব' নাটকের প্রসাদে এ বিষয় জ্ঞাত হোতেও আবাল-বৃদ্ধ কেহই বাকি নাই।'—পৃঃ ৪৭।

॥ চপলাচিত্ত-চাপল্য—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৬১ )॥ বিধবা বিবাহ সমর্থনে যে সব নাটক রচিত হইয়াছিল আলোচ্য নাটক তাহাদের অন্যতম। বিধবা চপলার চিত্ত-চাপল্য এবং পরিশেষে বিবাহে সেই চাপল্যের সমাধান,—ইহাই নাটকের বিষয়বস্তু। বিধবা-বিবাহ আন্দোলন যে সমাজের মধ্যে সহৃদয় লোকের সহানুভূতি উদ্রেক করিতে কতখানি সমর্থ হইয়াছিল এই নাটকে তাহার কিছু প্রমাণ মিলিবে। কিন্তু নাটকটিতে বৈধব্য-জীবনের দুঃখময় সমস্যার বেদনা অপেক্ষা বিধবার অনুরাগ বর্ণনাতেই অধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। এজন্য করুণ রস অপেক্ষা আদি রসই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নাটকটি ছয়টি অঙ্কে বিভক্ত। প্রত্যেক অঙ্কের অন্তর্গত ঘটনাস্থল ও পাত্রপাত্রী সমাবেশের মধ্যে সঙ্গতি নাই। চপলা ও চারুচন্দ্রের প্রেম আদ্যন্ত স্বগতোক্তির মধ্য দিয়া বর্ণনা করা হইরাছে, এই কৌশল অনাটকীয় কাব্য-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।১ গদ্য সংলাপের মধ্যে ঠিক গুরুত্বপূর্ণ স্থলে হঠাৎ লঘু পয়ার অথবা ত্রিপদী ছন্দের অবতারণা করিয়া নাট্যকার ঘনীভূত ভাবগাম্ভীর্য নিতান্ত তরল করিয়া ফেলিয়াছেন। সমসাময়িক বহু সামাজিক নাটকের ন্যায় এই নাটকটিও স্ত্রী-প্রধান ( পাত্র পাত্রীদের মধ্যেও আটজন পুরুষ ও এগার জন স্ত্রী )। এই সব স্ত্রী-চরিত্রের কথাবার্তা এখন অনেক স্থলেই গ্রাম্য ও অশ্লীল বোধ হইবে কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া যে তৎকালীন অন্তঃপুর-রমণীদের স্বভাব ও প্রকৃতি অতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজ-চিত্র হিসাবে নাটকটির মূল্য অস্বীকার করা চলে না।

॥ "বুঝলে কি না" ( ১২৭৩ )॥ আলোচ্য প্রহসনখানির রচয়িতা কে সে বিষয়ে মতভেদ আছে।২ অর্থশালী কুক্রিয়াসক্ত সমাজপতির ব্যঙ্গচিত্র তৎকালীন অনেক প্রসিদ্ধ নাটকে পাওয়া যায়। মধুসূদনের 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধুর 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো', রামনারায়ণের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রভৃতি নাটকে এ রকম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আলোচ্য প্রহসনেও অটলকৃষ্ণ বসু নামক এক দলপতির আসল চরিত্র অতি নির্মমরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নবীন ও প্রাচীনের সংঘর্ষে নাট্যকার স্পষ্টতই নবীনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার সহানুভূতির পাত্র নিরুপায় যুবক নীলাম্বর আর তাঁহার আঘাতের লক্ষ্য লম্পট, মদ্যপায়ী হৃদয়হীন সমাজপতি ও নীচ, কুখাদ্য-লোভী স্তাবক ব্রাহ্মণ। অটলকৃষ্ণের শাস্তি দীনবন্ধুর জলধর-চরিত্রের অনুরূপ পরিণতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রহসনের শেষ দিকে দর্পনারায়ণ বহুক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যালঙ্কারের ছদ্মবেশে অটলের সহিত কথা বলিয়া গেল অথচ তাহার কণ্ঠ অটল বিন্দুমাত্র ধরিতে পারিল না, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক মনে হয়।

১। 'চপলাচিত্তচাপল্য' নামে মাত্র নাটক, পদ্যরচয়িতার হাতে পড়িয়া ইহার নাট্যশক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।'
—দৃশ্যকাব্য পরিচয়, পৃঃ ৩২।

২। প্রহসনখানি সাধারণত মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের নামে প্রচলিত। কিন্তু ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে ইহা আসলে রামনারায়ণের রচনা।
সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন,প্রহসনখানির রচয়িতা প্রিয়মাধব বসু।
—দৃশ্যকাব্য পরিচয়, পৃঃ ৪৯।

মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠান লইয়া এসময় কয়েকখানি নাটক রচিত হইয়াছিল। বাঙালী হিন্দুর বিবাহ ব্যাপারে প্রধান অংশ মেয়েদের। বর ও বধূকে কেন্দ্র করিয়া আবহমানকাল ধরিয়া তাহাদের যে আমোদ-অনুষ্ঠান চলিয়া আসিয়াছে তাহার ধারা এই প্রগতি-গর্বী আধুনিক কালেও একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। তবে আজ এই সব অনুষ্ঠান শ্রদ্ধা ও মনোযোগ আকর্ষণ করে না বলিয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে ইহাদের কোন স্থান নাই। কিন্তু একদিন যখন ইহারা সমাজের অবশ্য-পালনীয় অনুষ্ঠানরূপে স্বীকৃত হইত তখন সাহিত্যের আসরেও ইহারা একেবারে অপাংক্তেয় ছিল না। অবশ্য যেসব নাটকে ইহাদের বর্ণনা রহিয়াছে তাহাদের নাট্যমূল্য খুব কমই। তবে সমাজ-চিত্ররূপে সেই সব নাটকের পরিচয় জানা আবশ্যক বোধ হইতে পারে। এই নাটকগুলির মধ্য হইতে দুইখানি নাটকের আলোচনা আমরা করিব।

প্রথম নাটকখানি হইল শ্যামাচরণ দের 'বাসর কৌতুক নাটক' (১৮৫৯)। নাটকখানি ক্ষুদ্র, বাসর ঘরে বর ও রঙ্গরসিকা কামিনীদের রসালো উক্তি-প্রত্যুক্তি লইয়াই ইহা রচিত। বাসর ঘরের চিত্ররূপে নাটকখানি সম্পূর্ণ বাস্তব। মেয়েদের রসিকতার বাক্য ও ভঙ্গি নাট্যকার অবিকল দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। ছড়াজাতীয় গান প্রাচীন রসিকতার অঙ্গ ছিল, সেই ধরণের বহু গান আলোচ্য নাটকে রহিয়াছে। বর ও বরাঙ্গনাদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে যে চাতুর্য ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বিশেষ উপভোগ্য।

দ্বিতীয় নাটকখানির নাম 'পুনর্বিবাহ নাটক' (১৮৬২)—লেখক গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বে বাল্যবয়সে মেয়েদের বিবাহ হইত বলিয়া পুনর্বিবাহ উৎসব একটি অবশ্য পালনীয় আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবরূপে পরিগণিত ছিল। সেই উৎসবের এক অতি বাস্তব বর্ণনা বর্তমান নাটকে রহিয়াছে। বিবাহের ন্যায় পুনর্বিবাহ উৎসবও প্রধানত মেয়েদেরই উৎসব। সেজন্য আলোচ্য নাটকের ক্রিয়াও স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পুরুষ কয়েকজন আছেন বটে এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসীও আছেন, তবে তাঁহারা দূরবর্তী দ্রষ্টা মাত্র, তাঁহারা কোথাও কোন নাটকীয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। নাট্যকার মেয়েদের মুখের কথা হুবহু বসাইয়াছেন, সেজন্য স্থানে স্থানে নাটকখানি অত্যন্ত অশ্লীল ও অমার্জিত হইয়া পড়িয়াছে। কুলটা ও লম্পটের দৃশ্যটি একেবারেই অবান্তর।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক (খ)

### রামনারায়ণ তর্করত্ন

মধুসূদনের পূর্বে যাঁহারা নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রামনারায়ণ শ্রেষ্ঠ। রামনারায়ণের নাটক সংস্কৃতপন্থী হইলেও ইহার বাস্তবতা এবং স্বচ্ছন্দ সরসতার জন্য তিনি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া 'নাটুকে রামনারায়ণ' এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। সামাজিক সমস্যা লইয়া তিনিই সর্বপ্রথম নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং নিজে একজন

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও তাঁহার মতের উদারতা আমাদের মনে বিস্ময় উদ্রেক করে। তাঁহার নাটকে একদিকে যেমন উপমা-অনুপ্রাস-বহুল সংস্কৃত শব্দের আধিক্য আছে, অন্যদিকে আবার তেমন ছড়া, প্রবচন এবং গ্রাম্য কথোপকথনের মধ্য দিয়া দেশের নিজস্ব রসধারাও স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। রামনারায়ণের সামাজিক সমস্যামূলক নাটকগুলি খুব প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং ঐগুলি পরে একাধিক নাট্যকারের দ্বারা অনুসৃত হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রদীপ্ত আলোকে আমাদের সমাজের বহুকাল-পোষিত অনেক কুৎসিত ব্যাধির নগ্ন রূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সমাজ হইতে এই সব ব্যাধি দূর করিবার জন্য তৎকালে অনেক সমাজ-নেতার উদ্যমশীল আন্দোলনের ইতিহাস আমরা সকলেই জানি। যে নবীন ও প্রাচীন ভাবের সংঘর্ষ তৎকালীন সমাজ-জীবনকে মথিত করিয়াছিল সাহিত্যেও তাহার প্রতিফলন অনিবার্যভাবে দেখা গিয়াছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য-প্রভাব-পুষ্ট নবীনভাবেরই জিত হইয়াছিল। সেজন্য সাহিত্যেও নূতনত্ব-বিলাসী, সংস্কার-পন্থী মতবাদ উৎসাহের সহিত সমর্থিত হইতেছিল। ভবানীচরণ, টেকচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, রামনারায়ণ; মনোমোহন, মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি সাহিত্যিকের সাহিত্যে ইহার প্রমাণ মিলিবে। নাট্যক্ষেত্রে সংস্কারের মুদ্গর লইয়া প্রথম অবতীর্ণ হইলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। রামনারায়ণের জন্ম ও মানসিক চর্যা প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজে, অথচ এই সমাজের বিরুদ্ধেই তিনি মুদ্গর হানিলেন। এটা আপাতদৃষ্টিতে একটু অদ্ভুত ঠেকিতে পারে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ থাকিলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

রামনারায়ণ সামাজিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, প্রহসন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার নাট্যরচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে হাস্যরসের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রহসনে। সামাজিক সমস্যার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং এই সমস্যার বাস্তব রূপ দেখাইতেও তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন। কিন্তু কান্নার ভারী অস্ত্র অপেক্ষা হাসির হাল্কা শস্ত্রই তাঁহার অধিক প্রিয় ছিল। এদিক দিয়া তিনি দীনবন্ধুর সমধর্মী ছিলেন। প্রহসনের মধ্যে তিনি যে শাসনের বেত হাতে লইয়াছেন তাহা গুরুমহাশয়ের বেত নহে, বাজিকরের বেত। তাহাতে আঘাতের বেদনা মরমে চাপিয়া রখিয়া হাসির হুল্লোরে যোগ দিতে হয়। কিন্তু যখন তিনি গম্ভীর হইয়া তত্ত্বকথা কি ধর্মকথা শুনাইয়াছেন তখনই তাঁহার কথা মরমে না পশিয়া পিছলিয়া দেয়।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) তাঁহার প্রথম নাটক। ইহাকে সাধারণত বাংলা সাহিত্যের আদি নাটক বলা হইয়া থাকে। অবশ্য পূর্বে আমরা যেসব নাটকের নাম উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে ইহাকে আদি নাটক হয়তো বলা চলে না, কিন্তু ইহাকে প্রথম সামাজিক নাটক বলিতে বোধ হয় কাহারো আপত্তি হইবার কারণ নাই। ইহার পূর্বেকার নাটকগুলি দেশের লোকের মনের মধ্যে কোনই প্রভাব স্থাপন করিতে পারে নাই। 'কুলীন

কুলসর্বস্ব'ই প্রথম সাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য ও সন্তোষের সঞ্চার করিল।'১

'কুলীন কুলসর্বস্বে' কৌলীন্য-প্রথার দোষ ও অসঙ্গতি হাস্যরসাত্মক দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া দেখাইয়া ইহার নিন্দা করা হইয়াছে।২ এক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক চার কন্যার যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের বিবাহ দিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে এক কুরূপ বৃদ্ধের সহিত কন্যাদের বিবাহ দিতে বাধ্য হইলেন। ইহাই নাটকের বর্ণিত বিষয়। নাটকখানি ছয় ভাগে বিভক্ত। কিন্তু এক ভাগের সহিত অন্য ভাগের সংযোজনা নিরবচ্ছিন্ন হয় নাই। প্রত্যেক ভাগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ চরিত্র রঙ্গব্যঙ্গের মধ্য দিয়া সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের মধ্যে গুরুগম্ভীর শব্দাড়ম্বরের পার্শ্বে সরস ও লঘু ভাষার চাপল্য স্থান পাইয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রী-চরিত্রের ভাষার মধ্যেই এই ব্যবধান সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। হয়তো সংস্কৃত নাটক অনুসরণ করিয়াই এই ব্যবধান তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পুরুষদের কথা যেমন আড়ষ্ট, নারীদের কথা তেমনি সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে। রামনারায়ণ একদিকে সংস্কৃত কবিতা, এবং অন্যদিকে ছড়া ও প্রবচন সমাবেশ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রভাব ভাষা ও ভাবের মধ্যে লক্ষিত হয়। সেই প্রভাবের ফলেই জায়গায় জায়গায় উপমা-অনুপ্রাসের ঘটা রহিয়াছে, যেমন—

বসন্ত অশান্ত বড় দুরন্ত নিতান্ত।
বিরহী বধিতে বুঝি হইল কৃতান্ত ॥

ক্রটিল বিরহিমন ফুটিল বকুল।
জুটিল মধুপাবলি হইয়া ব্যাকুল ॥

নাটকের মধ্যে নানা বিচিত্র চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। চরিত্রগুলির নাম বিশেষ কৌতুকপূর্ণ —অনৃতাচার্য, অধর্মরুচি, বিবাহবণিক, উদরপরায়ণ, বিবাহবাতুল, অভব্যচন্দ্র ইত্যাদি। নামের মধ্যে ইহাদের অন্তঃপ্রকৃতি ব্যক্ত হইয়াছে। ঘটক, পুরোহিত, ঔদরিক, মূর্খ প্রভৃতিকে লইয়া সরস ব্যঙ্গ করা হইয়াছে।

১ Kulin Kulasarvasva', for such was the name of the play, found ready acceptance at the hands of the Bengalees, who had the satisfaction to feel that they were doing immense benefit to society by playing a drama the sole purpose of which was to point out the glaring evils of polygamy and of that exceptional social custom known as 'Kaulinya',

*The Bengali Theatre*—S. P. Mookherjee.

২। লেখক বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন—'পুরাকালে বল্লাল ভূপাল, আবহমান প্রচলিত জাতি মর্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুলমর্যাদা প্রচার করিয়া যান, তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম'...

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় বলিয়াছেন—'গ্রন্থকার নিজে ছিলেন দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—বল্লালী প্রথার সহিত তাঁহার সমাজের কোনও সম্পর্ক ছিল না, তিনি তাঁহার অধীনে ছিলেন না, তাই বোধ হয় তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়াছিল ভাল—বংশগত কুসংস্কারে মলিন হয় নাই।'

প্রবাসী—আশ্বিন (১৩৩৮)

রামনারায়ণের 'নবনাটক' বহুবিবাহের অনিষ্টকারিতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত।১ জোড়াসাঁকো নাট্যশালার জন্য ইহা রচনা করিয়া নাট্যকার পুরস্কার লাভ করেন। ফরমায়েসী রচনায় যে দোষ অবশ্যম্ভাবী আলোচ্য নাটকেও তাহার কোন ব্যতিক্রম নাই। অর্থাৎ ইহাতে উদ্দেশ্যের চাপে নাটকত্ব গুঁড়াইয়া গিয়াছে।২ বহুবিবাহের বিরুদ্ধে ইহাতে এত তত্ত্বকথা আছে যে আধুনিক যুগে বার্নার্ড শ'য়ের কোন নাটকেও বোধ হয় তত তত্ত্বের কচকচি নাই। ভালোমানুষী উপদেশের ভীড় ঠেলিয়া যদি আমরা গবেশবাবুর পারিষদদের মধ্যে কিছুক্ষণ বসিতে পারি কিংবা অমলা-কমলা-বিমলা-চপলার রঙ্গ-আসরে যোগ দিতে পারি তবে আমাদের ভারাক্রান্ত চিত্ত যে অনেকখানি হাল্কা বোধ করে তাহা নিঃসন্দেহ। প্রকৃত পক্ষে গুরু বিষয় অপেক্ষা লঘু চুটকীতে রামনারায়ণের হাত ভালো খোলে। কৌতুক ও রসময়ী গোয়ালিনীর যে দৃশ্য তিনি দেখাইয়াছেন তাহা বিলক্ষণ হাস্য-সরস হইয়া উঠিয়াছে। রঙ্গপ্রিয় 'নাটুকে'র হাতে মাঝে মাঝে করুণ পরিবেশও রঙ্গ-মিশ্রিত হইয়া উঠিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ চন্দ্রলেখার হাতে চিত্ততোষের প্রহার-লাভের উল্লেখ করা যাইতে পারে। চন্দ্রলেখা স্বামী ভাবিয়া নিরীহ পুরোহিতকে 'আড়াই হাত লম্বা হালিশহুরে খেঙরা' দিয়া যে ভাবে উত্তম-মধ্যম দিয়াছে তাহার বর্ণনা প্রচ্ছন্ন কারুণ্যে সিক্ত হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যত যথেষ্ট কৌতুকাবহ হইয়াছে। নাট্যকার জায়গায় জায়গায় বিলাপোক্তি ক্ষেত্রে যে সব কবিতা ব্যবহার করিয়াছেন সেগুলিতে বিলাপের অপলাপ ঘটিয়াছে। ছড়ার ন্যায় হাল্কা জাতীয় কবিতা গুরুরসের ঘনমেঘকে লঘু-বিস্তারী বাষ্পে পরিণত করিয়াছে।৩

নাটকখানির মধ্যে কোন জটিল কাহিনী নিরঙ্কুশ গতিতে বিবর্তন লাভ করিয়া অনিবার্য পরিণতিতে শেষ হইতে পারে নাই। নানা টুকরা মূল-বিচ্ছিন্ন দৃশ্যে নাটকের মূল ভাব পদে পদে খণ্ডিত হইয়াছে। সে সব দৃশ্যে তৎকালীন সামাজিক জীবনের নানা বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মূল কাহিনীর রস তাহাদের দ্বারা ঘনীভূত হয় নাই। বহু-বিবাহ ছাড়াও নাটকের মধ্যে বৈধব্য-বেদনা, স্তাবকতা-দোষ, ভাষা-সমস্যা ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত

---

১। নাটকে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি উপহার-পত্রে লিখিত আছে, 'ইহা বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ।'

২। প্রকট উদ্দেশ্যমূলকতায় প্লটের সঙ্গতি ও স্বাভাবিকতার হানি হইয়াছে।
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (২য় সং)
—ডাঃ সুকুমার সেন।

৩ দুঃখময়ী সাবিত্রীর আত্মবিলাপ উদাহরণ স্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

'কি বলিব দিদি মোর কপালের গুণ
দেখ কপালের গুণ লো কপালের গুণ।
নগরে উঠিতে লাগে বাজারে আগুন।
দিদি বাজারে আগুন লো বাজারে আগুন॥
করিব সংসার সুখে বড় ছিল সাধ।
মনে বড় ছিল সাধ লো বড় ছিল সাধ।
সে সাধে বিষাদ হলো ঘটিল প্রমাদ,
তাতে ঘটিল প্রমাদ লো ঘটিল প্রমাদ॥

হইয়াছে। নাট্যকারের মুখপাত্র হইলেন সুধীর। তাঁহার মুখ দিয়া তিনি যাবতীয় তত্ত্বোপদেশ ব্যক্ত করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাকে সপ্রাণ ব্যক্তি অপেক্ষা নিষ্প্রাণ সাবয়ব তত্ত্ব বলিয়াই বোধ হয়। নাটকের নায়ক সুবোধের চরিত্রও কারুণ্যের কুজ্ঝটিকায় এমনি আবৃত যে তাহার ব্যক্তিত্ব কোথাও পরিস্ফুট হয় নাই। তৎকালীন সামাজিক নাটকে যে অস্বাভাবিক আতিশয্য এবং একতরফা দুঃখভোগের নিয়ম ছিল আলোচ্য নাটকেও তাহার কোন ব্যতিক্রম নাই। এখানে একমাত্র দুঃখদাত্রী হইতেছেন গবেশবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী চন্দ্রলেখা আর সকলে কেবল দুঃখভোগের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এই অস্বাভাবিক, আতিশয্যদুষ্ট করুণ রস হৃদয়কে স্পর্শ করে না, ইহাতে বিরক্তি উৎপাদন করে। বহু বিবাহের ভয়াবহ কুফল দেখাইবার জন্যই নাট্যকার নাটকখানি বিয়োগান্তক করিয়াছেন। সংস্কৃত আদর্শপ্রাপ্ত নাট্যকারের পক্ষে যে ইহা অভিনব সৎসাহস তাহাতে সন্দেহ নাই।

## (খ) প্রহসন

॥ যেমন কর্ম তেমনি ফল—(দ্বি-স ১২৭৯)॥ প্রহসন রচনায় রামনারায়ণের পটুত্ব অবশ্য স্বীকার্য। যে স্বচ্ছ ও লঘু সংলাপ এবং বাগবৈদগ্ধ্য প্রহসনের অনুকূল সেগুলিতে ছিল তাঁহার দক্ষ অধিকার। ব্যঙ্গের হুল এবং শ্লেষের খোঁচা যে সমাজ-মন শোধন করিতে তত্ত্বোপদেশের গদাঘাত অপেক্ষা অনেক বেশি কার্যকর রামনারায়ণের প্রহসন তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। আলোচ্য প্রহসনখানি দুই অঙ্কে বিভক্ত। প্রকৃত প্রহসনের ঘটনা দ্বিতীয় অঙ্কেই স্থাপিত। প্রথম অঙ্ক বর্ণনামূলক এবং ঘটনাহীন। পরস্ত্রীর প্রতি অবৈধ আসক্তি এবং তাহার হাস্যকর শাস্তি লইয়া প্রহসনখানি রচিত। আলোচ্য কাহিনীর সহিত দীনবন্ধুর 'নবীন-তপস্বিনী'র কাহিনীর অনেকটা মিল আছে। তবে সেখানে অপরাধী জলধর একা আর এখানে মুন্সোব এবং তাহার সেরেস্তাদার উভয়েই সমান অপরাধী। নাগর-যুগলের করুণ পরিণাম নিষ্ঠুর পাঠক ও দর্শকের কাছে বিলক্ষণ আমোদজনক হইয়াছে সন্দেহ নাই। মুন্সোব চরিত্রের মধ্য দিয়া লেখক তৎকালীন মূর্খ, অযোগ্য, পক্ষপাতী মুন্সেফ সমাজের উপর এক হাত লইয়াছেন। ইহাকে দেখিয়া দীনবন্ধুর ঘটিরাম ডেপুটির কথা আমাদের মনে হয়।

॥ চক্ষুদান (১৮৬৯)॥ এই ক্ষুদ্রাকার প্রহসনখানি লাম্পট্যব্যাধির প্রতিকারের উদ্দেশ্য লইয়া রচিত। স্বামী নিকুঞ্জবিহারী স্ত্রীর প্রতি অবহেলা করিয়া অন্য নারীতে নিমগ্ন। স্ত্রী বসুমতী একদিন এক ছলনার আশ্রয় লইয়া স্বামীর চিত্তে চৈতন্য উদ্রেক করিতে সমর্থ হন। ইহাই চক্ষুদান। তবে এ চক্ষুদান শুধু নিকুঞ্জবিহারীর নয়, এ চক্ষুদান বোধ হয় নাট্যকার দিতে চাহিয়াছেন তৎকালীন লাম্পট্যদুষ্ট সমাজকে। নিকুঞ্জবিহারীর শেষ কথাগুলি উল্লেখযোগ্য 'বসুমতি, তুমি আজ কেবল আমাকেই চক্ষুদান দিলে এমন নয়; সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই চক্ষুদান হলো। (সভা প্রতি কৃতাঞ্জলিপূর্বক) সভ্য মহাশয়েরা কি বলেন? এ আপনাদেরও কারু কারু চক্ষুদান।'

॥ উভয় সঙ্কট ( ১৮৬৯ ) ॥ ক্ষুদ্রাকার প্রসহন। কিন্তু ইহার উৎকর্ষ ক্ষুদ্র নয়। ইহাতেও সপত্নী-সমস্যার সরস অবতারণা করা হইয়াছে। তবে আলোচ্য প্রহসনের মধ্যে অহেতুক আতিশয্য এবং অবিশ্বাস্য নির্মমতা নাই। রহস্য-মধুর ঘটনার মধ্য দিয়া সমস্যাটির উপর পরিহাস-স্নিগ্ধ আলোকপাত করা হইয়াছে। এই জাতীয় প্রহসনে স্ত্রীভূমিকার প্রাধান্য থাকে এবং আলোচ্য প্রহসনেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। বড়-বৌ, ছোট-বৌ এবং গয়লানী তিনটি চরিত্রই বাস্তবধর্মিতায় উজ্জ্বল। দুই সতীনই কর্তাকে বিকৃত আদর যত্নের আতিশয্য দেখাইতে যাইয়া যে রকম মজার সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই প্রহসনের মধ্যে হাস্যজনকতা সঞ্চার করিয়াছে। কলহ-তিক্ত, যত্ন-পীড়িত বেচারা কর্তা শেষকালে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা বিলক্ষণ কৌতুকপ্রদ—

'ওড়ে ছেড়ে দে, প্রাণ যায়, একবার ছাড় ; আমি সভ্যমহাশয়দিগের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, হাত ছাড়ে না যে. কৃতাঞ্জলি হতে পেলেম না, কি করি সভ্যমহাশয়েরা। একটা কথা বলি, ওরে একটু স্থির হ, অগো মহাশয়েরা, আমার দুর্গতি আপনারা দেখচেন, আপনাদের মধ্যে আমার মত সৌভাগ্যশালী পুরুষ কেহ থাকেন তিনি এমন সময় উপস্থিত হলে না জানি কি করেন, বোধ করি তাঁরও এইরূপ উভয় সঙ্কট।

## পৌরাণিক নাটক

॥ রুক্মিণী হরণ ( ১৮৭১ ) ॥ 'রুক্মিণী হরণে'র কাহিনী রামনারায়ণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি পুরাণের অনুবাদ করেন নাই, অন্ধ অনুবর্তনও করেন নাই। নাটকীয় প্রয়োজনে নূতন চরিত্র-সৃষ্টি এবং কুশলী ঘটনাবিন্যাস করিয়া তিনি পৌরাণিক বৃত্তান্তকে নাট্যরসোত্তীর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। রসিক 'নাটুকে'র হাতে পড়িয়া প্রাচীন চরিত্রগুলি অলৌকিক রহস্য-মহিমার যবনিকা ছিন্ন করিয়া লৌকিক বাস্তবরসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের কথাবার্তা, হাবভাব আমাদের সমাজান্তর্গত পরিচিত মানুষের সাক্ষ্য বহন করে। সংস্কৃত শব্দবর্জিত চলিত ভাষার মধ্যে নাট্যপ্রবাহের স্বচ্ছন্দগতি সঞ্চারিত হইয়াছে। সরল লোভাতুর তোতলা ব্রাহ্মণ ধনদাসের চরিত্রটি সহজে ভুলিবার নহে।

॥ কংস বধ ( ১৮৭৫ ) ॥ কংস কর্তৃক অক্রূরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ হইতে নাটকের আরম্ভ এবং কংসবধ ও উগ্রসেনের পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্তিতে নাটকের সমাপ্তি। সংলাপের দীর্ঘতা ও আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাসের জন্য এই নাটকখানি রামনারায়ণের অন্য নাটকের মত সরস হইতে পারে নাই।

'রুক্মিণী হরণ' ও 'কংস বধ' ছাড়া রামনারায়ণ 'ধর্মবিজয়' ( ১৮৭৫ ) নামে আর একখানি পৌরাণিক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ চারখানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন, সেগুলির নাম হইতেছে—বেণীসংহার ( ১৮৫৬ ), রত্নাবলী ( ১৮৫৮ ), অভিজ্ঞান শকুন্তল ( ১৮৬০ ) ও মালতী মাধব ( ১৮৬৭ )।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

### ( মাইকেল দীনবন্ধু পর্ব )

## মাইকেল মধুসূদন

### (ক) ভূমিকা

'মেঘনাদ বধ' প্রণেতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার কাব্যাবলীর ভাষা ও ভাব লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে, বাংলা সাহিত্যে তাঁহার প্রভাবও সুস্পষ্টভাবে নির্ণীত ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কবি মধুসূদনের শিরে অক্ষয় যশোমুকুট অর্পণ করিয়াও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাইকেল মধুসূদনের যোগ্য মূল্য ও মর্যাদা দান করিতে আমরা সক্ষম হই নাই; কারণ, মাইকেলের আলোচিত নাট্যপ্রতিভা যে তাঁহার কাব্য-প্রতিভার মতই যুগান্তকারী ও প্রভাবশালী এ বিষয়ে আমরা তেমন দৃষ্টি দিই নাই। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার নহেন বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য নাটকের অনুকরণে তিনিই প্রথম সার্থক নাটক লিখিয়া বাংলার ভবিষ্য নাট্য-সাহিত্যের একমাত্র পথ সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করিয়া যান। সুতরাং এই বিদ্রোহী, অসমসাহসিক, অসাধারণ প্রতিভাবান নাট্যকারকে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক নাট্যসাহিত্যের জনক ও প্রবর্তকের সম্মানিত আসন সর্বাগ্রে দান করিতে হয়।

অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিগণ সাধারণত নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যে সম্পূর্ণ আস্থাবান থাকেন, মধুসূদনেরও এমনি নিজের ক্ষমতার উপর একান্ত নির্ভরতা ছিল; তাই যেদিন পাশ্চাত্যবিলাসী, বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ মাইকেল বন্ধু গৌরদাসের কাছে বাংলা নাটক লেখার সংকল্প প্রকাশ করেন সেদিন তিনি উপহসিত হইলেও ১ তিনি যে অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁহার সংকল্প অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন তাহা আমরা সকলেই জানি। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত নাট্যকারই কোনো না কোনো রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে আসিয়া নাটক লিখিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। মধুসূদনের বেলাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। বেলগাছিয়া থিয়েটার ও ইহার কর্মকর্তাদের সহিত জড়িত না হইলে হয়তো মধুসূদন নাটক লেখার অনুপ্রাণনা লাভ করিতেন না, এবং কে জানে, হয়তো তাঁহার প্রতিভার বিকাশে ব্যাঘাত এবং বিলম্ব ঘটিত।

মধুসূদন তাঁহার প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র প্রস্তাবনায় খেদ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

---

১। যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদনের জীবন চরিত'—পৃঃ ২২৭।

মধুসূদন অকারণে অযৌক্তিক খেদ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পূর্বে বঙ্গে রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠিত হইলেও ঐ সব রঙ্গশালায় অভিনয়ের উপযোগী নাটক রচিত হয় নাই। ইংরাজ প্রভাবের ফলে আমাদের দেশে রঙ্গশালার সৃষ্টি হইয়াছিল বটে কিন্তু তখনো ইংরাজী নাটকের সমধর্মী আধুনিক নাটকের জন্ম হয় নাই। মধুসূদনের পূর্ববর্তী নাট্যকারদের মধ্যে প্রধানতম হইতেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রামনারায়ণ তর্করত্ন। কিন্তু তাঁহারা হয় কোনো না কোনো সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন, অথবা সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষায় নব-শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য প্রভাবপুষ্ট নাট্যশালায় বসিয়া নান্দী, প্রস্তাবনা প্রভৃতি-যুক্ত উপমা-অনুপ্রাস-বহুল, দীর্ঘ হা-হুতাশ-বিলাপ-সমন্বিত নাটক দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দ পাইতেন না, এবং মাইকেলও পান নাই। মাইকেল তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নাটক উপভোগেচ্ছাকে তৃপ্ত করিবার জন্যই নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। গৌরদাস বসাককে লিখিত মাইকেলের তদানীন্তন একখানা পত্র হইতে ইহা স্পষ্টভাবে জানা যায়—'Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen, who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.' ১

অবশ্য সংস্কৃতের আনুগত্য সজোরে অস্বীকার করিলেও তিনি যে তাঁহার নাটকে সংস্কৃত প্রভাব-মুক্ত হইতে পারেন নাই, সেই আলোচনা আমরা পরে করিব। কিন্তু তবুও এ কথা সত্য যে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের বন্দীশালা হইতে তিনিই নাট্যভারতীকে উদ্ধার করিয়া আধুনিক সাজসজ্জা ও অলঙ্কারে তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য নাট্য সাহিত্যের প্রথায় তাঁহার নাটকসমূহ পঞ্চম অঙ্কে এবং প্রত্যেক অঙ্ক আবার কয়েকটি দৃশ্য অথবা গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। দর্শকগণের মন লঘু ও হাল্কা করিবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে গান সংযোজিত করিয়া তাঁহার নাটককে সরস ও সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

মাইকেলের নাটকের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ও গুণ এই যে নাটকের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত কাহিনীকে এক দৃঢ়-সূত্রে সংবদ্ধ করা হইয়াছে। এই ঐক্যের ( unity ) জন্য তিনি গ্রীক নাটকের কাছে ঋণী কিনা বলা যায় না, তবে একথা সত্য যে মধুসূদনের পরবর্তী নাট্য কারদের নাটকে কাহিনীর এই জমাট ঐক্য খুব কম লক্ষ্য করা যায়। আমরা পরে বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নাটকে ইহা দেখাইয়া আলোচনা করিব। তাঁহাদের নাটকের মধ্যে অনেক স্থলেই অসংলগ্ন ঘটনা অনাবশ্যক প্রাধান্য লাভ করিয়া নাটকের গতি বিক্ষিপ্ত ও মন্থর করিয়াছে। কিন্তু মধুসূদনের নাটকের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় অংশ একেবারে নাই বলিলে চলে। পড়িতে পড়িতে আমাদের মন মূল ঘটনা হইতে কখনো বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় না, এবং কাহিনীও নিরবচ্ছিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়া পরিণতি লাভ করে।

১। যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদনের জীবন চরিত', পৃঃ ২৩১।

কিন্তু কাহিনী দৃঢ়সংবদ্ধ ও গতিশীল হইলেও মাইকেলের নাটক রঙ্গমঞ্চে কখনো জনপ্রিয় হয় নাই। ইহার কারণ তাঁহার নাটকের মধ্যে নাটকীয় ভাব খুব কম। এই নাটকীয় (dramatic) ভাব না থাকিলে কোনো নাটক রঙ্গমঞ্চে জমিতে পারে না। আকস্মিক, অসাধারণ এবং অপ্রত্যাশিত বিষয়ের সমাবেশ না হইলে এই নাটকীয় ভাব নাটকের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে না। প্রসিদ্ধ সমালোচক নিকলের কথায় বলিতে গেলে—

…'the word dramatic has a connotation signifying the unexpected, with usually the suggestion of a certain shock occasioned either by a strange coincidence or by the departure of the incidents narrated from the ordinary tenor of life.' ১

মাইকেল আকস্মিক এবং অতর্কিত ভাবে চরিত্র ও ক্রিয়ার সন্নিবেশ দ্বারা এই নাটকীয় ভাব সৃজন করিতে সক্ষম হন নাই। সেজন্য অভিনয়ের সময় তাঁহার নাটক একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর হইয়া উঠে। দর্শকেরা পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া একই ভাবে একই ধরণের কথাবার্তা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া পড়ে এবং নাটকের রস গ্রহণে বঞ্চিত হয়। উপন্যাস এবং নাটকের কথোপকথন ঘটনার গতি সম্পাদন করে এবং দর্শকের মনকে ভাবাবেগে চঞ্চল করিয়া তুলে। নাটকীয় কথোপকথনের এই নীতি মাইকেল ভালো ভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। সেজন্য কোলরিজের ভাষায় নাটকের অভিনয়ের সময় আমাদের যে 'Willing suspension of disbelief' হয়, মাইকেলের নাটকের অভিনয়ের সময় তাহা হয় না। মাইকেলের বৈচিত্র্যহীন কথোপকথন দর্শকের মনের মধ্যে অবসাদ ও ক্লান্তির উদ্রেক করে। অবশ্য তাঁহার নাটক যখন পাঠ করা যায় তখন এই রকম কবিত্বপূর্ণ চমৎকার কথোপকথন পড়িতে আনন্দই বোধ হয়, কিন্তু নাটকের বিচার করিতে গেলে রঙ্গমঞ্চে ইহার উপযোগিতার দিকে সব সময়েই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে, কারণ—

'The stage affords the first test of a play's emotional appeal, and perhaps the best test of its dramatic power.' ২

মধুসূদনের নাটকের কথোপকথন একঘেয়ে এবং বৈচিত্র্যহীন হওয়ার আর একটা কারণ ইহার অনাবশ্যক ও আত্যন্তিক দীর্ঘতা। এই দীর্ঘ কথোপকথন নাটকের রস সৃজনে এক প্রধান প্রতিবন্ধক, কিন্তু বাংলার অধিকাংশ নাট্যকার এই দোষের দ্বারা তাঁহাদের নাটকসমূহকে নাটকত্ববর্জিত করিয়া তুলিয়াছেন। অবশ্য ঐতিহাসিক নাটকে বীররসাত্মক চরিত্রের কথায় ক্রমোচ্চ ভাবের অভিব্যক্তিতে এই রকম সুদীর্ঘ বক্তৃতা অনেক সময়েই অভিনয়ের গুণে বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির ঐতিহাসিক নাটকে এই রকম দীর্ঘ বীরত্বব্যঞ্জক ভাবাবেগপূর্ণ কথা অনেক সময়েই বিশেষ চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে।

---

১ *Theory of Drama* by A Nicoll, p. 36,

২ *Tragedy* by Thorndike, p. 15

কিন্তু লঘু ভাবের পরিস্ফুরণে এই রকম কথোপকথন কখনো চিত্তাকর্ষক হইতে পারে না। নাটকের মধ্যে পাত্রপাত্রীর দীর্ঘ উক্তি নাটকের গতিকে অনেক স্থলে একেবারে খর্ব করিয়া ফেলিয়াছে। উত্তররামচরিতের মধ্যে রামের বিলাপ, কিংবা 'বিক্রমোর্বশী'র মধ্যে পুরূরবার খেদ নাটকের দিক দিয়া মূল্যহীন।

মধুসূদনের নাটকের কথোপকথনের দীর্ঘতার কারণ তিনি তাঁহার নাটকের মধ্যে নিসর্গ বর্ণনা, এবং উপমা-অলংকারের প্রয়োগ করিয়া কবিত্ব ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভুল করিয়াছেন যে, কাব্যের পক্ষে যে কবিত্ব মনোহর ও সার্থক নাটকের পক্ষে তাহাই অনাবশ্যক ও হাস্যোদ্দীপক। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসরণে সেই চমৎকার অলংকার ও বর্ণনা দ্বারা তিনি তাঁহার কাব্যসমূহ সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাহা দ্বারাই আবার তিনি তাঁহার নাটককে কৃত্রিম ও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার লালিত্য, সুষমা ও ঝংকারের জন্য সংস্কৃত নাটকের অলংকৃত বর্ণনা কৃত্রিম ও আড়ষ্ট মনে হয় না, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদে অথবা সংস্কৃত নাটকসদৃশ বাংলা নাটকে এইরূপ বর্ণনা কখনো স্বাভাবিক মনে হয় না। মাইকেলের নাটক পড়িতে পড়িতে অনেক সময় মনে হয় যে, আমরা বুঝি কোনো সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ পাঠ করিতেছি। মাইকেলের নাটকের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি পড়িলে এই কথার যাথার্থ্য বুঝা যাইবে—

'রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) আহা! কি কুলগ্নেই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করেছিলেম। (চিন্তা করিয়া) হে রসনে! তোমার কি একথা বলা উচিত? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নযুগল ব্যথিত হয়, কেন না, দৈত্যদেশে গমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে। যেহেতু, তারা তথায় বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে! (পরিক্রমণ) বাড়বানলে পরিতৃপ্ত হ'য়ে সাগর যেমন উৎকণ্ঠিত হন, আমিও কি অদ্য সেরূপ হলেম? প্রভো অনঙ্গ! তুমি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিল ব'লে কি প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানব জাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর? (দীর্ঘ নিশ্বাস) কি আশ্চর্য্য। আমি কি মৃগয়া কত্তে গিয়ে কামব্যাধের লক্ষ্য হ'য়ে এলেম?'

'শর্মিষ্ঠা', দ্বিতীয় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

পাত্রপাত্রীর মুখে এই রকম কথা অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম বলিয়া নিশ্চয়ই মনে হইবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংযত ও সার্থক অলংকারকে এইরূপ ব্যঞ্জনাময় করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন যে তাহাতে তাঁহার নাটক গতিশীল ও মাধুর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

মাইকেলের নাটকে অনেক স্থলেই দীর্ঘ স্বগতোক্তি দেখা যায়। প্রাগাধুনিক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নাটকে এই রকম স্বগতোক্তি নাটকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শেক্‌স্‌পীয়ার-অনেক চরিত্রের স্বগতোক্তি বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। স্বগতোক্তি সাধারণত নাটকীয় স্বষ্ট চরিত্রের মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু অভিনয়ের সময় এইরূপ স্বগতোক্তির সার্থকতা দেখা যায় না, কারণ কোনো চরিত্র তাঁহার উক্তি রঙ্গমঞ্চস্থ অপর এক চরিত্রের কাছে অশ্রুত রাখিয়া পাঁচিশ হাত দূরের দর্শককে শুনাইতে

পারেন না। এই নাটকীয় কৌশলটী কৃত্রিম এবং অপ্রাকৃত বলিয়া আধুনিক নাট্যকারদের দ্বারা বর্জিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ইবসেন প্রথম ইহা তাঁহার নাটক হইতে বাদ দেন। ইবসেনের নাটকের বাস্তবতা আলোচনা প্রসঙ্গে ম্যারিয়ট ইহা উল্লেখ করিয়াছেন—

'The 'aside' must be abolished, because in real life people do not use it. A man may murmur a secret thought under his breath on occasion, but he does net declaim so as to be audible a hundred yards away. If he should do so, it is ridiculous for the character at his side to pretend not to hear.' ১

মাইকেলের নাটকের পাত্রপাত্রীর স্বগতোক্তিতে কোনো কোনো স্থলে অনুপম কবিত্ব-পূর্ণ বর্ণনা থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ উক্তি নাটকের গতিকে মন্থর করিয়া ফেলিয়াছে।

মধুসূদনের মানস-কল্পনা সুগম্ভীর দূরাস্থিত জগতে বিলাস করিতে চাহিত। সেজন্য তাঁহার কাব্য ও নাটকে প্রাত্যহিক জগতের পরিচিত ক্ষুদ্রতা নাই, অতীত জগতের বিচিত্র ইন্দ্রধনুচ্ছটায় তাহা রহস্যালোকিত। 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী,' 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'মায়াকানন'—ইহাদের মধ্যে যে সব নাট্যকাহিনী রহিয়াছে সেগুলি গৃহীত হইয়াছে অতীত পুরাণ ও ইতিহাস হইতে - ইহাদের পরিবেশে রহিয়াছে এক অসচরাচর-দৃষ্ট জগতের ভাব-মহিমা ও রসগাম্ভীর্য। সেজন্য ইহাদের ভাষা ও ভঙ্গিতে স্বভাবতই এক অসুলভ গুরুত্ব ও অসঙ্গত আড়ম্বর আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু মধুসূদনের প্রতিভা ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। 'শর্মিষ্ঠা'য় সংস্কৃত-প্রভাবিত ভাষা ও বর্ণনা-রীতির যতখানি প্রাধান্য, 'পদ্মাবতী'তে ততখানি নাই এবং 'কৃষ্ণকুমারী'তে তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। আবার 'মায়াকানন' রচনা করিবার সময় তাঁহার প্রতিভার অন্তর্মুখী দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সংস্কৃত প্রভাব পুনরায় তাঁহার নাট্যগতিকে কৃত্রিম ও আড়ষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

## (খ) নাটক

মাইকেলের নাটকগুলি আলোচনা কালে আমরা লক্ষ্য করি যে তিনখানা নাটকেরই নামকরণ নায়িকাদের নাম অনুসারে হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন—'নামকার্যং নাটকস্য গর্ভিতার্থ প্রকাশকম্', অর্থাৎ নাটকের নাম গর্ভস্থ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। মাইকেলের নাটক নায়িকা-নামাঙ্কিত হইয়াছে, ইহাতেই বুঝা যায় নায়িকাগণই ঐ নাটক-গুলির প্রধান চরিত্র, তাহাদিগকে ঘিরিয়াই অন্যান্য চরিত্রগুলি আবর্তিত হইয়াছে। নায়িকাদের চরিত্র নাট্যকার হিন্দু ও গ্রীক পুরাণ এবং দেশীয় ইতিহাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। 'শর্মিষ্ঠা'ই তাঁহার প্রথম নাটক, আমরা আগে ঐ নাটকের আলোচনাই করিব।

১। *Modern Drama* by J. W. Marriott, p. 36.

॥ শর্মিষ্ঠা ( ১৮৫৯ ) ॥ মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাস বাবুর লিখিত পত্রে জানা যায় যে মাইকেল 'শর্মিষ্ঠা' লিখিবার পূর্বে 'এসিয়াটিক সোসাইটী' হইতে কয়েকখানা বাংলা ও সংস্কৃত বই আনিয়া পড়িয়াছিলেন। ১ সম্ভবত সেজন্যই মহাভারতোক্ত কাহিনী লইয়া তিনি তাঁহার নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্যপ্রভাবাপন্ন খৃষ্টান মাইকেলের পক্ষে হিন্দুর পুরাণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করা বিস্ময়োদ্দীপক মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় তাঁহার মন হইতে হিন্দু সংস্কার কখনো লুপ্ত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন বিধর্মী হইলেও যে হিন্দু ধর্মে আস্থাবান ছিলেন, সমাজত্যাগী হইয়াও যে হিন্দু সমাজের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন যে মধুসূদনের সহিত তাঁহার একদিন কথোপকথনের সময় তিনি মধুসূদনকে বলিয়াছিলেন, "আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মত হইলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু"। তিনি ( মধুসূদন ) বলিলেন, 'তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু। কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁসিয়া না থাকিলে চলে না এইজন্য খৃষ্টীয় সমাজ ঘেঁসিয়া আছি।'" ২

পুরাণ হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়া মধুসূদনই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মৌলিক পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। তাঁহার পরে অনেকেই পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের নাটক অপ্রাকৃত ও অলৌকিক বিষয়সমন্বিত হইয়া অনেক স্থলেই যাত্রা লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মাইকেল তাঁহার নাটকে সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেন নাই, এবং ঘটনা সংস্থাপন ও চরিত্র-সৃষ্টির দিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া মধুসূদন তাঁহার নাটক লিখিয়াছেন, তবে তিনি এই উপাখ্যানের গোড়া হইতে নাটকের কাহিনী আরম্ভ করেন নাই। শর্মিষ্ঠার নির্বাসন হইতে নাটক সুরু হইয়া যযাতির জরামুক্তিতে ইহার শেষ হইয়াছে। মহাভারতের উপাখ্যানে প্রথমভাগে দেবযানী এবং শেষের দিকে শর্মিষ্ঠা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মাইকেল ঐ উপাখ্যানের অন্ত্যভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। সেজন্য শর্মিষ্ঠাই তাঁহার নাটকের প্রধান চরিত্র। মধুসূদন মহাভারতের কাহিনী বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়াছেন; পরবর্তীকালে তিনি তাঁহার কাব্যে কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে যে আদর্শ লঙ্ঘনের দুঃসাহস দেখাইয়াছেন, নাটকের মধ্যে তাহার চিহ্ন নাই। কেহ কেহ 'শর্মিষ্ঠা' ও 'রত্নাবলী'র ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, মধুসূদন খুব সম্ভবত রামনারায়ণ তর্করত্নরচিত 'রত্নাবলী'র দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। ৩ কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা'র উপর, রত্নাবলী'র প্রভাব বাহির করিয়া মাইকেলের ঋণ সম্বন্ধে আলোচনা করা অনর্থক ও অনাবশ্যক।

১ গৌরদাস বসাকের পত্র, 'জীবনচরিত'—'পরিশিষ্ট', পৃঃ ৬৫০।

২ রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত', পৃঃ ১০৯।

৩ যোগীন্দ্রনাথ বসু এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ডাঃ প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা তাঁহার 'Bengali Drama' নামক গ্রন্থে ঐ মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

কারণ মধুসূদন আর কোনো মৌলিক কাহিনী সৃষ্টি করেন নাই; মহাভারতের কাহিনীর সহিত 'রত্নাবলী'র সাদৃশ্য আছে, এবং মহাভারতের কাহিনীর অনুবর্তন করিয়াছেন বলিয়াই 'শর্মিষ্ঠা'র সহিত 'রত্নাবলী'র সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়। বস্তুতপক্ষে 'শর্মিষ্ঠা'র সহিত আরও অনেক সংস্কৃত নাটকের ভাবসাম্য বিদ্যমান আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' এবং হর্ষদেব প্রণীত 'প্রিয়দর্শিকা'র নাম করা যাইতে পারে।

কোনো প্রচলিত কাহিনীর অবিকল বর্ণনা নাটকের উদ্দেশ্য নহে, বস্তুতপক্ষে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তাঁহার পূর্বপ্রচলিত কোনো উপাখ্যান হইতে নাটকীয় অংশ নির্বাচন করিয়া নাটকের মধ্যে নিবদ্ধ করেন। 'শর্মিষ্ঠা' পড়িলে মনে হয় মধুসূদন মহাভারতের উপাখ্যান পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিয়া কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় গতি সম্পাদন করিতে পারেন নাই। যে সমস্ত ঘটনা কি ক্রিয়া নাটকীয় রস সৃজনে অনুকূল তিনি সেগুলি ভালো ভাবে সন্নিবেশিত করিতে পারেন নাই। পাত্রপাত্রীর কথার মধ্য দিয়া যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি করিতে হয় মধুসূদন তাহা বুঝিতে পারেন নাই, সেজন্য 'শর্মিষ্ঠা'র অধিকাংশ স্থলে পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। ঐ সব কথোপকথন চরিত্র বিকাশে মোটেই সহায়তা করে নাই। নাটকের প্রথম দৃশ্যে দৈত্য ও বকাসুরের আলাপে নাটকের পূর্ব ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। এই দৃশ্যকে প্রস্তাবনা (Prologue) বলা যাইতে পারে। একমাত্র পূর্ব ঘটনা পাঠক এবং দর্শককে অবগত করান ছাড়া ইহার আর কোন সার্থকতা নাই। শর্মিষ্ঠা, দৈত্যপতি এবং শুক্রাচার্যের দ্বারা যদি এই দৃশ্য অভিনীত হইত তাহা হইলে এই অংশ বিশেষ নাটকীয় হইয়া উঠিত এবং শর্মিষ্ঠার চরিত্র স্ফুরণে বিশেষ কার্যকর হইত। ডাঃ গুহ ঠাকুরতা মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রথম দৃশ্য নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি নাটকীয়-ভাবপূর্ণ।[১] কিন্তু আমাদের মনে হয় যে প্রথম দৃশ্যে নাটকীয় ভাব এবং নাট্য কলা-কৌশলের কোনো পরিচয় নাই। শর্মিষ্ঠা নায়িকা এবং দেবযানী প্রতি-নায়িকা। কিন্তু তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের পূর্বে কেবলমাত্র একবার ব্যতীত আমরা শর্মিষ্ঠার সাক্ষাৎ পাই নাই। এই পর্যন্ত দেবযানীই মুখ্য চরিত্র, এবং তাঁহার সহিত রাজার প্রণয় এবং পরিণয় ব্যাপার লইয়াই কাহিনী অগ্রসর হইয়াছে। যদি শর্মিষ্ঠাই নাটকের নায়িকা হন, তাহা হইলে এতো বিস্তৃতভাবে প্রতিনায়িকার কাহিনী বর্ণনা করার কোন সার্থকতা নাই। রাজার পক্ষে একই ভাবে একবার দেবযানীর প্রতি এবং আবার শর্মিষ্ঠার প্রতি আসক্ত হওয়ার চিত্র কাহিনার রস-সৃজনে পরিপন্থী হইয়াছে। রাজা এবং তাঁহার দুই প্রণয়ভাগিনী ভার্যা দ্বারা যে ত্রিকোণ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে সেই সমস্যার সংঘাত নাট্যকার পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই। শর্মিষ্ঠা-যযাতির প্রেম আবিষ্কারের পর কুপিতা, ঈর্ষান্বিতা দেবযানীর সহিত সমস্যাপীড়িত রাজার চমৎকার ঘাত-প্রতিঘাতমূলক কথোপকথনের সুযোগ ছিল। কিন্তু নাট্যকার রাজার মুখ দিয়া এই ঘটনা বিবৃত করিয়া সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। ইহার পর দেবযানী পিতার দ্বারা রাজাকে অভিশাপিত করিয়াছেন।

---

১ *Origin and Development of Bengali Drama* by Dr. P. C. Guha Thakurta.

কিন্তু তার পর দৃশ্যেই অনুতপ্ত হইয়া স্বামীর জন্য দুঃখাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। অথচ ইতিমধ্যে এমন কোনো কথা হয় নাই, যাহাতে দেবযানীর মতির পরিবর্তন হইতে পারে। তাঁহার চরিত্র পরিবর্তনের পূর্বে স্বামীর সহিত তাঁহাকে একবার দেখা করান উচিত ছিল। নাট্যকার সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত শর্মিষ্ঠা এবং দেবযানী উভয়কেই রাজার সহিত মিলিত করিয়াছেন। উঁহাদের মধ্যে কাহাকেও বিয়োগান্তক নায়িকা ( tragic heroine ) করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের চরিত্রগুলি সুবিকশিত হয় নাই, এবং নাটকীয় সংঘাত জমে নাই, তাহার কারণ নাটকখানির সংলাপ চরিত্র-বিকাশক ও ঘটনার গতি-বিধায়ক হয় নাই। সংলাপের মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে কাহিনীর বর্ণনা হইয়াছে মাত্র; সেজন্য নাগরিক, সখী, দৈত্য ইত্যাদি অপ্রধান চরিত্রের অনাবশ্যক অবতারণা করিয়া তাহাদের মুখ দিয়া অধিকাংশস্থলে কাহিনী ব্যক্ত করিতে হইয়াছে। প্রধান চরিত্রগুলিসম্বন্ধীয় ঘটনা যদি তাহাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে চরিত্রগুলি বিকশিত হইবার সুযোগ পাইত, এবং কাহিনীও নাটকীয় ক্রিয়াবিশিষ্ট হইয়া উঠিত।

শর্মিষ্ঠার নাম অনুসারে মাইকেল নাটকের নামকরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু শর্মিষ্ঠার চরিত্র মোটেই সজীব হয় নাই। নাটকের গোড়া হইতেই তাঁহাকে আমরা দেবযানীর দাসীপদে নিযুক্ত দেখিতে পাই। সুখৈশ্বর্যে পালিতা রাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠাকে নাটকের মধ্যে দেখান হয় নাই। সেজন্য পূর্ব অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার দুঃখপূর্ণ হীন অবস্থায় দর্শক সহানুভূতি বোধ করে না। শর্মিষ্ঠা সহিষ্ণু, ক্ষমাশীলা ও কোমলপ্রাণা; দেবযানী তাঁহার প্রতি গুরুতর অন্যায় করা সত্ত্বেও তাঁহার বিরুদ্ধে শর্মিষ্ঠার কোন অভিযোগ কিংবা ক্রোধ নাই। শর্মিষ্ঠা চরিত্রের মধ্যে মাইকেল ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু শর্মিষ্ঠার কোমল মাধুর্য সত্ত্বেও নায়িকার প্রভাব এবং ব্যক্তিত্ব তাঁহার মধ্যে নাই। বরং দেবযানীর চরিত্র অধিকতর পরিস্ফুট ও বিকশিত হইয়াছে। নাটকের মধ্যে দেবযানীই সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, এবং তাঁহার শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব কাহিনীকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। নাটকের প্রথম দিকে যযাতি ও দেবযানীর প্রণয়-ব্যাপারই ব্যক্ত হইয়াছে, এবং দেবযানীকে পতিপরায়ণা প্রেমময়ী স্ত্রী-রূপে দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহার সীমাহীন প্রেমধারা যযাতির বিশ্বাসঘাতকতার কঠিন প্রস্তরে রুদ্ধ হইয়া দুর্জয় অভিমানরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যিনি একবার কিশোর বয়সে প্রেমে ব্যর্থ হইয়া ক্রুদ্ধভাবে প্রেমাস্পদকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তিনি পুনরায় প্রতারিত হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হইলেন। পিতাকে অনুরোধ করিয়া তিনিই স্বামীকে জরাগ্রস্ত করেন কিন্তু পরে অনুতপ্ত হইয়া নিজেকেই ধিক্কার দিতে থাকেন, এবং পুনরায় তিনিই স্বামীর জরামুক্তির ব্যবস্থা করেন, স্বামার প্রতি তাঁহার সুগভীর প্রেম এবং প্রতিহিংসা, ক্রোধ এবং অনুতাপ প্রভৃতি বিপরীত গুণবিশিষ্ট হইয়া দেবযানীর চরিত্র বিশেষ সজীব ও নাটকীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দেবযানীকেই নাটকের নায়িকা বলা উচিত।

যযাতি চরিত্রের মধ্যে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই। যযাতি সংস্কৃত নাটকের প্রসিদ্ধ নায়কসমূহ—দুষ্মন্ত, অগ্নিমিত্র, উদয়ন প্রভৃতির ন্যায় প্রণয় ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ, এবং স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীতে আসক্ত হওয়া তাঁহাদের ন্যায় যযাতির পক্ষেও অমার্জনীয় অপরাধ নয়। প্রথমা স্ত্রীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া তাঁহারা স্ত্রী ও প্রণয়িনীর মধ্যে আপোষ বিধান করিয়া থাকেন। আলোচ্য নাটকে যযাতি নিজে শাপগ্রস্ত হইয়া তাঁহার দুই স্ত্রীর মধ্যে মিলন সাধন করিতে পারিয়াছেন।

বিদূষকের চরিত্র মধুসূদন সংস্কৃত নাটক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের ন্যায় 'শর্মিষ্ঠা'র বিদূষকও স্থূলবুদ্ধি, চেটী ও নটীর সহিত পরিহাস-রঙ্গ-রত এবং রাজার প্রেমব্যাপারে সহায়ক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার বিদূষক চরিত্র যেমন নূতন ভাবে অংকন করিয়াছেন মধুসূদন তাহা পারেন নাই।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের আলোচনা কালে ইহা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে শর্মিষ্ঠাই আধুনিক নাটকের পথপ্রদর্শক, সুতরাং প্রাথমিক নাটকের দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাহার মূল্য যে অনেকখানি ইহা স্বীকার করিতে হইবে। 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশিত হইলে ইহা শ্রেষ্ঠ নাটক রূপে বন্দিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন—'তথাপি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে সকল বাংলা নাটক এপর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে 'শর্মিষ্ঠাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিবেন সন্দেহ নাই।' ১

॥ পদ্মাবতী (১৮৬০) ॥ 'শর্মিষ্ঠা'র পরে মাইকেল 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। ২ পদ্মাবতীর বিষয়বস্তু তিনি গ্রীক পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাইকেল চিরদিনই গ্রীক সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। এই অনুরাগের ফলে তাঁহার নাটক ও কাব্যের অনেক স্থলে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যে Apple of discord নিয়া জুনো, ভিনাস ও প্যালাস দেবীত্রয়ের বিবাদ বাধিয়াছিল, এবং যাহার ফলে ট্রয়ের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল সেই উপাখ্যান সকলেরই সুবিদিত। ঐ গ্রীক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া মাইকেল 'পদ্মাবতী' নাটক রচনা করেন। 'পদ্মাবতী'র শচী, মুরজা ও রতি যথাক্রমে গ্রীক আখ্যানের জুনো, প্যালাস ও ভিনাসের অনুরূপ। প্যারিস ভিনাসকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলিয়া হেলেনকে লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ট্রয় নগরীর ধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন। 'পদ্মাবতী'র নায়ক ইন্দ্রনীলও রতিকে সর্বোত্তমা সুন্দরী এই অভিমত প্রকাশ করিয়া পদ্মাবতীকে লাভ করিয়াছিলেন এবং আবার হারাইয়াছিলেন। হেলেন অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী এবং পদ্মাবতী ইন্দ্রনীলের নিজের স্ত্রী, তাহাদের মধ্যে এই পার্থক্য। সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ করিয়া মধুসূদন শেষে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর মিলন সাধন করিয়াছিলেন ইহাও তাঁহার মৌলিকতা বটে।

'শর্মিষ্ঠা'য় পরোক্ষভাবে নাটকীয় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া নাটকের ঘাত প্রতিঘাত ফুটিয়া উঠে নাই, একথা আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু 'পদ্মাবতী'তে

১। বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৭৮০ শকাব্দ, মাঘ।

২। অবশ্য 'পদ্মাবতী'র পূর্বেই তিনি তাঁহার প্রহসন দুইখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

মধুসূদন নাট্যকলা বিষয়ে অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। এই নাটকের চরিত্রগুলি নিজেদের উক্তি দ্বারা বিকশিত হইতে পারিয়াছে। প্রথম অংকে ইন্দ্রনীলের সহিত দেবীত্রয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে, এবং সৌন্দর্য-কলহ ও ইন্দ্রনীলের অভিমত দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনার সূত্রপাত এই অংকেই হইয়াছে। ইহার পর প্রসন্ন রতি একদিকে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর মিলনে চেষ্টা করিয়াছেন, অন্যদিকে ক্রুদ্ধ, ঈর্ষাজর্জরিত শচী তাঁহাদের সর্বনাশ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনী দেবীর সক্রিয়তায় কাহিনী যথেষ্ট গতিশীল হইয়াছে। ইন্দ্রনীল ছদ্মবেশে মাহেশ্বরীপুরীতে আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ছদ্মবেশের কারণ জানা যায় না, এবং যে রকম তুচ্ছ কারণে ছদ্মবেশ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে ছদ্মবেশের রহস্যময়তা নষ্ট হইয়াছে। পদ্মাবতী ইন্দ্রনীল রাজা নহেন একথা মনে করিয়া মর্মপীড়িতা হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং ইন্দ্রনীলের প্রকৃত পরিচয় পদ্মাবতীর সম্মুখে ব্যক্ত হইলে পদ্মার বিস্ময় ও আনন্দের মধ্যে নাটকটী রসঘন হইয়া উঠিত। ইন্দ্রনীলের ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া নাট্যকার যেই নাটকীয় বিস্ময় ও উদ্বেগ উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে সম্পূর্ণ সমর্থ হন নাই। শচীর আদেশে ইন্দ্রনীলের রাজপুরী হইতে কলি পদ্মাবতীকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছেন। রাজরাণীর পক্ষে রাজার এই অকারণ এবং অবিশ্বাস্য আদেশ অনুসারে সারথির সহিত পুরীর বহির্গত হওয়াটা যেন আমাদের বিশ্বাসপ্রবণতাকে আঘাত করে। কলি দুঃখিনী পদ্মাবতীকে রাজার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার মনে প্রচণ্ড শোক ও গভীর নৈরাশ্য উদ্রেক করিয়াছেন। স্বামীর পুনর্মিলনের পূর্ব পর্যন্ত যদি পদ্মা স্বামীকে মৃত মনে করিয়া থাকিতেন, তবে মিলনের মুহূর্তটী আরো বেশী নাটকীয় হইয়া উঠিত। যে ভাবে নাট্যকার রাজা ও পদ্মাবতীকে অঙ্গিরার আশ্রমে মিলিত করিয়াছেন এবং শচী ও রতির বিরোধ অবসান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নাট্যকলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকটীর শেষ হইয়াছে সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারে। সংস্কৃত নাটকে যেমন পরিপূর্ণ মিলনে ভরত বাক্যের মধ্যে সকলের শুভ কামনায় নাটকের শেষ হয়, পদ্মাবতীতেও তাহাই হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে যে সব চরিত্র বিষাদান্তক হইতে পারিত তাহাদের মিলনেও যেন বিষাদের ধাক্কা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। 'পদ্মাবতী' নাটকে তেমনি সকলের আনন্দপূর্ণ মিলনের মধ্যে ঈর্ষাদগ্ধ প্রতিশোধপরায়ণা অথচ পার্বতী আদেশে নিরুপায় শচীর ট্র্যাজেডির দুঃখপূর্ণ সুর ধ্বনিত হয়।

রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন যে, 'পদ্মাবতী'র উপর 'শকুন্তলা'র স্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। এই উক্তি যথার্থ বলিয়া মনে হয়। পদ্মাবতীর সহিত ইন্দ্রনীলের মিলন ও বিচ্ছেদ, এবং অবশেষে অঙ্গিরার আশ্রমে তাঁহাদের পুনর্মিলন—এ সমস্ত ঘটনা 'শকুন্তলা'র সহিত সাদৃশ্য ব্যক্ত করে। ইহা ছাড়া নাটকের বর্ণিত বিষয়ের মধ্যেও 'শকুন্তলার' প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'পদ্মাবতী'র তৃতীয়াংকের প্রথম গর্ভাংকের শেষ দিকে সখীকে পদ্মা বলিতেছেন—

পদ্মা—'সখি! দেখ, এই নূতন তৃণাঙ্কুর আমার পায়ে বাজতে লাগলো। উহুঁ!

আমি ত আর চলতে পারি না, তোমরা একজন আমাকে ধর! (রাজার প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত)

এই অংশটী একেবারে শকুন্তলার প্রথম অংকের শেষাংশের অনুরূপ। ১

পদ্মাবতী নায়িকা হইলেও এই নাটকের শ্রেষ্ঠ চরিত্র শচী। এই শচী মহিমময়ী দেবী স্বর্গের ইন্দ্রাণী নহেন, ইনি ঈর্ষা-কলহপরায়ণা অলিম্পিয়ার রাজ্ঞী জুনোর সমগোত্রীয়া। মাইকেল 'মেঘনাদ-বধে' হিন্দুর চির আরাধ্য দেবদেবীর চরিত্র বিকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকে গুরুতর অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগ বর্তমান নাটকে প্রযোজ্য হইলেও একথা সত্য যে শচীর চরিত্র চমৎকারভাবে সজীব ও নাটকীয় হইয়া উঠিয়াছে। শচী সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় পরাজিত ও অপমানিত হইয়া বিচারককে শাস্তি দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং নানাভাবে নাটকের মধ্যে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীকে দুঃখ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শেক্সপীয়রের গনেরিল (Goneril) ২ ও লেডী ম্যাকবেথের ন্যায় শচীর দৃঢ় সংকল্প, প্রখর বুদ্ধি, সুচতুর উপায় উদ্ভাবনী শক্তি, নিষ্করুণ কাঠিন্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিজের দলিত মর্যাদা উদ্ধার করিবার জন্য তিনি পদ্মাবতী ও ইন্দ্রনীলের বিচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, এবং কলিকে দিয়া পদ্মাবতীর কাছে ইন্দ্রনীলের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিশোধ-স্পৃহা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু দেবী পার্বতীর আজ্ঞায় তাঁহার মাথা নত করিতে হইল। নিরুপায় শচীর পরাজয় বাস্তবিকই দুঃখাবহ। শচী যখন শেষকালে বলিতেছেন—'হায়! আমার এত পরিশ্রম কি তবে বৃথা হলো? অবশেষে রতিই জিতলে!' তখন তাঁহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি উদ্রিক্ত না হইয়া পারে না। মুরজা শচীর সহযোগিনী হইলেও তাঁহার মধ্যে আমরা বরাবর দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই। তাঁহার মাতৃহৃদয় সচেতন মনের অজ্ঞাতসারেই কন্যাকে পীড়া দিতে সংকুচিত হইতেছিল। এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সহিত সম্বন্ধ-রহস্যোদ্ঘাটনের চমৎকার সামঞ্জস্য হইয়াছে।

রতি শচীর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী। বুদ্ধি ও চাতুর্যে বার বার তিনি শচীর উদ্দেশ্য ব্যাহত করিয়াছেন, এবং অবশেষে ভগবতীর সহায়তায় তিনিই সর্বশেষে জয়লাভ করিয়াছেন। এই তিন দেবীর প্রবল প্রতিযোগিতার ঘূর্ণ্যাবর্তে মানব চরিত্রগুলি নিতান্ত অসহায়ভাবে আবর্তিত হইয়াছে। রতির আনুকূল্যে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী মিলিত হইয়াছেন, শচীর প্রতিকূলতায় তাঁহারা আবার বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, এবং ভগবতীর প্রসাদে তাঁহারা পুনর্মিলিত হইতে পারিয়াছেন। দেব চরিত্রের এই প্রাধান্যের জন্য মানব চরিত্র মোটেই ফুটিতে পারে নাই। পদ্মাবতী সরলা, কোমলপ্রাণা এবং পতিব্রতা স্ত্রী। কিন্তু ভাগ্য ও ঘটনার প্রতিরোধ করিয়া নিজের চরিত্র তিনি বিকাশ করিতে পারেন নাই। রাজা ইন্দ্রনীলকে

১। শকুন্তলা—অণসূয়ে, অহিণবকুসসূইয়ে পরিক্খদং মে চলণং। কুরবঅ সাহাপরিলগ্গং চ বক্কলং। দাব পরিপালেধ মং, জাব ণ মোআবেমি।

(রাজানমবলোকয়ন্তী সব্যাজং বিলম্ব্য সহ সখীভ্যাং নিষ্ক্রান্তা)।

২। রাজা লীয়ারের কন্যা।

নাটকের মধ্যে খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায় এবং সৌন্দর্য বিচারে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ব্যতীত তাঁহার চরিত্রের অন্য কোন বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য নহে। বিদূষক অনেকস্থলে অনাবশ্যকভাবে নিজের স্থূল বুদ্ধির দ্বারা সকলকে হাসাইতে চেষ্টা করিয়াছে। 'পদ্মাবতী'র বিদূষক 'শর্মিষ্ঠা'র বিদূষক অপেক্ষা অনেক বেশি স্বাভাবিক, তবে তাহার রসিকতা অনেক স্থলেই বিরক্তিকর।

॥ কৃষ্ণকুমারী( ১৮৬১) ॥ 'কৃষ্ণকুমারী' মধুসূদনের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। পূর্ববর্তী নাটক দুইখানিতে তিনি সংস্কৃত প্রভাব একেবারে বর্জন করিতে পারেন নাই, কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করিয়া নাটক রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। প্রাচ্যনাট্যকলা-বহির্ভূত বিয়োগান্তক নাটক রচনা করিয়া তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ বিদ্রোহের পরিচয় দিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণকুমারী'ই বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ট্রাজেডি অর্থাৎ বিষাদান্তক নাটক সাধারণের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, 'কৃষ্ণকুমারী'র পূর্বেই 'কীর্তিবিলাস' ( ১৮৫২ ) এবং 'বিধবাবিবাহ নাটক' ( ১৮৫৬ ) নামে দুইখানি বিয়োগান্ত নাটক রচিত হইয়াছিল। যাহা হউক 'কৃষ্ণকুমারী'র পূর্বে বিয়োগান্ত নাটক প্রণীত হইলেও সাধারণ্যে ঐ সব নাটকের প্রচার নাই, সুতরাং মধুসূদনকেই সার্থক বিয়োগান্ত নাটকের প্রবর্তক বলিলে অন্যায় হইবে না।

'কৃষ্ণকুমারী' শুধু মাত্র প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নহে, ইহা মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার প্রধানতম কীর্তি। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' উভয় নাটকেই ছিল পুরাণের কাহিনী—একটিতে হিন্দুপুরাণের কায়া আর একটিতে গ্রীক পুরাণের ছায়া। কিন্তু পুরাণ পুরাণই, তাহাতে বাস্তব নরনারীর জটিল হৃদয়দ্বন্দ্ব বিকাশ করিয়া দেখাইবার অবসর নাই। নাট্যকারের হাত সেখানে সুবিদিত কাহিনীর রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ। সেজন্য এই দুইখানি নাটকে তিনি তাঁহার মৌলিক প্রতিভার লীলানৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। সংস্কৃত নাটকের রীতি ও নির্দেশ না মানিয়া তাঁহার উপায় ছিল না। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' তাঁহার নাট্যপ্রবাহের বাধাটি সরাইয়া দিল, আপন প্রাণোচ্ছ্বাসে তখন তাহা আত্মপ্রকাশ করিল। রাজপুত ইতিহাস প্রাচীন হইলেও তাহা আমাদের মত মানুষেরই ইতিহাস। এই ইতিহাস অবলম্বন করিয়া মধুসূদন বাস্তব নরনারীর বিচিত্র হৃদয়-সংঘাত পরিস্ফুট করিয়া তুলিলেন। চরিত্রগুলি অন্তরাবেগ ও সৌন্দর্যে প্রাণময় হইয়া উঠিল বলিয়া বাহিরের সাজসজ্জার আর প্রয়োজন রহিল না।

মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' রচনা করিবার সময় তাঁহার বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবকে যে সব চিঠি-পত্র লিখিয়াছিলেন সেগুলি হইতে তাঁহার নাট্যজ্ঞান ও আলোচ্য নাটকের প্রেরণা ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানিতে পারি। প্রসিদ্ধ অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত একখানি পত্রে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় নাটকের মৌলিক বিভিন্নতার কারণ সম্বন্ধে যে আলোচনা তিনি করিয়াছেন তাহা যেমন জ্ঞানগর্ভ তেমনি রসগ্রাহী। উক্ত পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of fairylands. The genius of the drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems; and even Wilson, the great foreign admirer of our language, has been compelled to admit this. In the Sermistha, I often stepped out of the path of the dramatist, for that of the mere poet. I often forgot the real in search of the poetical. In the present play, I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry, if I find her before me I shall not drive her away; and I fancy, I may safely reckon upon coming across her now and then. I shall endeavour to create characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry.

এই মূল্যবান পত্রখানি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মধুসূদন কাব্যোচ্ছ্বাস-বিরহিত, দ্বন্দ্ব-সংঘাতমূলক নাটকের আদর্শ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়াও তাঁহার পূর্ববর্তী নাটকে অত্যধিক কাব্যবশ্যতার জন্য সেই আদর্শ রূপায়িত করিতে পারেন নাই। এই কাব্যবশ্যতা হয়তো কিছুটা তাঁহার স্বভাবগত কবিধর্মের কারণে, হয়তো বা কিছুটা জনচিত্তের সুলভ স্বীকৃতি পাইবার লোভে। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী'তে তিনি নিজের স্বভাব ও পরের রুচি উভয়কেই উপেক্ষা করিলেন, অবিমিশ্র নাট্যপ্রেরণা লইয়া তিনি নাট্যজগতের মূল মর্মলোকে প্রবেশ করিলেন। কবি মাইকেল তাঁহার নাট্যসত্তার পরিপূর্ণ গৌরবালোকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গেলেন।

মধুসূদন বুঝিয়াছিলেন, বস্তুজগতের তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত ও তাহার অনিবার্য দুঃখময় পরিণাম প্রাচ্য রুচি ও আদর্শসম্মত না হইতে পারে কিন্তু তাহাই শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি—মানবের সর্বোৎকৃষ্ট রস-চেতনার অঙ্গীভূত। শুধু নাটকে নহে, কাব্যেও এই অপূর্বদৃষ্ট ট্র্যাজিক চেতনার পরিচয় মাইকেলই সর্বপ্রথম দিয়াছিলেন। পঙ্গু ও অক্ষম মানুষের দৈবনিয়ন্ত্রিত দুঃখ ও বিলাপের বিগলিত প্রবাহ যে করুণরসের পঙ্কিল ও আবর্তহীন জলাশয় সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ট্র্যাজেডির প্রখর জ্বালাস্পর্শে শুষ্ক-কঠিন সংগ্রামক্ষেত্রে পরিণত হইল। এই ট্র্যাজেডি রহিয়াছে 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' আর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে। ১৮৬১ সাল মধুসূদনের সাহিত্যপ্রতিভার সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় বৎসর। ঐ সালে তাঁহার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মেঘনাদ বধ', শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' ও শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য 'ব্রজাঙ্গনা' রচিত হয়। এই তিনখানি গ্রন্থই বিষাদান্তক ইহা মনে রাখিলে তৎকালে মানবজীবনের এই শাশ্বত শোকাবহ দিকে কবির চিত্ত কতখানি নিমগ্ন ছিল তাহা সহজেই ধারণা করা যাইবে। শুধু এই তিনখানি গ্রন্থে নহে

তাঁহার অন্যান্য অধিকাংশ গ্রন্থ,—যথা 'তিলোত্তমাসম্ভব', 'বারাঙ্গনা', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', 'মায়াকানন', 'হেক্টর বধ কাব্য' প্রভৃতি দুঃখ ও বেদনাভারাক্রান্ত। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে এই সজীব প্রবৃত্তির সুতীব্র সংঘাত-জনিত বাস্তব দুঃখশোকের চেতনা তাঁহার চিত্তের গভীরতম মূলে আবদ্ধ হইয়াছিল। অবশ্য দুঃখশোকের চেতনামাত্রই সাহিত্যকে যথার্থ বিষাদ-করুণ করিতে পারে না; সেই দুঃখশোকের যথোপযুক্ত প্রকাশরীতিও আয়ত্ত থাকা দরকার। এই প্রকাশরীতি মধুসূদনের আয়ত্ত ছিল বলিয়াই তিনি মানবজীবনের বিষাদময় দিকটি এত গভীর ও উজ্জ্বলভাবে তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ-প্রবর্তন ভাষার শব্দ-গাম্ভীর্য ও বর্ণনাশক্তির ওজস্বিতা প্রভৃতি দ্বারা যেমন 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের মধ্যে ট্র্যাজেডির সমুন্নত মহিমা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তেমনি দ্বন্দ্বজটিল ঘটনা-সমাবেশ, সংলাপের অলঙ্কার-ভারমুক্ত ক্ষিপ্রতা ও চরিত্রের অন্তঃসংঘাতের চিত্র অঙ্কন করিয়া নাটককে যথার্থ ট্র্যাজিক গৌরবে ভূষিত করিলেন। 'কৃষ্ণকুমারী' সার্থক ট্র্যাজেডি শ্রেণীভুক্ত হইবার কারণ, নাট্যকার গোড়া হইতেই একটি অনুত্তীর্য অবস্থা-সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়া নাটকের ঘটনাবেগকে এক অনিবার্য দুঃখ-পরিণতির দিকে অলঙ্ঘ্য আকর্ষণে লইয়া চলিয়াছেন। সেজন্য মাঝে মাঝে ধনদাস মদনিকা প্রভৃতির সরস কথোপকথন থাকিলেও কোথাও কোন লঘু হাস্যরসাত্মক দৃশ্যের অবতারণা করিয়া নাট্যকার ইহার রসগাম্ভীর্য তরল করিয়া ফেলেন নাই। ১

'মেঘনাদ বধ কাব্য' ও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' শুধু যে সমকালীন রচনা তাহাই নহে, উভয়ের মধ্যে ট্র্যাজিক সমধর্মিতাও বিদ্যমান। উভয় রচনার মধ্যেই পিতৃহৃদয়ের মর্মান্তিক বেদনার এক বহ্নিমান রূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অথচ এই ব্যক্তিগত বেদনার সহিত এক সুমহান স্বদেশহিতৈষণার প্রেরণা উভয় চরিত্রকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। রাবণ চরিত্রের বিশালতা অতুলস্পর্শী সমুদ্রের সঙ্গেই উপমেয়। এই পাষাণসদৃশ পুরুষের অশ্রুবিধৌত রূপ দেখিয়া কঠিন হিমগিরির গাত্রবাহিত বিগলিত তুষারধারার কথাই মনে হয়। দৈব ও পুরুষকারের যুগপৎ প্রভাবে তাহার ব্যক্তিত্বে মিলিয়াছে বীরের হুঙ্কারের সহিত বিলাপীর হাহাকার। এই বিশালতা ও বিচিত্র রহস্যঘন বিরোধজটিল ব্যক্তিত্ব ভীমসিংহের নাই বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে পিতার করুণ বাৎসল্যের সহিত রাজার কঠোর কর্তব্যের যে নিদারুণ সংঘাত ও তাহার ফলে যে অসহায় সঙ্কট ও অপরিমেয় অন্তর্জ্বালার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বোধ হয় রাবণ-চরিত্রেও নাই। রাবণের দুঃখে রহিয়াছে মর্মভেদী আত্মবিলাপের ঊর্ধ্বচারী বিস্তার আর ভীমসিংহের দুঃখে ফুটিয়াছে আত্মঘাতী হৃদয়ের ভূমিলুণ্ঠিত আর্তনাদ।

---

১। এই প্রসঙ্গে মধুসূদন কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিছুটা উদ্ধৃত হইল—

As the play is a tragedy, I have not thought it proper to begin any scene with the determination of being comic; in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the play. But whenever in the course of the dialogue a pleasant remark has suggested itself I have not neglected it. The only piece of criticism I shall venture upon, is this :—never strive to be comic in a tragedy, but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable variety.

'কৃষ্ণকুমারী'র কাহিনী মাইকেল টড প্রণীত 'রাজস্থান' হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। মধুসূদন যেমন পৌরাণিক নাটকের জনয়িতা, তেমনি ঐতিহাসিক নাটকেরও প্রবর্তয়িতা বটে। তাঁহার পরে বহুতর নাট্যকার 'রাজস্থান' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নানা বীরত্ব-ব্যঞ্জক ও স্বদেশ প্রেমমূলক আখ্যান অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিয়াছেন। দেশের অতীত গৌরবময় কাহিনী নাটকের মধ্যে রূপ নিয়া আমাদের সুপ্ত দেশাত্মবোধকে অনেকখানি জাগ্রত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। মাইকেলের পরে নাট্যকারগণ অনেক 'নাটকে ইতিহাসের গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহার নাটকে ইতিহাসের সহিত মিল রাখিয়াই চলিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। মধুসূদন তাঁহার 'ট্র্যাজেডি'র জন্য কৃষ্ণকুমারীর শোকাবহ কাহিনী নির্বাচন করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। নাটকের বিষাদান্ত পরিণতি যথেষ্ট করুণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু করুণ হইলেও নাটকটী প্রকৃত 'ট্র্যাজিক' হইয়াছে কিনা তাহাই এখন আমাদের আলোচ্য।

নাট্য সাহিত্যের অদ্বিতীয় সমালোচক নিকল তাঁহার 'Theory of Drama'তে একটি চমৎকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে পুরুষ চরিত্রই সব সময়ে ট্র্যাজেডির নায়ক হইয়া থাকে। স্ত্রীচরিত্র যেখানে প্রধান চরিত্র সেখানে সেই চরিত্র নিশ্চয়ই বিশেষ শক্তিশালী, দৃঢ়চেতা, পুরুষভাবাপন্ন হইবে। ১ কোমল-ভাবাপন্ন, দুর্বলচিত্ত নারী ট্রাজেডির মধ্যে অপ্রধান ও প্রভাবহীন। প্রকৃতপক্ষে 'ওথেলো' এবং 'হ্যামলেট' নাটকে ডেসডেমনা ও ওফেলিয়ার কোনো গুরুত্ব এবং প্রভাব নাই। পক্ষান্তরে লেডী ম্যাকবেথ, ইফিজেনিয়া, ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রা, মিডিয়া, গনেরিল এ সব চরিত্র নারীত্বভাববিবর্জিত, অসম শক্তিশালী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং পুরুষায়িত। কৃষ্ণকুমারীর নামে নাটকের নাম হইলেও সে সরলা, কোমল-প্রাণা, অনভিজ্ঞা বালিকা; ট্র্যাজেডির নায়িকা হইবার মত বৈশিষ্ট্য তাহার নাই। অ্যারিষ্টোটল তাঁহার 'Poetics' এ বলিয়াছেন যে ট্র্যাজেডির নায়ক অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ হইবেন না বটে, কিন্তু তিনি পাপী ও দুষ্কৃতকারীও হইবেন না এবং কোনো মানবীর ভ্রান্তির জন্য ট্র্যাজেডি সংঘটিত হইবে—

'But a character of this is one who neither excels in virtue and justice, nor is changed through vice and depravity, into misfortune from a great renown and prosperity, but has experienced this change through some ( human ) error.' ২

এইরূপ অজানিত ভ্রান্তির জন্যই ইডিপাসের জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটিয়াছিল। কিন্তু শেকস্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডি সব সময়েই নায়কের স্বকৃত কোনো ক্রিয়ার দ্বারা সংঘঠিত হয়। লীয়ার, ওথেলো, ম্যাকবেথ, হ্যামলেট ইহাদের ট্র্যাজেডি নিজেদের কোনো ইচ্ছা কিংবা ক্রিয়ার ফলেই হইয়াছিল। কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডি তাহার নিজের কোনো ভ্রান্তির দ্বারা

১ *Theory of Drama* by A. Nicoll, p, 127-158.

২ *European Theories of Drama* by Clark, Aristotle, ch, ix

ঘটে নাই, অথবা তাহার কোনো কার্যের দ্বারাও ট্র্যাজেডি অনিবার্য হইয়া উঠে নাই। মদনিকা, ধনদাস প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্রই নাটকের বিষাদান্ত পরিণতির জন্য দায়ী। সুতরাং কৃষ্ণকুমারীকে কথনো ট্র্যাজিক নায়িকা বলা চলে না।

তবে ইহা সত্য যে, ভীমসিংহের চরিত্র যথার্থই ট্র্যাজিক হইয়া উঠিয়াছে এবং সেজন্যই নাটকখানি উচ্চাঙ্গ ট্র্যাজেডির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিয়াছে। ভীমসিংহের কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া দুই প্রবল প্রতিপত্তিশালী রাজা তাঁহার কাছে প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কাহাকে তিনি অসন্তুষ্ট করিবেন? স্নেহান্ধ পিতা যদি কন্যাকে রক্ষা করিতে যান, তবে ইঁহাদের প্রদীপ্ত ক্রোধানলে দেশ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। আবার দেশপ্রাণ রাণা যদি দেশের হিত চান তবে কন্যাকে বিসর্জন দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই নিদারুণ সংকটে পড়িয়া বৃদ্ধ রাজার জীবন নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। অবশেষে দেশহিতৈষণাই জয় লাভ করিল। দেশ এবং জাতির কল্যাণার্থ গ্রীক সেনাপতি অ্যাগামেমনন নিজের কন্যা ইফিজেনিয়াকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং এখানে দেশের ও প্রজার মঙ্গলের জন্য ভীমসিংহ নিজের কন্যাকে বলি দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু নিজের কর্তব্যবোধকে উচ্চে স্থান দেওয়াতে দেশ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু তিনি নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। নিদারুণ দুঃখ ও গ্লানিতে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল। কন্যা-স্নেহান্ধ রাজা লীয়ার উন্মত্তভাবে ক্রুদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে যেমন নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি ভীমসিংহকেও ঝড়-দুর্যোগের মধ্যে নিতান্ত অসহায় ভাবে প্রলাপ বকিতে দেখিয়া প্রচণ্ড দুঃখের আঘাতে আমাদের অন্তর রুদ্ধ হইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে ভীমসিংহ শেষদিকে একেবারে শেক্‌সপীয়ারের ট্র্যাজিক চরিত্রের অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতির জন্য যদি কেহ সর্বাপেক্ষা বেশি দায়ী হইয়া থাকে, তবে সে মদনিকা। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বসন্তসেনার সহচরী মদনিকার মতই সে চতুরা এবং বুদ্ধিশালিনী। মদনিকা মধুসূদনের প্রিয় চরিত্র ইহা তাঁহার এক পত্রে জানা যায়।১ ধনদাস ধূর্ত, কিন্তু মদনিকা তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি ধূর্ত। ধনদাস উদয়পুরে জগৎ-সিংহের বিবাহ-প্রস্তাব নিয়া গিয়াছে, কিন্তু মদনিকা বিলাসবতীর দ্বারা নিয়োজিত হইয়া সেই বিবাহ পণ্ড করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারী যাহাতে মানসিংহের প্রতি আকৃষ্ট হয় সেইজন্য মদনিকা তাহাকে চিত্রপট দেখাইয়াছে, মানসিংহের কাছে কৃষ্ণকুমারীর আসক্তির কথা জ্ঞাপন করিয়াছে, ধনদাস ও মরুদেশের দূতের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়াছে, এবং সব সংকটের সৃষ্টি করিয়াছে। মদনিকা এ সমস্ত ব্যাপার না করিলে জগৎসিংহের সহিত কৃষ্ণকুমারীর বিবাহে কোনোই বাধা হইত না এবং নাটকের পরিণতি বিষাদান্ত হইত না।

মদনিকার পরেই নাটকের মধ্যে ধনদাসের স্থান উল্লেখযোগ্য। ধনদাস ইয়াগোর

১। 'But that Madanika is my favourite'—'জীবন চরিত', পৃঃ ৪৬৫।

মতই ক্রূর-স্বভাব, অনিষ্টান্বেষী এবং দুর্মতিপরায়ণ। তবে ইয়াগোর সহিত ধনদাসের এই পার্থক্য যে ইয়াগোর মধ্যে উদ্দেশ্যবিহীন ক্রূরতা ( motiveless malignity ) লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ধনদাস স্বার্থসিদ্ধির আশাতেই মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়াছে। তবে ধনদাসের খলতা ও নীচাশয়তা কখনো শক্তিশালী ও নাটকের মধ্যে বিশেষ কার্যকর হইয়া উঠিতে পারে নাই, কারণ অধিকতর চতুর ও বুদ্ধিশালিনী মদনিকার দ্বারা তাহার সমস্ত ইচ্ছা ও কার্য বার বার ব্যাহত হইয়াছে। মদনিকা-চরিত্র মধুসূদনের প্রিয় ছিল বলিয়া সে গুরুতর অন্যায় করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি তাহাকে কোনো শাস্তি দেন নাই, অথচ ব্যর্থ ও বিফল ধনদাসকে অপমানিত, শাসিত ও বিপর্যস্ত করিয়াছেন।

প্রথম দুই নাটকে মধুসূদন যে কৃত্রিম কবিত্বের অনাবশ্যক আধিক্য দ্বারা নাটকের গতি মন্থর ও চরিত্রগুলিকে আড়ষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন কৃষ্ণকুমারী নাটকে সেই দোষ অনেকখানি পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই নাটকে চরিত্রগুলি তাহাদের অর্থপূর্ণ উক্তিদ্বারা সজীব হইয়া উঠিয়াছে এবং নাটকের কাহিনী ঘটনার জটিলতা সত্ত্বেও কেন্দ্রচ্যুত কিংবা ঐক্যহীন হইয়া পড়ে নাই। জগৎসিংহ-বিলাসবতী-মদনিকা-ধনদাসের কাহিনী উদয়পুরের রাজপরিবারের সহিত চমৎকার ভাবে সুসমঞ্জস হইয়া উঠিয়াছে, এবং মদনিকা যে কারণে উদয়পুরের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া যেভাবে মরুদেশের রাজাকে নাটকের মধ্যে আনয়ন করিয়াছে তাহার বর্ণনাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, বিশ্বাসযোগ্য ও কৌশলপূর্ণ হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারী চিত্রপট দেখিয়াই মানসিংহের প্রতি গভীর ভাবে অনুরক্ত হইলেন, এই ব্যাপার যদিও মধুসূদন রুক্মিণীর সহিত তুলনা করিয়া স্বাভাবিক বলিতে চাহিয়াছেন, তবুও এরূপ প্রেম আমাদের মনের মধ্যে অবিশ্বাস ও সংশয় জন্মাইয়া দেয়। কৃষ্ণকুমারীর এই প্রেমের জন্য তাহার মনের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় নাই, এবং বাহিরের কোনো ঘটনা কি চরিত্রের সহিত তাহার কোনো সংঘাতও দেখা দেয় নাই। সুতরাং তাহার প্রেমাসক্তি নাটকের মধ্যে মূল্যহীন ও নিরর্থক। নাটকের মধ্যে স্থানে স্থানে অভিনয়ের অযোগ্য দৃশ্য সংযোজিত হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্কস্থ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ধনদাসকে জব্দ করিবার জন্য মদনিকা জগৎসিংহকে লইয়া অন্তরালে অবস্থিত হইয়া রাজাকে ধনদাস ও বিলাসবতীর কথোপকথন শুনাইয়াছে। এখানে রাজা ও মদনিকা নিশ্চয়ই ধনদাস ও বিলাসবতীর অদৃশ্য কোনো স্থলে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা নিশ্চয়ই দর্শকবর্গের কাছেও অদৃশ্য থাকিবেন। অথচ মধুসূদন এইখানে মদনিকা ও রাজার কথোপকথন নিবদ্ধ করিয়া রঙ্গমঞ্চের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। এ সব দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও কৃষ্ণকুমারী মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক এবং প্রকৃতই "বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত যে সকল বিষাদান্ত নাটক রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অতি অল্পই ইঁহ'র সমকক্ষতা করিতে পারে।"

॥ মায়াকানন (১৮৭৪) ॥ কৃষ্ণকুমারী নাটকের তের বৎসর পরে মধুসূদন 'মায়াকানন' রচনা করেন। তখন তাঁহার আয়ুর চক্র শেষ পরিক্রমণ করিতেছে, প্রতিভার গোধূলিছায়া

ইতিপূর্বেই দেখা গিয়াছে। যে শোকাবহ দুর্গতি ও দুরবস্থার মধ্যে তিনি নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিলে ইহার দোষগুণ আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না।১ তখন তাঁহার চোখের সম্মুখে নামিয়াছে কাল রজনীর ভয়াল অন্ধকার—'আসিছে রজনী, নাহি যার মুখে কথা বায়ু রূপ স্বরে, নাহি যার কেশ পাশে তারা রূপ মণি।' সেই অন্ধকারের ছায়া 'মায়াকাননে'র সর্বত্রই বিরাজমান। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকও বিষাদময় ও বিয়োগান্তক। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী'তে বিষাদের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার একটি সবল সংগ্রামের রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, সেখানে দ্বিধাবিভক্ত সত্তার নিষ্ঠুর সংঘাতে একটি উত্তেজনাকর গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। সেই সংগ্রাম ও সংঘাতের কোন চিহ্ন 'মায়াকাননে' নাই।২ ইহাতে দৈবঘটিত দুঃখের কাছে নিরুপায় মানুষের প্রতিবাদহীন আত্মসমর্পণই বর্ণিত হইয়াছে। সেজন্য ইহাতে জ্বালা ও উত্তেজনার পরিবর্তে আছে কেবল কান্না ও কাতরতা। ট্র্যাজেডির গৌরবচূড়া লুটাইয়া পড়িয়াছে কারুণ্যের কলধারায়। 'শর্মিষ্ঠা' হইতে 'কৃষ্ণকুমারী'তে তাঁহার নাট্যপ্রতিভার ক্রমোচ্চ উর্ধ্বে আরোহণ আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী'র পর আবার সেই প্রতিভার নিম্নপথে অবরোহণ হইয়াছে। সেজন্য 'শর্মিষ্ঠা'র দোষ পুনরায় 'মায়াকাননে'র মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ সেই সংস্কৃত নাটকের অনুকৃতি—সংলাপের দীর্ঘতা, ভাবের কৃত্রিম আতিশয্য, কাব্যমিশ্রিত কারুণ্যের একাধিপত্য—সব আবার যেন মাইকেলের জীর্ণ হস্তের ক্লান্ত লেখনীকে পাইয়া বসিয়াছে।

'মায়াকানন' একটানা দুঃখের কাহিনী, কিন্তু এই দুঃখের সঙ্গত কারণ ও অনিবার্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনে এক অবিশ্বাস জাগিয়া থাকে। অজয় ও ইন্দুমতীর প্রেম নিতান্তই কল্পনাচারী; উভয়ের মধ্যে কোন গভীর প্রেমের দৃশ্য আমরা দেখি নাই, শুধু কেবল দর্শন ও শ্রবণেই এই প্রেমের উৎপত্তি ও অধিষ্ঠান। সেজন্য তাহাদের বিলাপ ও খেদোক্তি অনেকটা কৃত্রিম ও প্রাণহীন মনে হয়। আর একটি কথা। উভয়ের প্রেমে দুর্নিবার প্রতিবন্ধক কোথায়? আমরা কেবল জানিয়াছি দেবতারা তাহাদের বিবাহ চান না এবং অজয়ের মৃতপিতার আত্মাও ইহার প্রতিকূল। অথচ অজয় ও ইন্দুমতীর মিলন না হওয়া সত্ত্বেও তো উহাদের চরম ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিয়াছে। মিলন হইলে ইহা অপেক্ষা গুরুতর আর কি সর্বনাশ ঘটিতে পারিত? প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা তাহাদের সর্বাপেক্ষা হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহারাই তাহাদের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারী হইয়াছেন।

১। 'নিজের বিষাদময় জীবনের প্রতিবিম্বপাত করিয়াই তিনি স্বরচিত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন
—জীবন চরিত—যোগীন্দ্র নাথ বসু

২। 'মায়াকাননে'র ট্র্যাজেডি নিষ্করুণ শোকাবহ এবং মধুসূদনের জীবনে যেমন এখানেও তেমনি নায়কনায়িকার সব আশা ভরসা নিঃশেষে চুকিয়া গিয়া যবনিকা পতন হইয়াছে।'
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড—৪৯

তাঁহারা হইতেছেন মন্ত্রী ও অরুন্ধতী। ষড়যন্ত্র করিয়া ধূমকেতুর কাছে দূত প্রেরণ না করিলে ব্যাপার এতদূর গড়াইত না। নাটকখানির যথেষ্ট নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু দৈবনির্ভরতা ও সংস্কৃত নাটকের প্রতি আনুগত্যের ফলে সেই সম্ভাবনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তবে নাট্যরচনার এই অসিদ্ধির মধ্য দিয়াও কিন্তু কবিমানসের একটি রূপ আমাদের কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং তাহা হইতেছে এই যে, মাইকেল জীবনের প্রান্তভাগে আসিয়া দুঃখবাদী, দৈবনির্ভরশীল, ভারতীয় ভাবমগ্ন শ্রীমধুসূদন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

## প্রহসন

মধুসূদনের নাটকের দোষ ত্রুটির উল্লেখ আমরা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রহসন ঐ সব দোষত্রুটি হইতে আশ্চর্য ভাবে মুক্ত। প্রহসন দুইখানা মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রতিভার অবিস্মরণীয় কীর্তিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাংলায় যে ২।১ জন শ্রেষ্ঠ প্রহসন রচয়িতা জন্মিয়াছেন মাইকেল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি দুইখানার বেশি প্রহসন লিখেন নাই। যদি লিখিতেন তবে প্রহসনকার রূপে তিনি দীনবন্ধু মিত্র ও অমৃতলাল বসুর ন্যায় খ্যাতি অর্জন করিতেন। মধুসূদনের প্রহসনগুলিকে বাংলা সাহিত্যের আদিতম প্রহসন বলা যায়। কারণ তাঁহার পূর্বে প্রহসন লেখা হইলেও বর্তমানে তাহা পাওয়া যায় না।১ প্রহসন লিখিতে তিনি রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রহসন দুইখানা লিখিবার জন্য পরে আক্ষেপ করিয়াছিলেন।২ তাঁহার সমসাময়িক লোকেরাও এই বই দুইখানাকে বেশি ভালো চোখে দেখে নাই। মধুসূদনের ব্যঙ্গ সার্থক ও মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। সেজন্য তখনকার সমাজ তাঁহার প্রহসনকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। 'একেই কি বলে সভ্যতা' তখনকার যুবক সমাজের দোষ ও অনাচার লইয়া লিখিত হইয়াছিল বলিয়া সেই যুবক সমাজের কয়েকজন প্রতিনিধি পাইক পাড়ার রাজাদিগকে ঐ প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিতে বাধ্য করিয়া যথেষ্ট সৎসাহসের (?) পরিচয় দিয়াছিলেন। মধুসূদনের অন্যতর প্রহসন বন্ধ করিবার জন্য কোনো লোক আসিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না বটে, তবে রাজাদ্বয় বিরক্ত হইয়া উভয় প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিয়া সমাজের প্রাচীন ও নবীন উভয় সম্প্রদায়ের মান রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রহসনের অভিনয় না হওয়াতে নিরাশ হইয়া মধুসূদন তাঁহার বন্ধু কেশব বাবুকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

---

১। *Western Influence in Bengali Literature* by P. R. Sen, p 233

২। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র—'জীবন চরিত', পৃঃ ৩১০-৩১১

'Mind, you broke my wings once about the farces ; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese.'১

আমরা কল্পনা করিতে পারি যে সমসাময়িক সমাজের দ্বারা এভাবে নিরুৎসাহিত না হইলে হয়তো তিনি আরও প্রহসন লিখিতেন। প্রহসন-লেখক সমাজের দোষ, ত্রুটি, ব্যাধি ও গ্লানি অনাবৃত করিয়া সমাজের মহদুপকার সাধন করেন বটে, কিন্তু সমাজের কাছে তিনি চিরকালই নিন্দা ও তিরস্কার লাভ করেন। শুনা যায় জগদ্বিখ্যাত প্রহসনকার মলিয়েরে সমসাময়িক সমাজে এতোই অপ্রিয় ছিলেন যে মৃত্যুর পরে তাঁহার সৎকার করিবার লোক জুটে নাই।

মধুসূদনের প্রহসন আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের স্বভাবতই এই প্রশ্ন মনে হয় যে, যাঁহার দৃষ্টি ও কল্পনা সব সময়ে গুরু ও গম্ভীর ভাবদ্যোতক বিষয়ে লিপ্ত থাকিত তাঁহার দ্বারা কি ভাবে এই রকম লঘু, তরল ও হাস্যোদ্দীপক প্রহসন লেখা সম্ভব হইল? যিনি হোমার ও মিলটনে ডুবিয়া থাকিতেন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'মেঘনাদ বধ' লেখা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু তিনি যে বাস্তব সমাজে মিশিয়া এভাবে হাসিতে ও হাসাইতে পারেন তাহা বিস্ময়কর নয় কি? বিস্ময়কর হইলেও মধুসূদনের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সহজ ও সুসাধ্য হইয়াছিল।

মধুসূদনের নাটকের আলোচনা কালে আমরা দেখিয়াছি যে সংস্কৃতের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার নাটকের মধ্যে যথেষ্ট সংস্কৃত প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রহসনের মধ্যে সংস্কৃত প্রভাব মোটেই নাই। প্রহসনের সংলাপ নাটকের ন্যায় মোটেই আড়ষ্ট ও কৃত্রিম নয়। সাধারণের ব্যবহৃত ভাষায় সংলাপ লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নাটকীয় হইয়াছে।

সামাজিক প্রহসন রচনা করিতে গেলে সমাজ ও ইহার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকা দরকার। মধুসূদনের প্রহসনগুলি পড়িলে মনে হয় যে, তিনি 'মধুকরী কল্পনা'য় মগ্ন থাকিলেও তাঁহার সমাজ সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞানের মোটেই অভাব ছিল না। মধুসূদন দুইখানা প্রহসনে সমাজের দুই বিপরীত ধারার চিত্র অংকন করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্যবিলাসী 'ইয়ং বেঙ্গল' যেমন সমাজকে ধ্বংস করিবার জন্য সমুদ্যত হইয়াছিল, রক্ষণশীল প্রাচীন সম্প্রদায় তেমনি ভিত্তিহীন প্রথা ও যুক্তিহীন আচারসমূহ সযত্নে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই দুই সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি, মূঢ়তা ও কাপট্য মধুসূদন পরম উপভোগ্যভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং 'ইয়ংবেঙ্গল'ভুক্ত হইয়াও যেমন এই সম্প্রদায়ের অধঃপতিত অবস্থার কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে দ্বিধা করেন নাই, তেমনি তাঁহার বিপক্ষ প্রাচীন সম্প্রদায়ের কথা বলিতেও

১। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র—'জীবন চরিত'—পরিশিষ্ট—পৃঃ ৩৭৭

অতিরঞ্জন কিংবা অতিকথন দোষে দোষী হন নাই; প্রকৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের ন্যায় নিরপেক্ষ, অপক্ষপাতী দৃষ্টি লইয়া স্বয়ং দূরসংস্থিত হইয়া হাস্যে, কৌতুকে, ব্যঙ্গে, সহানুভূতিতে তাঁহার চরিত্রগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। সমসাময়িক সমাজকে তিনি আঘাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই আঘাতের পিছনে তাঁহার করুণার্দ্র হৃদয়ের সন্ধান পাইতে দেরি হয় না। প্রহসন দুইখানা উদ্দেশ্যমূলক হইলেও সেই উদ্দেশ্য কখনো প্রধান হইয়া ঘটনা কিংবা চরিত্রকে খর্ব করে নাই। নাটকীয় রস আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত বইখানাকে উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক করিয়া রাখিয়াছে।

॥ একেই কি বলে সভ্যতা ( ১৮৬০ ) ॥ মাত্র দুই অংকে প্রহসনখানি বিভক্ত। প্রহসন সমাজের কোন বিশেষ দিক আলোকিত করিয়া ইহার দোষ অসঙ্গতি অনাবৃত করিয়া দেয়, মানব জীবনের কোনো গভীর কি মৌলিক সমস্যার আলোচনা ইহার উদ্দেশ্য নহে। সেজন্য এই জাতীয় নাটকের মধ্যে বিস্তৃতভাবে চরিত্র বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। মানুষের জীবনের কয়েকটী অসঙ্গত, ভ্রান্ত মুহূর্তকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা ইহাতে করা হয়। ঘটনার দ্বন্দ্বে ও ভাবের বিরোধিতায় হাস্যরস সৃজন করিতে পারিলেই ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; সেইজন্য প্রহসন আকারে সাধারণত ছোট হয়। কিন্তু ছোট হইলেও মাইকেল কয়েকটী খণ্ড চিত্র আঁকিয়া তৎকালিক সমাজের এক নিখুঁত পরিচয় দিয়াছেন।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রথম অংকের প্রথম গর্ভাংকে নবকুমার এবং কালীনাথের কথোপকথনে তখনকার সমাজের 'ইয়ং-বেঙ্গলে'র প্রকৃতি অনেকখানি ব্যক্ত হইয়াছে। মদ্য-পানে আসক্তি প্রথম হইতেই বর্ণিত হইয়াছে। নবকুমার এবং কালীনাথ ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত, কুসংস্কার-বর্জিত সভ্য যুবক। সুতরাং তাহাদের পক্ষে মদ খাওয়াটা সভ্যতার অঙ্গ বিশেষ। রাজনারায়ণ বসু তখনকার যুবকদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'তাঁহারা মনে করিতেন, এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা'।১ এই মদ্যপানাসক্তি এরূপ ব্যাপকভাবে এক দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে সমাজের মধ্যে সংক্রামিত হয় যে প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি সুরাপান নিবারণী আন্দোলন করিয়া সমাজকে ব্যাধিমুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।২ মাইকেলের পরে দীনবন্ধু মিত্র এবং অন্যান্য প্রহসনকার ঐ সমস্যা নিয়া প্রহসন রচনা করিয়াছেন। কালীনাথ ও নবকুমারের কথোপকথনে প্রচুর ইংরাজী শব্দের ব্যবহার দেখিয়া আমরা তখনকার যুবকগণের কথাবার্তার বিকৃত ধরণের পরিচয় পাই। 'আমার father yesterday কিছু unwell হওয়াতে doctorকে call করা গেল, তিনি একটী physic দিলেন। Physic বেশ অপারেট করেছিল, four, five times motion হলো, অদ্য কিছু better বোধ কচ্চেন'।৩ এরূপ হাস্যাস্পদ বাক্য তখনকার

১ সেকাল ও একাল—রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ ২৭।

২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পৃঃ ৩৫৯–৩৬০।

৩। সেকাল ও একাল—রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ ৫২।

লোকে ব্যবহার করিত। কালীনাথ শ্রীমদ্ভবদ্‌গীতা এবং গীতগোবিন্দের নাম পর্যন্ত শুনে নাই, ইহাতে স্বদেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি তৎকালিক যুবক সমাজের বীতরাগ প্রকাশ পাইতেছে। স্বয়ং মধুসূদন 'পাশ্চাত্য কবিদিগের সহিত তুলনায় আমাদিগের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদিগকেও তিনি অতি নিম্নস্থানীয় মনে করিতেন।'১ সুতরাং কালীনাথের পক্ষে গীতা কিংবা গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে অজ্ঞতা অস্বাভাবিক নহে। প্রথম গর্ভাংকে যেভাবে কালীনাথ ও নবকুমার পরম ভক্তিমান বৈষ্ণব সাজিয়া বৃদ্ধ কর্তামহাশয়কে প্রতারণা করিয়াছে তাহাতে সুস্নিগ্ধ হাস্যরসের মধ্যদিয়া একদিকে কর্তামহাশয়ের সারল্য ও বাৎসল্য ও অন্যদিকে যুবকদ্বয়ের চরিত্রের আত্যন্তিক হীনতা প্রকাশিত হইয়াছে। এই অভিনব চাতুরী না খেলিলে নবকুমারের পক্ষে বাহিরে গিয়া জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় মদ ও বারবনিতার পবিত্র সংসর্গে জ্ঞান বিতরণ করা সম্ভব হইত না।

দ্বিতীয় গর্ভাংকে বায়স্কোপের চিত্রের ন্যায় কতকগুলি চিত্র দ্রুত আমাদের দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হয়। বিমূঢ়, সরলপ্রাণ, বিপর্যস্ত বাবাজী; পরিহাসরঙ্গিণী বারবিলাসিনী; সন্ত্রস্ত চৌকিদার ও অর্থলোলুপ সারজেণ্ট; পূর্ববংগীয় মুসলমান মুটিয়াদ্বয়; নর্তকী নিতম্বিনী ও পয়োধরী প্রভৃতি মিশিয়া এক বিচিত্র রস ও কৌতুকের সৃষ্টি করিয়াছে। নিখুঁত বাস্তবতায় ও বর্ণনার সরসতায় চিত্রগুলি উজ্জ্বল ও প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছে। রুচিবাগীশ সমালোচক হয়তো রূঢ় বাস্তবের কঠোর আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া মাইকেলের নিন্দা করিবেন, কিন্তু সত্যসন্ধিৎসু পাঠক তাঁহার নির্ভীক সত্যপ্রিয়তার প্রশংসা করিবেন। বারবনিতা-পল্লীর বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলি মূল কাহিনীর সহিত অসংলগ্ন নয়, কারণ এই রকম পল্লীর কুৎসিত আবহাওয়ার মধ্যে জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভার আলোক-প্রাপ্ত সভ্যবৃন্দের সমাগম হইবে। মধুসূদনের ব্যঙ্গ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় অংকের প্রথম গর্ভাংকে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার অধিবেশন। সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও নীতি ধর্ম পরিত্যাগ করিতে সভ্যগণ সোৎসাহে বদ্ধপরিকর। ডিরোজিওর শিষ্যবৃন্দ যে ভাবে মাণিকতলায় সিংহবাবুদের উদ্যানে 'একাডেমি'র অধিবেশনে অগ্নিগর্ভ বক্তৃতার স্ফুলিংগ ছড়াইয়া বাংলার সমাজ ও ধর্ম ধ্বংস করিতে চাহিতেন এখানে যেন তাহারই পুনরভিনয় চলিতেছে। কিন্তু এই সমস্ত বাক্‌সর্বস্ব বিদ্রোহী যুবকবৃন্দের মূল লক্ষ্য যে সমাজ-সংশোধন কিংবা ধর্ম-সংস্কার নয়, পরন্তু ইন্দ্রিয়বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল এপিকিউরীয় নীতিই ইহাদের সার কথা নবকুমারের উক্তির মধ্য দিয়া মাইকেল ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন— 'ইন দি নেম অফ ফ্রীডম লেট য়াস এঞ্জয় আওয়ারসেল্‌ভস্‌'। যাহারা অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক দ্বারা সর্বময় স্বাধীনতার পথ আলোকিত করিতে চাহিতেছিল, তাহারাই আবার তুচ্ছ কারণে নিজেদের মধ্যে বিবাদে মত্ত, স্বাধীনতার বাহিনী সুরা ও গণিকাদেবীর উপাসক—মাইকেল সরস ব্যঙ্গের আঘাত দিয়া ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা

১। 'জীবনচরিত', পৃঃ ৪৫

করিয়াছেন একেই কি বলে সভ্যতা? মাইকেলের পরিহাস-রসিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত তখন দেখা গিয়াছে, যখন নবকুমার ইংরাজী গালিতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছে—

'ট্রাইফলীং ?—ও আমাকে লায়ার বললে আবার ট্রাইফলিং ? ও আমাকে বাংলা ক'রে বললে না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বললে না কেন? তাতে কোন্ শালা রাগতো? কিন্তু লায়ার—এ কি বরদাস্ত হয়?

শেষ দৃশ্যে মদোন্মত্ত নবকুমার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যে কুৎসিত ব্যাপারের অভিনয় করিয়াছিল তাহার পূর্বে নাট্যকার অন্তঃপুরিকা রমণীদের একটী লঘু চিত্র অংকন করিয়াছেন। তাসখেলারত, রসিকতাপ্রিয় রমণীগণ তৎকালীন নারীসমাজের প্রকৃতি চমৎকার ভাবে প্রকাশ করিয়াছে। এই রমণীয় চিত্রদ্বারা আমাদের মনকে তরল করিবার পরক্ষণেই নাট্যকার প্রমত্ত নরকুমারের উন্মত্ত ক্রিয়াকলাপ দ্বারা আমাদিগকে আঘাত করিয়া আমাদের মন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তখনকার 'ইয়ং বেঙ্গল' মাতাপিতা ও ভগ্নী প্রভৃতির সম্মুখে নবকুমারের এই বীভৎস আচরণ সুস্থিরভাবে প্রত্যক্ষ করিলে অনেক শিক্ষালাভ করিতেন সন্দেহ নাই। এই দৃশ্য দর্শনে অস্বস্তি, লজ্জা ও ঘৃণায় যেমন শরীর মন আকুঞ্চিত হইয়া উঠে, তেমনি সমাজের গুরুতর সমস্যায় প্রতি অব্যর্থভাবে পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। মধুসূদনের ক্ষমতা অসীম বটে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' মাত্র একদিনের ঘটনা লইয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু একদিনের কাহিনীর মধ্যে মাইকেল কোনো বিষয় বর্ণন করিতে বাকি রাখেন নাই। অথচ তিনি অতিরিক্ত কিংবা অপ্রয়োজনীয় একটা ব্যাক্যও উচ্চারণ করেন নাই। খণ্ড চিত্রগুলি পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া এক অখণ্ড রসের সৃষ্টি করিয়াছে। চরিত্রগুলির সংলাপ সম্পূর্ণ বাস্তব ও স্বাভাবিক হইয়াছে বলিয়া তাঁহার চিত্রাংকন এমন সার্থক হইয়াছে। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিাছেন—'আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানি সর্বোৎকৃষ্ট'। ইহা অত্যুক্তি নয়।

পূর্বতন প্রহসনখানি যে বৎসর লিখিত হইয়াছিল সেই বৎসরেই (১৮৬০ খৃষ্টাব্দ) মধুসূদনের অন্যতর প্রহসন—'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হয়। প্রহসনখানির অদ্ভুত নাম রাজা ঈশ্বরচন্দ্র দিয়াছিলেন। নাম যেমন অদ্ভুত, ইহার বিষয়বস্তুও তেমনি বিস্ময়জনক। ('একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে মধুসূদনের ব্যঙ্গের লক্ষ্য ছিল 'ইয়ং বেঙ্গল,') এবং এই প্রহসনখানির মধ্যে তাঁহার উপহাসের পাত্র ভণ্ড, দুষ্কৃতকারী, অত্যাচারী প্রাচীন সমাজ। পূর্ব প্রহসনখানি যেমন নবীন সমাজের বিরাগের কারণ হইয়াছিল, এখানিও তেমনি প্রাচীন সম্প্রদায়ের দ্বারা নিন্দিত হইয়াছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় সেকারণেই এই প্রহসনখানির তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় মুসলমান রমণীর প্রতি ভক্ত-প্রসাদের আসক্তি অস্বাভাবিক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই রকমের লোক তখনকার সমাজে প্রকৃতই ছিল। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—'মধুসূদনের সময়ে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোকের কলিকাতার ও তাহার নিকটবর্তী পল্লীসমাজে বিশেষ

প্রতিপত্তি ছিল। বাহিরে মালাজপ, কিন্তু গোপনে পরস্বাপহরণ, সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা, কিন্তু গোপনে বারাঙ্গনা প্রতিপালন, তাঁহাদিগের অনেকের নিত্য ব্রত ছিল।১

('একেই কি বলে সভ্যতা'র ঘটনাস্থল নবীন সমাজের লীলাক্ষেত্র কলিকাতা সহর,) কিন্তু 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র সংযোগস্থল প্রবীণ সমাজের পীঠস্থান পল্লীগ্রাম। পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিলেও মাইকেল তাহার কথা জীবনের কোনো দিনই ভুলেন নাই,'চতুর্দশ পদাবলী'তে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র মধ্যেও তিনি পল্লীজীবনের কথা স্নেহ ও সহানুভূতির সহিত বর্ণন করিয়াছেন। পল্লীগ্রামের হানিফ, ফতেমা, ভগী, পঞ্চীর মতো দরিদ্র, দুঃস্থ ও উপদ্রুত লোকের কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। প্রবলের অত্যাচারে পীড়িত দুর্বল লোকের চরিত্র তিনিই প্রথম দরদের সঙ্গে অংকন করেন। তাঁহার পরে দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিক ইহাদের কথা সাহিত্যে আলোচনা করিয়াছেন। বিধর্মী, সমাজদ্রোহী মাইকেলের পক্ষে পল্লীসমাজের দুর্গত লোকের চরিত্র সম্বন্ধে আগ্রহবান হওয়া বিস্ময়কর বটে।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩৫১ সনের আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে 'মধুস্দন ও ফরাসী সাহিত্য' সম্বন্ধে একটী উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' মলিয়েরের 'তারতুফ' ( Tartuffe ) নাটকের প্রভাবে লিখিত। তারতুফ নামে এক ব্যক্তি ধর্মের ভাণ করিয়া অর্গ° ( Orgon ) নামে সরলপ্রাণ লোকের সংসারে প্রবেশ করে, এবং তাঁহার পত্নীকে ফুসলাইতে চেষ্টা করে। বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সে ঐ পরিবারের অনিষ্ট করিতে প্রয়াস পায়। ইহাই মোটামুটি 'তারতুফে'র বর্ণিত বিষয়বস্তু। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তারতুফের সহিত মাইকেলের প্রহসনের জায়গায় জায়গায় মিল থাকিলেও অবিকল সাদৃশ্য নাই। মাইকেল মলিয়ের হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

প্রথম প্রহসনখানির ন্যায় দ্বিতীয় প্রহসনখানিও দুই অংক ও চার গর্ভাংকে সমাপ্ত। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে সমগ্র ইয়ং বেঙ্গল সমাজ মাইকেলের বর্ণনীয় বিষয়। আর এই প্রহসনখানিতে ভক্তপ্রসাদই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। কাহিনী যেন তাঁহার চরিত্র বিকাশ করিবার জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য কাহিনীর সহিত অসংলগ্ন ভক্ত ও আনন্দের কথাবার্তার মধ্য দিয়া ভক্তপ্রসাদের চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

১। 'জীবনচরিত,—পৃঃ ৩০৪

ভক্তপ্রসাদ বড়ো হুঁসিয়ার জমিদার, গরীব চাষীর খাজনার এক পয়সা মাপ তাঁহার কাছে চলিবে না, এক কানা কড়ি সাহায্যও তাঁহার কাছে কেহ পাইবে না। অথচ তিনি পরম রসিক ব্যক্তি, পরস্ত্রীর রূপ বর্ণনা শুনিলে তিনি ভাববিহ্বল হইয়া ভারতচন্দ্র প্রভৃতির কবিতা আবৃত্তি করেন। হানিফের স্ত্রী ফতিমার কাছে কুটনি পাঠাইয়া তিনি তাহার সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, বৃদ্ধ চেহারাকে সাজসজ্জার দ্বারা যথাসম্ভব নব্য যুবার মতো বানাইয়া তিনি অভিসারে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন। যিনি সর্ববিধ কুকর্মে রত তিনিই আবার পুত্রের ধর্মাচরণের প্রতি বিশেষ সতর্কদৃষ্টি, হিন্দুধর্ম সংরক্ষণে নিদারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যিনি মুসলমানী স্ত্রী-সংসর্গে প্রবৃত্ত, মুসলমান-স্পৃষ্ট খাদ্য খাওয়া সম্বন্ধে তাঁহারই বিষম আতঙ্ক। মধুসূদনের ব্যংগ এইখানে সর্বাপেক্ষা তীব্র ও সার্থক হইয়াছে। শেষ দৃশ্যে ভক্তপ্রসাদ তাহার প্রাপ্য শাস্তি পাইয়াছে, এবং তাহার মতিরও পরিবর্তন হইয়াছে। ভক্তপ্রসাদের যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিয়া নাট্যকার Poetic Justice দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু মাত্রাধিক্যের জন্য দৃশ্যটী একটু অসংগত হইয়াছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে নবকুমারের চরিত্র শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন না করিয়া মধুসূদন আমাদের মনকে বেশি করিয়া বিচলিত করিয়াছেন। 'বুড়ো শালিকে'র মধ্যেও যদি তিনি ভক্তপ্রসাদের চরিত্র শেষ পর্যন্ত অন্যভাবে না দেখাইতেন তাহা হইলে সমস্যার আঘাত অধিকতর মর্মস্পর্শী হইত। প্রহসনের শেষে যে ব্যংগাত্মক কবিতাটী যোজিত হইয়াছে তাহা কৌতুকপূর্ণ হইলেও ভক্তপ্রসাদের মুখ দিয়া বাহির হওয়াতে অস্বাভাবিক হইয়াছে।

গরীব চাষী হানিফের চরিত্র চমৎকারভাবে ফুটিয়াছে। হানিফ দারিদ্র্য-পীড়িত, দুঃখগ্রস্ত, কিন্তু কোপনস্বভাব ও গোঁয়ার। তবে শেষ দৃশ্যে ভক্তপ্রসাদের সঙ্গে তাহার শ্লেষাত্মক কথাগুলি অস্বাভাবিক হইয়াছে। চিন্তা-ক্লেশ ভারাক্রান্ত, সরল-স্বভাব ব্রাহ্মণ বাচস্পতির চরিত্র ভক্তপ্রসাদের বিপরীতধর্মী হইয়া নাট্যকারের অপক্ষপাতী দৃষ্টির পরিচয় দিতেছে। অন্যান্য চরিত্রগুলিও type হিসাবে চমৎকাররূপে ফুটিয়াছে। কুটনী পুঁটীর চরিত্র মাইকেল প্রাচীন বাংলা সমাজ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। পল্লীগীতিকা প্রভৃতিতে অনুরূপ চরিত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়। শাইলকের ভৃত্য লনসিলট গোব্বোর (Launcelot Gobbo) ন্যায় ভক্তপ্রসাদের অনুচর গদা প্রহসনের মধ্যে হাস্যরস জোগাইয়াছে। তাহার 'আজ্ঞে-এ-এ-এ' অভিনয়ের সময় দর্শকগণকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে মধুসূদন যতোখানি সূক্ষ্ম নাট্যকলা-বোধ ও নিখুঁত পরিপাটি রচনার পরিচয় দিয়াছেন তাঁহার দ্বিতীয় প্রহসনখানার মধ্যে ততো পারেন নাই। সেজন্য জায়গায় জায়গায় রচনার স্বতঃস্ফূর্তির অভাব লক্ষ্য করা যায়। রাম ও গদার কথোপকথন হাস্যরসাত্মক হইলেও অবান্তর। শেষ দৃশ্যের কৃত্রিমতার কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সামান্য দোষ থাকিলেও সামাজিক প্রহসনরূপে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে

রোঁ'র মূল্য অনেকখানি, কোন কোন দিক দিয়া দ্বিতীয় প্রহসনখানার মূল্য ও প্রভাব প্রথমখানার অপেক্ষাও অধিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে মাইকেল গ্রামের মূর্খ, অশিক্ষিত কৃষক পরিবারের মুখে গ্রাম্যভাষা দিয়া ঐ সব চরিত্রের স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে ; হাঁনিফ মুসলমান, সেজন্য প্রহসনকার তাহার কথায় প্রচুর মুসলমানী শব্দ ( আরবী, পারসী ) ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে চরিত্রটী আরো বেশি সরল ও উপভোগ্য হইয়াছে। মাইকেলের পরে তাঁহার প্রভাবপুষ্ট নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এবং অন্যান্য অনেকে প্রাদেশিক ভাষায় নাটকীয় চরিত্রের কথোপকথন লিখিয়াছেন। আলোচ্য প্রহসনখানির আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মধ্যে মধুস্দন ছড়া, প্রবাদ এবং কবিতার অংশ সন্নিবেশ করিয়া ইহাকে সরস ও কৌতুকপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার পূর্বেই রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে এই সব দেখা যায় বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য-প্রভাবলালিত মধুস্দনের পক্ষে প্রাচীন ছড়া, পাঁচালী প্রভৃতির প্রভাব পরিস্ফুট করা আশ্চর্যজনক সন্দেহ নাই। ছড়া, প্রবাদ, কবিতা প্রভৃতিতে নাটক যে কতো রংগরসপূর্ণ হইয়া উঠে দীনবন্ধুর নাটক প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

# দীনবন্ধু মিত্র

## (ক) ভূমিকা

শেক্‌স্‌পীয়ার তাঁহার পূর্বতন নাট্যকার ক্রিষ্টোফার মারলোর বহু নাটক হইতে ভাব-গ্রহণ করিয়াও যেমন এলিজাবেথীয় সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে বিখ্যাত হইয়াছেন, দীনবন্ধু মিত্রও তেমনি অগ্রবর্তী পথিকৃৎ মধুসূদনের দ্বারা অশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াও মাইকেলী-যুগের শ্রেষ্ঠতম নাট্যকাররূপে অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত হইয়াছেন। দীনবন্ধুর নাটকে, বিশেষত তাঁহার প্রহসনে মধুসূদনের সুস্পষ্ট প্রভাব সুপরিস্ফুট। কিন্তু কাব্যধর্মী মাইকেলের নাটকে যে সৃষ্টি প্রভাতী অরুণছটায় আভাসময় হইয়া উঠিয়াছে, দীনবন্ধুর নাটকে তাহাই সুদূর-প্রসারী প্রদীপ্ত আলোকে পরিণতি লাভ করিয়াছে। দীনবন্ধু বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে যে উত্তুঙ্গ প্রতিষ্ঠায় উন্নীত করিয়া দেন, তাঁহার পরবর্তী নাট্যকারবৃন্দ তাহা অপেক্ষা খুব উচ্চতর স্থানে পৌছিতে পারেন নাই। নাট্যকারের পক্ষে যে বস্তুনিষ্ঠ অপক্ষপাতী, সমাজ-সচেতন ও মানবচরিত্র-অভিজ্ঞ-দৃষ্টি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় বাংলার অধিকাংশ নাটক-রচয়িতার মধ্যে তাহা নাই। সেজন্য আমাদের নাট্যসাহিত্য বহু উচ্চ ও মহৎ ideaর বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে বটে, নাটককারদের মন ও মত অনেক নাটকেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাও সত্য, কিন্তু খাঁটি নাটক খুব বেশি রচিত হয় নাই। আমাদের দেশের ভাবাবেগ-চালিত পাঠক সমাজও প্রকৃত কৃতীর যোগ্য মর্যাদা দিতে তৎপর হয় নাই। ইহা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা নহে। শৈশবে গন্ধর্বনারায়ণ মিত্রকে[১] তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধুগণ 'গন্ধ' 'গন্ধ' বলিয়া উপহাস করিত। ক্ষুব্ধ, অপমানিত বালকের মাতার স্নেহশীল, সান্ত্বনা-বাক্য সম্পূর্ণ সত্যে পরিণত হইয়াছে। গন্ধর্বনারায়ণের গন্ধে একদিন নাট্যামোদী সমাজ বিভোর হইয়াছিল, এবং ভবিষ্যতের রসজ্ঞ সমাজও তাহা দ্বারা সুরভিত হইবে এই অনুমান অসঙ্গত নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর জীবনীতে লিখিয়াছেন, "অনেক সময়েই তাঁহাকে মূর্তিমান হাস্যরস বলিয়া মনে হইত। দেখা গিয়াছে যে অনেকে 'আর হাসিতে পারে না' বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে।" দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনগুলি তাঁহার স্বভাব-জাত পরিহাস-পটুতার অবিস্মরণীয় সাক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। শেক্‌সপীয়ারের প্রথম যুগের কমেডি 'Merry Wives of Windsor', 'Comedy of Errors' প্রভৃতি নাটকের ন্যায় অজস্র-উচ্ছ্বসিত হাস্যরসই দীনবন্ধুর নাটকের প্রাণ। মনে হয় আমাদের অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত জীবনে যেখানে যতকিছু হাস্যরসের টুকরা পড়িয়া রহিয়াছে তাহাই তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধৃত হইয়া নাটকের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নাটকে ব্যঙ্গ আছে, আঘাতও

১। দীনবন্ধুর প্রকৃতনাম গন্ধর্বনারায়ণ, নিজের নামে বিরক্ত হইয়া তিনি দীনবন্ধু এই নাম গ্রহণ করেন।

আছে, কিন্তু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা ও আঘাতের নির্মমতা সর্বস্থলেই সুস্নিগ্ধ হাস্যরসের অনাবিল প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যের বেন জনসন ( Ben Jonson ) সুইফট ( Swift ) প্রভৃতির ন্যায় ভ্রান্ত, পতিত মানব জীবনকে নিষ্করুণ আঘাত করিয়া তিনি তাঁহার মানববিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক লেখকেরা মানব সমাজের ভ্রান্তি স্খলন ও বিপর্যয় দেখাইয়া দেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিছক হাস্যরস সৃষ্টি করা, এবং এই হাস্যরসের মধ্য দিয়া তাঁহারা পাঠক কিংবা দর্শকের মন আর্দ্র করিয়া মানুষের প্রতি দরদী ও সহানুভূতিশীল করিয়া তোলেন। কার্লাইলের উক্তি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ উঠে না যে, 'Humour is sympathy with the seamy side of things.' হাস্য-রসিক লেখক যাহাদিগকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেন তাহারাই আবার তাঁহার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, তাহাদের জন্য লেখকের সব কিছু স্নেহ ও ক্ষমা সঞ্চিত হইয়া থাকে। ফ্রান্সের বিখ্যাত নাট্যকার মলিয়েরের আদর্শ নায়ক হয়তো অ্যালসেসটিস ( Alcestes ), যে পৃথিবীকে ও মানব-সমাজকে অকৃত্রিম, অকপট ও পরিশোধিত দেখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু যাহারা কৃত্রিম, ভণ্ড, অনুদার তাহাদের নিয়াই মলিয়েরের চিত্ত উল্লসিত থাকিত।১ আমাদের দীনবন্ধুও যখন কোনো আদর্শ, সৎ ও মহৎ চরিত্র অংকন করিতে গিয়াছেন তখন তাঁহার মন সায় দিয়াছে বটে, কিন্তু চিত্ত সাড়া দেয় নাই। কিন্তু যখন জলধর, নিমচাঁদ, রামমাণিক্য, কেনারাম, রাজীব, বগলা, বিন্দুবাসিনী প্রভৃতি তাঁহার নাটকের আসরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তখনই তিনি তাঁহাদের সহিত মিশিয়া বিচিত্র রঙ্গরসে জমিয়া গিয়াছেন।

হাস্যরসের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, যাহা কিছু সঙ্গত, স্বাভাবিক ও সাধারণ জীবনধারার ব্যতিক্রম করিয়াছে তাহাই হাস্যরসের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য উদ্ভট ঘটনা ও অদ্ভুত চরিত্রই সাধারণত হাস্যরস জোগাইয়া থাকে। দীনবন্ধুর প্রহসনগুলি বিচার করিলে তাঁহার সৃষ্ট ঘটনাগুলিকে অপ্রাকৃত ও চরিত্রগুলি অতিরঞ্জিত মনে হইতে পারে। কিন্তু অসাধারণতা ও অতিরঞ্জন প্রহসনের পক্ষে দোষাবহ নহে। সূক্ষ্ম লেখনীর সংযত চালনায় ঈষদ্‌স্ফুরিত ওষ্ঠাধরের মৃদুহাস্য সঞ্জাত হইতে পারে বটে, কিন্তু সশব্দ অনর্গল হাস্য উদ্রেক করিতে হইলে হাস্যরসিককে সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা ভুলিয়া একটু বাড়াইয়া বলিতে হয়। হয়তো আধুনিক সভ্যতাভিমানী সূক্ষ্মরুচি-সম্পন্ন যুগে আকর্ণ-বিসারিত উচ্চ হাসি অভদ্রোচিত বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে, কিন্তু দীনবন্ধুর সময়ে এইরূপ হাসি লোকে হাসিত ও ভালোবাসিত।

দীনবন্ধুর হাস্যরস অনেক স্থলেই অশ্লীলতার দ্বারা কলুষিত হইয়াছে এই অভিযোগ আজকাল অনেকে করিয়া থাকেন। হাস্যরসবোধ সমাজের মধ্যে চিরকাল একরূপ থাকে

১। Every man's Library হইতে প্রকাশিত মলিয়েরের নাটকাবলীর প্রথম খণ্ডে F. C. Green এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

না। যে পাঠক রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' ও 'শেষরক্ষার' বুদ্ধিমার্জিত হাস্যরসে তৃপ্ত হইবেন, তিনি বগলা ও বিন্দুবাসিনীর কলহে বিরক্ত হইবেন এবং পেঁচোর মার রসিকতা অশ্লীল মনে করিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু দীনবন্ধুর সমসাময়িক সমাজ এসবের মধ্যে অজস্র আনন্দের উপাদান ব্যতীত দূষণীয় কিছুই লক্ষ্য করিত না। দীনবন্ধুর নাটকের শ্লীলতা অশ্লীলতা বিচার করিবার পূর্বে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে তৎকালীন সমাজই এই রকম অশ্লীল ও নিন্দিতরুচিসম্পন্ন ছিল। কবি ভারতচন্দ্রের সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধ পর্যন্ত রাজনৈতিক অব্যবস্থা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেশের মনকে বিকৃত ও কলুষিত করিয়া দিয়াছিল। এই শিথিল, স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি সাহিত্যের মধ্য দিয়াও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তখনকার টপ্পা, পাচালী, খেউড় প্রভৃতি সাহিত্য তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। বিকৃতরসলিপ্সু সমাজ ঐ সব সাহিত্য হইতে প্রচুর আনন্দ লাভ করিত। পাশ্চাত্য ভাবধারা এই দেশে প্রবেশ করিবার পরে সমাজের নৈতিক উন্নতি বিশেষ হইল না। তফাতের মধ্যে ইহাই হইল যে, অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের মধ্যে যে রুচিহীনতা ও নীতিশৈথিল্য ছিল এখন তাহাই সভ্যতার ছদ্মবেশে ভূষিত হইয়া শিক্ষিত ও সহরবাসী লোকের মধ্যে আশ্রয় নিল। দীনবন্ধু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই দুই ভাবধারার সন্ধিক্ষণে জন্মিয়াছিলেন। সেজন্য 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও 'জামাই বারিকে'র মধ্যে বিকৃত গ্রাম্য-সমাজের কথা আছে, আবার 'সধবার একাদশী'র মধ্যে কলুষিত ইয়ংবেঙ্গলের পরিচয়ও আছে। দীনবন্ধু হাস্যরসের রসাল কাচের মধ্য দিয়া তাঁহার সমসাময়িক বাস্তব সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেজন্যই তাঁহার সাহিত্য স্থানে স্থানে অশ্লীল মনে হয়।১

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, 'লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল, তিনি আহ্লাদ পূর্ব্বক সকল শ্রেণীর সঙ্গে মিশিতেন।' দীনবন্ধু সরকারের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন; সুতরাং তিনি উচ্চস্থানীয় ভদ্রব্যক্তি-গণের সহিত মিশিবেন ইহা স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত, কিন্তু সমাজের নিম্ন, অশিক্ষিত ও অবজ্ঞাত পুরুষ ও নারী সম্বন্ধে তাঁহার সুগভীর অভিজ্ঞতা থাকা বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিস্ময়জনক হইলেও ইহা সত্য যে শেষোক্ত শ্রেণীর নর নারী সম্বন্ধে তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর ছিল। নীলকর-নিপীড়িত অসহায় দুঃস্থ রায়ত, পরমুখাপেক্ষী দয়াপ্রার্থী ঘর জামাই, মূর্খ হাস্যাস্পদ ডেপুটি, রঙ্গরস-রতা পরিচারিকা, গুলীখোর বয়াটে যুবক—কেহই দীনবন্ধুর দৃষ্টি এড়াতে পারে নাই। ইহাদের ভাবভঙ্গি; স্বভাব চরিত্র তিনি যেমন দেখিয়াছিলেন, সুদক্ষ শিল্পীর মত তাহাই তিনি আঁকিয়া গিয়াছেন। ইহারা স্থূল, লজ্জাস্পদ, ভদ্রসমাজের ব্যতিক্রম, আদর্শবাদীর অনালোচ্য; কিন্তু ইহাদের কথা লিখিতে গিয়া দীনবন্ধুর এতোটুকু সংকোচ ও দ্বিধা নাই, ইহাদের অশোভন নগ্নতা ঢাকিবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস

---

১। ডাঃ সুকুমার সেনের মত প্রণিধানযোগ্য—'দীনবন্ধুর কৌতুকরস যে স্থানে স্থানে গ্রাম্য তাহা স্বীকার্য, কিন্তু কুত্রাপি অশ্লীল নয়'—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃঃ ১০৬।

নাই, ইহাদের ভালো করিয়া দেখাইবার কোনো আত্যন্তিক আগ্রহ তাঁহার নাই। নিরক্ষর চাষীদের ভাষাটুকু পর্যন্ত তিনি সযত্নে ব্যবহার করিয়াছেন, অন্তর্বত্নী পতিব্রতা রমণীর প্রতি পাষণ্ড অত্যাচারের দৃশ্য নিঃসঙ্কোচে দেখাইয়াছেন। ঈর্ষাপরায়ণা কলহরতা সপত্নীদের প্রতিটী অশ্লীল গালাগালি লিখিয়া গিয়াছেন, মদ ও গুলীর কদর্য মত্ততা নির্বিকার চিত্তে উপস্থাপিত করিয়াছেন। যদি তিনি কেবল রুচি ও শালীনতার দিকে লক্ষ্য করিতেন তাহা হইলে ইহাদের চরিত্র কখনো যথার্থ ও সম্পূর্ণ হইত না। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বলিতে হয়—'রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।' কিন্তু রুচি অপেক্ষা বাস্তবতার মূল্য তিনি অনেক বেশী মনে করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অগ্রদূত, এবং বোধ হয় তিনিই বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রধান বাস্তববাদী লেখক।

প্রহসন সাধারণত সমাজের কোনো বিকার কিংবা সামাজিক চরিত্রের কোনো অসংগতি দেখাইবার জন্য লিখিত হয়। দীনবন্ধুর প্রহসনেও সমাজের নানা দোষত্রুটির উল্লেখ আছে, সমাজ-শোধনের উদ্দেশ্য তাঁহাকেও চালিত করিয়াছে। 'নীলদর্পণে'র কথা ছাড়িয়া দিলাম, কারণ ঐ নাটকে নাট্যকারের ক্রোধ, দুঃখ ও সহানুভূতি এতো প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ ঠাট্টা করিতে পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য নাটক ও প্রহসনে তিনি সমাজের অহিত সাধনে রত বিবাহেচ্ছু বৃদ্ধ, মদ্য ও গণিকাসক্ত 'ইয়ং বেংগল', অসহায় রমণীর সর্বনাশে প্রবৃত্ত সমাজের উচ্চতম ব্যক্তি প্রভৃতিকে ব্যংগবিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখার মধ্যে উপহাসের আঘাত অপেক্ষা পরিহাসের মৃদু হস্তাবলেপই বেশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে হয় নাট্যকার যেন রঙের পিচকারী দিয়া সমাজের চতুর্দিকে ইতস্তত তরল রঙ ছড়াইয়া দিয়াছেন, এবং যাহারাই রঞ্জিত হইয়াছে তাহারা যেন লজ্জিত, অপ্রতিভ ও হাস্যাস্পদ হইয়া পলায়ন করিতেছে। লোকে লাঠির বাড়ি সহ্য করিতে পারে কিন্তু লোকের মধ্যে লজ্জা সহ্য করিতে পারে না। দীনবন্ধুর নাটকে সমাজের যেরূপ চেতনা হইয়াছে, প্রত্যেককে একশো ঘা চাবুক মারিলে বোধ হয় তাহা হইত না।

দীনবন্ধুর দুর্বলতা ধরা পড়িয়াছে যখন তিনি হাসি বন্ধ করিয়া গম্ভীর হইয়াছেন। দীনবন্ধুকে হাসিলেই স্বাভাবিক ও মনোহর দেখায়, হাসি বন্ধ করিলেই তাঁহাকে অস্বাভাবিক ও অপ্রীতিকর মনে হয়। মাঝে মাঝে যেখানে তিনি ধর্মকথা ও নীতিকথা শুনাইতে গিয়াছেন, সেখানে নিজেই তিনি হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিয়াছেন। নিরক্ষর, গ্রাম্য সমাজের মধ্যে নবীনমাধব যখন অতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় নীলকরদের ধিক্কার দেয়, অথবা চাষীদের জন্য দুঃখ বোধ করে তখন তাহা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে না, ললিতের অতি উদার ও মহৎ বাক্যাবলী অপেক্ষা উৎকলবাসী ভৃত্যের উড়িয়া ভাষা আমাদের কাছে অধিকতর প্রীতিকর মনে হয়, বিদুষী লীলাবতীর পালিশ-করা বচন অপেক্ষা আদুরী কিংবা হাবার মার কথা অনেক বেশী স্বাভাবিক বোধ হয়। যখনই দীনবন্ধুর কোনো

চরিত্র তত্ত্বকথা বলিতে আরম্ভ করে তখন মনে হয় যে সে কলের পুতুলের কয়েকটা শেখানো কৃত্রিম কথা বলিয়া যাইতেছে, ঐ কথার সহিত যেন তাহার অন্তরের সচল যোগ নাই। দীনবন্ধু কাদামাটির মধ্যে লুটোপুটী করিতে ভালোবাসিতেন, মলয়-সেবিত মধুর কুঞ্জে বিহার করিতে যাইয়া তাঁহার অস্বাচ্ছন্দ্য সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়িত। হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তি নিয়া নাটক রচনা করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যদি না করিতেন তাহা হইলেই বোধ হয় ভালো হইত। হয়তো তিনি ভাবিয়াছিলেন যে নেহাত প্রহসন ও হাস্যরসের মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু দীনবন্ধু সমাজের সুস্থ, স্বাভাবিক ও ভদ্র পাত্রপাত্রী নিয়া যে নাটকগুলি লিখিয়াছেন সেইগুলি কৃত্রিম ও ক্লান্তিজনক হইয়া উঠিয়াছে। ঐসব চরিত্রের প্রেম-অনুরাগ, মিলন-বিরহ আমাদের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁহার এই ধরনের নাটকগুলি প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্মচারী, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি দীনবন্ধু যে 'নবীন তপস্বিনী' ও 'লীলাবতী'র বর্ণিত সমাজ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন ইহা মনে হয় না। দীনবন্ধু যে সমসাময়িক ব্রাহ্ম আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি ব্রাহ্ম সমাজের উন্নত, সুনীতিমূলক আদর্শ সমর্থন করিতেন তাহার পরিচয় 'লীলাবতী'তে আছে, কিন্তু এই সমাজের প্রতি তাঁহার সমর্থন ও সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও তিনি ইহার চিত্র ভালো ভাবে আঁকিতে পারেন নাই; ইহার কারণ তাঁহার নাটকীয় কলা-কৌশলের দৈন্য, অভিজ্ঞতার অভাব নহে।

দীনবন্ধু নাট্যরচনায় মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। মধুসূদনের নাটক যে কারণে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হইয়াছে, দীনবন্ধুর নাটকও সেই কারণে অপ্রাকৃত ও প্রাণহীন হইয়াছে। অর্থাৎ মাইকেলের ন্যায় তাঁহার অনুবর্তী নাট্যকারও বাংলা নাটকে সংস্কৃত আদর্শ অনুকরণ করিয়া নাটককে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। দীনবন্ধুর কোমল ভাবমূলক নাটকগুলিতে সংস্কৃত প্রভাব বিদ্যমান। মাইকেলের ন্যায় তিনিও সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে নাটকের মধ্যে গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার কথোপকথন নিবদ্ধ করিয়াছেন। সামাজিক নাটকের পাত্রপাত্রীদিগকে পদ্যে কথাবার্তা বলিতে দেখিলে তাহা নিতান্তই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বোধ হয়। দীনবন্ধুর কাব্যপ্রতিভা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, সেজন্য ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাবপুষ্ট শিষ্য যখন পয়ার ও ত্রিপদীর তরল ছন্দে বাহুল্যপূর্ণ বর্ণনা করিতে গিয়াছেন, তখন তাহা নিতান্ত একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। পাত্রপাত্রীদের সংলাপের ভাষাও তাহাদের চরিত্র বিকাশনে ক্ষতিকর হইয়াছে। সাধারণ স্ত্রীপুরুষকে দুরূহ সংস্কৃত শব্দবহুল ভাষায় নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে দেখিলে তাহা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ না করিয়া হাস্যরস উদ্রেক করে। নিম্নোদ্ধৃত অংশটী আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিবে—

"এই অসীম অবনীধামে লীলাবতী ব্যতীত আর আমার কেহ নাই; লীলাবতী আমার সহধর্মিণী হবে এই আশায় জীবিত ছিলাম, আমার আশালতা পল্লবিত হয়েছিল,

কিন্তু আপনি কি অশুভক্ষণে এই ভবনে পদার্পণ করলেন, আমার চিরপালিত আশালতার উচ্ছেদ হলো, আমি দুস্তর বিপদবারিধি জলে নিপতিত হ'লেম।"

লীলাবতী, ৫ম অংক, দ্বিতীয় গর্ভাংক।

দীনবন্ধুর নাটকের নিকর্ষের আর একটী কারণ আতিশয্য-দোষ। সংস্কৃত নাটকের ধ্বনি-বৈচিত্র্য ও অর্থগৌরবে দীর্ঘ ভাবোক্তি বিরক্তিজনক হয় না, কিন্তু বাংলা নাটকে এরূপ উচ্ছ্বাসপ্রবণতা নিতান্ত অপ্রাকৃত ও ক্লান্তিদায়ক মনে হয়। সুনিপুণ চিত্রকরের সংযত তুলিকার মৃদুটানে যে অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় চিত্র অংকিত হইতে পারে, আনাড়ির রঙ মাখামাখিতে তাহা হয় না। দীনবন্ধু ভাবোচ্ছ্বাস বর্ণনায় সংস্কৃত উপমা ও অলংকারের বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে কথোপকথন ভারাক্রান্ত হইয়াছে মাত্র, প্রাণবন্ত হয় নাই। চরিত্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্বের অভাববশত সেগুলি নিতান্ত নির্জীব হইয়াছে। যে সংঘাত নাটকের প্রাণ তাহার অভাবে চরিত্রগুলি নিতান্ত goody goody ধরণের হইয়াছে।

## (খ) প্রহসন

॥ সধবার একাদশী ( ১৮৬৬ ) ॥ বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে 'সধবার একাদশী' প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে দীনবন্ধু তাঁহার বন্ধুর নিষেধ শুনেন নাই।১ যদি তিনি 'সধবার একাদশী' প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রহসন লোকের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। ইহা অত্যুক্তি নহে। হাস্যরস যদি প্রহসনের প্রাণ, এবং সমাজশোধন তাহার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে 'সধবার একাদশী'র শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

'সধবার একাদশী' তাৎকালিক নব্য সভ্যতার ধ্বজাবাহী 'ইয়ংবেংগলে'র নিখুঁত চিত্র। অনুরূপ বিষয় নিয়া লিখিত পূর্ববর্তী প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র সহিত আলোচ্য প্রহসনের সাদৃশ্য খুব বেশি। দীনবন্ধু তাঁহার পূর্বসূরি মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন ইহা সুস্পষ্ট। ঘটনা সন্নিবেশ, চরিত্রচিত্রণ, এমন কি কথোপকথনে পর্যন্ত এই প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু 'সধবার একাদশী' অধিকতর পূর্ণাংগ প্রহসন। ইহার নাটকীয় রস অনেক বেশি ঘনীভূত, এবং ইহার চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতর কলানৈপুণ্যের পরিচয় সুপরিস্ফুট।

'সধবার একাদশী'তে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য প্রভাবপুষ্ট নবীন সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব দোষ ও অনাচার দেখা গিয়াছিল, এবং তাহার প্রতিকারকল্পে যে সংস্কার

১। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত দীনবন্ধু জীবনী দ্রষ্টব্য।

আন্দোলনসমূহের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। তখনকার যুবকদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য সমাজলব্ধ যে গুরুতর দোষটী দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে সমাজদেহকে পঙ্গু করিয়া তুলিতেছিল তাহাই আলোচ্য প্রহসনখানির মূল বক্তব্য বিষয়। অনুচিত এবং অপরিমিত মদ্যাসক্তি নিমচাঁদ, অটলবিহারীর মত অনেক যুবককেই সর্বনাশের অতল গহ্বরে নিঃশেষে নামাইয়া দিতেছিল। যুবকেরা তখন শিক্ষিত হইতেছিলেন বটে, কিন্তু সুনীতি ও সদাচার অসংকোচে অবজ্ঞা করিতে মোটেই লজ্জিত হইতেন না। প্রকাশ্যভাবে বারাঙ্গনা-বিলাস করিতে তাঁহারা দূষণীয় কাজ মনে করিতেন না। শুধু যে অটলবিহারীর মত উন্মার্গগামী অপরিণামদর্শী যুবকের মধ্যে এই আসক্তি ছিল তাহা নহে, নকুলেশ্বরের ন্যায় উকীল ও কেনারামের ন্যায় ডেপুটীও এই দোষে কলুষিতচরিত্র ছিল। হিন্দুসমাজের এই সব দুর্নীতি ও দুষ্কর্মপরায়ণতার প্রতিক্রিয়ারূপেই ব্রাহ্ম-সমাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল। নবোত্থিত ব্রাহ্ম-সমাজ অধঃপতিত, স্খলিত সমাজকে সুনীতি, সদাচার ও শালীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিল। প্যারীচরণ সরকার-প্রবর্তিত সুরাপান নিবারণী সভা শিক্ষিত সমাজ হইতে সুরাপান নিবারণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, প্রহসনখানার মধ্যে সুরাপান নিবারণী সভার উল্লেখও আছে।১ যে সব যুবক মাতাপিতার দ্বারা যথাসময়ে শাসিত ও শোধিত না হয় তাহাদের পরিণাম কি রকম শোচনীয় হইয়া উঠে এই অটলবিহারীর চরিত্রের মধ্যে তাহার পরিচয় আছে। মাতাপিতার প্রশ্রয়প্রাপ্ত বিপথগামী যুবকের চিত্র প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলালে'র মধ্যে অংকন করিয়াছেন। দীনবন্ধুও অটলের স্নেহান্ধ মাতার অবিমৃষ্যকারিতা দেখাইয়া প্রত্যেক মাতাপিতাকে সতর্কিত করিতে চাহিয়াছেন। ঘটিরাম ডেপুটী তখনকার ডেপুটী সমাজের একটী বাস্তব চরিত্র, ঘটিরামের মত মূর্খ ও নির্বোধ অনেক ডেপুটী তখন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন যে মুন্সেফ, ডেপুটীদের সম্বন্ধে অনেক হাস্যজনক গল্প দীনবন্ধুর জানা ছিল, ঘটিরামের হাস্যাস্পদ চরিত্র সেই সব গল্পেরই একটী নায়ক। দীনবন্ধু নিজে খাঁটি পশ্চিমবঙ্গবাসী হইলেও২ পূর্ববঙ্গের ভাষা তিনি যে কতখানি আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা সৃষ্ট রামমাণিক্য চরিত্রটী হইতে বুঝা যায়। রামমাণিক্য চরিত্র তাঁহার অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়। শুধু তাহার কথাই নহে, পূর্ববঙ্গবাসীর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য এবং অসংগতিও দীনবন্ধু দেখাইতে ভুলেন নাই। রামমাণিক্যের অনেক কথা অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, এবং তাহার অনুকরণে বাংলা সাহিত্যে বহুতর চরিত্র অংকিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গবাসীর প্রতি লেখক অন্যায় করিয়াছেন একথা বলা অযৌক্তিক; কারণ দীনবন্ধুর উদ্দেশ্য কেবল অবারিত হাস্যরস সৃষ্টি করা, আঘাত

১। 'সধবার একাদশী' প্রকাশিত হইবার পর প্যারীচরণ সরকার দীনবন্ধুর সহিত দেখা করিয়া বলিয়াছিলেন—'আপনার যে বহি বাহির হইয়াছে, এখন আমাদের সোসাইটী উঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে'—ললিতচন্দ্র মিত্র লিখিত 'সধবার একাদশী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২। কলিকাতার অনতিদূরে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধুর জন্ম হয়।

করা তাঁহার ইচ্ছা নহে। স্বয়ং শেকসপীয়ার পর্যন্ত 'Merry Wives of Windsor' নাটকের মধ্যে Dr. Caius এবং Sir Hugh Evans-এর বিকৃত কথা নিয়া হাস্য পরিহাস করিয়াছেন।

'সধবার একাদশী'র মধ্যে কোনো জটিল, রহস্যময় কাহিনী নাই। নাটকের চমৎকারিত্ব কাহিনীর মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে নাই। কোনো আকস্মিক ঘটনা-সন্নিবেশের দ্বারা হাস্যরস সৃজন করার চেষ্টা করাও এখানে হয় নাই। নাটকের মধ্যে বিভিন্ন পাত্রপাত্রী ও বিচিত্র ঘটনা-সমাবেশের দ্বারা যে নাটকীয় গতি সম্পাদন করা হয়, এই প্রহসনে তাহারও অভাব। তিনটী অংকের মধ্যে দুই এক স্থান ব্যতীত প্রায় সর্বত্রই একই পরিবেশের মধ্যে নাটকীয় কথোপকথন সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু তবুও প্রহসনখানি পড়িবার সময় কোনো স্থলেই একঘেয়ে লাগে না, এবং দৃশ্য সংযোজনার কোনোখানেই অসংগতি ও অসংলগ্নতা বোধ হয় না। ঘটনার বিক্ষিপ্ততা নাই বলিয়া বইখানার নাটকীয় রস জমাট হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। অথচ সংলাপের চমৎকারিত্বের জন্য কাহিনী সর্বত্র সরস ও প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছে। 'সধবার একাদশী'র শ্রেষ্ঠ গুণ ইহার একান্ত বাস্তব ও অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় কথাবার্তা। নাট্যকারের প্রধান অবলম্বন নাটকের কথোপকথন, ইহার মধ্য দিয়া তাঁহাকে চরিত্র সৃষ্টি করিতে হয় ও ঘটনার চলমানতা বিধান করিতে হয়। যে জায়গায় যে কথাটী ব্যবহার করিতে হয়, ঠিক সেই কথাটীর অভাবে নাটকীয় রস ব্যাহত হয়। এই কথা-ব্যবহারে দীনবন্ধুর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোনো নাট্যকার এই বিষয়ে দীনবন্ধুর সমকক্ষ নহেন। নিমচাঁদের প্রতিটী শ্লেষাত্মক কথা, প্রতিটী witty বাক্য দর্শকদের মন হর্ষোদ্বেলিত করিয়া রাখে। ঘটিরাম ডেপুটী, রামমাণিক্য, অটল, ভোলা, কাঞ্চন—প্রত্যেকের কথা তাহাদের চরিত্র বিকাশনে অভ্রান্তভাবে সাহায্য করিয়াছে। দীনবন্ধু কথাকে আবরু দ্বারা ঢাকিয়া তাহার ইজ্জত রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই, সেজন্য অশ্লীলভাষিণী বারবনিতা, মদ্যপায়ী মাতাল, বয়াটে আদুরে দুলাল প্রভৃতির মুখ দিয়া সমাজের ভব্যতা ও শালীনতার মুখোস খসিয়া পড়িয়াছে, এবং এক অশ্লীল, অভদ্র রসস্রোতে সমস্ত নাটকীয় প্রাঙ্গন প্লাবিত হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে অনেক রুচিবিলাসী সমালোচক দীনবন্ধুর নাটকের অশ্লীলতায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়১ ও ডাক্তার প্রভুচরণ গুহ ঠাকুরতা২ নাট্যকারেকে অনেক কটু কথাও শুনাইয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা ভুল করেন যে দীনবন্ধু যেসব চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, তাহাদের মুখ দিয়া ভব্য ও ভদ্র কথা বলাইলে তাহা শোভন হইত বটে, কিন্তু নাটকের পক্ষে তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক হইত ইহাও সত্য। প্রহসনখানির মধ্যে ঘটনার অদ্ভুতত্ব দেখা গিয়াছে তৃতীয় অংকের শেষ দৃশ্যে।

১। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

২। Origin & Development of Bengali Drama.

সেখানে মোগলবেশী অটলবিহারী ও তাহার কুমুদিনী হরণ-বৃত্তান্তের মধ্যে হাস্যরস সশব্দ আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

'সধবার একাদশী'র মধ্যে পাশ্চাত্য-সংস্পর্শ-দুষ্ট সমাজের দোষগুলি যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চরিত্রাংকনের নিখুঁত বাস্তবতায়, এবং অধঃপতিত চরিত্রগুলির শোচনীয় পরিণাম দর্শনে আমাদের মন ভারাক্রান্ত ও করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠে। কিন্তু নাট্যকার প্রহসনের মধ্যে কোনো স্থলে নীতি ও আদর্শ লইয়া অযথা বাগাড়ম্বর করেন নাই, এবং শেষে পতিত চরিত্রগুলিকে অনুতাপে দগ্ধ করাইয়া তাহাদের নেহাত ভালো মানুষ করিবার চেষ্টাও করেন নাই। বরং গ্রন্থের মধ্যে যাহারা সুরাপান নিবারণী সভা ও ব্রাহ্মসভার নাম করিতে গিয়াছেন তাঁহারাই নিমচাঁদের সুতীব্র ব্যঙ্গের আঘাতে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছেন। নীতি, সততা ও আদর্শের প্রতি দীনবন্ধুর শ্রদ্ধা ছিল না একথা বলিলে ভুল বলা হইবে, কিন্তু জীবনের ভালোমন্দ দুইদিক তিনি সমান করুণামাখা দৃষ্টি দ্বারা দেখিয়াছেন। ওয়াল্ট হুইটম্যানের মত তিনিও ভাবিয়াছেন—

"I am not the poet of goodness only,
I do not decline to be the poet of wickedness also."১

সেইজন্য তাঁহার চরিত্রগুলি শেষ পর্যন্ত অধঃপতিত থাকিয়াই তাহাদের জীবনের করুণ ট্র্যাজেডি দ্বারা আমাদের মনকে অভিভূত করিয়াছে, অবিরত হাস্য কৌতুকের মধ্যেও করুণ ফল্গু স্রোত সমস্ত প্রহসনখানিকে সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

'সধবার একাদশী'র অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্ব একান্তভাবে নির্ভর করিয়াছে নিমচাঁদের চরিত্রের উপর। অটলবিহারীকে গ্রন্থের নায়ক বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার চরিত্রের জঘন্য হীনতা এবং আত্যন্তিক ক্ষুদ্রতা কেবল ঘৃণা ও বিরক্তি উৎপাদন করে। সে নির্দ্বন্দ্ব হইয়া সর্বপ্রকার কুকর্মে রত, কোনোপ্রকার পাপেই তাহার অরুচি নাই। নিমচাঁদ অটলের ইয়ার হইলেও তাহার প্রবলতর ব্যক্তিত্বের প্রভাব সর্বত্রই অনুভূত হয়। তাহার সুতীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, সুগভীর অনাসক্ত নির্লিপ্ততা সমস্ত প্রহসনখানিকে অভিনব রসে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। অনেকেই বলেন নিমচাঁদ মাইকেল মধুসূদনের চরিত্র অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে; দীনবন্ধু অবশ্য এ কথা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'মধু কি কখনো নিম হয়?'২ দীনবন্ধু অস্বীকার করিলেও একথা সত্য যে মধুসূদনের পরোক্ষ প্রভাব প্রহসনখানার উপর পড়িয়াছে। মাইকেল 'ইয়ংবেঙ্গলে'র সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন, এবং 'ইয়ং বেঙ্গলে'র কোনো চরিত্র অংকন করিতে গেলে মাইকেলের জীবন্ত প্রভাব ইহার উপর পড়িবে তাহা অস্বাভাবিক নহে। অপরিমিত মদ্যাসক্তি মধুসূদনের

১। Song of myself—*Leaves of Grass* by Walt Whitman

২। ললিত চন্দ্র মিত্রের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জীবনের অশান্তির মূলে ছিল, এবং নিমচাঁদের জীবনেও এই আসক্তি তাহার সর্বনাশ করিয়াছে। মধুসূদন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ও পূরাদস্তর ইংরাজীনবীশ ছিলেন। তিনি একদিন ভূদেববাবুকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই নিমচাঁদ বলিয়াছে, 'I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English and dream in English.' মধুসূদনের জীবনের শেষভাগে মনোমোহন বসু প্রভৃতির নিকট যে রকম মর্মান্তিক খেদোক্তি করিতেন নিমচাঁদও মাছে মাঝে তাহাই করিয়াছে। এই সব সাদৃশ্য বশত নিমচাঁদের উপর মধুসূদনের সম্ভাব্য প্রভাব একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। নিমচাঁদ ইয়ার বটে, কিন্তু ভোলার মতো নির্বোধ ইয়ারকি সে মারে না; জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম জ্ঞানলাভর পর সে সব কিছুর প্রতি অনাসক্ত ও বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তথাকথিত ভালো লোক ও সদনুষ্ঠানের প্রতি তাহার কোনো আস্থা নাই। নকুল গোকুল প্রভৃতি লোক যাহারা সুরাপান নিরারিণী সভা প্রভৃতির উদ্‌যোগী তাহারা যে বস্তুত কত অন্তঃসারশূন্য ও কপট তা সে জানে। সেজন্য তাহাদের সদ্‌কর্ম-প্রচেষ্টাকে সে নিতান্ত অনুকম্পার চোখে দেখে। রামমাণিক্য, ঘটিরাম ডেপুটী প্রভৃতি যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়া কত ছোট তাহাও সে অনুভব করে, সেজন্য সে তাহাদের নিয়া সর্বদা করুণা-মিশ্রিত কৌতুক করে। সে মাতাল এবং উচ্ছৃঙ্খল বটে, কিন্তু তাহার গভীর অনাসক্তি ও সূক্ষ্ম আভিজাত্যবোধ তাহাকে সর্বদা পাপকম হইতে বিরত রাখে। সে পুণ্যাত্মা নয়, নীতিনিষ্ঠ নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় তাহার আসক্তিও নাই। সে কাঞ্চনকে নিয়া ঠাট্টা-তামাসা করে, বন্ধুদের নিয়া অশ্লীল ইয়ারকিও মারে বটে, কিন্তু কোনো প্রকার জঘন্য আমোদে লিপ্ত হইতে তাহাকে দেখা যায় নাই। অটলবিহারী যখন গোকুলবাবুর স্ত্রীকে হরণ করিবার নিতান্ত গর্হিত প্রস্তাব করিল নিমচাঁদ তখন অসম্মত হইয়া বলিয়াছিল,

'I dare do all that may become a man,
Who dares do more, is none.'

নিমচাঁদের সহিত বাংলা সাহিত্যে একমাত্র তুলনীয় চরিত্র শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী'র নায়ক জীবানন্দ। জীবানন্দের মতোই নিমচাঁদ নিজেকে নিয়া ব্যঙ্গ করিতে ছাড়ে না। রামধন রায় তাহাকে মারিতেছে, অথচ সে এই মার নিয়া রামধনের সহিত ঠাট্টা করিতেছে, ইহা পরম উপভোগ্য ব্যাপার। জীবনের স্বাভাবিক, সঙ্গত ও শান্তিময় ধারা হইতে সে দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সেজন্য নিজের জীবনের প্রতিও তাহার কোনো দরদ ও মমত্ব নাই। সে অনুভব করে যে তাহার মত জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিও আজ অবস্থা-বৈগুণ্যে ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাই যখন তাহার ব্যঙ্গ-কুটিল ওষ্ঠদ্বয়ের ভিতর দিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বাহির না হইয়া হৃদয়ভেদী অনুতাপ উদ্গত হইতে থাকে, তখন আমাদের হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। সে যখন মর্মান্তিক নৈরাশ্যপূর্ণ উক্তি করিতেছে—

So sweet was ne'er so fatal, I must weep
But they are cruel tears.

তখন মনে হয় দীনবন্ধু কমেডির মধ্যে এক নিতান্ত করুণ ট্র্যাজিক চরিত্র আঁকিয়াছেন এবং তাহার চরিত্র আলোচনা কালে কিং লীয়ারের উক্তি মনে হয়—'I am more sinned against than sinning.'

'সধবার একাদশী'র আলোচনার উপসংহারে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেনের উক্তি সমর্থন করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি, 'শুধু নিমচাঁদের ভূমিকার জন্যই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও সধবার একাদশী বাঙ্গালার দুই চারখানি শ্রেষ্ঠ নাট্যগ্রন্থের অন্যতম বলিয়া চিরদিন পরিগণিত হইবে।'১

॥ বিয়ে পাগলা বুড়ো ( ১৮৬৬) ॥ 'সধবার একাদশী' যেমন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুকরণে লিখিত, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'ও তেমনি মাইকেলের অন্যতম প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'এর দ্বারা প্রভাবিত। ভক্তপ্রসাদের সহিত রাজীবের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই প্রহসনের মধ্যে মাইকেলের ন্যায় দীনবন্ধুও প্রাচীন, সংস্কারবিরোধী সমাজকে উপহাস করিয়াছেন।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নিখুঁত হাস্যরসপ্রধান প্রহসন হিসাবে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। ইহার মধ্যে ধারালো কথার তীব্র ঝলক নাই, কোনো গভীর সমাজ-সমস্যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও নাই, হাস্যরসের অনর্গল ধারায় প্রহসন খানা আগাগোড়া স্নিগ্ধ ও মধুর করিয়া রাখা হইয়াছে। এই হাস্যরসের মূল কোনো বিশেষ চরিত্রের মধ্যে নহে। এক সুকল্পিত রহস্য-মধুর ষড়যন্ত্রের উপর ইহা নিহিত। সুতরাং এই প্রহসনের কাহিনীই সর্বাপেক্ষা প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়। যে বিয়ে পাগলা বুড়োকে নিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে, সেইরকম ভীমরতিগ্রস্ত, সমাজের সর্বনাশেচ্ছু বৃদ্ধ পূর্বেও ছিল, এবং এখনও যথেষ্ট আছে। খবরের কাগজে এই রকম নবীনম্মন্য বিবাহার্থী'র বিবাহনেশা এবং রতা প্রভৃতির ন্যায় যুবক সম্প্রদায়ের হাতে যথোচিত নাকাল হওয়ায় কৌতুকপূর্ণ বিবরণ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। রাজীবলোচন নিজে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ হইয়াও বিবাহ করিবার জন্য উন্মত্ত, অথচ রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্কৃতি' কবিতার পিতার ন্যায় বিধবা কন্যাদের বৈধব্য-রক্ষা ও ব্রহ্মচর্য-পালন বিষয়ে অতিমাত্রায় কঠোর ও কর্তব্যপরায়ণ। ছন্নমতি, দয়াহীন পিতার আশ্রিতা কন্যাদ্বয় রামমণি ও গৌর-মণির বৈধব্য-ক্লেশ দীনবন্ধু প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে বর্ণন করিয়াছেন। স্পষ্টত নাট্যকার পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পরিপোষণ করিয়াছেন। পুরুষ ও নারীর বিবাহ ব্যবস্থায় সমাজ-নীতির নিতান্ত গর্হিত ও অযৌক্তিক তারতম্য লেখক চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন। শরৎচন্দ্র যাহাদের নিয়া উপন্যাস রচনা করিয়া অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন তাহাদেরই স্থান দরদী নাট্যকারের দ্বারা নাটকের মধ্যে সহানুভূতির সহিত নির্দেশিত হইয়াছে।

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ( ২য় খণ্ড )—ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১০৪

রাজীবলোচন 'বুড়োশালিকে'র নায়ক ভক্তপ্রসাদের ন্যায় সুরসিক ও কবিতা-প্রিয়, নবীন নায়কের মত সেও স্ত্রীর সহিত আলাপনে অনেক রসাল কবিতা ও ছড়া আবৃত্তি করিয়া অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। দীনবন্ধু রাজীব ও তাহার 'রতা নাপিত স্ত্রী'র সহিত মধুর রস আলাপনের মধ্যে অনেক স্থলে কবিতা ব্যবহার করিয়াছেন। বাল্যবয়সে তিনি গুরু ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অনুকরণে যে রকম যমক-অনুপ্রাসবহুল, তরল পয়ার ছন্দে কবিতা লিখিতেন এই সব কবিতাও সেইরূপ। কোমলভাব-বিশিষ্ট নাটকের মধ্যে দীনবন্ধুর কবিতা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হইয়াছে, কিন্তু আলোচ্য হাস্যরসাত্মক প্রহসনের মধ্যে এই রকম কবিতা বিশেষ সার্থক ও চমৎকার হইয়াছে; কারণ নাট্যকার প্রেমবিহ্বল রাজীব ও তাহার 'ছলনাময়ী স্ত্রী'র আদিরসাত্মক কবিতাযুদ্ধের মধ্যে তাঁহার ঈপ্সিত হাস্যরস ফুটাইয়া তুলিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছেন। রাজীব তাঁহার কল্পিত স্ত্রীকে কবিতা দ্বারা মনোরঞ্জন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, মাঝে মাঝে কবিতা ভুল করিতেছে, অথচ না দমিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আবার চেষ্টা করিতেছে, ইহাই পাঠক ও দর্শকের পক্ষে চূড়ান্ত হাস্যরসের কারণ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পের পুত্র হঠাৎ বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত বালকের ন্যায় আচরণ করিয়া লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়াছে। রাজীবও বিবাহার্থী তরুণ যুবকের ন্যায় নিজেকে নিতান্ত কচি ও কাঁচা দেখাইতে গিয়া পদে পদে কি রকম বিপর্যয় ও অসঙ্গতি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে তাহা দেখাইয়া লেখক আমাদিগকে যথেষ্ট হাসাইয়াছেন। প্রহসনখানির রস জমিয়া উঠিয়াছে দুই বিপরীত ঘটনাপরম্পরায় সংঘাতে। বুদ্ধিহত রাজীব কিছু না জানিয়া ও না বুঝিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আত্ম-সুখে বিভোর হইয়া চলিয়াছে, অথচ তাহার চারিপার্শ্বে একটী সরস, জটিল ষড়যন্ত্র কুণ্ডলীকৃত হইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, এবং বিপর্যস্ত রাজীব শেষে চূড়ান্ত নাজেহাল হইয়াছে। শেষ দৃশ্যে আশাহত, স্তম্ভীভূত রাজীবের প্রতি চতুর ঘটক, দুষ্টমতি বালকেরা ও রাজীবের নব-পরিণীতা পাঁচীর মা তাহার প্রতি রাশি রাশি কাদা নিক্ষেপ করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে। বিয়ে পাগলা বুড়ো উপহাসের লগুড়াঘাতে যথোচিত শাস্তি পাইয়াছে।

আলোচ্য প্রহসনে রতা ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গেরা রাজীবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের ন্যায় চঞ্চলমতি বালকগণের পক্ষে বৃদ্ধকে নিয়া কৌতুক করা তাহাদের স্বভাবানুযায়ী হইয়াছে, বৃদ্ধকে নকল সাপ দ্বারা দংশন করানো এবং শরৎচন্দ্র-বর্ণিত 'বিষহরির আজ্ঞে'র অনুরূপ মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি এবং বৃদ্ধকে উত্তম মধ্যম প্রহারের মধ্যে যথেষ্ট কৌতুকের সৃষ্টি করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাদের মুখ দিয়া আদিরসাত্মক কবিতা বলানো একটু অসঙ্গত হইয়াছে। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত উল্লেখযোগ্য—ঐ ছেলেগুলি বাসরঘরে শালীশালাজ প্রভৃতি সাজিয়া যে ঘোরতর ইয়ারকি দিয়াছে, প্রৌঢ়া যুবতীরাও সকলে সেরূপ পাকা ইয়ারকি দিতে পারে না। সুতরাং সেগুলি কিছু অস্বাভাবিক হইয়াছে।'১

১ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—পৃঃ ২৭১।

॥ জামাই বারিক ( ১৮৭২ ) ॥ দীনবন্ধুর তৃতীয় প্রহসন 'জামাই-বারিকে'র কাহিনী একটু অদ্ভুত ধরণের। অনেকগুলি জামাইকে একটী ব্যারাকের মধ্যে পুরিয়া রাখা এবং পাশ লইয়া তাহাদের অন্তঃপুরে যাওয়ার বিষয়গুলি একটু অস্বাভাবিক হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রহসনের ( farce ) পক্ষে অচলিত ও অতিরঞ্জিত বিষয় দূষণীয় নহে, যদি তাহাতে রসের হানি না হইয়া থাকে। ড্রাইডেন ( Dryden ) কমেডি ও প্রহসনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'Farce entertains us with what is monstrous and chimerical১' সুতরাং দীনবন্ধু যদি হাস্যরসের দমকে পাঠক ও শ্রোতাকে মাতাইয়া তুলিবার জন্য সরস অদ্ভুতত্বের সমাবেশ করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে প্রহসনের মূল্য কমে নাই।

'জামাই-বারিক' সমাজের দুই বাস্তব (এবং করুণ) সমস্যা অবলম্বনে লিখিত। পূর্বে কুলীন জামাইরা নিষ্কর্মা ও বেকার অবস্থায় শ্বশুরবাড়ীতে থাকিত। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য শ্বশুরের 'পরে নির্ভর করিতে হইত বলিয়া তাহারা সকলের কাছে (স্ত্রী পর্যন্ত) নিতান্ত অবজ্ঞেয় এবং উপহাসাস্পদ হইত। ইহাদের করুণ অবস্থা এবং নিরুপায় দুঃখের কথা দরদী নাট্যকার হাস্যরসের অনাবিল স্রোতের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সপত্নী-ঈর্ষা-কলহ-পীড়িত দ্বিপত্নীক স্বামীর সমস্যা প্রহসনে আলোচিত দ্বিতীয় বিষয়। কিছুদিন পূর্বেও যখন দুই কিংবা ততোধিক পত্নীগ্রহণ সমাজের মধ্যে নিন্দনীয় ছিল না, তখন ষটশীর্ষ দৈত্য Scylla এবং প্রবল বাত্যা Charybdis-এর মধ্যস্থিত বিপদস্থ নাবিকের ন্যায় অনেক বেচারা স্বামীর জীবন যে সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অবশ্য আধুনিক বাঙালী জীবনে উপরিউক্ত দুই সমস্যাই লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, সূক্ষ্মমর্যাদা-সম্পন্ন আধুনিক জামাতাগণ যেমন পরনির্ভরশীল হইতে অসম্মান বোধ করে, তেমনি অর্থ নৈতিক সমস্যাপীড়িত যুবকগণ একাধিক স্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে নিতান্ত অপছন্দ করে। কিন্তু দীনবন্ধুর সময়ে এই দুই সমস্যা সমাজে একান্ত বাস্তব আকারে ছিল, সেজন্যই ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছিলেন, 'কৌলীন্যানুরোধে যাহারা ঘরজামাই রাখেন বা ঘরজামাই থাকেন, এই পুস্তক পাঠে তাহাদের অনেকেরই চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা।'২

দীনবন্ধুর প্রহসনগুলির মধ্যে হাস্যরসের প্রাবল্য 'জামাই বারিকে' সর্বাপেক্ষা বেশি। এই হাস্যরস সূক্ষ্মভাবে বুদ্ধিকে নাড়া দেয় না, ইহার মূর্তি ছদ্মবেশে আচ্ছন্নও থাকে না, ইহার অনাবৃত, অবারিত আঘাত দর্শকগণকে ক্রমাগত কৌতুকে নাচাইতে থাকে। বগলা ও বিন্দুবাসিনীর কলহ, স্বামীর স্নেহকে ভাগাভাগি করিয়া নেওয়ার ব্যাপার, বেচারা চোরকে স্বামী ভাবিয়া উত্তম মধ্যম দেওয়ার দৃশ্য প্রভৃতি কৌতুকের মেলা সৃষ্টি করিয়াছে। জামাই বারিকের হতভাগ্য জামাইগুলির জীবনযাপনের যে বিচিত্র দৃশ্য নাট্যকার আঁকিয়াছেন তাহাও যথেষ্ট হাস্যরসাত্মক হইয়াছে। নিষ্কর্মা, নেশাখোর জামাইরা অলস সময় আমোদপ্রমোদের

১। *Dramatic Essays* by John Dryden, p. 78. (Everyman's Library)

২। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, পৃঃ ২৭৩

মধ্য দিয়া কাটাইতে চায়। পাশ পাওয়ার ফুর্তিতে মত্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে একজন মিসেস ম্যালাপ্রপ (Mrs. Malaprop) এর ন্যায় ভাষা ব্যবহার করিয়া রামায়ণের যে অদ্ভুত ভাষ্য (অদ্ভুত রামায়ণ নহে) করিয়াছে তাহা বিলক্ষণ আনন্দজনক হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান যুগ্ম ধর্মাশ্রিত বিচিত্র মাণিকপীরের গানটী স্থান ও সময়ের সহিত বিশেষভাবে খাপ খাইয়াছে। দীনবন্ধু আমাদের সমাজের বিচিত্র প্রাণস্পন্দনময় বহুমুখী নাড়িগুলির সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। ঘরোয়া ঠাট্টা রসিকতা ও ছড়া প্রবাদের মধ্যে বাঙালীর প্রাণরস কিভাবে স্ফুর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা তিনি জানিতেন। সেজন্য তাঁহার প্রহসনের মধ্যে নানা লৌকিক ছড়া ও প্রবাদ রংগরসের তালে তালে চরিত্রগুলিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। এই সব সমিল পংক্তিগুলি বাদ দিলে চরিত্রগুলি নিতান্ত প্রাণহীন ও নীরস হইয়া পড়ে। সূক্ষ্ম রুচিমান আধুনিক শিক্ষিত সমাজ হইতে এই জাতীয় সম্পদগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছে ইহা শুভ চিহ্ন নহে।

দীনবন্ধু এই প্রহসনের মধ্যে আমাদিগকে যথেষ্ট হাসাইয়াছেন বটে, কিন্তু একটানা হাসিতে ক্লান্তি আসিবার সম্ভাবনা, সেজন্য করুণ রসের একটি অদৃশ্য প্রবাহ প্রহসনের মধ্যে আনয়ন করিয়া তিনি আমাদের মানসিক সমতা রক্ষা করিয়াছেন। তটের তলদেশ যেমন তরংগের মৃদু আঘাতে ক্ষয় হইতে থাকে, আমাদের হৃদয়ের গোপন স্তরও তেমন এই করুণ রসে আস্তে আস্তে দ্রব হইয়া উঠে। স্ত্রীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও অবজ্ঞাত অভয়কুমারের অবস্থা দেখিয়া আমাদের দুঃখিত অন্তঃকরণ এই কথাটীর করুণ সত্যতা স্পষ্ট উপলব্ধি করে যে, 'ঘর জামাইয়ের পোড়ার মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ'। সপত্নী-কলহ জর্জরিত মর্মপীড়িত পদ্মলোচনের অবস্থা আমাদের মনে প্রচুর কৌতুকরসের উৎপত্তি করিয়া বেচারা স্বামীর দুঃখে সহানুভূতিশীল করিয়া তুলে।

'জামাই বারিক' স্ত্রী-প্রধান প্রহসন। অন্তঃপুরের রংগ-ললনা-কলিত-কন্দরে নাট্যকারের রসসন্ধিৎসু দৃষ্টি কিভাবে বিচরণ করিত তাহার যথার্থ পরিচয় গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। অন্তঃপুরিকাদের রংগরস, হাসিঠাট্টা, নর্মালাপ ও খরকলহ দীনবন্ধু বিস্ময়কর নৈপুণ্যের সহিত বর্ণন করিয়াছেন। গর্বোদ্ধতা ধনী অঙ্গনা কামিনী হইতে গ্রাম্যরসের প্রস্রবিনী হাবার মা পর্যন্ত সকল স্ত্রী-চরিত্র কাহিনীকে গতিশীল ও রসময় করিয়া রাখিয়াছে। 'দেবা না জানন্তি কুতো মানবাঃ', তাই কোমলতায় ইহারা যেমন ললিত পল্লবিনী, উগ্রতায় তেমনি আবার ভীমা উগ্রচণ্ডা। বগলা ও বিন্দুবাসিনী যে ভাষায় পরস্পরের প্রতি উগ্র বিষ ছড়াইয়াছে, তাহা একান্তভবে এই সব অন্তঃচারিণীদেরই ভাষা, অন্তঃপুরের বাহিরে এই বিচিত্র ভাষার অস্তিত্ব নাই। 'মড়িপোড়ানির ঝি', 'শতেকখোয়ারি', 'নয়দুয়ারি', 'ভালখাগি', 'হতচ্ছাড়ি' প্রভৃতি চমকপ্রদ বিশেষণে ভূষিত হইয়া সপত্নীদ্বয়ের খরজিহ্বা হইতে যে শাণিত ছুরিসমূহ নির্গত হইয়াছে তাহা পদ্মলোচন কেন, যে কোন বলবান স্বামীকে জীবন্মৃত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এইরূপ বাস্তব ঝগড়ার দৃশ্য বাংলা সাহিত্যের অন্য কোনো গ্রন্থে আছে কিনা সন্দেহ। নির্দোষ ও নির্বিরোধ পদ্মলোচন এই

দুই নাগিনীর উদ্যত নাগপাশ হইতে পলায়ন করিয়া বৃন্দাবনে আশ্রয় গ্রহণ করিবে ইহা মোটেই আশ্চর্যজনক নহে। অভয়কুমারও অনুরূপ শীতল-প্রকৃতিবিশিষ্ট পরাশ্রিত স্বামী। ক্যাথারিনার ( Katharina ) ১ ন্যায় গর্বিণী স্ত্রীকে কিভাবে বশীভূত করিতে হয় তাহা তাহার জানা ছিল না, সেজন্য তাহাকেও অনাশ্রয়ের আশ্রয় ব্রজধামে গমন করিতে হইয়াছিল। গ্রন্থের অন্য কোনো পুরুষচরিত্র উল্লেখযোগ্য নহে।

'জামাই-বারিকে'র কাহিনী দুইভাগে বিভক্ত। বগলা, বিন্দু ও পদ্মলোচনের আখ্যান এবং কামিনী, অভয়, ভবী ও ময়রা বুড়োর গল্প প্রথম তিন অঙ্কে স্বতন্ত্রভাবে অগ্রসর হইয়া চতুর্থ অংকে একত্রিত হইয়াছে। যেভাবে নাট্যকার গ্রন্থের দুই ধারাকে মিশাইয়া দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম নাট্যকলা নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রহসনের ঘটনা বৃন্দাবনে স্থানান্তরিত করাতে যে অবিশ্বাসী সন্দেহের উৎপত্তির কারণ ঘটিয়াছিল, লেখকের বর্ণনার কৃতিত্বে ও চরিত্র-সমাবেশের কুশলতায় তাহা হয় নাই। দীনবন্ধুর নাটকের একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে অপ্রাসংগিক ও অতিরিক্ত বিষয়ের অনাবশ্যক উত্থাপন লক্ষ্য করা যায় না। ঘটনা-বৈচিত্র্য যেখানেই আছে, সেখানে তাহা মূল বিষয়ের সহিত অংগাংগীভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছে।

## নাটক

নীলদর্পণ (১৮৬০) ॥ নীলের হাঙ্গামা আজ পুরাতন ইতিহাসের বিলীয়মান স্মৃতির মধ্যে পর্যবসিত হইয়াছে। দেশের ইতস্ততবিক্ষিপ্ত কয়েকটি ভগ্নকুঠী এবং লোকপরম্পরায় প্রচলিত কতকগুলি কিংবদন্তী আজ সেই নীলের কাহিনীর জীর্ণ সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু একশত বৎসর পূর্বে এই নীলের সমস্যাকে অবলম্বন করিয়া এমন একটি দেশজোড়া জাগরণ গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহা এক আকস্মিক ভূমিকম্পের মত বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি সজোরে নাড়িয়া দিয়াছিল। বোধ হয় তাহাই হইল আমাদের সর্বপ্রথম জাতীয় জাগরণ।

বহুকাল পূর্ব হইতে ভারতবর্ষে নীলের চাষ হইত। ভারতে উৎপন্ন হইত বলিয়া নীলের নাম হইল Indigo। দিল্লী হইতে ঢাকা পর্যন্ত নীলের চাষ হইত বটে কিন্তু বাংলার নীলই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইত এবং ১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাংলার নীলই সারা পৃথিবীর চাহিদা মিটাইত। নীলের চাষ প্রথমত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছিল এবং তাহারা ইহা হইতে প্রভূত অর্থলাভ করিয়াছিল কিন্তু ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী এই চাষের ভার তাহাদের কর্মচারী এবং অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের হস্তে অর্পণ করে। ইহারা এই ব্যবসার ভার গ্রহণ করিবার পর হইতে দেশের চাষী রাইয়তদের দুর্দশা সুরু হয় এবং ক্রমে ক্রমে এই দুর্দশার চরম অবস্থা দেখা দেয়।

১। শেক্সপীয়রের 'The Taming of the Shrew' নাটকের চরিত্র।

নীলকর সাহেবরা দাদন দিয়া রাইয়তদিগকে নীল বুনিবার চুক্তিতে আবদ্ধ করিত। রাইয়তেরা অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাদন লইতে বাধ্য হইত। নীলের চাষে তাহাদের কোনই লাভ ছিল না, কারণ দাদনের টাকা বাকি বকেয়া প্রভৃতি শোধ করিয়া তাহাদের ভাগ্যে বেশি কিছু অবশিষ্ট থাকিত না ; অথচ দেনা ও ঋণসমেত চুক্তির বোঝা তাহাদিগকে পুরুষানুক্রমে বহিয়া বেড়াইতে হইত। অসম্মত প্রজাদের নিষ্কৃতির কোনই পথ ছিল না ; কারণ জালজুয়াচুরি, প্রতারণা উৎপীড়ন প্রভৃতি যে কোন উপায়েই হউক নীলকর সাহেবরা তাহাদের উপর চুক্তির দায়িত্ব চাপাইয়া দিত। অসহায় প্রজাগণ অনাহারে থাকিয়া সব অত্যাচার সহিয়া নীলের চাষ করিয়া দিত, প্রতিকারের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইত না।

কিন্তু এইসব সহায়সম্বলহীন প্রজাদের রক্তশোষণ করিয়া বিদেশাগত নীলকর ব্যবসায়ীরা রাজার হালে দিন কাটাইত। নীলের ব্যবসায়ে অপরিমিত অর্থ উপার্জন করিয়া তাহাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অপরিসীম হইয়া উঠিল। সার হেনরী কটন নীলকর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'His power in my time was practically unlimited'। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি অনেক সময় নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। কয়েকটি ইংরাজি সংবাদপত্রও তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং তাহারা বিনা বাধায় তাহাদের শোষণ ও উৎপীড়ন চালাইয়া যাইতে পারিয়াছিল। তাহাদের অত্যাচারের বিবরণ পড়িলে আজও লোকের শরীর শিহরিত হইয়া উঠিবে। 'নীলদর্পণে' বর্ণিত একটি কথাও মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত নহে। যেসব রাইয়ত চাষ করিতে অসম্মত হইত তাহাদের গুলি করিয়া অথবা বর্ষাবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইত ; কিংবা নীচু, সংকীর্ণ অন্ধকার গুদামঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। নীলকরদের শ্যামচাঁদ অথবা রামকান্ত প্রজাদের পিঠে পড়িবার জন্যই সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত এবং সাহেবদের সবুট অভ্যর্থনা প্রজারা তো নিত্ত-নৈমিত্তিক ব্যাপার বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিল। সময় সময় এক একটা গোটা গ্রাম অথবা বাজার নীলকরদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে লুন্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইত। গৃহস্থ কন্যা ও বধূদেরও অব্যাহতি ছিল না। মাঝে মাঝে তাহাদিগকে জোর করিয়া আনিয়া কুঠীতে বদ্ধ করিয়া রাখা হইত। ক্ষেত্রমণির প্রতি অত্যাচার-বৃত্তান্ত একটি সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়াই লিখিত হইয়াছিল।

অবশ্য তৎকালীন ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে কেহও যে প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই তাহা নহে। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসলি ইডেন ও কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেলের ন্যায় কর্মচারীও তখন ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাদের জাতীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া নিরীহ নিঃসহায় কৃষককুলের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নাম বাঙালী জাতি চিরকাল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। প্রজাদরদী ছোটলাট স্যার পিটার গ্রাণ্ট কার্যভার গ্রহণ করিয়াই একটি পরোয়ানা জারি করিলেন যে, নীলের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া প্রজাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। এই পরোয়ানা

প্রজাদের অসন্তোষের বারুদে আগুন ধরাইয়াছিল। তাহারা বহুদিন নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এতদিন পরে তাহারা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই আগুনে ইন্ধন দিয়াছিলেন প্রথম দুইজন গ্রামবাসী—বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। দুর্বল কৃষককুল এতদিন পরে একতার মধ্যে এক মহাশক্তি খুঁজিয়া পাইয়াছিল, বাঙালীর জাতীয় জীবনে ইহাই হইল প্রথম মহাশক্তির উদ্বোধন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীলের হাঙ্গামা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের সভ্য ছিলেন পাঁচজন এবং সিটনকার ইহার সভাপতি ছিলেন। চার মাস ধরিয়া সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া কমিশন রিপোর্ট দিলেন যে, দরিদ্র কৃষকদের দ্বারা জোর করিয়া নীলের চাষ করান হয় এবং এই চাষ তাহাদের পক্ষে মোটেই লাভজনক নয়। কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট নীলকর-অত্যাচার প্রশমনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু দুর্দান্ত নীলকর দমিবার পাত্র নহে। তাহারা গ্রাণ্ট, ইডেন, হার্সেল, সিটনকার প্রভৃতির বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিল এবং নানাভাবে ইঁহাদের অপদস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

নীলকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাহারা সমগ্র দেশকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়—হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু মিত্র। হরিশচন্দ্র তাঁহার হিন্দু-পেট্রিয়টে নীলকরদের বিরুদ্ধে তাঁহার অগ্নিস্রাবী লেখনীকে নিয়োজিত রাখিলেন। শোষিত প্রজাবৃন্দের জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিলেন, এমনকি শেষপর্যন্ত অকাল মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিয়া লইলেন। নীলকরগণ এই শত্রুতা ভুলিতে পারে নাই, তাঁহার মৃত্যুর পরেও তাঁহার সহায়হীন পরিবারের উপর তাহাদের ঘৃণ্য প্রতিহিংসা পতিত হইয়াছিল। 'নীলদর্পণে'র আঘাত বোধ হয় আরো তীব্র ছিল এবং সেজন্য ইহার উপর তাহাদের প্রতিহিংসা আরো বেশি হিংস্র ও পৈশাচিক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার অনুবাদ করিয়া মাইকেল সুপ্রিম কোর্টের চাকরী হারাইয়াছিলেন, ইহার প্রকাশ করিয়া পাদরী লং কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রচারে সাহায্য করিয়া সিটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। আজ দেশে নীলের চাষ নাই, নীলকরের অত্যাচারও নাই কিন্তু একদিন ইহাদের লইয়া কত না ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে এবং সেই দুর্যোগ-দিনে যে সব স্বদেশী ও বিদেশী মহাপ্রাণ হৃদয় অসহায় প্রজাপুঞ্জের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল কৃতজ্ঞ জাতির ইতিহাসে চিরকাল তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

'নীলদর্পণ' বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইহা যে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার তুলনা অন্য কোথাও আমরা দেখি নাই। নীলকর-অত্যাচারে পীড়িত হইয়া যখন নিরুপায় জনসাধারণ দুঃখের অন্ধকারে তাহাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল তখন

'নীলদর্পণ' তাহাদের সম্মুখে অগ্নিবর্তিকা জ্বালিয়া ধরিল। সেই অগ্নিতে সেদিন জনগণের প্রথম দীক্ষা হইয়া গেল, সেই অগ্নি ছড়াইয়া পড়িল দেশের প্রান্ত ও প্রান্তরে। অত্যাচারের লেলিহ জিহ্বা মুহূর্তকালের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, 'নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে তাহার অভিনয়। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহা উদ্দীপনার ফল স্বরূপ নীলকরের অত্যাচার জন্মের মত বঙ্গদেশ হইতে বিদায় লইল। 'নীলদর্পণে' যে বিদ্রোহ-বাণী ধ্বনিত হইল তাহার প্রভাব সাময়িক কালেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, তাহা দুঃখ-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে নিত্যকালের প্রতিবাদ। সেজন্য তাঁহার রক্ত-আখরে চিরকালীন শোষিত, মুক্তিকামী জনগণের জীবনবেদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাটকখানি নিষ্ঠুর নিরবচ্ছিন্ন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া সত্যপ্রিয় সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই ইহার প্রকৃত মর্যাদা দিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড লং, সিটনকার প্রভৃতি সদাশয় ব্যক্তি ইংরাজ হইয়াও এই পুস্তকের প্রচার-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে বুঝা যায় নাটকখানির সমাদর কত বহুধা-বিস্তৃত হইয়াছিল।

'নীলদর্পণ' বঙ্গসাহিত্যের বাস্তবতার পথনির্দেশ করিয়াছিল। লেখকের দৃষ্টি এই সর্বপ্রথম আদর্শের নন্দন-কানন হইতে বিদায় লইয়া বাস্তবতার কঠিন মৃত্তিকায় সঞ্চরণ সুরু করিয়াছে, ধনীর বিলাস-হর্ম্যের মায়া কাটাইয়া দরিদ্রের কারুণ্য-কুটীরে প্রকৃত সত্য সন্ধান করিয়া পাইয়াছে। তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী ও ক্ষেত্রমণিও তাহাদের দুঃখবেদনা শুনাইবার দরদী শ্রোতা পাইয়াছে। আজ বাংলা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রের প্রতি যে সুস্পষ্ট প্রবণতা দেখা দিয়াছে তাহার সূচনা একশত বৎসর পূর্বে লিখিত এই অবিস্মরণীয় নাটকের আজিকার সাহিত্যিকদের এবিষয়ে সচেতন হইবার প্রয়োজন আছে।

'নীলদর্পণ' পরবর্তী সামাজিক নাট্যধারাকে যে অনেকাংশে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'নীলদর্পণে'র কাহিনীর মূলকেন্দ্র হইল সুখে শান্তিতে অবস্থিত একটি একান্নবর্তী বাঙালী পরিবার, প্রতিকূল অবস্থার নিষ্ঠুর আবর্তনে যাহা সর্বনাশের অতলতলে ডুবিয়া যায়। এই ধরণের কাহিনী পরবর্তী বহু সামাজিক নাটকে আলোচিত হইয়াছে। করুণরসাত্মক নাটকের আদর্শ রূপেও 'নীলদর্পণ' পরবর্তী নাট্যসাহিত্যে বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের বিষাদান্ত সামাজিক নাটকে 'নীলদর্পণে'র প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। মৃত্যুদৃশ্যের আধিক্য, করুণরসের আতিশয্য, প্রতিবাদহীন দুঃখভোগ প্রভৃতি যে যে করুণরসাত্মক লক্ষণ এই নাটকের মধ্যে বিদ্যমান সেগুলি বহুলাংশে 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' প্রভৃতি পরবর্তী প্রসিদ্ধ নাটকে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

নাট্যশালার ইতিহাসেও 'নীলদর্পণে'র মূল্য কম নয়। এই 'নীলদর্পণে'র অভিনয়ের মধ্য দিয়াই সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই নাটকের অভিনয় দেশের মধ্যে

এক অদৃষ্টপূর্ব উদ্দীপনা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির দৃষ্টি ও সহানুভূতি রঙ্গালয়ের প্রতি জাগরূক করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং রঙ্গালয়ের গৌরব ও জনপ্রিয়তার মূলে এই অসাধারণ নাটকখানির অবদান যে অনেকখানি তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বহু পুরাতন জনপ্রিয় নাটক বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিকার দিনেও যে নূতন করিয়া 'নীলদর্পণে'র অভিনয়ের আয়োজন দেশের মধ্যে দেখা যাইতেছে, ইহাতে প্রমাণিত হয় সমসাময়িক কালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া নিত্যকালের সাহিত্য-দরবারে ইহার আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

গোলোক বসুর পরিবারকে কেন্দ্র করিয়াই নাটকের মূল কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মূল কাহিনীর সহিত সম্পৃক্ত আর একটি উপকাহিনী সাধুচরণের পরিবারকে অবলম্বন করিয়া নাটকের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই উভয় পরিবার একই অত্যাচারে সর্বস্ব হারাইয়া নিদারুণ শোকাবহ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রধান কাহিনী ও উপকাহিনীর মধ্যে নাটকীয় সাদৃশ্য অথবা Parallelism রহিয়াছে। এই দুইটি কাহিনীর চরিত্রগুলির সহিত নীলকর সাহেবদের সংঘাত বাধিয়াছে এবং এই সংঘাতে সহায়তা করিয়াছে গোপীনাথ ও পদী ময়রাণী। 'নীলদর্পণে'র বিষয়বস্তুর মধ্যে এক দৃঢ় সংহতি ও অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, অপ্রাসংগিক দৃশ্য ও অবান্তর চরিত্রের অনুচিত অবতারণা দ্বারা ইহার ঘটনাপ্রবাহ কোথাও তির্যক কি তরল করা হয় নাই। স্বল্পকালের পরিসরের মধ্যে নাটকের বিষয়বস্তু সীমায়িত হওয়ার ফলে ইহার মধ্যে এক ঘন-গম্ভীর ভাবচেতনা প্রাণময় রূপ লাভ করিয়াছে। অনেকগুলি দৃশ্যের মধ্যে উত্তেজনামূলক চমকপ্রদ ঘটনার সন্নিবেশ করিয়া নাট্যকার তাঁহার কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট গতিবেগ ও চমৎকারিত্ব সঞ্চার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেগুনবেড়ের কুটির গুদাম ঘরে রাইয়তদের দুঃখভোগ, ক্ষেত্রমণির লাঞ্ছনা এবং নবীনমাধব ও তোরাপের দ্বারা তাহার উদ্ধার প্রভৃতি দৃশ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেবল যেখানে যেখানে আদিরসাত্মক ও করুণরসাত্মক দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছে সে সব জায়গায় কাহিনীর গতি মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। নাট্যকারের সহানুভূতি ও আত্মময়তা যেখানে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে সেখানেই তাঁহার আর্ট দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এক ধনী গৃহস্থ পরিবার ও আর এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের সহিত দুর্বৃত্ত নীলকরদের সংঘর্ষের সূচনাতে নাটকের আরম্ভ এবং সেই সংঘর্ষের শোচনীয় পরিণতিকে নাটকের উপসংহার। প্রথম অংকে সংঘর্ষের আভাস—গোলক বসু চিন্তিত, সাধুচরণ বিব্রত, তাহাদের সুখী পরিবার আসন্ন দুর্যোগের কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন। দ্বিতীয় অংকে সংঘর্ষের সূচনা—গোলোক বসুকে কারাবদ্ধ করিবার জন্য নীলকরদের গোপন ষড়যন্ত্র। তৃতীয় অংকে সংঘর্ষের চূড়ান্ত অবস্থা—প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নবীনমাধব নীলকরদের সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত গোলোক বসুর কারাবাস, ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগ সাহেবের অত্যাচার। চতুর্থ অংকে সংঘর্ষের করুণ পরিণতি—গোলোক বসুর আত্মহত্যা, সর্বনাশের

মুখে গোলোক বসুর পরিবার। পঞ্চম অংকে সর্বনাশের গর্ভে গোলোক ও সাধুর পরিবার, সর্বগ্রাসী দুর্ভাগ্যের অতি নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু সম্বন্ধে তাঁহার অনবদ্য সমালোচনার মধ্যে বলিয়াছেন যে, সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি—এই দুইটি গুণের ফলে তাঁহার অংকিত চরিত্রগুলি এত বাস্তব ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি অনেকাংশে সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার সহিত আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। শুধু কেবল অভিজ্ঞতা নহে, সহানুভূতি নহে, চরিত্রসৃষ্টির বিশিষ্ট কলাকৌশল অবলম্বন না করিলে কোন চরিত্রই যথার্থভাবে রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠিতে পারে না। এই কলাকৌশলের একদিকে সংযম আর একদিকে আবেগ। নাটকীয় চরিত্রের ভাব ও আচরণ যেমন একটি পরিমিত স্বাভাবিকতার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিতে হয় তেমনি আবার আবেগ ও দ্বন্দ্ব সঞ্চার করিয়া তাহাকে প্রাণচঞ্চল করিয়া তুলিতে হয়। 'নীলদর্পণ' নাটকের কোন কোন চরিত্র যে সরল ও জীবন্ত হইয়াছে আবার কোন কোন চরিত্র যে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে তাহার মূলেও রহিয়াছে এই কলাকৌশলের সার্থকতা ও ব্যর্থতা। তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী, গোপীনাথ প্রভৃতি চরিত্র যে এত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ,—তাহাদের হৃদয়বৃত্তি যেমন প্রবলরূপে দেখান হইয়াছে, তেমনি আবার তাহাদের ভাষা ও ভঙ্গি অতি স্বাভাবিকরূপে চিত্রিত হইয়াছে। নীলমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা প্রভৃতি চরিত্র যে নির্জীব ও নীরস হইয়াছে তাহার কারণ দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতার অভাব নহে, সহানুভূতির স্বল্পতাও নহে। তাহাদের চরিত্র বেশি ভালো বানাইতে যাইয়াই নাট্যকার তাহাদিগকে মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাদের মুখের ভাষার তোড়ে হৃদয়ের ভাষা ভাসিয়া গিয়াছে, হৃদয়বৃত্তির কোন প্রবল সংঘাত তাহাদের মধ্যে নাই, ক্রিয়া অপেক্ষা কথাদ্বারাই তাহারা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছে। এই সব কারণেই তাহাদের চরিত্র সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই। সংলাপের শুধু দীর্ঘতা নহে, ইহার অসংগত অস্বাভাবিকতার ফলেও ভদ্র ও উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলি এরূপ প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। নাটকের চরিত্র প্রাণ লাভ করে তাহার সংলাপ হইতে, সেই সংলাপ যেখানে অবাস্তর সেখানে চরিত্র কখনো বাস্তব হইতে পারে না। প্রণয়ে কিংবা প্রলাপে তাহারা যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছে তাহা তাহাদের হৃদয় হইতে উৎসারিত হয় নাই, তাহা আহৃত হইয়াছে সংস্কৃত নাটক হইতে। সেজন্য তাহাদের কথা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে না, তাহাদের মূর্তিও আমাদের অন্তরে রেখাপাত করে না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বিকৃতমস্তিষ্কা মাতার হাতে নিজের স্ত্রীর মৃত্যু দেখিয়া বিন্দুমাধব বলিতেছে, 'আহা! মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কি সুখপ্রদ। মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা প্রস্তর প্রাচীরে বেষ্টিত; শোকশার্দূল আক্রমণ করিতে অক্ষম।' বিন্দুমাধবের এই কথাগুলি নিদারুণ শোকাবহ অবস্থাতেও যে আমাদের অন্তর নাড়া দেয় না তাহার কারণ নিতান্ত কৃত্রিম সংস্কৃতগন্ধী ভাষা ছাড়া আর কিছুই নহে, খাঁটি বাংলা

ভাষায় ব্যক্ত হইলে কথাগুলি আমাদের চিত্তে অন্যরকম প্রতিক্রিয়া উদ্রেক করিত। সুস্থ ও সভ্যশ্রেণীর ভাষার এই কৃত্রিমতার কারণ সম্ভবত এই যে, দীনবন্ধু তৎকালীন প্রচলিত ভাষাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। ডাঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের মত প্রণিধান-যোগ্য 'মনে হয়, সাধুভাষার সম্বন্ধে দীনবন্ধু প্রচলিত প্রথা ও কালের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তৎকালীন হাস্যরসাত্মক প্রহসন ও গম্ভীর রসাত্মক নাটকের ভাষা সম্পূর্ণ দুই রকম ছিল। প্রহসনের ভাষা যেমন সচল ও স্বাভাবিক নাটকের ভাষা তেমনি অচল ও অস্বাভাবিক ছিল। রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' অথবা 'উভয়-সঙ্কটে'র ভাষার সহিত 'নবনাটকে'র ভাষার প্রভেদ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। দীনবন্ধুব 'সধবার একাদশী' অথবা 'জামাই বারিকের' সহিত 'লীলাবতী' অথবা নবীন তপস্বিনীর তুলনা করিলেও ভাষার গুণে তাঁহার প্রহসনের চরিত্রগুলি কত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে। নাটকের মধ্যেও তিনি যেখানে লঘু হাস্যরসের অবতারণার সুযোগ পাইয়াছেন সেখানেই নাটকীয় চরিত্রগুলিকে প্রাণরসের প্রতিমূর্তি করিয়া তুলিয়াছেন; নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ, জলধর, জগদম্বা প্রভৃতি চরিত্র এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'নীলদর্পণে'ও প্রধানত এই ভাষার একান্ত সজীব স্বাভাবিকতার জন্য আদুরী, গোপীনাথ, তোরাপ, রাইচরণ, পদী, রোগ, উড ও রাইয়তগণের চরিত্র এত সরস হইয়াছে। পক্ষান্তরে নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা প্রভৃতি চরিত্র, নিতান্ত নীরস হইয়া পড়িয়াছে। নবীনমাধব নাটকের নায়ক। এই উদার, নির্ভীক ও মহাপ্রাণযুক্ত যুবক দুর্দান্ত নীলকর সাহেবদের সহিত কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত। সুতরাং তাহার চরিত্রের মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল, সুঅংকিত হইলে ইহা আমাদের মনে অবিস্মরণীয় প্রভাব মুদ্রিত করিতে পারিত, কিন্তু এই ভাষার কৃত্রিম কাঠিন্যের জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। সৈরিন্ধ্রীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবার সময় অথবা নীলকর সাহেবদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবার অবস্থায় তাঁহার ভাষার আড়ম্বরে অন্তরের কোন প্রবল আবেগ ও প্রবৃত্তি পরিস্ফুট হইতে দেয় নাই।

নীলদর্পণে দরিদ্র কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি অদ্ভুত কৃতিত্বের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে তোরাপ ও রাইচরণের মত কৃষক এবং আদুরীর মত ঝি আর কোথাও অঙ্কিত হইয়াছে কিনা জানি না। শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্যের সর্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু তাহাদের প্রাণের বন্ধু হইয়া নিজেকে তাহাদের মধ্যে মিশাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের উন্মুক্ত অমার্জিত জীবনের প্রতিটি ছন্দ ও ভঙ্গি তিনি হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন। তোরাপ সহায়সম্বলহীন দরিদ্র কৃষক কিন্তু দুর্দান্ত অত্যাচারের গোপনতা নাই, জীবন সম্বন্ধে একেবারেই কোন পরোয়া নাই। সুনিশ্চিত বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে একবার ক্ষেত্রমণি ও আর একবার নবীনমাধব উদ্ধার করিয়াছে। তাহার হাত গিয়াছে কিন্তু দাঁতের দ্বারা সে প্রতিশোধ লইয়াছে। নবীনমাধবের ন্যায় সে শিক্ষিত ও উদার নহে, ক্ষমার মহিমা সে জানে না, আবেদনের কোন মূল্য তাহার কাছে নাই, সে সেই আদিম আইনে বিশ্বাসী—

দাঁতের বদলে দাঁত আর চোখের বদলে চোখ। কিন্তু তাহার এই ক্রুদ্ধ হিংস্র প্রতিহিংসার নীচেয় রহিয়াছে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যধর্ম—নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, অকৃত্রিম প্রভুভক্তি আর স্নেহসিক্ত মনুষ্যপ্রীতি। সাধুচরণ ও রাইচরণ এই দুই ভাইয়ের মধ্যে রাইচরণের চরিত্রই অধিকতর সজীব হইয়াছে। তাহার কারণ সাধুচরণ একটু হিসাবী, সাবধানী, সহিষ্ণু ও আপোষপন্থী—তাহার কথাবার্তা একটু আড়ষ্ট ও ভদ্রঘেঁসা, কিন্তু রাইচরণ খাঁটি চাষা—গোঁয়ার, বেপরোয়া ও চিন্তাভাবনাহীন। তাহার পেটের জ্বালার কাছে বিষয়ের চিন্তা তুচ্ছ, পদীময়রাণী মেয়েলোক হইলেও দামঠাসা করিতে তাহার দ্বিধা নাই। আদুরী-চরিত্র নাট্যকারের আর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। আদুরী ঝি হইলেও নাটকের মধ্যে সে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং নাটকের বিষাদ-ঘন পরিবেশের মধ্যে সে এক সরস কৌতুকের ধারা সঞ্চার করিয়াছে। নাটকের স্ত্রী-মহল জমাইয়া রাখিয়াছে সে—তাহার রসাল ছড়া আর শাঁসাল মন্তব্যের মধ্য দিয়া। সে সব বিষয়েই ওয়াকিবহাল, সব ব্যাপারে সে একটি মত প্রকাশ করিয়া ছাড়িবে। নাড়ের বিয়ে দেয় যে সাগর সে যে তাহার দলে নয়, দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়িলে সে যে কখনই সাহেবের কাছে যাইবে না, কুটির বিবির মাচের টক সাহেবের সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়া যে সে মোটেই সমর্থন করে না—ইত্যাকার বিবিধ মন্তব্য দ্বারা সে সকলের মাঝে নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করিয়া বসে। কিন্তু আদুরীর আর একটি দিক আছে—প্রভুপরিবারের সকলের সহিত তাহার হৃদয়ের যোগ, তাহাদের দুঃখ বেদনার সহিত তাহার একান্ত একাত্মতা।

দীনবন্ধুর সহানুভূতি আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি-শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন।" এই সর্বব্যাপী সহানুভূতির ফলেই তিনি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক—শেক্‌স্‌পীয়ার, ডিকেন্স ও শরৎচন্দ্রের সহিত একই পংক্তিতে তিনি অধিষ্ঠিত। পুণ্যবানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা আছে কিন্তু পাপীর প্রতিও তাঁহার ঘৃণা নাই। সেজন্য গোপীনাথ ও পদীময়রাণীর চরিত্রও তিনি সহানুভূতির সহিত বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গোপীনাথ নীলকরের পদলেহী, নীচ স্বার্থপর ভৃত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে এমন একটি বেদনাকরুণ, আত্মসচেতন ধিক্কারবোধ আছে যাহাতে তাহার প্রতি আমরা একপ্রকার অনির্দেশ্য সমবেদনা বোধ করিয়া থাকি। শেক্‌স্‌পীয়ারের ফলস্টাফ-চরিত্রের ন্যায় দীনবন্ধু একটি নীচ ঘৃণ্য চরিত্রকে সরস-রহস্যপ্রিয় উপভোগ্য চরিত্রে পরিণত করিয়াছেন। পদী ময়রাণীও একটি নষ্টচরিত্রা কুটনী হইয়াও যে একেবারে নির্লজ্জ হৃদয়হীন হইয়া পড়ে নাই নাট্যকার তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। সকলের ঘৃণা ও পরিহাস কুড়াইয়া সে নিজের কলঙ্কিত মুখটি সমাজের দৃষ্টি হইতে আবৃত করিয়াই রাখিতে চাহে। নবীনমাধবকে দেখিয়া সে লজ্জায় ধিক্কারে বলিয়াছে, 'ও মা, কি বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম। ক্ষেত্রমণিকে সে রোগ সাহেবের কাছে ভুলাইয়া আনিয়াছে বটে কিন্তু এই নরপিশাচের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেও সে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। তাহার নিজের কাজের প্রতি নিজেরই ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। সে নিজেই

বলিয়াছে, 'আমার কি সাধ, কচি কচি মেয়ে সাহেবেরে ধরে আপন পায় আপনি কুড়ুল মারি?……আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়। উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই?'

'নীলদর্পণ' নীলকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করিবার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া রচিত। এই উদ্দেশ্য নাট্যকার প্রচ্ছন্ন রাখিতে চাহেন নাই। নাটকের ভূমিকায় এবং নাটকীয় চরিত্রের কথায় অত্যাচার-পীড়িত কৃষকদের দরদী মুখপাত্র নিজেকে দ্ব্যর্থ-হীন-ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। এই কারণে নাটকের শিল্প ও রসপরিণতিও একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্যচেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। নিরুপায় কৃষককুলের নিদারুণ সমস্যাটি সকলের হৃদয়ের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই নাট্যকার তাঁহার নাটকে সর্বব্যাপী করুণ রসের প্রবাহ ঢালিয়া দিয়াছেন। 'নীলদর্পণ' করুণ রসাত্মক নাটক সন্দেহ নাই এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী ইহার মধ্যে ভাব, বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাব সব কিছুই দেখান যাইতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র করুণ রসাত্মক বলিয়া 'নীলদর্পণে'র বিচার শেষ করা চলে না। 'নীলদর্পণ' পাশ্চাত্য প্রভাবাশ্রিত পঞ্চাঙ্ক নাটক, সুতরাং পাশ্চাত্য নাট্যলক্ষণ অনুসরণ করিয়া ইহা বিষাদান্তক হইলেও যথার্থ ট্র্যাজেডি হইয়াছে কিনা সেই বিচার অবশ্যই সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়। নাটক বিষাদান্তক হইলেই ট্র্যাজেডি হয় না। যে বিষাদ শুধু কেবল বাহ্য ঘটনা ও শক্তি দ্বারা উদ্দীপিত, যে বিষাদ চরিত্রের কোন দুর্বার চিত্তবৃত্তি অথবা দুর্লঙ্ঘ্য আচরণ দ্বারা উদ্রিক্ত হয় নাই তাহা ট্র্যাজেডির অন্তর্ভুক্ত নহে। মানুষ নিষ্ঠুর ভাগ্যের সহিত দুর্দান্ত সংগ্রাম করিয়া যখন পরাজিত, সে তাহারই দ্বিধাবিভক্ত অন্তরের নিদারুণ দ্বন্দ্বে যখন ক্ষতবিক্ষত তখনই তো তাহার ট্র্যাজেডি। কিন্তু সেই ট্র্যাজেডি 'নীলদর্পণে' নাই। এই নাটকে দুঃখ আছে, আঘাত আছে কিন্তু সেই দুঃখ ও আঘাতের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিরোধ কোথায়? নিছক দুঃখভোগের মধ্যে ট্র্যাজেডি নাই, বিরুদ্ধ শক্তির কাছে নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের মধ্যেও কোন ট্র্যাজিক মহিমা নাই। অ্যারিস্টোটল বলিয়াছেন, 'Tragedy is an imitation of action and primarily on that account, of persons acting'। কিন্তু 'নীলদর্পণে'র বিয়োগান্তক চরিত্রগুলির মধ্যে এই সচল, সক্রিয় ভাব আমরা দেখি না। স্বরপুর-বৃকোদর নবীনমাধবের বলবীর্যের কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু ক্ষেত্রমণির উদ্ধার দৃশ্য ব্যতীত আর কোথাও তাহার সাক্ষাৎ পাই নাই। অ্যারিস্টোটল আর একটি অতি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন—'Now, persons possess certain qualities in virtue of their characters, but are happy or the reverse in virtue of their actions। কিন্তু নাটকে গোলোক, নবীনমাধব, সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতির করুণ পরিণতি তাহাদের কোন আচরিত কর্মের ফলে হয় নাই। তাহারা বাহিরের নিষ্ঠুর অত্যাচারে নীরব আত্মাহুতি দিল। ইহা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কিন্তু এই দুঃখ বিশ্ববিধানের কোন নিগূঢ়, অনির্দেশ্য রহস্যবেদনা আমাদের মনে জাগ্রত করে না। ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় বলিয়াছেন, 'প্রাচীন গ্রীক নাটকের অন্তর্গত যে ট্র্যাজেডি

পরিকল্পনা তাহার সহিত নীলদর্পণের করুণ ভাবের সাদৃশ্য আছে।' কিন্তু তাহাও বোধ হয় ঠিক নহে। গ্রীক নাটকে যে মারাত্মক ভ্রান্তির ফলে ট্র্যাজেডি অনিবার্য হইয়া উঠে সেই রকম কোন ভ্রান্তিও এই নাটকে নাই। এখানে দুঃখের কোন কারণ, কোন দায়িত্ব নাটকীয় চরিত্রের মধ্যে নিহিত নাই; সেজন্য এই দুঃখ তাহাকে করুণ করিয়াছে কিন্তু জীবন্ত করিতে পারে নাই। নাটকের মধ্যে যে সর্বব্যাপী বিষাদময়তা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাও অতিকথন ও আতিশয্য-দোষে সংহত-গম্ভীর রূপ হারাইয়া যেন ফেন-তরল রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। দুঃখের রুদ্রজ্বালার তপ্ত নিশ্বাসে অশ্রুবাষ্প শুকাইয়া যায়, বাক্যপ্রবাহ সেখানে নিরুদ্ধ হইয়া এক নির্বাক অন্তর্বেদনায় গুমরিয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু এই নাটকে অশ্রুর নির্ঝর ছুটিয়াছে, বাক্যের বন্যা বহিয়াছে, দুঃখের জ্বালা-বেদনা ইহাতে সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছে। ইহাতে মৃত্যুর অসঙ্গত আতিশয্য দেখিয়া মৃত্যুর ভয়াবহতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা মুছিয়া যায়। যেখানে মৃত্যু এত সুলভ, এত সহজ সেখানে মৃত্যু আমাদের মনে দুঃখ উদ্রেক করে না, আতঙ্কও সঞ্চার করে না। শ্মশান-দৃশ্যে মৃত্যুর শোভাযাত্রা দেখিয়া আমরা বিচলিত হই না, অথচ কোন কাল্পনিক নায়ক-নায়িকার মৃত্যুর সম্ভাবনায় আমরা কাঁদিয়া আকুল হই। এই নাটকেও মৃত্যু শুধু ঘটানো হইয়াছে মাত্র; ইহাকে শিল্পরসের অঙ্গীভূত করা হয় নাই। সেইজন্য ইহা আমাদের চোখের দৃষ্টিতে শেষ হইয়া যায়, মনের মর্ম পর্যন্ত আর পৌঁছিতে পারে না।

॥ নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩) ॥ এই নাটকখানির মধ্যে ঘটনার জটিলতা ও বৈচিত্র্য ইহার নাটকীয় গতি বৃদ্ধি করিয়াছে। দুইটি কাহিনী গ্রন্থের মধ্যে নাটকীয় রসকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। রমণীমোহন-তপস্বিনী-বিজয়-কামিনী উপাখ্যান প্রেম এবং বিচ্ছেদমূলক এবং জলধর-জগদম্বা-মল্লিকা-মালতী-বিনায়ক ঘটিত কাহিনী হাস্যরসাত্মক। নাটকের নাম হইতে মনে হয়, নবীন তপস্বিনী কামিনী এবং তাহার আখ্যানের উপরেই নাটকের গুরুত্ব নির্ভর করিতেছে। কিন্তু পাঠক ও দর্শকের কাছে যে অদ্ভুত কৌতুকজনক গৌণ বিষয়টিই অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও আদরণীয় তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। দীনবন্ধুর নাটকের অনেক স্থলে মধুসূদনের নাটকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, একথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। দীনবন্ধু সম্ভবত তাঁহার প্রতিভার ধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত নাটকের ন্যায় সুদীর্ঘ কাব্যরসাত্মক উক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রেমমূলক নাটক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'দীনবন্ধু ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটক নভেল পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে বাংলা কাব্যে বাংলার সমাজস্থিত নায়ক নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন'। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত নাটকের রাজা ও রাণীর ন্যায় অংকিত দীনবন্ধুর নাটকের পাত্র-পাত্রী কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হইবার সর্বপ্রধান কারণ এই যে, দীনবন্ধু ঐ সব চরিত্রের অনুকূল আবহাওয়া (atmosphere) সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। যে দূরত্ব ও মহিমোন্নত বিশিষ্টতা থাকিলে দর্শক ও পাঠক কল্পনা-নয়নে ইহাদের

কাহিনী স্বাভাবিক মনে করিত, তাহার অভাবে এই সব পাত্রপাত্রী নিতান্ত ঘরোয়া ও আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে। রাজার বয়স্য মাধব, সভাসদ ও পণ্ডিতবর্গ, জলধর ও বিনায়ক, সুরমা ইহাদের চরিত্র একান্তই আমাদের সচরাচর দৃষ্ট আধুনিক চরিত্র। সুতরাং এই রকম আধুনিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে বিজয় ও কামিনীর প্রেম এবং অভিজ্ঞান দর্শনে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার ন্যায় এই নাটকে রাজা ও রাণীর মিলন ব্যাপার বেমানান ও অসংগত হইয়াছে। প্রেমে দোষ নাই, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র-নিন্দিত courtship'ও আপত্তিজনক না হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া সুলম্বিত সংস্কৃত উক্তিসমূহ অত্যন্ত বিরক্তিজনক হইয়াছে। দীনবন্ধু মাইকেলকে অনুসরণ করিয়া মাঝে মাঝে অমিত্র-ছন্দে কবিতা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত আড়ষ্ট ও বৈচিত্র্যহীন হইয়াছে। নাটকের প্রধান কাহিনীর পাশে যে সরস, কৌতুকোজ্জ্বল ও রহস্যপূর্ণ উপাখ্যানটী রহিয়াছে তাহার রসোচ্ছ্বসিত সংঘাতে প্রেম, মিলন, বিরহ প্রভৃতি করুণ ও আদিরসাত্মক বিষয়গুলি নিতান্ত ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে।

জলধর-জগদম্বা-মল্লিকা-মালতীর কাহিনীটি শেক্‌স্‌পীয়ারের "Merry Wives of Windsor' নাটক অবলম্বনে রচিত ইহাতে সন্দেহের কারণ নাই। উভয় কাহিনীর মধ্যে ঘটনা এবং চরিত্রগত বিলক্ষণ সাদৃশ্য বিদ্যমান। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকেও আছে যে সার জন ফলস্টাফ মিসেস পেজের কাছে প্রেমপত্র পাঠাইয়া তাহাদের প্রেম সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রণয়-প্রাবল্যের জন্য নোংরা বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা আবৃত হইয়া কর্দমাক্ত জলে পতিত হন, দ্বিতীয়বার ফোর্ডের হাতে প্রহৃত হন, অবশেষে নকল পরীদের খোঁচায় বিব্রত হন। জলধরও দুইবার শাস্তি পায়, এবং তাহার শাস্তিও ফলস্টাফের অনুরূপ। তবে জগদম্বা চরিত্রটী মৌলিক, এবং এই দুই 'দেবাদেবী'র মধ্যে যে লড়াই ও পাল্‌টাপাল্‌টি চলিয়াছে তাহাতে কাহিনীটি আরো বেশী সরস হইয়াছে। মল্লিকা ও মালতী যথাক্রমে মিসেস পেজ ও মিসেস ফোর্ডের ন্যায় রঙ্গরসময়ী স্ত্রী ( merry wives ), এবং তাহাদের সুচতুর বুদ্ধি, witty কথাবার্তা ও রংগরসপ্রিয়তা বিশেষ উপভোগ্য। তবে বাঙালী ললনার পক্ষে লজ্জাশীলতা বর্জ্জন করিয়া এভাবে একজন পুরুষের সহিত সাহসিক রসিকতা করা একটু অস্বাভাবিক হইয়াছে। 'Merry Wives'এর মধ্যে ঈর্ষাপীড়িত স্বামী ফোর্ড যেমন ঠকিয়াছে, দীনবন্ধুর নাটকেও তেমনি রতিকান্ত মালতীর সতীত্বে সন্দেহ করিয়া বেয়াকুব বনিয়াছে। শেক্‌স্‌পীয়ারের প্রহসনখানিতে আগাগোড়া কৌতুকরসের উচ্ছল স্রোত প্রবহমান। মিস্ অ্যানি পেজের প্রণয়ার্থীদের মধ্যে যে কৌতুকাবহ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা মূল কাহিনীর সহিত সুকৌশলে লগ্ন হইয়াছে, কিন্তু 'নবীন তপস্বিনী'র দুইটী উপাখ্যানের মধ্যে কোনো দৃঢ়-সংলগ্ন যোগ নাই, একটা কাহিনী অপরটীর উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠে নাই, এবং ফলে নাটকের ঐক্য ( unity ) নষ্ট হইয়াছে। নাটকখানির নাম 'নবীন তপস্বিনী' হইলেও তপস্বিনী কামিনীর চরিত্র মোটেই উল্লেখযোগ্য নহে। যে রকম তুচ্ছ কারণ দেখাইয়া কামিনী ও বিজয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার এবং

পারস্পরিক আকর্ষণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত দুর্বল ও অবিশ্বাস্য বোধ হয়। বড় রাণীর প্রতি রাজার বিদ্বেষ ও সন্দেহ পরোক্ষভাবে দর্শকদিগকে জ্ঞাপিত করা হইয়াছে, নাটকের মধ্যে প্রদর্শিত হয় নাই, সেজন্য রাজার অনুতাপদগ্ধ বিলাপ আমাদের কাছে অনর্থক এবং আবেদনহীন, রাজা ও রাণীর পুনরায় মিলনও আমাদের আনন্দ উদ্রেক করে না। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে ঘটকগণের পাত্রী বর্ণনার মধ্যে নাট্যকার বিভিন্ন স্থানের ব্যাপক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

॥ লীলাবতী (১৮৬৭) ॥ 'লীলাবতী' নাট্যকারের পরিণত লেখনীর রচনা। দীনবন্ধু উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—'অপরিমিত আয়াসসহকারে 'লীলাবতী'নাটক প্রকটন করিয়াছি।' বিষয়বস্তুর রহস্যঘনতায় এই আয়াসের পরিচয় পাওয়া যায় বটে। বস্তুত তাঁহার সমস্ত নাটকের মধ্যে 'লীলাবতী'ই ঘটনার সংঘাত ও আকস্মিকতা দ্বারা দর্শকের মনকে সর্বাপেক্ষা বেশি আগ্রহ-চঞ্চল করিয়া রাখিতে পারে। নাটকের শেষদিকে কাহিনী অত্যন্ত গতিমান হইয়া উঠিয়াছে। অরবিন্দ, যোগজীবন, চাঁপা ও তারার পরিচয়ের রহস্যশীলতা আমাদের মনকে নিতান্ত কৌতূহলী ও বিপর্যস্ত করে। ইহাদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যে বিশ্বাস গড়িয়া ওঠে বার বার তাহা সজোরে নাড়িয়া দিয়া নাট্যকার আমাদের সহিত যথেষ্ট কৌতুক করিয়াছেন। যোগজীবনকে প্রথমে একজন তপস্বী, পরে অরবিন্দ, তারপরে একজন ভণ্ড সন্ন্যাসী এবং অবাশষে একজন 'আউরাৎ' বুঝিতে পারিয়া ইন্‌স্পেক্টারের মত দর্শকেরও বলিতে ইচ্ছা হয়—'আমি বড় হয়রান হয়েছে'। অবশ্য নাট্যকার ক্ষীরোদবাসিনীর সতীত্বের প্রশ্ন নিরসন করিয়া দিবার জন্যই যোগজীবনকে চাঁপারূপে পরিণত করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই রকম একজন করিতকর্মা সন্ন্যাসী যে প্রকৃত একজন স্ত্রীলোক—ইহা আমাদের বিশ্বাসকে আঘাত করে। চরিত্রের সবল সংঘর্ষও 'লীলাবতী'কে বিশেষ নাটকীয় রসসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। লীলাবতীর বিবাহ নির্ণয় এবং ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে একদিকে হরবিলাস, ভোলানাথ এবং নদেরচাঁদ এবং অন্য দিকে শ্রীনাথ, সিদ্ধেশ্বর এবং ললিতমোহন দুই প্রবল প্রতিপক্ষের সৃষ্টি করিয়াছে। ললিত এবং লীলাবতীর একাগ্র অনুরাগ বাধাপ্রাপ্ত এবং বিঘ্নগ্রস্ত হওয়াতে পাঠক ও দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। অবশ্য কাহিনীর চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও ইহার মধ্যে দুর্বল অংশও আছে। অরবিন্দের নিরুদ্দেশ এবং তাঁহার পুনরাগমন দর্শকের কাছে আগ্রহোদ্দীপক নয়। অরবিন্দ যদি প্রকৃতই কোনো অন্যায় করিত, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্তের সার্থকতা থাকিত। কিন্তু সামান্য ভুল এবং লোকাপবাদের জন্যই সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া তপশ্চর্যায় নিরত হইল। তাহার নিরুদ্দেশে ক্ষীরোদবাসিনীর মর্মান্তিক বিলাপ এবং প্রত্যাগমনে সকলের আনন্দোল্লাস দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় যে, এতো সবের কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু একথা সত্য বটে যে অরবিন্দের নিরুদ্দেশের জন্য নাটকের বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্ব যথেষ্ট বাড়িয়াছে।

'লীলাবতী-প্রেম এবং প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাতমূলক নাটক। কিন্তু দীনবন্ধু কোনো

নাটকেই আদিরস বর্ণনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন নাই, এবং এই নাটকেও তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থকাম হইয়াছেন। ললিত এবং লীলাবতীর প্রেমের দৃশ্য আমাদের মনে আনন্দের পরিবর্তে ভীতির সঞ্চারই করে। নাটকখানি প্রকাশিত হওয়ার পর যখন অভিনীত হয় তখনও দর্শকগণ ললিত এবং লীলার প্রেমপূর্ণ কথোপকথনে নিতান্ত বিরক্ত হইত। ইহার কারণ বিশ্লেষণে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' যে অতি উৎকৃষ্ট সমালোচনা করেন আমরা তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।১

দীনবন্ধু অনেক নাটকেই সামাজিক কুপ্রথা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই নাটকেও তিনি কৌলীন্যপ্রথার অনিষ্টকারিতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তখনকার সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে তাঁহার সাগ্রহ সমর্থন ছিল। 'লীলাবতী'তেও ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি যাহাদিগকে সমর্থন ও প্রশংসা করিতেন, যাহাদিগের মহত্ত্ব বহুতর সুদীর্ঘ উক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিতেন তাহারা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না। শালীনতা, সদাচার সতীত্ব প্রভৃতি মহৎ মহৎ গুণগুলি দ্বারা তিনি কয়েকটি চরিত্রকে কেবল ভারগ্রস্ত করিয়াছেন, স্বাভাবিক করিতে পারেন নাই। নায়ক ললিত, সুশীল সুবোধ ও সদাচারী বটে, কিন্তু বিশেষত্ব-বর্জিত এবং প্রভাবহীন। নায়িকা লীলাবতীর চরিত্রও আড়ষ্ট ও আবেদনহীন। দীনবন্ধু শিক্ষিতা ব্রাহ্মভাবাপন্না স্ত্রী চরিত্র আঁকিতে যাইয়া আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন। লীলার মিলনানন্দ ও বিরহ-বেদনা—দুইটীই সমানভাবে বিরক্তিকর। সংস্কারনিষ্ঠ, পুত্রবিচ্ছেদকাতর, কন্যাবৎসল পিতা হরবিলাসের চরিত্র দর্শকের মনের পরে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এই ধরণের দৃঢ়চেতা অথচ প্রাচীনপন্থী, দ্বন্দ্বপূর্ণ চরিত্র

১।...'লীলাবতী নাটকের উৎকৃষ্ট অংশ ললিত ও লীলাবতীর প্রেমালাপ, সেই সময় শ্রোতৃবর্গ বিরক্তি প্রকাশ করেন কেন? আমরা ইহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করি। একখানি পাঠোপযোগী নাটক সাধারণতঃ অভিনয়োপযোগী হয় না। পাঠের সময় আমরা অনেক বিষয় ভুলিয়া যাই, অনেক স্থানে চিন্তা করিয়া অর্থ করিয়া অর্থ করিয়া লই। অনেক স্থলে একটী ভাবে নানা ভাবের উদয় হয় অভিনয়ের সময় আমরা প্রকৃত অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া জীবনের কার্য্যগুলি প্রত্যক্ষ দেখিতে আশা করি, সুতরাং সে সময় স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিলে আমরা সুখ বোধ করিতে পারি না, প্রত্যুত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি। এই জন্য প্রধান প্রধান লেখকদিগের নাটকও অভিনয়োপযোগী করিবার জন্য পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হয়। পাঠকালীন যাহাই হউক অভিনয়ের সময় দুই ব্যক্তির পদ্যে কথোপকথন এদেশীয়দের রুচিবিরুদ্ধ ও বিরক্তিজনক এই জন্য সেদিন ললিত ও লীলাবতীর প্রেমালাপের সময় অনেকে ইংরাজিতে 'প্রেমিকেরা প্রেমালাপে ক্ষান্ত হউন' বলিয়া বারম্বার চীৎকার করিয়াছিলেন। লীলাবতী রোগ বা বিরহ শয্যায় অচেতন হইয়া আছেন, তাঁহার মুখ দিয়া তখন কবিতাস্রোত বাহির হওয়া অস্বাভাবিক।

অমৃতবাজার পত্রিকা—১১ই জানুয়ারী, ১৮৭৩।

('বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস'—পৃঃ ১২৭ হইতে পুনরুদ্ধৃত।)

দীনবন্ধুর অন্য কোনো নাটকে দেখা যায় না। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি এই শ্রেণীর চরিত্র অনেক সৃজন করিয়াছেন, সুঅভিনয়ে উজ্জ্বল হইয়া অনেকগুলি চরিত্র দর্শকের মনে অমর হইয়া আছে।১ হরবিলাসের অনমনীয় দৃঢ়তা এবং কুলীন পাত্রে কন্যা সমর্পণ ও পোষ্যপুত্র গ্রহণে স্থির সংকল্পের জন্যই নাটকের অন্যান্য চরিত্র ক্রিয়াশীল এবং সংঘাতমূলক হইয়া উঠিয়াছে। হরবিলাসই সমস্ত ঘটনার শক্তিমান নিয়ন্ত্রী।

দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক এবং প্রহসনের ন্যায় এই নাটকেও যে চরিত্রগুলি নিন্দিত এবং ঘৃণিত তাহারাই পাঠক ও দর্শকের কৌতূহলী এবং আগ্রহসিক্ত দৃষ্টিকে অব্যাহতভাবে জাগাইয়া রাখে। আত্মীয় চিত্তের অজ্ঞাত সহানুভূতি যে গোপনে ইহাদের চরিত্র সরস মাধুর্যে গড়িয়া তুলিয়াছে, সম্ভবত স্বয়ং নাট্যকারও তাহা জানিতে পারেন নাই। মূর্খ, নির্বোধ, নেশাখোর নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদ কৌতুকরসে দর্শকের মন পূর্ণ করিয়া রাখে। পাত্রী দেখিতে যাইয়া নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদ যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও বাগ্মিতার পরিচয় দিয়াছে, তাহা যথেষ্ট কৌতুকপূর্ণ ও আনন্দদায়ক হইয়াছে। 'হরিণের শিং', 'দানেন ন ক্ষয়ং যাতি স্ত্রীরত্ন মহাধনং' ইত্যাদি কথা শিক্ষিত দর্শককে যথেষ্ট আমোদ দিতে পারে। নদেরচাঁদের ন্যায় অধঃপতিত, মূর্খ ও ধিক্কৃত চরিত্র আমাদের অবজ্ঞামিশ্রিত অনুকম্পার উদ্রেক করে। শ্রীনাথের witty ব্যঙ্গবিদ্রূপ নিমচাঁদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীনাথ নিজে মদ্যপায়ী, আড্ডাধারী—দোষ ও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা তাহার আছে। সেজন্য তাহার ব্যঙ্গ ও উপহাস অব্যর্থ ও চিরস্থায়ী। গোরু খেদাইতে সে গাছের মোটা ডাল বাছিয়া নেয়, পাতলা ছড়ি ব্যবহার করে না। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের তিরস্কার এবং উপদেশ শিরোধার্য বটে, কিন্তু মর্মস্পর্শী নহে।

॥ কমলে কামিনী (১৮৭৩) ॥ 'কমলেকামিনী' দীনবন্ধুর সর্বশেষ নাটক। দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকে রাজা, রাণী এবং ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত থাকিলেও প্রহসনের পরিচিত আবেষ্টনীর আঘাতে নাটকের গুরুত্ব তরল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই নাটকেই কেবলমাত্র পূর্বাপর ঐতিহাসিক চরিত্রোপযোগী গম্ভীর পরিবেশ রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু হাস্যরসলিপ্সু নাট্যকার জায়গায় জায়গায় তরল হাস্য পরিহাসের দ্বারা নাটকের রসে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছেন। দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকে হাস্যরসই প্রাণ, কিন্তু এই নাটকে হাস্যরস অনেক স্থলেই মূলরসের পরিপন্থী এবং বিরক্তিজনক হইয়াছে। ঐতিহাসিক কিম্বা বীররসাশ্রিত নাটক রচনার প্রতিভা দীনবন্ধুর ছিল না, সুতরাং নাটক হিসাবে এইখানাও ব্যর্থ ও অসার হইয়াছে।

১। হরবিলাসের ভূমিকায় 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটারে' শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী অবতীর্ণ হইয়া যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', পৃঃ ৯৭ দ্রষ্টব্য।

দীনবন্ধুর অনেকগুলি নাটকে জন্মবৃত্তান্ত এবং প্রকৃত পরিচয়ের গোলমাল দেখান হইয়াছে। এই নাটকেও শিখণ্ডিবাহনের জন্ম প্রথমে রহস্যাচ্ছন্ন, এবং পরিশেষে রহস্য উদ্‌ঘাটনে নাটকের সমাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু জন্ম-অপবাদের জন্য শিখণ্ডিবাহনের মনে কোন ক্ষোভ কিংবা দ্বন্দ্ব নাই, এবং তাহার চরিত্র বিকাশেও ইহা তেমন বাধা দিতে পারে নাই। ব্রহ্মরাজ প্রথমে জারজ বলিয়া তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে সামান্য আপত্তি করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু অবশেষে তাহার সৌন্দর্য ও বীর্য দর্শনে তাহাকে স্বীয় কন্যা এবং কাছাড় সিংহাসন প্রদান করিতে সম্মত হন। শিখণ্ডিবাহন এবং রণকল্যাণীর মিলনেও কোনো বাধা উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং নাটকের শেষদিকে ঘটা করিয়া শিখণ্ডিবাহনের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়া ঘটনার গতি বিশেষ পরিবর্তন করিতে পারা যায় নাই। 'কমলে-কামিনী' অভিনয়ের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী নাটক। শিখণ্ডিবাহন এবং রণকল্যাণীর প্রথম সাক্ষাৎকার-দৃশ্যটি রঙ্গমঞ্চে দেখান সম্ভব নহে। অশ্বারূঢ় শিখণ্ডিবাহন, প্রাসাদউপরিস্থ রণকল্যাণী, উপর হইতে নিম্নে মালা নিক্ষেপ ইত্যাদি ব্যাপার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন করা অসাধ্য। অশ্বপৃষ্ঠলগ্ন বক্কেশ্বরের হাস্যরসাত্মক দৃশ্যটীও প্রদর্শিতব্য নহে। নাটকের মধ্যে অবান্তর এবং বিরক্তিকর দৃশ্য যথেষ্ট আছে। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রণকল্যাণীর দিদিমাকে দিয়া স্থূল হাস্যরসের দৃশ্যটি নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে বক্কেশ্বর এবং পারিষদবর্গের যে নির্জলা ভাঁড়ামির চিত্রটী দেওয়া হইয়াছে, তাহাও দর্শকের ধৈর্যের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করে। নাটকের মধ্যে রামলীলার যে দৃশ্য দেখান হইয়াছে তাহা সংস্কৃত নাটকের মদনোৎসবকে স্মরণ করাইয়া দেয়। নাটকের স্ত্রী ভূমিকাগুলি পুরুষ চরিত্রগুলি অপেক্ষা অধিকতর জীবন্ত। বিশেষত রণকল্যাণীর প্রখরবুদ্ধি-শালিনী রঙ্গরসবতী সখী সুরবালার ক্রিয়াকলাপ এবং কথাবার্তা বিশেষ মনোহারী হইয়াছে।

———

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

### অপেরা বা গীতাভিনয়

বাঙালীর মন স্বভাবতই কোমল এবং ভাবপ্রবণ। সেজন্য তরল, উচ্ছ্বাসময় ভক্তিধারা তাহার অন্তরে যেমন সহজে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, এমন আর কিছুই পারে নাই। রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পরে পার্থিব ঘাতপ্রতিঘাতমূলক নাটক দেখিবার সুযোগ পাইলেও দর্শক-সাধারণ ধর্মমূলক, ভাবতরল যাত্রা দেখিতে অভিলাষী ছিল। নাটকের প্রচলন হইলেও সর্বত্র রঙ্গালয় স্থাপন করা সম্ভব এবং সাধ্য ছিল না। এই দুই কারণেই নাটকের মত লিখিত অথচ যাত্রার ন্যায় অভিনেতব্য এইরূপ একপ্রকার দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব হইল। ইহাকে অপেরা বা গীতাভিনয় বলা হইত। ইহার সম্বন্ধে পূর্বেও আলোচনা হইয়াছে। অপেরা লিখিয়া যাঁহারা খ্যাতিলাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে মনোমোহন শ্রেষ্ঠ। মনোমোহনের পরে তাঁহার অনুসরণে বহুতর অপেরালেখক তাঁহাদের নাটকের দ্বারা বাঙলা সাহিত্য-ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

### মনোমোহন বসু

#### ( ক ) গীতাভিনয়

মাইকেল এবং দীনবন্ধুর পরে বাংলা নাটক সাধারণত পাশ্চাত্য রীতিতে রচিত হইলেও প্রাচ্য রীতি একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায় নাই। মনোমোহন বসু ইঁহাদের পরবর্তী ( ১৮৩১—১৯১২ ) হইলেও, তিনি প্রাচ্য আদর্শ অনুসরণ করিয়া নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন।১ মনোমোহন দুই তিনখানা সামাজিক নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু নূতন ধরণের পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াই তিনি তাঁহার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বাংলা নাটক প্রচলিত হইবার পূর্বে পৌরাণিক কাহিনী ও উপাখ্যান লইয়া যাত্রা রচিত হইত। যাত্রাগুলি এককালে বিশেষ জনপ্রিয় হইলেও ক্রমে ক্রমে বৈচিত্র্যহীনতার জন্য এবং রুচি পরিবর্তনের ফলে লোকের কাছে অনাদৃত হইয়া পড়ে। যাত্রার বিষয়গুলি

---

১। এদেশের নাটককারগণ দুই শ্রেণীতে বিভাজিত। একশ্রেণীর নাম ইংরাজীনবিশ। আর এক শ্রেণীর নাম বাংলানবিশ। বাংলানবিশদিগের মধ্যে মনোমোহন বাবুই সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং আমরা এইজন্য বহুদিন হইতেই ইঁহার গুণ পক্ষপাতী।'

বান্ধব, বৈশাখ, ১২৮৮ সাল

খুবই সীমাবদ্ধ, সাধারণত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কোনো পালা লইয়া যাত্রাগান হইত, এবং এইরূপ বিষয়ের গতানুগতিকতা লোকের মন আর আকর্ষণ করিতে পারিত না। যাত্রাগুলির মধ্যে যে নিম্ন রুচি ও অশ্লীল রসের অবতারণা থাকিত তাহাও পাশ্চাত্যশিক্ষাপুষ্ট জনসাধারণ প্রশংসার চোখে দেখিত না। থিয়েটারের প্রবর্তনের ফলে লোকে আধুনিক রুচিসম্মত নাটকের অভিনয় দেখিবার সুযোগ পাইল বটে; কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষে বহু ব্যয়সাধ্য রঙ্গালয় স্থাপন এবং অভিনয় দর্শন সম্ভব হইত না। সুতরাং তখন হইতে নাটকের ধরণে রচিত, অথচ রঙ্গমঞ্চের অভাবেও অভিনেতব্য এইরূপ একপ্রকার দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব হয়; ইহাকে অপেরা বা গীতাভিনয় বলা হইয়া থাকে।১ এই রকম নাটকের মধ্যে দৃশ্যপটের অভাব গীতের আধিক্য দ্বারা পরিপূর্ণ হইত। যাত্রার ন্যায় ইহাতেও ভক্তি এবং করুণ রসের প্রাবল্য থাকিত, তবে যাত্রা অপেক্ষা ইহাতে সাজপোষাকের বৈচিত্র্য এবং ভাষার অধিকতর শালীনতা ও পারিপাট্য দেখা যাইত।২ দৃশ্য সংযোগ এবং ঘটনা সংস্থাপনের দিক দিয়া এই সব অপেরা বা গীতাভিনয় নাটকের সমধর্মী। বস্তুত তৎকালীন অনেক প্রসিদ্ধ নাটক রঙ্গমঞ্চের বাহিরে গীতাভিনয়রূপে অভিনীত হইত।৩ মনোমোহন বসুর নাটকগুলি আলোচনা করিলে মনে হয় যে, খাঁটি নাটক অপেক্ষা এইগুলিকে গীতাভিনয় নাম দেওয়া অধিকতর সঙ্গত। মনোমোহন প্রধানত একজন গীতিকার ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই কবি, হাফ-আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই সমস্ত গানের রসে তাঁহার চিত্ত সিক্ত ছিল, সেজন্য নাটক লিখিতে যাইয়া ইহাদের প্রভাব তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার সব নাটকেই গীতের অত্যধিক প্রাচুর্য বিদ্যমান, এমন কি তাঁহার সামাজিক নাটকেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, আমাদের দেশের লোকেরা সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী। সেজন্য তিনি স্বীয় নাটকের গীতের বহুলতা

১। ইংরেজী শিক্ষার ফলে এদেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ যাত্রা ও যাত্রায় প্রদর্শিত মামুলি কালুয়া-ভুলুয়া, কৃষ্ণ-গোপিনী, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতির প্রতি বীতরাগ হইয়া নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের পক্ষে পাইকপাড়ার রাজাদের মত অজস্র অর্থব্যয় করিয়া নাট্যশালাস্থাপন সম্ভব নয়, সেজন্য অনেকে গীতাভিনয় করাইতেন।'

'হিন্দু পেট্রিয়টে'র মন্তব্য—ব্রজেন্দ্রবাবু দ্বারা পুনরালোচিত—'নাট্যশালার ইতিহাস', পৃঃ ৮৮।

২ In an Opera there is a variety of dress and costumes, elegant language and other imposing things.

'*Indian Stage*', Vol. I, by Hemendra Nath Das Gupta, p. 133.

৩। রামনারায়ণের 'রত্নাবলী', কালীপ্রসন্নর 'সাবিত্রী-সত্যবান' এবং মাইকেলের 'পদ্মাবতী' গীতাভিনয় রূপে অভিনীত হইয়াছিল।

আমাদের দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং লোকরঞ্জক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।১ রঙ্গমঞ্চের মধ্যে দৃশ্যপটের সাহায্যে অনেক নৈসর্গিক চিত্র উপস্থাপিত করা হইয়া থাকে, দৃশ্যপটের অভাবে কথার মধ্য দিয়া অনেক প্রাকৃতিক চিত্র ফুটাইয়া তোলা দরকার হইতে পারে, এবং সেজন্য গীতাভিনয়ে সংলাপ দীর্ঘ এবং কবিত্বপূর্ণ হয়। মনোমোহনের নাটকের সংলাপও অধিকাংশস্থলে খুব দীর্ঘ, এবং নাট্যকার সংস্কৃত শব্দ এবং সংস্কৃত রূপক, উপমা প্রভৃতি দ্বারা ইহাকে কবিত্বময় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা অনেক স্থলেই ব্যর্থ এবং নিষ্ফল হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দ এবং অলংকার বাংলা ভাষার সহিত মানাইয়া, খাপ খাওয়াইয়া ব্যবহার করিতে না পারিলে ইহা নিতান্ত কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক হয়; মনোমোহনের নাটকে তাহাই হইয়াছে। দুঃখ এবং বিলাপের স্থলেই উক্তি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইয়াছে, এবং ভাষাও এখানে অত্যন্ত ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মনোমোহনের নাটকে গীতের বাহুল্য তো আছেই, এবং মাঝে মাঝে পয়ার অথবা লঘুত্রিপদী ছন্দে কবিতাও আছে। দীনবন্ধুর মতো তিনিও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য, এবং উভয়েই নাটকের মধ্যে অযথা গুরুর কাব্যধারার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। দীনবন্ধুর ন্যায় মনোমোহনের নাটকেও অনেক ছড়া-প্রবাদ রহিয়াছে বটে, কিন্তু দীনবন্ধুর ছড়া প্রবাদগুলি যেমন স্বতঃস্ফূর্তির আবেগে প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে, মনোমোহনের সেইরূপ হয় নাই। তিনি সংস্কৃত নাটকের রীতি বহুলাংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অধিকাংশ নাটকে সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে প্রাথমিক প্রস্তাবনার মধ্যে নট-নটীর কথোপকথনে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাত্রা ও গীতাভিনয়ের প্রধান ধর্ম করুণরসের আধিক্য তাঁহার নাটকে ভালোভাবেই রহিয়াছে। এই করুণরসের নির্ঝর পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হয় নাই। ইহা নিতান্তই কোমল জলাস্থান হইতে স্বতোচ্ছ্বসিতভাবে নির্গত হইয়াছে। জটিল ঘটনার অনিবার্য প্রবাহের মধ্য দিয়া করুণরস স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হয় নাই, সংলাপের ক্ষেত্রে করুণ রস সেচন করা হইয়াছে। সেজন্য কারুণ্যের মধ্যে অনেক স্থলেই নাট্যকারের হস্তস্পর্শ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময়েই পাত্র-পাত্রীরা যথাসাধ্য কাঁদিয়াও আমাদিগকে কাঁদাইতে পারে নাই।

১। 'সতীনাটকে'র ভূমিকায় মনোমোহন লিখিয়াছেন—'ইউরোপে নাটককাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয়োজন। এটী জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক। যে দেশের বেদ অবধি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত পাঠ পর্যন্ত স্বর সংযোগ ভিন্ন সাধিত হয় না; যে দেশের অপর সাধারণ জনগণ পরাধীনতার জন্য সর্বপ্রকার হীনতা ও দীনতার হস্তে পড়িয়াও পূর্ব গান্ধর্ববিদ্যার উন্নত অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙ্গে অত্র বঙ্গে যাত্রা, কবি, পাঁচালী, ফুল ও হাফ আখড়াই, কীর্তন, তর্জা, মন্থিচা, ভজন প্রভৃতি নিত্য নূতন সঙ্গীতামোদে আবহমান ঘোর আমোদী; অধিক কি, যে দেশের দিবাভিক্ষু ও পথভিখারীরাও গান না শুনাইলে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে না, সে দেশের দৃশ্যকাব্য যে সঙ্গীতাত্মক হইবে, ইহা বিচিত্র কি?'

মনোমোহনের পৌরাণিক চরিত্রগুলি নিতান্তই সাধারণ মানবীয় চরিত্র হইয়া পড়িয়াছে। অতীত পুরাণ কিংবা স্বর্গ হইতে তাহারা আসিয়া যেন আমাদের ঘর সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। সাধারণ দর্শকেরা দেব দেবী এবং পৌরাণিক চরিত্র এইরূপ সহজ ও সাধারণ দেখিতেই ভালোবাসে এবং মনোমোহন তাহাদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে যে রকম আধ্যাত্মিকতা ও তন্ময়তা ফুটিয়া উঠিয়াছিল মনোমোহনের নাটকে তাহার কোনো আভাস নাই। সাধারণের রুচি সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই তিনি পৌরাণিক নাটকেও অনেক স্থূল, হাস্যরসাত্মক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন।

॥ রামাভিষেক নাটক অথবা রামের অধিবাস ও বনবাস ( ১৮৬৭ ) ॥—ইহাই মনোমোহনের প্রথম পৌরাণিক নাটক। রামের অভিষেকের আয়োজন হইতে বনগমন পর্যন্ত নাটকের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। নাট্যকার রামায়ণের প্রসিদ্ধ করুণরসাত্মক অংশ অবলম্বন করিয়া তাঁহার নাট্যরূপ দিয়াছেন,১ কোনো স্থলেই পরিবর্ধন কিংবা পরিবর্জন করেন নাই। সেজন্য কাহিনীর দিক দিয়া আলোচনা করিবার কিছুই নাই। তবে নাট্যকার কাহিনীর আরম্ভ ও পরিণতি সাজাইয়া নাট্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। অভিষেকের আনন্দ উৎসবের সহিত বনগমনের বিষাদ বেদনার অতি সুন্দর বৈপরীত্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। দশরথের উপায়হীন বেদনা, দুরতিক্রম্য সঙ্কটের মধ্যে পতিত হইয়া তাঁহার আত্মঘাতী বিলাপ খুবই করুণরসপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মর্মান্তিক দুঃখ করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু ঘটার স্থলেই নাটকের উপসংহার হওয়ায় নাটক উপভোগের পর তাঁহার বিষাদময় চরিত্রের প্রভাব আমাদের অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। বোধ হয় মনোমোহনের কেবলমাত্র এই নাটকখানারই পরিণতি বিয়োগান্ত হইয়াছে, এবং তাহাতে নাটক হিসাবে ইহার মূল্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই। এই নাটকের প্রথমে চাষাদের পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় যে কথোপকথন সন্নিবেশ করা হইয়াছে তাহা নেহাত দর্শকদের হাস্যরস উদ্রেক করার জন্য বটে, কিন্তু ত্রেতাযুগের কাহিনীর মধ্যে আধুনিক চাষার দৃশ্য নেহাত বেমানান ও অসঙ্গত হইয়াছে। ইহাতে আমাদের রসাচ্ছন্ন দৃষ্টি যেন খণ্ডিত করা হইয়াছে।

॥ সতী ( ১৮৭৩ ) ॥ শিব অনার্য দেবতা বলিয়া বহুদিন আর্যসমাজে স্থান পান নাই। দক্ষযজ্ঞে শিব অন্যান্য দেবতার সহিত নিমন্ত্রিত হন নাই, ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে তিনি আর্যেতর সমাজসম্ভূত। যাহা হউক দক্ষযজ্ঞের সুপ্রচলিত কাহিনী আশ্রয় করিয়াই 'সতী নাটক' রচিত হইয়াছে। মনোমোহন তাঁহার প্রায় সমস্ত নাটকেই কাহিনীকে নাটকের উপযোগী

১। 'যে সপ্তকাণ্ডময় কল্পপাদপ, সমস্ত ভারতবর্ষীয় কাব্যকাননের বীজবৃক্ষ স্বরূপ; এই নাটকখানি তাহারি একটী পল্লব মাত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইল।'

'রামাভিষেক নাটকে'র প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

করিয়া তুলিতে বিশেষ তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। 'সতী নাটকে' সতীর চরিত্রই প্রধান বর্ণিতব্য বিষয়। সেইজন্য সতীর দেহত্যাগেই নাটকের শেষ হইয়াছে। নাট্যকার দক্ষযজ্ঞভঙ্গ প্রভৃতি নিতান্ত লোভনীয় এবং আকর্ষণীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন। মনোমোহনের নাটকে অবান্তর কিংবা অহেতুক অংশ খুব কমই থাকাতে নাট্যকাররূপে তিনি প্রশংসাভাজন সন্দেহ নাই। 'সতী নাটক' দেব দেবীর লীলা লইয়া রচিত হইলেও ইহা একান্তই মানবভাব-প্রধান নাটক।১ নাট্যকার চতুষ্পার্শ্বস্থ সামাজিক নরনারী এবং তাহাদের স্বভাব ও প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। প্রসূতীর কন্যাস্নেহ, সতীর পিত্রালয়-প্রীতি, মঘা-অশ্লেষা প্রভৃতির ঈর্ষা এবং কোন্দল-পরায়ণতা বাঙালী ঘরের নিতান্ত সুলভ এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্য। নাটকের পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে দক্ষের পরেই শান্তিরামের নাম উল্লেখযোগ্য। শান্তিরামের সরস ছড়া এবং কৌতুকপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী বিশেষ আনন্দদায়ক হইয়াছে। নারদের কথাতে শান্তিরামের চরিত্র যথার্থভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—'নিষ্ক্রিয় ভাবুক, প্রকৃত ভক্ত, বিরত বৈষ্ণব, প্রলাপী শৈব, দরিদ্র সেবক' ( ২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক )। কিন্তু শান্তিরাম বাহ্যত নির্বোধ এবং পাগলরূপে আচরণ করে। তাহার বাহ্য এবং আন্তর অবস্থার বৈষম্যই বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। পূর্বে আমাদের সমাজে হাস্যরসের উৎস ছিল ছড়া ও কবিতা। শান্তিরামও এই ছড়া ও কবিতার মধ্য দিয়া হাস্য উদ্রেক করার চেষ্টা করিয়াছে। অবশ্য আধুনিক রুচিতে তাহার অসঙ্গত অঙ্গভঙ্গি এবং অসংলগ্ন প্রলাপ বিরক্তিকর। 'সতী নাটকে'র শেষে একটী মিলনান্তক অঙ্ক সংযোজিত হইয়াছে। এইরূপ সুখকর ক্রোড় অঙ্ক ভক্তিবিলাসী ভাবুক দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যই রচিত হয়। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকেও এইরূপ ধর্মভাবপোষক স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা আমরা লক্ষ্য করিব।

॥ হরিশ্চন্দ্র (১৮৭৫) ॥ দাতাশ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে সংস্কৃতে 'চণ্ডকৌশিক' নামক নাটক আছে, মনোমোহনের পূর্বেও কেহ কেহ ঐ নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন। মনোমোহন প্রধানত 'চণ্ডকৌশিক' নাটক অনুসরণ করিলেও 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকে তাঁহার কৃতিত্বপূর্ণ মৌলিকতাও রহিয়াছে। খগেন্দ্র-নাগেশ্বর কমলা ঘটিত উপাখ্যান এবং পাতঞ্জলের ন্যায় বিশেষ মনোহর চরিত্র মনোমোহনের নিজস্ব সৃষ্টি। নাট্যকার হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যার মূল কাহিনীর সহিত খগেন্দ্র এবং নাগেশ্বরের বিরোধপূর্ণ উপকাহিনীটী অতি সুকৌশলে জুড়িয়া দিয়াছেন। পুরাণে এবং সংস্কৃত 'চণ্ডকৌশিক' নাটকে হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যগ্রহণ বিশ্বামিত্রের একটা খেয়ালমাত্র। রাজাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্য সেখানে সুপরিস্ফুট। কিন্তু মনোমোহনের নাটকে শরণাপন্ন নাগেশ্বরকে রাজ্য দিবার মধ্যে বিশ্বামিত্রের একটা সুস্থির সংকল্প এবং সকারণ চণ্ডত্ব লক্ষ্য করা যায়। সেজন্য এই নাটকে বিশ্বামিত্রকে আর কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণেচ্ছু মহাপ্রাণ বলিয়া মনে হয় না। দুরাচার নাগেশ্বরকে রাজ্য দেওয়াতে তাঁহার প্রতি বিতৃষ্ণা জাগরিত হয়। কমলা এবং মল্লিকা স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য

১। 'দক্ষের সংসার যেন বাঙালী গৃহস্থের ঘর'—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১১।

বিধান করিয়াছে। উপকাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রগুলি না থাকিলে নাটকখানি নেহাত একঘেয়ে করুণরসের মধ্যে মজিয়া যাইত। 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের প্রথম দৃশ্যও 'চণ্ডকৌশিকে'র অনুরূপ নহে। মৃগয়াবেশী হরিশ্চন্দ্র 'শকুন্তলা' নাটকের প্রথম দৃশ্যের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত, এবং এইরূপ আরম্ভ যথার্থ ই নাটকীয় হইয়াছে। নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য পাতঞ্জল চরিত্র। পাতঞ্জল বিশ্বামিত্রের শিষ্য হইলেও চণ্ড গুরুর ন্যায় দণ্ডদানে তাঁহার উল্লাস নাই। গুরুভক্ত হইয়েও গুরুর অন্যায় কাজ তিনি সমর্থন করেন নাই, এবং রাজার দুঃখে তিনি প্রকৃতই ব্যথিত হইয়াছেন। কিন্তু বাহিরে মহত্ত্ব প্রকাশ করিবার কোনো আগ্রহ তাঁহার নাই। তাঁহার পাগলাটে, এবং অসংলগ্ন সংলাপের মধ্যে ব্যঙ্গ এবং বিদ্রূপের খোঁচাগুলি খুবই কৌতুকপূর্ণ। খগেন্দ্র নাটকের প্রথমভাগে বিকৃতমস্তিষ্করূপে প্রতীয়মান হইলেও তাহাকে বীরপুরুষরূপে দেখাইবার জন্যই নাট্যকার তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন করিয়াছেন।

## (খ) সামাজিক নাটক

॥ প্রণয় পরীক্ষা (১৮৬৯) ॥ মনোমোহনের প্রথম সামাজিক নাটক হইতেছে 'প্রণয়-পরীক্ষা'। পাশ্চাত্য সভ্যতার আঘাতে যেসব সামাজিক কুপ্রথা লোকের চোখে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, সেই সব লইয়াই তখনকার সামাজিক নাটকগুলি লিখিত হইতেছিল। বহুবিবাহের কুফল লইয়া রামনারায়ণ তর্করত্ন 'নবনাটক' রচনা করিয়াছিলেন ; মনোমোহনও সেই বিষয় অবলম্বন করিয়া'প্রণয়-পরীক্ষা'নাটক প্রণয়ন করেন, এবং এই নাটকেও সপত্নী-বিদ্বেষের ভয়াবহ পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে। সপত্নীকলহের পরম সরস, রঙ্গব্যঙ্গ পূর্ণ চিত্র অদ্বিতীয় হাস্যরসিক দীনবন্ধু 'জামাই-বারিকে' আঁকিয়াছিলেন, কিন্তু দীনবন্ধুর ন্যায় রামনারায়ণ এবং মনোমোহন হাসির বাষ্পে সমস্যাটিকে উড়াইয়া দিতে চান নাই, দুঃখ ও মৃত্যুর গাম্ভীর্যে ইহাকে ভারী করিতে চাহিয়াছেন। নাটকখানির গোড়ার দিকে ইহার সামাজিক বাস্তবতা অটুট রহিয়াছে; যেভাবে মহামায়া ও কাজল সরলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিয়াছে তাহা বিশেষ কৌশলপূর্ণ এবং আগ্রহোদ্দীপক হইয়াছে, কিন্তু যখন শান্তশীল মহামায়ার ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া নিরপরাধিনী সরলার শোকে গৃহত্যাগ করিয়াছে, তখন হইতেই নাটকীয় ঘটনা এক অবাস্তব রোমান্টিক জগতে প্রবেশ করিয়াছে। শান্তশীল যখন বনমধ্যে শোকার্তভাবে পরিক্রমণ করিতেছে, তখন মনে হয়, সে যেন আর আধুনিক বাস্তব সমাজের সাধারণ লোক-নয়, সে বুঝি সংস্কৃত নাটকের রাম, পুরূরবা প্রভৃতির ন্যায় বেশ বাছা বাছা কবিত্বময় শোক বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। মহামায়ার প্রতিও নাট্যকার এতো বেশি রাগিয়াছেন যে তাহাকে ঘর হইতে টানিয়া আনিয়া বনের মধ্যে বাঘের দ্বারা খাওয়াইয়া তবে একটু শান্ত হইয়াছেন। নাটকের মধ্যে ঔষধের ক্রিয়ার খুব বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে। যদি ঔষধে অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য কাজ না করিত তবে কোনো ব্যাপারই ঘটিত না। মহামায়া এবং কাজলের মধ্যে তুলনা করিলে মনে হয় যে, চরম নিষ্ঠুর কাজ সাধন করিতে মহামায়া বার বার দ্বিধা বোধ

করিয়াছে, কিন্তু কাজলের বলিষ্ঠ দুষ্প্রবৃত্তিই তাহাকে চালিত করিয়াছে। সরলা দীনবন্ধুর লীলাবতীর ন্যায়—শিক্ষিতা, মার্জ্জিতরুচিসম্পন্না, এবং সেজন্য একটু কৃত্রিমও বটে। নটবরও উনপাজুরে, মূর্খ, গুলিখোর নদেরচাঁদ হেমচাঁদের ন্যায়, তবে শেষ পর্যন্ত এই চরিত্রটিকে মহৎ ও পরোপকারী করা হইয়াছে।

॥ আনন্দময় নাটক (১৮৯০)॥ আনন্দময় চৌধুরী এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণের নানান বিপত্তি ও পরিশেষে পরিপূর্ণ সুখকর মিলনের বিষয় নইয়া 'আনন্দময় নাটক' রচিত। কিন্তু ঘটনার অত্যধিক বাহুল্য নাটকীয় আগ্রহ ও কৌতূহলকে কেন্দ্রবিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। যে ঘটনার টুকরাগুলিকে একত্রিত করিয়া জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে সেইগুলি যেন মিশিয়া যায় নাই, চিড়গুলি বড়ো বেশি প্রকট হইয়া রহিয়াছে। ভূষণ, পুলিন, ললিত, নির্মল, কিরণশশী, –এতোগুলি চরিত্রের পরিচয় গোপন রাখিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে হইয়াছে; সেইজন্য অনেক সময়েই অতর্কিত এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণের মদ্য দিয়া রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে হইয়াছে, যথাযোগ্য বিশ্লেষণের অভাবে দর্শকের মন সন্তুষ্ট হয়না। ভূষণ, তাঁহার পুত্রত্রয় এবং কিরণশশীর পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার পরে আমাদের কৌতূহল শান্ত হয় এবং নাটকের প্রকৃত প্রয়োজন এইখানেই শেষ হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরে নীলুঠাকুরের কন্যার ব্যভিচার এবং ললিতের ষড়যন্ত্রজালে জড়িত হওয়ার বিষয়টী অনর্থক নাটকের উপর চাপানো হইয়াছে। ভরতিপেটে পুনবায় খাবারের আয়োজন দেখিলে যেমন বিরক্তি উপস্থিত হয়, শেষ অংকের বিষয়ও আমাদের মনে তেমন এক বিতৃষ্ণ ভাবের উদ্রেক করে। নাট্যকার হয়তো বিধবা বিবাহ না দেওয়াতে সমাজের কি ক্ষতি হয় তাহা ইঙ্গিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য তেলের মতো উপরে ভাসিয়াছে, ঘটনাস্রোতের সহিত মিশিতে পারে নাই। নাটকের কাহিনীর সব সংকটের প্রধান ত্রাত্রী হইয়াছে ভৈরবী। সে যেন এক সর্বজ্ঞ সর্বময় সত্তার ন্যায় সমস্যার মুহূর্তটীতে উপস্থিত হইয়া চরিত্রগুলির কাজ সহজ ও অনায়াসসাধ্য করিয়া দিয়াছে, নাট্যকার তাহার কর্মশীলতার সম্ভাব্যতা বিচার করিয়া দেখেন নাই। তাহার ন্যায় প্রাক্তন পতিতা অথচ মহৎ অবস্থান্তরিত চরিত্র পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের অনেক নাটকে লক্ষ্য করা যাইবে। কান্ত এবং রাধু এই দুইজনের দ্বারা ক্রূর ষড়যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, কিন্তু নির্মম নৃশংসতা রাধুর মধ্যে বেশি, খুন খারাপ প্রভৃতি চরম পাপ কাজ সাধন করিতে কান্ত বরাবর দ্বিধা এবং অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

### জাতীয় ভাবাত্মক রোমান্টিক নাটক

( ১৮৭০—১৮৮০ )

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে যে বাংলা নাটকের স্থচনা হইয়াছে তাহার আদি পর্বে সমাজ-সংস্কার-চেতনা যে প্রধান নিয়ন্ত্রী শক্তি রূপে বিরাজমান ছিল সে আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। বাংলা নাটকের দ্বিতীয় পর্বের গোড়ার দিকে এই শক্তির রূপান্তর হয়, সমাজচেতনা সম্প্রসারিত হয় জাতীয়তার ক্ষেত্রে। সেজন্য নাটকীয় কাহিনী স্থানান্তরিত হইল সামাজিক পরিবেশ হইতে ঐতিহাসিক পরিবেশে। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘাতে জনগণ-মানসের দুই বিশিষ্ট জাগৃতি লক্ষিত হইয়াছে। প্রথম জাগৃতি রূপায়িত হইয়াছে সমাজ-বিপ্লবে। রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও-রিচার্ডসন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবৃন্দ এই বিপ্লবের অগ্নিদীক্ষা দান করেন। কিন্তু সেই দীক্ষা কল্যাণচিত্তে গ্রহণ করিবার সময় তখনও আসে নাই। সেজন্য নব্য যুবকদের চোখে দীপ্তি অপেক্ষা দাহই ফুটিয়া উঠিল অধিক। এই দাহ ধ্বংসে উল্লসিত হইল, কিন্তু স্থষ্টির ইঙ্গিত দিতে পারিল না। বাংলা সমাজের প্রাণকেন্দ্র তখনও অবস্থিত ছিল অবারিত পল্লী পরিবেশে, সেজন্য এই ধ্বংসলীলা সেদিন সেই শান্ত পল্লী-পরিবেশ স্পর্শ করিয়াছিল। এই বিশ্লেষণ-ধারা অনুসরণ করিয়া আদি পর্বের সামাজিক নাটক বিচার করিতে হইবে।

বাঙালী জনমানসের দ্বিতীয় জাগৃতি ঘটিয়াছে সম্মিলিত জাতীয় চেতনায়। শ্মশানের চিতাগ্নি ক্রমে ক্রমে শান্ত হইয়া আসিয়া তপোবনের হোমাগ্নি-শিখায় পরিণত হইল। শুধু কেবল আঘাত নহে, বিভেদ নহে, এক মহামিলনের ভূমিতে সব আঘাত-বিভেদ বিসর্জন দিয়া সুদৃঢ় ভাবে দাঁড়াইতে হইবে। এবার বিরোধী শক্তি ভিতরে নহে বাহিরে, তাহাকে আঘাত করিয়াই নিস্তার নাই, প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সেজন্য চাই নিশ্ছিদ্র সংহতি ও নির্নিমেষ সাধনা। এই চেতনাই এক অখণ্ড সার্বভৌম জাতীয়তার রূপ গ্রহণ করিল।

যে শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদের ধ্বংসোন্মুখ অচলায়তনকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাই আবার আমাদিগকে জাতীয় গৌরব ও মহিমার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে প্রেরণা জোগাইল। পাশ্চাত্য-শিক্ষা-বাহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদার উন্মুক্ত আলোক আমাদের রুদ্ধ কক্ষতলে প্রবেশ করিয়া ইহার রত্নভাণ্ডার চোখের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিল। বাঙালী জানিল যে তাহারা এক বিরাট, মহিমময় জাতির অধঃপতিত বংশধর। তখন হইতে অবলুপ্ত প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্য তাহারা মানসিক এষণা বোধ করিতে লাগিল. এবং ক্রমে ক্রমে সাহিত্যে, শিল্পে এবং রাজনীতিতে পরাধীনতা-ক্ষুব্ধ, মর্মপীড়িত জাতির আশা ও

উৎসাহের বাণী ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ইহাই হইল বাঙালীর জাতীয়তা-বোধের গোড়াকার কথা।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দেশীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনার ফলে আমাদের দেশে স্বদেশী ভাব গড়িয়া উঠিতে লাগিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সময় হইতেই এই স্বদেশী ভাব লোকের মনে উদিত হইতে থাকে।১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের কিছুকাল পরেই সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল হাঙ্গামার দ্বারা বাংলার সামাজিক জীবন বিশেষভাবে বিপ্লুত হয়। এই সমস্ত গণ-বিদ্রোহের মধ্য দিয়া বাঙালীর স্বাধিকার-বোধ ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ইহার পর কয়েক জন উৎসাহী স্বদেশ-প্রেমিক ব্যক্তি দ্বারা 'হিন্দু-মেলা' প্রতিষ্ঠিত হইল।২ এই হিন্দু-মেলা স্থাপিত হওয়ার পরে দেশে উচ্ছ্বসিত স্বদেশপ্রেমের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইল। হিন্দু মেলার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'অতএব সেই সামাজিকতাকে উদ্ধার করা যে কতদূর আবশ্যক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সে সামাজিকতার অন্য নাম জাতিধর্ম। সেই স্বজাতি ধর্ম আমাদিগের অজ্ঞানতা রূপ অন্ধকার কারাগারে পরবশ্যতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে, তাহাকে মুক্ত করা সর্বপ্রযত্নে বিধেয়। কিন্তু তাহা করিতে গেলে অগ্রে আত্ম নির্ভর নামা শাণিত অস্ত্র দ্বারা পরবশ্যতারূপ শৃঙ্খলকে ছেদন করিতে হইবে। সেই আত্মনির্ভর লাভ করিবার জন্য এইরূপ সমাবেশ যে অদ্বিতীয় উপায়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা বাহুল্য।' সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার প্রসিদ্ধ স্বদেশী-সঙ্গীত—'মিলে সবে ভারত সন্তান, এক তান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান' হিন্দু মেলার জন্য রচনা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ইত্যাদি জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা লেখেন। এই সব গানে অতীত ভারতের গৌরবকীতির সহিত বর্তমান হীন দুরবস্থার তুলনা করিয়া এক নব জাতীয়তাবোধ উদ্দীপিত করা হইয়াছে, যেমন—

১। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী ভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় উক্ত পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবকাহিনী লিখিয়া লোকের মনে সর্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন।"

'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩১।

১। নবগোপাল মিত্র মহাশয়, স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কল্পনা অনুসারে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চৈত্র মেলার (পরে হিন্দু মেলা নামে খ্যাত) অনুষ্ঠান করেন। এই মেলায় স্বদেশীয় শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইত এবং জাতীয় সংগীত এবং বক্তৃতাদি দ্বারা দেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করা হইত।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—মন্মথনাথ ঘোষ, পৃঃ ১৯।

কোথা ক্ষত্রবীর সব—ক্ষত্র রাজগণ !
কোথা ভীষ্ম কার্তবীর্য পাণ্ডুর নন্দন !
কোথায় হামির রায়,—কোথা ভীমসিংহ হায়,
কোথায় প্রতাপ আদি বীরবরগণ !
দেখুক ভারতে তারা কি দশা এখন !১

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি জাতীয়-ভাব-অনুপ্রাণিত নাট্যকারদের দ্বারা স্বদেশের গৌরবসূচক অতীত ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নাটক প্রভৃতি লিখিত হয়। কাব্যে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র যেমন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত শুনাইলেন, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন 'বন্দেমাতরমে'র মন্ত্রে বাঙালীকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তেমনি গৌরবোজ্জ্বল অতীত বীরত্বকাহিনী আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রদর্শিত ধারা তাঁহার সমসাময়িক নাট্যকারদের দ্বারা অনুসৃত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ দাস, প্রমথনাথ মিত্র, উমেশচন্দ্র গুপ্তর নাম উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত লেখকদের স্বদেশীভাবোদ্দীপক নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। জাতীয় আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় স্বদেশপ্রেমিক জনগণ তাঁহাদের বিগত ইতিহাস দ্বারা অনুপ্রাণিত ও চালিত হইয়াছিলেন। সেই ইতিহাসে তাঁহারা হিন্দুগৌরব এবং বিদেশীর আগমনে সেই গৌরবের ম্লানিমা বিষণ্ন নেত্রে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাদের সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষের ইতিহাস, এবং সেই সংঘর্ষে হিন্দুদের বীর্য ও মহত্ত্ব দেখান হইয়াছে। টড-প্রণীত রাজস্থানের বৃত্তান্তে হিন্দু রাজপুতগণের বীরত্বকাহিনী লেখকেরা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিলেন। এই সমস্ত গৌরব কাহিনীর উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করিয়া তাঁহারা পতিত, মোহগ্রস্ত হিন্দুজাতিকে পুনরায় স্বাধীনতা-লাভের আশায় উদ্বোধিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

১৮৭০ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই নব জাতীয় উদ্দীপনা সাহিত্যক্ষেত্রে এক সর্বনিয়ন্তা শক্তিরূপে রাজত্ব করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ( ১৮৭৩ ) 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) প্রভৃতি এই সময়েই প্রকাশিত হইয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), ও মৃণালিনী' (১৮৬৯) তো ইতিপূর্বেই বাহির হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত' (১৮৬৯) 'ভারত ভিক্ষা' (১৮৭৫) ও 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫) প্রভৃতি কাব্য-মহাকাব্য এই সময়েই রচিত হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ-রঞ্জিনী' (১৮৭১) ও 'পলাশির যুদ্ধে'র (১৮৭৬) রচনাকাল এই যুগের অন্তর্ভুক্ত। নাটকের ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য নাট্যকারগণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার সমকালীন স্বদেশপ্রাণ সহকর্মিবৃন্দ এই যুগেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। আরও সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে তাঁহাদের নাটকসমূহ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের

১। 'হিন্দুমেলা'র কার্য-বিবরণীতে প্রকাশিত একটি কবিতার অংশ।

পরেই প্রণীত হইয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ জাতীয় জাগৃতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হয়। একদিকে জ্ঞানের বিচার অন্যদিকে রসের বিকাশ—এই দুইদিক দিয়াই জাতীয় আন্দোলন কলকল্লোলিত হইয়া উঠিল। তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল তৎকালীন নাটকের মর্ম্মমূলে। কাব্যক্ষেত্রে হেম-নবীন এই জাতীয় সাহিত্যের উত্তরসাধক মাত্র। তাঁহাদের বহুপূর্বেই ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলাল মধুসূদন সেই সাধনা সুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু নাট্যক্ষেত্রে সগোষ্ঠী জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ইহার প্রবর্তক।

জাতীয় ভাবৈষণা তৎকালীন নাটকের প্রবল প্রেরণা ছিল বটে কিন্তু একমাত্র প্রেরণা ছিল না। আর একটি প্রেরণা ইহার সহিত মিলিয়াছিল এবং তাহা হইল রোমান্টিকতা। নাট্যকারগণ জাতীয় গৌরব-কাহিনীর মধ্যে নরনারীর প্রণয়-স্পর্শ আনিয়াছিলেন, বীরের অসির সহিত প্রণয়ীর বাঁশী আসিয়া মিলিত হইল। অনেক সময় রোমান্টিক-ধর্ম জাতীয় ধর্মকে আচ্ছন্ন করিয়াছে ইহাও আমরা দেখিয়াছি। 'অশ্রুমতী', 'বীরবালা','হেমলতা', 'হেমনলিনী' প্রভৃতি নাটকের উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। এই রোমান্টিকতার আবেগে ইতিহাসের বেগ ব্যাহত হইয়াছে সেই রকম দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সেজন্য সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক এই সময়ে খুব বেশী লেখা হয় নাই। রোমান্টিকতার এতখানি প্রাদুর্ভাবের কারণ কি? পাশ্চাত্য-সাহিত্যের আদর্শ, বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক উপন্যাসের প্রভাব প্রথমেই মনে আসিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এবং এই সব নাটকে যে ভয়লেশহীন অকুণ্ঠ প্রণয়ের মর্যাদা ঘোষিত হইয়াছে তাহার প্রেরণা আসিতে পারে শুধু কেবল এমন এক সমাজ হইতে, যেখানে পুরুষের ন্যায় নারীও সমান অবস্থা ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতীয় চেতনার সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষের একটি সাম্যবোধও তখন সমাজের মধ্যে স্বীকৃত হইয়াছিল। ঈশ্বরগুপ্ত যাহাই বলুন, পদ্মিনী-প্রমীলা-আয়েষা-বিমলা বাংলা সাহিত্যে এমন এক নারীকুলের আদর্শ স্থাপন করিল যাহারা প্রেম ও পরাক্রম উভয়ক্ষেত্রেই অশঙ্কিনী। এই অশঙ্কিনী নারীচরিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে তৎকালীন স্বদেশী ভাব-রঞ্জিত নাটকে। যিনি নিজের পুরাঙ্গনাকে বীরাঙ্গনা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ঘোড়ার পিঠে পর্যন্ত চড়াইয়াছিলেন তিনিই ঐলবিলা ও সরোজিনীর ন্যায় স্ত্রী-চরিত্র সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথের সরোজিনী ও বিনোদিনী চরিত্রও অবলা বাঙালী রমণী মাঝে সবলা নারীর আদর্শ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। নাট্যকারগণ রণক্ষেত্রের জয় পরাজয় হইতে নরনারীর মিলন-বিরহ-সিক্ত প্রেমকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন, কিন্তু তাহা কখনও পরাজয়ে মলিন নহে, তাহা জয়ের গৌরবে দীপ্তিময়। ভাব ও আদর্শের এই মহিমার ফলে কি তৎকালীন নাটক বিশেষ সমৃদ্ধ রূপ লাভ করিয়াছিল? না, তাহা করে নাই। তাহার কারণ শিল্পের ত্রুটি, ভাষা ও আবেগের অসংযম। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ নাটক আলোচনা করিয়া আমরা এই বিষয়টি পরিস্ফুট করিব।

## জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটকের মধ্য দিয়া যে জাতীয় ভাব উদ্দীপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাহার বিকাশ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে তাহার পূর্ণতম পরিণতি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটক রচিত হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' ঐতিহাসিক নাটকসমূহের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকের মধ্যে যে স্বাদেশিক ভাবোদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং অপূর্বদৃষ্ট। তিনি তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে বলিয়াছেন, 'হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।'[১] কিন্তু ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেও, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার মানস-ইচ্ছা ও আদর্শ অনুযায়ী ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহার করিয়াছেন। একমাত্র 'পুরুবিক্রম' ব্যতীত অন্যান্য নাটকে নাটকীয় রস ও গুরুত্ব ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের প্রাধান্যের উপর নির্ভর করে নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা ও পাত্রপাত্রী নাট্যকারের হস্তে অপরূপ দ্বন্দ্ববহুল হইয়া রূপলাভ করিয়াছে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে নাটকীয় পাত্রপাত্রী নাট্যকারের কোনো বিশেষ idea অথবা ভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। সেইজন্য তিনি তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেক চরিত্রকে নূতনভাবে গঠন করিয়াছেন, এবং অনৈতিহাসিক অনেক ঘটনা সন্নিবেশ করিয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলা নাটককে অনেকাংশেএসংস্কৃত প্রভাব-মুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে মাইকেল ও দীনবন্ধুর নাটকে সংস্কৃত প্রভাব আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষা ও পাত্র-পাত্রীর আচরণে অনেকখানি বাস্তবনিষ্ঠ ছিলেন, তবে ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ণ, পরিণত রূপ তখনো আসে নাই, সেজন্য লক্ষ্য করা যায় যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকের সংহত পরিমিতি অনেক স্থলেই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সাধারণত তাঁহার নাটকগুলি দীর্ঘ এবং অভিনয়ের অনুপযোগী, নাটকের মধ্যে দৃশ্য-পরম্পরা আলগা ( loose ) এবং বিস্তৃতভাবে যুক্ত ; সেজন্য বহু জায়গায় নাটকীয় রূপ জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। কথোপকথন অনেক স্থলেই দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর, এবং অধিকাংশস্থলে অত্যন্ত দুর্বল ও সাদাসিদে হইয়াছে। অবশ্য অভিনয়নৈপুণ্যে সাধারণ কথাও অত্যন্ত উদ্দীপক এবং সংঘর্ষশীল হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সংলাপের অন্তর্নিহিত শক্তি নাটককে গতিমান করিবার

১। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪১।

প্রধান উপায়। অ্যেহেনা ব্যতীত অন্যান্য স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নাই, সকলেই এক ধরণের—সরলা, পতি অথবা প্রেমিকের প্রতি একনিষ্ঠা, এবং সহনশীলা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাতীয়ভাব উদ্দীপিত করিবার জন্য নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোনো সুস্পষ্ট এবং সুনির্দেশিত জাতীয় ভাব অপেক্ষা স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্য প্রভৃতির দ্বন্দ্ব-সমস্যাই বেশিভাবে নাটকের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নে তাঁহার নাটকসমূহের বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের মতের যাথার্থ্য নির্ধারণ করিব।

## (ক) ঐতিহাসিক নাটক

॥ **পুরুবিক্রম (১৮৭৪)** ॥ স্বদেশীভাব উদ্বোধনের আশায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের স্বাধীনচেতা এবং গর্বোন্নত বীর রাজা পুরুর বিক্রম কাহিনী লইয়া প্রথম নাটক রচনা করেন। অবশ্য নাট্যকার ইতিহাসকে যে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার কল্পিত আদর্শ অনুযায়ী ঘটনা এবং চরিত্র তিনি অংকন করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করা নাট্যকারের অভিপ্রেত হইলেও নাটকের শেষের দিকে পুরু-ঐলবিলা-তক্ষশীল-অম্বালিকা ঘটিত প্রেম এবং ঈর্ষামূলক ঘটনাবলীই বেশি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'পুরুবিক্রম' প্রকাশিত হইলে রসিক এবং পণ্ডিত সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল।১ কিন্তু ইহা সমালোচনার কড়া পাহারার সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া চিরকালীন রসিক দরবারে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। নাটকখানির মধ্যে স্বদেশী ভাবোদ্দীপনা এবং বীররসোদ্বেলতার জন্য ইহা সাময়িকভাবে দর্শকগণকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটির জন্য ক্রমে ইহার মূল্য কমিয়া আসিয়াছিল। নাটকের উক্তিগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং সাধারণ, লেখক বীররস ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাটকের ভাষা বীররসাত্মক হয় নাই। কথার বেগে দর্শককে উত্তেজিত না করিয়া যখন তিনি সস্তা ধরণের মাতামাতি দাপাদাপির মধ্যে বীররস অবতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তখন তাহা নিতান্ত তরল ও কৃত্রিম হইয়াছে। অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলিয়াছেন—'পুরু-বিক্রমের বীররস অবাস্তব, যুদ্ধের ও দ্বন্দ্বযুদ্ধের বর্ণনা থিয়েটারী যুদ্ধের মত।'২

নাট্যকার পুরুচরিত্রকে সর্বত্র মহৎ এবং বীর্যবান দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেজন্য তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার একটু এদিক ওদিক করিয়াছেন। পুরুর সহিত সেকেন্দারের

১। নাটকখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন, রেভারেণ্ড লালবিহারী দেও 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' লিখিয়াছিলেন—The story is well told ;·· the descriptions are lively, some of the characters are well drawn, and the language is simple & idiomatic.

মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'—পৃঃ ৪১-৪২ হইতে পুনরুদ্ধৃত।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০২।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ, সেকেন্দারের পরাজয়, অন্যায়ভাবে পুরুর প্রতি আক্রমণ ইত্যাদি ব্যাপার নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত।১ তক্ষশীলের মুখে সামান্য শ্লেষবাক্য শুনিয়া পুরু ক্রোধে দিশাহারা হইয়া তাহাকে হত্যা করিয়া বসিলেন—ইহা যেমন পুরুর বীরত্ব ও মহত্ব ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে, তেমনি তক্ষশীলের চরিত্র আকস্মিক এবং অপূর্ণভাবে শেষ করিয়াছে। কাপুরুষ যুদ্ধভীরু তক্ষশীল পুরুর মনে ঈর্ষা ও সন্দেহ উদ্রেক করা ব্যতীত আর কোনো সক্রিয় প্রতিরোধ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অম্বালিকার প্রেমমুগ্ধ সেকেন্দরের চরিত্রের মধ্যে বিরাট মহত্ব এবং সংহত গাম্ভীর্য ফুটিয়া উঠে নাই। স্ত্রী-ভূমিকার মধ্যে কুলুপর্বতের রাণী ঐলবিলার স্বদেশ-প্রাণতা এবং বীর্যবত্তা অবশেষে হৃদয়বত্তার লীলাতে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। নাটকের একমাত্র ট্র্যাজিক, এবং বোধ হয় সর্বাপেক্ষা ক্রিয়াশীল চরিত্র—অম্বালিকা। সে দুর্বল ভ্রাতাকে সেকেন্দরের সহিত যুদ্ধ হইতে বিরত রাখিয়াছে। সেকেন্দরকে আশ্রয় করিয়া তক্ষশীলের সহিত ঐলবিলার মিলন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সে এত সব করিয়াছে, সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নাই। রণলিপ্সু সেকেন্দর তাহার সর্বত্যাগী মর্মান্তিক প্রেমকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। সুতীব্র অনুতাপ এবং সুগভীর নৈরাশ্যে তাহার পক্ষে সন্ন্যাসিনী হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক। অম্বালিকার বিষাদান্ত পরিণতি পুরু এবং ঐলবিলার মিলনের আনন্দ ম্লান হইয়া গিয়াছে।

॥ সরোজিনী ( ১৮৭৫ ) ॥ সরোজিনী পূর্বতন নাটক 'পুরুবিক্রম' অপেক্ষা অনেক দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ। একটা অতি দ্বন্দ্ববহুল, উত্তেজনাময় কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া নাটকের ক্রিয়া (action) অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। কুটিল ষড়যন্ত্রের বিসর্পিল গতিতে, এবং বিরুদ্ধ শক্তির সবল সংঘাতে দর্শকের মন উদ্বেগচাঞ্চল্যে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। বিশেষত চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে সরলপ্রাণা, কুসুমকোমলা সরোজিনীর হত্যার আয়োজনের দৃশ্য এত অধিক লোমহর্ষণকারী বিভীষিকায় পরিপূর্ণ যে দর্শকের পক্ষে তাহা সহ্য করা কঠিন। 'সরোজিনী'র অভিনয়ের সময় এই দৃশ্য দেখিয়া অনেকেই অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন।২ নাটকখানি

১। ইতিহাসে পুরুর পরাজয় এবং আহত হওয়ার ঘটনা এইভাবে বর্ণিত আছে—'Poros himself a magnificent giant, six and a half feet in height, fought to the last, but at last succumbed to nine wounds, and was taken prisoner in a fainting condition.'

*Early History of India* by V. H. Smith, p, 74

২। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী বিনোদিনী 'আমার অভিনেত্রী জীবন' প্রবন্ধে এই দৃশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'কপট ব্রাহ্মণ-বেশধারী ভৈরবাচার্য ত রবারি হস্তে সরোজিনীকে যেমন কাটতে এসেছে, এমন সময় । জয়সিংহ যেমন সেখানে ছুটে এসে বললেন, সব মিথ্যে, সব মিথ্যে, ভৈরবাচার্য ব্রাহ্মণ নয়, মুসলমান, সে মুসলমানের চর', অমনই সমস্ত দর্শক একেবারে ক্ষেপে উঠে মার মার কাট কাট করে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। জন দুই দর্শক এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁরা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, ফুটলাইট ডিঙিয়ে মার মার করতে করতে একেবারে ষ্টেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন।'

সরোজিনীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ভৈরবাচার্য এবং রণধীর সরোজিনীকে উৎসর্গ দিবার যে সুশৃঙ্খল এবং শক্তিশালী আয়োজন করিয়াছিল তাহা ফাঁসিয়া যাইবার পর নাটক সুপরিণত সমাপ্তিতে পৌঁছিয়াছে। বিজয় এবং সরোজিনীর মধ্যে যে বিচ্ছেদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়া নাটকখানিকে বিষাদান্ত ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে ঠেলিয়া আনিতেছিল, রহস্যোদ্‌ঘাটনের পর তাহা মিলনের শান্তিতে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে ; সুতরাং পঞ্চমাঙ্কে প্রকৃতপক্ষে নাটকের শেষ হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরে ষষ্ঠ অঙ্কের যে অগ্নিকুণ্ড-দৃশ্য দেখান হইয়াছে, নাটকের দিক দিয়া তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। বিজয়সিংহ এবং সরোজিনীর মৃত্যু ট্র্যাজিক হয় নাই। কারণ এই রকম মৃত্যুর সম্ভাবনা তাহাদের চরিত্র-বিকাশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ছিল না। শেষ অংকের মৃত্যু দৃশ্য অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ অভিযোগ এবং দুঃখপূর্ণ নির্বেদ দর্শকের মনকে আচ্ছন্ন করে বটে, কিন্তু তবুও উহা ট্র্যাজেডি হয় নাই, কারণ প্রকৃত ট্র্যাজেডি চরিত্রের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া উঠে।১

অনেকেই বলিয়াছেন যে, 'সরোজিনী'র উপর ইউরিপিডিসের 'Iphigenia at Aulis' নাটকের প্রভাব আছে। ইহা অসম্ভব নহে। কারণ, উভয় নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের ঐক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। লক্ষ্মণসিংহ রণধীর এবং বিজয়সিংহের সহিত যথাক্রমে অ্যাগামেমনন—মেনেলাউস—অ্যাকিলিসের সাদৃশ্য আছে। ইউরিপিডিসের নাটকেও অ্যাগামেমনন সন্তানবাৎসল্য ও স্বদেশহিতের মধ্যে দ্বন্দ্ব বোধ করিয়াছেন, বিজয়সিংহের ন্যায় অ্যাকিলিস নিরপরাধা বালিকাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং নায়িকা ইফিজেনিয়া 'Hellas' কে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

নাটকের সমস্ত ষড়যন্ত্রের নিয়ন্ত্রী ভৈরবাচার্য রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতিকে মনে করাইয়া দেয়। ভৈরবাচার্যের কথার মধ্যে তাহার শক্তিশীল ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট না হইলেও সমস্ত নাটকের মধ্যে তাহার অলঙ্ঘ্য প্রভাব ক্রুদ্ধ ঝড়ের মত সকলকে সচকিত ও সন্ত্রস্ত করিয়াছে। পরাজিত, বিপর্যস্ত ভৈরবাচার্য যখন নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে নিজের ছলনাজালে আবদ্ধ হইয়া কন্যাকে হত্যা করিয়া বসিল তখন তাহার চরিত্রের মধ্যে 'Dramatic Hedging'এর ২ সৃষ্টি হয়, এবং দর্শকের মন তাহার প্রতি সহানুভূতি-সিক্ত হইয়া উঠে।

১। 'What we do feel strongly, as a tragedy advances to its close, is that the calamities and catastrophe follow inevitably from the deeds of men, and that the main source of these deeds is character'.

*Shakespearean Tragedy*, by Bradley, p. 13

২। অধ্যাপক মোলটন (Richard G. Moulton) Dramatic Hedging ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—'Dramatic Hedging by which unpleasant elements in the characters of Shylock and Brutus are met by another treatment bringing out peculiarities in the position of these personages which restoref them to our sympathy.'

'*Shakespeare as a Dramatic Artist*. (3rd ebition), P. 327

রাজা - লক্ষ্মণসিংহের মধ্যে কন্যাস্নেহ এবং স্বদেশপ্রাণতার অতি সুন্দর দ্বন্দ্ব দেখান হইয়াছে। কর্তব্য-পরায়ণ, স্নেহপীড়িত রাজার চরিত্র মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভীমসিংহকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সরোজিনী নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বটে, কিন্তু এই নাটকের কেন্দ্রাভি-কর্ষণী শক্তিসমূহের সংগ্রামই মূল বিষয়। সেইজন্য নাটকখানি নায়িকা-নামাংকিত হইলেও সরোজিনীর প্রভাব কোন স্থানেই অনুভূত হয় নাই। তবে সরোজিনীর মধুর সৌরভে নাটকখানি আমোদিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'সরোজিনী' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা সার্থক রচনা।

॥ অশ্রুমতী ( ১৮৭৯ ) ॥ 'অশ্রুমতী' নাটকের ললাটদেশে টডের 'রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃতি দেখিয়া সহজেই অনুমান হয় যে নাট্যকার 'রাজস্থান' গ্রন্থস্থ প্রতাপসিংহের অতুলনীয় স্বদেশপ্রেমের কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিযাছেন। কিন্তু প্রতাপসিংহের কাহিনীর উপর ভিত্তি কবিয়া লেখা হইলেও সেলিম ও অশ্রুমতীকে কেন্দ্র করিযা যে মূল কাহিনীটা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতেই নাটকের লক্ষ্য ও প্রাণ সঞ্চারিত হইযাছে। অশ্রুমতী এবং তাহার প্রেমবৃত্তান্ত সম্পূর্ণ অমূলক এবং অনৈতিহাসিক গ্রন্থকার নিজেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। নাটকখানি প্রকাশিত এবং অনূদিত হইবার পর প্রতাপসিংহের কন্যা সেলিমের অনুরাগিণী হইযাছে দেখিযা অনেক অবাঙালী পাঠক ও দর্শক বিশেষ ক্ষুব্ধ হন, এবং গ্রন্থকাবের বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানী সমাজে কিছুদিন প্রবল আন্দোলন চলে।১ এই সমস্ত বিক্ষোভ এবং অভিযোগের উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেন যে অশ্রুমতীর কাহিনী কাল্পনিক হইলেও, তাহা দ্বারা প্রতাপসিংহের চরিত্র-গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আমরা সেই বিষয়টি আলোচনা করিয়া দেখিব।

'অশ্রুমতী' নাটকখানি পড়িলেই বুঝা যায যে, ইহার মধ্যে দুইটী কাহিনী দর্শকের মনকে দ্বিখণ্ডিত করিযা রাখে। নাট্যকার যদি প্রতাপসিংহের বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগের চিত্র অংকন না করিতেন তবে অশ্রুমতীর কাহিনী যেভাবে ইচ্ছা গঠন করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁহার ছিল। কিন্তু প্রতাপসিংহের সুমহান, স্বদেশহিতব্রতী চরিত্র সতত দর্শকের মনে জাগরূক থাকাতে, তাঁহার কন্যার প্রেমকে আর আলাদা, বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। যে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতাপ মৃত্যুপণ সংগ্রাম করিযাছেন, যাহাকে তিনি নিজের এবং স্বদেশের ঘোরতর শত্রু মনে করেন, তাঁহাকেই যখন প্রাণসমা কন্যা আত্মদান করিয়া বসিল তখন যে প্রতাপের অভ্রভেদী গৌরব-চূড়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল তাহাতে সন্দেহ নাই। অশ্রুমতীর পক্ষে সেলিমকে ভালোবাসা অন্যায় নহে, কিন্তু সেই ভালোবাসা যে পিতার আদর্শ ও গর্বকে আঘাত করিযা ছোট করিয়া দিয়াছে ইহাতেই দর্শকের মন অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। আরও একটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে। মানসিংহ প্রতাপের অবমাননার প্রতিশোধ দিবার জন্যই অশ্রুমতীকে অপহরণ করাইয়া ফরিদের সহিত তাহার

---

১ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'—পৃঃ ৭৬-১০০ দ্রষ্টব্য।

বিবাহ দিয়া প্রতাপের কুলগৌরব নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেম। সেলিমকে হৃদয় দান করিয়া অশ্রুমতী স্বেচ্ছায় মানসিংহের সেই সংকল্পে পরোক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে অশ্রুমতী ভীলেদের মধ্যে পালিত হইয়াছিল, সুতরাং পিতার আদর্শ ও গৌরব সে জানিত না।১ ইহার উত্তরে বলা যায় যে অশ্রুমতী যখন অপহৃত হইয়াছিল, তখন সে ভীলদের মধ্যে ছিল না, পিতামাতার সহিত পর্বতের কন্দরে কন্দরে ঘুরিতেছিল, সুতরাং পিতার কষ্টস্বীকার এবং সুদৃঢ় সংকল্প সে বুঝিত না ইহা অস্বাভাবিক। সেলিমের বন্দিনী হইয়া যখন সে বাস করিতেছিল তখন সে যথেষ্ট সেয়ানা হইয়াছে, কামদেবের রীতিনীতি বুঝিতে পারিয়াছে, কেবল এইটুকুই সে বুঝে নাই যে তাহার প্রেমাস্পদ তাহারই পিতার ঘৃণিত শত্রু। প্রকৃতপক্ষে 'Love is ever blind' এই নীতি দেখাইয়া অশ্রুমতীর প্রেমকে সহানুভূতির চোখে দেখা যাইত, যদি নাট্যকার তাহার মনের মধ্যে প্রেম এবং কর্তব্যের দ্বন্দ্ব দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু অশ্রুমতী সেলিমের প্রেমে এতই সমাহিত হইয়া পড়িয়াছে যে নিজের পরাধীন অবস্থাতেও তাহার কোনো অ-সুখ নাই, এবং পিতা মাতা এবং স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও তাহার কোনো অসন্তোষ কিম্বা অশান্তি নাই। সেলিম তাহাকে নিতান্ত অন্যায়ভাবে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ইহাতেও তাহার মনের মধ্যে কোনো অভিমান কিংবা অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই, পিতার সুকঠোর আদেশ সত্ত্বেও সে তাহার প্রণয়াস্পদকে ভুলিতে পারে নাই—এই সব কারণে তাহার প্রেমের মধ্যে একটা আত্যন্তিক হীনতাএবং বিরক্তিকর দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়।

নাটকের মধ্যে প্রতাপসিংহের কাহিনী প্রথম অঙ্কে চমৎকারভাবে বর্ণিত হইলেও পরে নিতান্ত গৌণ হইয়া আসিয়াছে। নাট্যকার দুইটী কাহিনীকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করিয়া শেষ পর্যন্ত চালিত করিতে পারেন নাই। নাটকখানি অত্যন্ত দীর্ঘ, কেবলমাত্র চতুর্থ অঙ্কেই সপ্তদশটী দৃশ্য রহিয়াছে। এইজন্য অভিনয়ের পক্ষে ইহা উপযোগী নহে। সেলিম, ফরিদখাঁ, মলিনা, অশ্রুমতী প্রভৃতি কয়েকটী চরিত্রের বারবার প্রবেশ দর্শকের পক্ষে নিশ্চয়ই বিরক্তিজনক।

সেলিমের মধ্যে ঈর্ষা ও বিশ্বাসের যে অস্থির দোলায়মান অবস্থা নাট্যকার দেখাইয়াছেন তাহা খুবই চমৎকার হইয়াছে। Othelloর মতই সে ঈর্ষা-বিষে জর্জরিত হইয়া নিতান্ত

---

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'ভারতমিত্রের' সম্পাদককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে আছে 'অশ্রুমতী অতি শিশুকালেই নিরুদ্দেশ হয় এবং বহুকাল ভীলেদের নিকট থাকায় এবং তাহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ায়, নিজের কুল ধর্মজ্ঞান তাহার মন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সে জানিত না—কে রাজপুত, কে মুসলমান, সেলিম তাহাকে দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে মনে করিয়া তাহার প্রতি প্রথমে সে কৃতজ্ঞ হয়, পরে সেই কৃতজ্ঞতা প্রেমে পরিণত হয়। ইহা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে।'

'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'—মন্মথনাথ ঘোষ, পৃঃ ৮২।

অন্যায়ভাবে প্রণয়িনীকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এবং পরে অনুতাপের সুতীব্র অগ্নিতে নিজেকে দগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সেলিমের যে উদারতা ও মহত্ত্ব দেখিয়া অশ্রুমতী তাহার প্রেমে পড়িয়াছে বলিয়া দেখান হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে সেই সব গুণ তাহার মধ্যে নাই। পৃথ্বীরাজের কাছে মুক্তিপণ পাইয়াও সে অশ্রুমতীকে মুক্তি দিতে রাজী হয় নাই, এবং নিজের স্বার্থপর প্রেমকে নির্বাধ, নিষ্কণ্টক করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র ফরিদ খাঁর। ইয়াগোর মতই সে তাহার ক্রূর ষড়যন্ত্রের কুণ্ডলীকৃত চক্রের মধ্যে সকলকে আনিয়া নিষ্পেষিত করিয়াছে। মলিনার প্রেমমুগ্ধ পৃথ্বীরাজ অকস্মাৎ কিভাবে অশ্রুমতীর প্রতি আসক্ত হইলেন তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। মলিনার প্রতি একনিষ্ঠ থাকিয়াও যদি শুধুমাত্র প্রতাপসিংহের গৌরবরক্ষা করিবার কর্তব্যের প্রেরণায় অশ্রুমতীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইতেন তবেই তাঁহার চরিত্রের সামঞ্জস্য ও সার্থকতা থাকিত। পৃথ্বীরাজের দ্বারা অবজ্ঞাত ও অবহেলিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি নির্লজ্জ-ভাবে প্রেম নিবেদন করিয়া মলিনা নিজের চরিত্রকে হীন ও ছোট করিয়া ফেলিয়াছে। ট্র্যাজিক নায়িকার নির্লিপ্ত উদাসীনতা এবং সংহত শোক তাহার মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। ভ্রাতৃবৎসল, কুলরক্ষাব্রতী শক্তসিংহের চরিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

॥ স্বপ্নময়ী (১৮৮২)॥ আরংজীবের রাজত্বকালীন তালুকদার শুভসিংহের বিদ্রোহকে ভিত্তি করিয়া এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে। কিন্তু নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনাকে নূতন-ভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। 'স্বপ্নময়ী'কে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় কিনা সন্দেহ, কারণ ইতিহাসের পটভূমিকায় লিখিত হইলেও ইহা ঐতিহাসিক অতীত হইতে আমাদের দৃষ্টিকে বিসারিত করিয়া সামাজিক বর্তমানের উপর নিবদ্ধ করে। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ এবং গূঢ় কৌতুকরসে নাটকখানি বিশেষ প্রাণবান এবং উপভোগ্য হইয়াছে। ঠিক এই ধরণের সূক্ষ্ম, ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যঙ্গ-কৌতুক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্য কোনো নাটকে দেখা যায় নাই। অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে এই নাটকের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। অবশ্য যে-সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন তখন সবে-মাত্র রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তখনও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবে 'স্বপ্নময়ী'র নাটকীয় ভঙ্গি ও চরিত্র রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকের পূর্বাভাস বটে। 'স্বপ্নময়ী'র মধ্যে যে গীতিকাব্যের প্রাধান্য আছে তাহা রবীন্দ্রনাথের গীতধর্মী নাটকের কথা মনে করাইয়া দেয়। বিদ্রোহী নেতা শুভসিংহের মধ্যে দয়া ও কোমলতার সমাবেশ দেখিয়া 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র বাল্মীকির সহিত তাহার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য অনুভূত হয়। ভাবময় idea-রূপিণী স্বপ্নময়ীর চরিত্র রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকের স্ত্রী-চরিত্রের অনুরূপ। নকল দেবতা এবং তাহার প্রতি স্বপ্নময়ীর দুর্বার, দুষ্প্রতিরোধ্য আকর্ষণ 'রাজা' নাটকের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। সাধারণ লোকেদের ধর্মবিশ্বাস এবং কুসংস্কার লইয়া নাট্যকার যে রকম পরিহাস করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও বহু কবিতা ও নাটকে সেই ধরণের পরিহাস অনেক করিয়াছেন।

শাস্ত্র-বিলাসী, সংসার-অনভিজ্ঞ, স্নেহপরায়ণ রাজা কৃষ্ণরামের ভূমিকা খুবই মনোরম হইয়াছে। এই সরল, যুদ্ধবিমুখ, অনুকম্প্য বৃদ্ধের বিরুদ্ধে যে হিংস্র বিদ্রোহ পুঞ্জীভূত হইয়া নির্মম আঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে—তাহা অত্যন্ত করুণ ও মর্মান্তিক হইয়াছে। কৃষ্ণরামের শোকাবহ পরিণতি এবং স্বপ্নময়ী ও শুভসিংহের জীবনের শোচনীয় ব্যর্থতা দেখিয়া দর্শকের মনে উগ্র স্বাদেশিক বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং স্বদেশ-প্রেমের উদ্বোধন যদি নাট্যকারের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে এই নাটকে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। ক্রূর ষড়যন্ত্রকারী রহিম খাঁর চরিত্রের মধ্যে কৌতুকরসের সৃষ্টি করা সঙ্গত হয় নাই; কারণ বাতিকগ্রস্ত, পাগলাটে লোক দেখিলে আমরা হাসি বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের কোণে অজ্ঞাতসারে অনুকম্পাশীল সহানুভূতি জমা হইয়া থাকে। কিন্তু রহিম খাঁর প্রতি উদ্যত সহানুভূতি তাহার কুটিল এবং চক্রান্তকারী ক্রিয়া দ্বারা আহত হয়। জেহেনা চরিত্রের মৌলিক অভিনবত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছলনাময়ী, কুহকিনী রমণী যে ভাবে তাহার বাহ্য সারল্য এবং কোমলতা দ্বারা অন্তরের কাম-কুটিল অভিসন্ধি সিদ্ধ করিয়াছে তাহা দর্শকের আগ্রহশীল চিত্তকে চমৎকৃত করিয়া রাখে।

## (খ) প্রহসন

বীর-রসাশ্রিত, বিষাদাচ্ছন্ন নাটক রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও. তরল ও চপল হাস্যমুখর প্রহসনেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিশিষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে মাইকেল ও দীনবন্ধু শ্রেষ্ঠ প্রহসন লিখিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু সত্য উদ্‌ঘাটনের ব্রত লইয়া তাঁহাদিগকে সমাজের পঙ্কপল্বলে নামিতে হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহাদের অঙ্গের স্থানে স্থানে ক্লেদ ও কলুষের ছাপ লাগিয়া গিয়াছিল। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ক্লেদাক্ত বাস্তব সমাজের গভীর প্রদেশে দৃষ্টিপাত করেন নাই, সমাজের কোনো দুরূহ সমস্যার উপর অভ্রান্ত আলোকপাতও করেন নাই। সেজন্য শালীনতার গণ্ডি কোনো সময়ে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হয় নাই। দীনবন্ধু প্রভৃতি ঝড়ো হাওয়ার বেগে সমাজের ছদ্মবেশটা উড়াইয়া লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৃদু মলয় পবনের ন্যায় সেই বেশটা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন মাত্র; সুতরাং তাঁহার নাটকে বাস্তবের নগ্নতা ফুটিয়া উঠে নাই। যেখানে ভদ্রতার বালাই নাই, নীতি ও নিয়মের চোখ-রাঙ্গানি নাই, সেখানে হাস্যরস অনর্গল ও সশব্দ হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু সুরুচিসম্পন্ন, ব্রাহ্মধর্মাশ্রয়ী নাট্যকারের কাছে হাস্যরস এইরূপ অবাধ প্রশ্রয় পাই নাই। প্রহসনকারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম হাস্যরসকে রুচির বশীভূত করিয়াছিলেন।

॥ কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২) ॥ তাঁহার প্রথম প্রহসন। এই প্রহসনে নব্যতন্ত্রী স্বাধীনতা-প্রয়াসী ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্যঙ্গ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই ব্যঙ্গে জ্বালা নাই, এবং তাহা

গ্রন্থের সর্বত্রপ্রসারীও নহে। গ্রন্থের প্রথম ভাগেই কেবল পূর্ণ ও বিধুমুখীর কথোপকথনে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতি একটু কটাক্ষ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রহসনের কেন্দ্রীয় ঘটনার মধ্যে কোনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পরিস্ফুট হয় নাই। স্বামী-স্ত্রীর ঈর্ষাদগ্ধ সন্দেহ, এবং সেই সন্দেহের সুখকর নিরসনই প্রহসনের মধ্যে কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছে। যে পূর্ণচন্দ্র কিছুক্ষণ আগে পত্নীর কাছে জোর গলায় বলিয়াছে যে 'বাস্তবিক আমার মনে কোন কু-সন্দেহ প্রায়ই উপস্থিত হয় না', সেই যখন পেরুরামকে দেখিয়া ঈর্ষা-ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছে তখন নিজেই সে অত্যন্ত উপহাসের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত হাস্যরস অব্যর্থ-লক্ষ্য তীরের ন্যায় কোনো ব্যক্তিবিশেষকে আঘাত করে না, ইহা তারাবাজির ন্যায় চতুর্দিকে আগুনের ফুল্‌কি ছড়াইতে থাকে। ইহার হাত হইতে কাহারো নিস্তার নাই। পূর্ণচন্দ্রের মিথ্যা সন্দেহে বিধুমুখী দর্শকের সহিত মিলিয়া খুব হাসিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে নিজেই সন্দেহের খপ্পরে পড়িয়া বেয়াকুব বনিয়াছে। এইভাবে সকলকেই নাকাল ও বিপর্যস্ত হইতে দেখিয়া পরিতুষ্ট হাস্যরসে আমাদের চিত্ত উল্লসিত হইয়া উঠে, হাসির বাতাসে বিদ্বেষ ও গ্লানির কণাটুকু পর্যন্ত উড়াইয়া নেয়। আলোচ্য প্রহসনের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র যখন পেরুরামের পিছনে তরবারী লইয়া ধাওয়া করিয়াছে, অথবা বিধুমুখী পেরুরাম ও তাহার স্বামীর নকল যুদ্ধ দেখিয়া আশঙ্কায় মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে তখনই আমাদের হাস্যরস বেশি উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্রের সন্দেহ অমূলক এবং বিধুমুখীর আতঙ্ক অকারণ, অথচ তাহারা ইহা জানে না, কিন্তু দর্শকের কাছে ইহা অজ্ঞাত নাই। সেইজন্য সে বিশেষ কৌতুক বোধ করে, এবং পাত্রপাত্রীদের নির্বুদ্ধিতার জন্য তাহাদিগকে হাস্যাস্পদ মনে করে।

॥ এমন কর্ম আর করব না (১৮৭৭)॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রহসন 'এমন কর্ম আর করব না' পরে 'অলীকবাবু' নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রহসনে সরস পরিহাসের লক্ষ্য দুইটী—মূর্খ অলীকের মিথ্যাভাষণ এবং নভেলী নায়িকা হেমাঙ্গিনীর রোমান্সপ্রিয়তা। ঘটনার পরম কৌতুকাবহ বৈচিত্র্য গদার দ্বারা ঘটিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অলীক অপেক্ষাও গদার সুচতুর কর্মতৎপরতা দৃষ্টি অধিকতর আকর্ষণ করে। গদা বার বার সাহায্য না করিলে অলীকের মিথ্যাবাদ যে কোনো মুহূর্তেই ধরা পড়িত, এবং অলীক ও গদার পরস্পর-সান্নিধ্যে গদার কথার তুবড়ির কাছে অলীককেও চুপ করিতে হইয়াছে। কিন্তু যে গদা অলীকের মিথ্যাভাষণের সহকারী ছিল তাহার দ্বারাই একই অবস্থার মধ্যে অলীকের স্বরূপ প্রকাশিত হওয়াটা যথার্থ হয় নাই। বস্তুত প্রহসনের শেষের দিকে ঘটনার সমাধান খুব স্বাভাবিক হয় নাই, অলীক মিথ্যা অস্ত্রের বলে বেশ জিতিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ যেন সকলে মিলিয়া তাহাকে 'অভিমন্যুবধ' করিয়া বসিল। ঘটনার অনিবার্য গতির পাকে পাকে জড়াইয়া যাইয়া তাহার আসল রূপটী যদি বাহির হইয়া পড়িত তবেই হাস্যরসের ধারা কোনো স্থলে ব্যাহত হইত না। গদার মুখে লম্বা বর্ণনার মধ্য দিয়া রহস্য উদ্‌ঘাটনের উপায়টী খুবই দুর্বল হইয়াছে। অলীকের বাক্য ও আচরণ সত্যসিন্ধুর কাছে হাস্যরসাত্মক নয়, কারণ সে অলীক অপেক্ষাও মূর্খ ও সরল, কিন্তু শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান

দর্শক শেকসপীয়ারের 'ওয়েবস্টার ডিকস্যনারি', বায়রণের 'চেম্বার্স অ্যাটলাস' এবং কালিদাসের 'মুগ্ধবোধ'-পড়া অলীকপ্রকাশের বিদ্যার দৌড় বুঝিতে পারে। তাহার মূর্খতা এবং সত্যসিন্ধু ও হেমাঙ্গিনীর নির্বুদ্ধিতা—দুই কারণেই দর্শক যথেষ্ট কৌতুক বোধ করে। হেমাঙ্গিনী বঙ্কিমের নভেল পড়িয়া, নভেলী নায়িকার ন্যায় নিজেকে ভাবিতে শিখিয়াছে, এবং তাহার ভাব ও আচরণ বাস্তব সংসারের সম্পর্ক হারাইয়া কল্পলোকে বিহার করিতে চহিয়াছে। মলিয়েরের 'Romantic Ladies' নামক প্রহসনের নায়িকাদ্বয়ের মত হেমাঙ্গিনীও রোমান্সের সন্ধানে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। অলীকপ্রকাশ একটা উপলক্ষ্য মাত্র, যে কোনো লোককেই সে নায়ক বলিয়া কল্পনা করিয়া তাহার সহিত সে নায়িকার ন্যায় আচরণ করিত। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং চরিত্র সংস্থানের উপর রসের বিকাশ এবং তাৎপর্য নির্ভর করে। মদের আড্ডাখানায় কেহ ধর্মকথা শুনাইলে ভক্তির উদ্রেক না হইয়া হাস্যরসের উদ্রেক হয়। হেমাঙ্গিনী প্রেমমূলক গুরুভাববিশিষ্ট কোনো কাহিনীর মধ্যে প্রকৃতই নায়িকা হইতে পারিত। কিন্তু তরল হাস্যোজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে তাহার প্রেমপরায়ণতা নিতান্তই বেমানান হইয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছে।

॥ হিতে বিপরীত (১৮৯৬)॥ এক বৃদ্ধ কৃপণের জব্দ হওয়ার কাহিনী লইয়া 'হিতে বিপরীত' প্রহসনখানি রচিত হইয়াছে। বিবাহ এবং বাসরঘরের দৃশ্যের সহিত দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই প্রহসনখানিতেও নিছক হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে, এবং ঘটনার অদ্ভুতত্ব এই হাস্যরসের মূল।

॥ হঠাৎ নবাব ১৮৮৪)॥ 'হঠাৎ নবাব' এবং দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ'—এই দুইখানা প্রহসন জগদ্বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের নাটকের অনুবাদ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের কাছে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ফরাসী সাহিত্যের গ্রন্থও বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'হঠাৎ নবাব' মলিয়েরের 'The Cit Turned Gentleman' (Le Burgeois Gentil homme) নাটকের অনুবাদ। অনুবাদ অবিকলভাবে মূল নাটককে অনুসরণ করিয়াছে, সেজন্য একমাত্র ভাষা ব্যতীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিকতা কিছুই নাই। মূল নাটকের পাত্রপাত্রীর নামের সহিত পর্যন্ত বাংলা অনুবাদগ্রন্থের পাত্রপাত্রীর সঙ্গতি রহিয়াছে। Jordan, Cleontes, Dorimene, Dorantes, Nicola, Coviel প্রভৃতি বাংলা প্রহসনে যথাক্রমে জুর্দনখাঁ, খেলাৎখাঁ, ডেলমনিয়া, দৌলৎখাঁ, নকুলিয়া, কবলুখাঁ রহিয়াছে। মলিয়েরের প্রহসনের বৈশিষ্ট্য এই যে, দৃশ্যের গোড়াতেই সব চরিত্রগুলির সমাবেশ হইয়া থাকে। মাঝামাঝি জায়গায় কোনো প্রবেশ এবং নিষ্ক্রমণ নাই, এবং অনেক দৃশ্যই খুব সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই, অথচ ইচ্ছা করিলেই তিনি এই রীতি ত্যাগ করিয়া সাধারণ এবং সচরাচর প্রচলিত রীতি গ্রহণ করিতে পারিতেন। মলিয়েরের প্রহসনখানায় উচ্চ এবং অভিজাত শ্রেণীতে স্থান পাইবার জন্য Jordan যে সব হাস্যকর চেষ্টা করিয়াছে সেগুলি লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হইয়াছে। তুর্কী উৎসব এবং অনুষ্ঠানের কৌতুকময় বর্ণনা অত্যন্ত সরস এবং হাস্যরসপূর্ণ হইয়াছে।

॥ দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ (১৩০৯) ॥ মলিয়েরের 'Marriage Force' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ' নাম দিয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই প্রহসনের অন্তর্গত ন্যায়রত্ন এবং বেদান্তবাগীশের দৃশ্য দুইটী লেখকের রসজ্ঞ মৌলিকতার পরিচায়ক। এই ধরণের জ্ঞানী পণ্ডিতদিগের নিবু দ্ধিতা লইয়া পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতা ও নাটক-প্রহসন রচনা করিয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ সাঙ্গ করিবার পূর্বে তিনি যে সংস্কৃত নাটকগুলি অনুবাদ করিয়াছিলেন সেইগুলি সম্বন্ধে তাঁহার কৃতিত্ব উল্লেখ না করিলে তাঁহার প্রতি অন্যায় হইবে। তিনি সমুদয় বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকগুলি বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং সাবলীল স্বাভাবিকতার গুণে সেই অনূদিত নাটকগুলি মূল গ্রন্থসমূহের ভাবের চমৎকারিতা এবং বর্ণনার পারিপাট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে তিনি নাটকের রসধারা পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহারা কৃতী অনুবাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। বাংলা সাহিত্যে যাঁহারা অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্থান পুরোভাগে ইহা জোর করিয়া বলা যায়।

## (২) কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' ও 'ভারতে যবন' এই দুইখানি নাটিকা অতি ক্ষুদ্রাকার হইলেও জাতীয় ভাবাত্মক নাট্য আন্দোলনের সূচনায় ইহাদের প্রভাব ছিল অনেকখানি। নাট্যকার এই নাটিকা দুইখানিকে মাস্ক (রূপক) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'ভারতে যবনে'র ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, 'বঙ্গভাষায় ভারতমাতা প্রথম মাস্ক (রূপক)। সাধারণ ব্যক্তিগণ ভারতমাতার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে ভারতে যবন দ্বিতীয় মাস্ক রচনা করিলাম।' 'ভারতমাতা'র মধ্যে ইংরাজ রাজত্বকালীন অবস্থা ও 'ভারতে যবনে'র মধ্যে মুসলমান শাসনাধীন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। দুইখানি নাটিকাতেই ভারতীয় সন্তানগণের দুঃখদুর্গতি দেখাইয়া ইংরাজ ও মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ উদ্দীপিত করা হইয়াছে।

॥ভারতমাতা (১৮৭৩)॥ 'ভারতমাতা'র মধ্যে জাতীয়ভাবের অবতারণা হইলেও শেষ পর্যন্ত দীনদুঃখী ভারতসন্তানের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছেন কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়া। সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ শাসন মুক্তির অভিপ্রায় ইহাতে অদৃশ্য। দুইটি সাহেবের চিত্র অঙ্কন করিয়া লেখক দেখাইতে চাহিয়াছেন যে সাহেবদের মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয় শ্রেণীর লোকই আছে। সেজন্য সৎ সাহেব ও সদয়া মহারাণীর করুণা উদ্রেকের চেষ্টাই রহিয়াছে নাটিকার মধ্যে। পরিশেষে ধৈর্য, সাহস ও একতা এই তিনটি চরিত্র আনিয়া আভাস দেওয়া হইয়াছে যে, এইগুলিই পরাধীন ভারতবাসীর মুক্তিপথের ঐকান্তিক অবলম্বন।

॥ ভারতে যবন (১৮৭৪) ॥ 'ভারতে যবনে'র মধ্যে মুসলমানগণের নানাবিধ অত্যাচার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই অত্যাচার সহিয়াও ভারতসন্তান নিশ্চেষ্ট ও প্রতিকারহীন। দুঃখে অভিমানে ভারতলক্ষ্মী বলিলেন, 'যতদিন আর্যসন্তানগণ পুণ্য-ভূমি হতে যবনগণকে দূরীভূত কোরতে না পারবে, ততদিন অবধি প্রিয় ভারতভূমির সুখে বঞ্চিত হলেম, আদরের আর্য সন্তানগণের নিকট হতে বিদায় হলেম। যদি কখন ভারতমাতার দুঃখ দূর হয়, আমারও হবে। নচেৎ এই শেষ।' নাটিকার শেষে ভারত-সন্তানের উদ্দীপিত ভাষণ ও সাহসিক সংগ্রামের বর্ণনা রহিয়াছে।

## (৩) হরলাল রায়

হরলাল রায়ের নাটকে রোমান্টিক কাহিনী থাকিলেও জাতীয় ভাবোদ্দীপনাই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বীরত্ব ও মহাপ্রাণতার আদর্শ হরলালকে উদ্বোধিত করিয়াছিল, সেজন্য স্বদেশী ভাবানুপ্রাণিত জনসাধারণের কাছে তাঁহার নাটক সহজেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। হরলালের কয়েকখানি নাটকের মধ্যে তাঁহার জাতীয় ভাবাত্মক নাটক দুইখানিই সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ঐ দুইখানি নাটকের নাম 'হেমলতা নাটক' ও 'বঙ্গের সুখাবসান'।

॥ হেমলতা ( ১৮৭৩ ) ॥ 'হেমলতা নাটক' নায়িকা হেমলতার নামাঙ্কিত। কিন্তু হেমলতার প্রভাব নাটকের মধ্যে নিতান্তই সামান্য। প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রধান চরিত্র হইল বীরশ্রেষ্ঠ সত্যসখা। সেই তেজসিংহের কবল হইতে চিতোররাজ বিক্রমসিংহকে উদ্ধার করিয়াছে এবং যবনের আক্রমণ হইতে চিতোরপুরীকে রক্ষা করিয়াছে। যেভাবে সত্যসখার আসল পরিচয় গোপন করিয়া ঘটনার পর ঘটনার মধ্য দিয়া দর্শকদের সাগ্রহ কৌতূহল বজায় রাখা হইয়াছে তাহাতে নাট্যকারের সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। বহ্বাড়ম্বর ও অতিনাটকীয় উপাদান কম আছে বলিয়াই এই নাটকের প্রতি কোথাও আমাদের মনে তেমন অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মায় না।

॥ বঙ্গের সুখাবসান ( ১৮৭৪ ) ॥ বক্তিয়ার খিলিজি কর্তৃক বঙ্গবিজয় বাংলার ইতিহাসের এক চিরকলঙ্কিত অধ্যায়। নাট্যকার সেই অধ্যায়টি অপরিমেয় বেদনার অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া দর্শকদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। বঙ্গবিজয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা লইয়া নাটকখানি রচিত। বৃদ্ধ রাজা লাক্ষ্মণ্য সেন গুরু গোবিন্দ ভট্টাচার্যের আদেশে ও মন্ত্রী মহেন্দ্রের প্ররোচনায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করিয়া বাংলার সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার এই আচরণ ক্ষমার অযোগ্য হইলেও নাট্যকার তাঁহার চিত্তে তীব্র আক্ষেপ ও আত্মগ্লানি সঞ্চার করিয়া তাঁহার প্রতি করুণা আকর্ষণ করিয়াছেন। বস্তুত এই নাটকের মধ্যে কোন চরিত্রকেই অবিমিশ্র মন্দ করিয়া অঙ্কন করা হয় নাই। বিশ্বাসঘাতক

মহেন্দ্রের মধ্যেও যথেষ্ট দ্বিধা ও অন্তিম মনস্তাপ দেখান হইয়াছে এবং বক্তিয়ার বিধর্মী পর-রাজ্যহারী হইলেও ক্ষমা ও মনুষ্যত্ব-ধর্ম হইতে যে বঞ্চিত নহেন তাহাই পরিস্ফুট করা হইয়াছে। লাক্ষ্মণ্য সেনের দুঃখব্রতী বীর ভ্রাতুস্পুত্র বিরাট সেন ভীরুতার লতাগুল্মের মধ্যে এক উচ্চশির শালবৃক্ষ। বাংলার একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রাণান্তকর চেষ্টা করিয়াও সে এই নির্জীব জড়ীভূত জাতিকে জাগাইতে পারিল না। মর্মান্তিক বেদনায় সে বলিয়াছে—'কোটি বাঙালীর মধ্যে দশ জন স্বদেশ উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত নয়। প্রাণে এত মমতা? দুদিনের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কি এত বড় হল, আর স্বাধীনতা কিছুই নয়! বাঙালীরা কি জীবিত আছে? বাঙালীরা জীবিত নাই—সেদিন ছিল না, আজও নাই।

## (৪) উপেন্দ্রনাথ দাস

রোমাঞ্চকর ও অতিনাটকীয় উপাদান দ্বারা সুলভ জনপ্রিয়তার অধিকারী হইলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। স্থায়ী নাট্যরসসমৃদ্ধ না হওয়াতে সমসাময়িক কালের সীমিত ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া এই জনপ্রিয়তা পরবর্তী কালে বিস্তৃত হইতে পারে নাই।[১] নাটক যে আরব্য উপন্যাস নয় এবং নাটকের action ও ফুটবল খেলার actionএর মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা তৎকালীন রোমাঞ্চপ্রিয় অনেক নাট্যকারই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, উপেন্দ্রনাথও এই ভুল কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত নরনারী-সমাজ লইয়া তিনি নাটক রচনা আরম্ভ করিলেন, সেজন্য একটা স্বতন্ত্র, সংস্কারমুক্ত মনোভাব তাহাদের মধ্যে দেখা গেলেও মাঝে মাঝে তাহাদিগকে যে একটু আড়ষ্ট ও অসামাজিক বোধ হয় তাহাও সত্য। শিক্ষিত যুবক যুবতীর মধ্যে যে তৎকালে ইংরাজ বিদ্বেষী ও স্বদেশহিতৈষী স্বদেশগর্বী ভাব জাগ্রত হইয়াছিল নাট্যকার নাটকে তাহার অবতারণা করিলেন। কিন্তু কোন মহৎ ভাব স্থান, কাল পরিবেশের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে না পারিলে যে তাহা লঘু ও নিরর্থক হইয়া পড়ে তিনি সম্ভবত তাহা জানিতেন না। 'শরৎ সরোজিনী'র কথাই ধরা যাক। এক ইংরাজ সার্জনের সঙ্গে লড়াই করিয়া শরৎ যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় হয়তো দিয়াছে, অথবা কয়েকটি গোরা ডাকাতকে নিপাত করিয়াছে কিন্তু সেই জন্যই এই কর্মগুলিকে উচ্চধরনের জাতীয়তার অঙ্গ বলা যায় না। সমগ্র নাটকের মধ্যে কোথাও জাতীয় ভাবের অনুকূল পরিবেশ নাই, সেজন্য মাঝে মাঝে তরল জাতীয়তার বহ্বাস্ফোট থাকিলেও ইহাকে জাতীয় ভাবোদ্দীপিত নাটক বলা চলে না।

১। উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটক তৎকালে যে কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা 'শরৎ-সরোজিনী' সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা হইতে কিছুটা অনুমান করা যায়। 'বাঙ্গলা ভাষায় এ পর্যন্ত যতগুলি নাটক লেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে এখানি সর্বোৎকৃষ্ট না হউক, দুই একখানি ব্যতীত ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক একখানিও অদ্যাবধি বাহির হয় নাই।'

॥ শরৎ-সরোজিনী ( ১৮৭৫ ) ॥ শরৎ-সরোজিনী এবং বিনয়-সুকুমারীর অনুরাগ ও নানা বাধা-বিপত্তির অবসানে তাহাদের মিলনই হইল নাটকের আখ্যান-বস্তু। পাষণ্ড-চেতা মতিলালের দ্বারাই নাটকের যাবতীয় সংকট-জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অসংগত ঘটনা সরোজিনীর গৃহত্যাগ। শরতের গৃহে পালিতা হইয়া হঠাৎ তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার মধ্যে কোন বিশ্বাস্য কারণ অনুমান করা যায় না। তাহাদের অনুরাগের মধ্যে কোন বাধা-বিপত্তিও উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং সরোজিনীর আকস্মিক বৈরাগ্য অর্থহীন। যদি প্রণয় সংকট এড়াইবার জন্যই সে শরতের আশ্রয় ছাড়িয়া গেল তবে ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় আসিয়া আবার সেই সংকটের মধ্যে ধরা দিল কেন? যাহাই হউক সরোজিনীর ছদ্ম পরিচয় প্রকাশের দৃশ্য যে অত্যন্ত কৌতূহলসূচক ও নাটকীয় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান দস্যুদের হস্তে শরতের বন্দী হইবার ঘটনা একেবারেই উদ্ভট ও নাট্যসম্পর্কহীন। মূল চরিত্রগুলি অপেক্ষা কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র অনেক বেশি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞান-পাগল হরিদাস, কলঙ্কিতা অথচ পরহিতপ্রাণা ভুবনমোহিনী এবং দুর্দান্ত শয়তানরূপী মতিলাল চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

॥ সুরেন্দ্র-বিনোদিনী ( ১৮৭৫ ) ॥ 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' প্রণয়মূলক সামাজিক নাটক হইলেও ইহা সুলভ জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত। নাটকে চমৎকারিত্ব সঞ্চার করিবার জন্য লেখক মারামারি ও পিস্তল ছোঁড়াছুঁড়ির আধিক্য দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে বীররসের গাম্ভীর্য নাই, আছে কেবল নকল বীরত্বের হাস্যকর তারল্য। সুরেন্দ্র ও বিনোদিনী নাটকের নায়ক ও নায়িকা। ইহাদের প্রণয়, প্রণয়ের বাধা ও পরিশেষে মিলনই নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয়। কিন্তু ইহাদের যে প্রণয় চিত্রিত হইয়াছে তাহা ভাবাতিশয্যে এবং উচ্ছ্বাস-প্রাবল্যে তরল ও সংবেদনহীন হইয়া পড়িয়াছে। 'The course of true love did never run smooth' একথা সত্য, কিন্তু সুরেন্দ্র ও বিনোদিনীর মধ্যে যে সাময়িক ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে তাহার তেমন জোরালো কারণ নাই। তাহাদের মনে যে ভ্রান্ত সংশয় ও দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা কোন জটিল ঘটনার আবর্তে ঘটে নাই। একমাত্র হরিপ্রিয়ের বাক্যে ও চক্রান্তে এই সংকটের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু হরিপ্রিয়ের অনিষ্টকারিতা ইয়াগোর মত একেবারেই অকারণ ও উদ্দেশ্যহীন। হরিপ্রিয় সুরেন্দ্র ও বিনোদিনীর মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করিতে যাইয়া নিজেই বলিয়াছে—'ছেলেবেলা সকলের সঙ্গে খুঁসুড়ি মুসুড়ি করতেম বলে, বাবা আমাকে শয়তানের অবতার বলে ডাকতেন। তা, মা দুষ্ট সরস্বতী এখনও আমার ঘাড় থেকে নাবেন নি। মানুষে মানুষে ঝগড়া বাধিয়ে দিতে পারলে আমার বড়ই আহ্লাদ হয়।' কিন্তু শুধু কেবল একটা দুষ্ট খেয়ালের ফল স্বরূপ এরূপ ঘনীভূত সংকট সৃষ্টি করা মোটেই সঙ্গত ও স্বাভাবিক হয় নাই। হরিপ্রিয় সুরেন্দ্রের ভগ্নী বিরাজমোহিনীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল, সুতরাং নিতান্ত অকারণে সুরেন্দ্রর ক্ষতি করিতে যাওয়া তাহার নিজের পক্ষেও সঙ্গত ও লাভজনক নহে। ম্যাক্রেগুলের সহিত সুরেন্দ্রর শত্রুতার ফলে নাটকের মধ্যে রোমাঞ্চকর ঘটনা ও স্বাদেশিক ভাবালুতার অবতারণা হইয়াছে। ম্যাক্রেগুল তৎকালীন

গর্বোদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারী ইংরাজ রাজকর্মচারীর এক অতি নিখুঁত প্রতিনিধি। সুরেন্দ্রকে সে বলিয়াছিল, 'নির্বোধ, আমি বাইবেল চুম্বন করিয়া শপথ পূর্বক যাহা বলিব, তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের দুইশত বাঙালির সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।' কথাগুলি দেশীয় লোকেদের প্রতি তৎকালীন ইংরাজের মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতেছে। ঔদরিক ন্যায়রত্ন মহাশয় এবং সরল-স্বভাব নীলকণ্ঠ নাটকের মধ্যে যে হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছে তাহা স্থূল হইলেও উপভোগ্য। পূর্ববংগবাসীদের প্রতি বিদ্রূপ প্রিয়তা ন্যায়রত্নের চরিত্রের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। হাস্যপরিহাসপ্রিয় বৃদ্ধ রাজচন্দ্র বসুর কথাগুলি বিশেষ সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

॥ দাদা ও আমি ( ১৮৮৮ )॥ আলোচ্য নাটকখানিও রোমান্টিক ভাবাপন্ন, তবে নাট্যকারের পূর্বোক্ত প্রসিদ্ধ নাটক দুইখানির ন্যায় ইহা বীররসাত্মক নহে, লঘু হাস্যরসাত্মক। ধীরেন্দ্রকুমার ও অনন্তকুমার দুই ভাই, দুই ভাইয়ের মধ্যে ভালোবাসা এতই গভীর যে তাহারা ভাইয়ের গণ্ডি ছাড়াইয়া বন্ধুর সীমানায় প্রবেশ করিয়াছে। বিবাহ সম্বন্ধে তাহাদের বড়ই অনিচ্ছা. নারী সমাজ সম্বন্ধেও তাহাদের আশঙ্কার অন্ত নাই। অবশ্য কিভাবে তাহাদের অনিচ্ছা কাটিয়া গেল এবং আশঙ্কা আকাঙ্ক্ষায় পরিণতি লাভ করিল তাহা নাটকের মধ্যে যথাযথ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নাটকের কাহিনীর মধ্যে রহস্যজটিল ভাবটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাট্যকার ঘটনাবিন্যাসের কৌশল দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রণয় ও পরিহাসের দুইধারা ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া নাটকের মধ্যে এক স্নিগ্ধ সরস পরিবেশ রচনা করিয়াছে। তবে জায়গায় জায়গায় দুই ভাইয়ের ছেলেমি ও ছ্যাবলামি একটু অশোভন হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

## ( ৫ ) উমেশ চন্দ্র গুপ্ত

॥ হেমনলিনা ( ১৮৭৪ )॥ কাল্পনিক ইতিবৃত্তমূলক রোমান্টিক নাটক যে কতখানি নিকৃষ্ট হইতে পারে তাহার একটি দৃষ্টান্ত বর্তমান নাটকখানি। প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক সব প্রকার হাবভাব ও পরিবেশ ইহাতে আছে। বীর, রৌদ্র, আদি, হাস্য ও করুণ কোনপ্রকার রসেরও অভাব নাই ইহাতে, কিন্তু তবুও নাটকের কোন গুণই ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সংস্কৃত নাটক, শেকসপীয়ারের নাটক, এমন কি রঙ্গলাল-বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবও আলোচ্য নাটকে অতি সহজেই ধরা যায়; কিন্তু ভাব, চরিত্র ও কার্যকারণের কোন প্রকার সঙ্গতি ইহাতে চোখে পড়ে না। উদয়পুরের বর্তমান রাজা যশোবন্ত সিংহ অন্যায়ভাবে রাজ্য হস্তগত করিলেও নাটকের মধ্যে তাহার যে চরিত্র ও আচরণ আমরা দেখিয়াছি তাহাতে তো তাহার প্রতি বরং অনুকম্পা ও সহানুভূতিই জাগ্রত হয় এবং হেমচন্দ্র ও নাগরিকগণ যে ব্যবহার তাহার সহিত করিয়াছে তাহা নিতান্তই নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন বলিয়া মনে হয়।

ছদ্ম ব্রহ্মচারীর কারসাজিতে নলিনী ও হেমচন্দ্র উভয়েরই প্রাণবিয়োগ হইল, অথচ তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় সকলেই একেবারে ঢলিয়া পড়িয়াছে। এরকম উৎকট অসঙ্গতি যে নাটকের মধ্যে কত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

॥ বীরবালা (১৮৭৫)॥ নাটকের শিরোনামা ব্যাখ্যা করিয়া লেখা হইয়াছে—'সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকবীর সিলিউকস এবং মগধেশ্বরের যুদ্ধ।' কিন্তু এই যুদ্ধ অপেক্ষা বীরবালা এবং চন্দ্রগুপ্তের প্রণয়কাহিনীই নাটকের মধ্যে বেশি প্রাধান্য পাইয়াছে। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন, 'উমেশচন্দ্রের বীরবালা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকের পরিকল্পনা যোগাইয়াছিল'। কিন্তু উভয় নাটকের পরিকল্পনা, পরিবেশ এবং পাত্রপাত্রীদের চরিত্রসৃষ্টিতে যথেষ্ট পার্থক্য রহিযাছে। গ্রীক চরিত্রগুলির নামগুলিই যে শুধুমাত্র হিন্দু হইয়াছে তাহা নয় (যথা—শিলবক্ষ, বীরবালা দামিনী, কুশলা) তাহাদের স্বভাব-প্রকৃতিও আগাগোড়া বদলাইয়া সম্পূর্ণরূপে হিন্দু-বাঙালীর অনুরূপ হইয়া পড়িযাছে। বীরবালা যেন পূর্বরাগিণী শ্রীরাধা, শুধু কেবল চন্দ্রগুপ্তের নাম শুনিয়াই সে উন্মাদিনী —'নাম পরতাপে যারে ঐছন করল গো—' তাহার উদ্বেলিত ভালবাসা উচ্ছ্বসিত প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে—পিতার পরাজয়, অপমান—কিছুতেই সেই প্রবাহে ভাঁটা কিংবা কোন আবর্তও দেখা যায় নাই। নাটকের মধ্যে হিন্দু-গৌরব ও বীরত্বের উদ্দীপিত বর্ণনা আছে। যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা বীররসের অনুপ্রেরণা ইহাতে সঞ্চার করা হইযাছে। চাণক্যের ছায়াপাত নাই বলিযা এই নাটকে চন্দ্রগুপ্ত প্রকৃত শৌর্য-বীর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। নাটকের নায়িকাকে বীরবালা না বলিয়া নীরবালা বলাই সঙ্গত, অর্থাৎ তাহার মধ্যে বীররস অপেক্ষা করুণ-রসেরই আধিক্য বেশি।

॥ মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক (১৮৭৫)॥ লেখকের মতে আলোচ্য নাটকখানি 'আরঙ্গজীবের সমসাময়িক প্রকৃত ঘটনাময় দৃশ্যকাব্য।' কিন্তু এই প্রকৃত ঘটনা ইতিহাসের নেপথ্যেই ঘটিয়াছে, সেইজন্য নাটকখানির ঐতিহাসিক মূল্য খুব সামান্যই। আরঙ্গজীবকে নাটকের শেষে নিতান্তই অকারণে অতর্কিতভাবে আনা হইয়াছে। নাটকের মূল ঘটনাগতির সহিত শম্ভুজী-আরঙ্গজেবের সংঘাত অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত নহে। শম্ভুজীর কামলালসা ও তাহার ফলে একটি উদারচেতা বীরসৈনিক ও তাহার নিষ্পাপ প্রণযিনীর শোকাবহ পরিণতিই নাটকের আসল আখ্যানবস্তু। তবে নাট্যকার শম্ভুজীর চরিত্রে যে অন্তিম অনুতাপ ও স্বদেশপ্রাণতার লক্ষণ চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে চরিত্রটি অন্যায়কারী অপরাধী হইলেও আমাদের অনুকম্পা হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না। তৎকালীন রোমান্টিক নাটকগুলির ন্যায় এই নাটকেও প্রেমের সর্বময় প্রভাবকেই একটু অসঙ্গত আতিশয্যের দ্বারা সকলের উপরে স্থাপন করা হইয়াছে।

### (৬) প্রমথনাথ মিত্র

॥ নগ-নলিনী ( দ্বি-স ১২৮৩ ) ॥ 'নগনলিনী'র দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশক গর্ব করিয়া বলিয়াছেন, "পাঠকগণ ! নগনলিনী নাটকমধ্যে 'জয় ভারতের জয়' নাই, 'পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছ', 'দুরাচার যবন' নাই, 'হায়, স্বাধীনতা !' নাই, 'ফোর্টউইলিয়ম' নাই, পিস্তল, বন্দুক, লাঠি প্রভৃতি কিছুই নাই—ইহারও যে আবার দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, বড় আশ্চর্যের বিষয় ! বাঙালীদের চরণে নমস্কার তাঁদের আর ভরসা নাই – তাঁদের এমন রুচি যে, তাঁহারা এই বইও এত লোকে কিনিয়া পড়িয়াছেন ও পড়িবেন।" নাট্যকারের ব্যাজস্তুতিসত্ত্বেও তাঁহার নাটককে কখনই উচ্চাঙ্গের নাট্যশ্রেণীভুক্ত করা চলে না। ইহার যেমন বিষয়বস্তু তেমনি সৃষ্টি-কৌশল ! নাট্যকারের উচ্ছ্বসিত কাব্যলহরী তাঁহার নাটকের সর্বাপেক্ষা ক্ষতি করিয়াছে। কন্যার সর্বনাশে ক্ষিপ্তচিত্ত গোবিন্দরায়ের চরিত্র ব্যতীত আর কোন চরিত্রই আলোচনার যোগ্য নহে।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

## গিরিশ-যুগ

### নাটকে ধর্মবিশ্বাস ও পৌরাণিকী লীলা

( ১৮৮০-১৯০০ )

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর ইতিহাস দ্রুত পরিবর্তনশীল ভাবের সংঘাতে নব নব রূপান্তর লাভ করিয়াছে। দীর্ঘকালীন সুপ্তির পর বাঙালী যখন জাগিল তখন বিচিত্রের নেশায় তাহার দৃষ্টি চঞ্চল আর অস্থির ভাবের মদিরায় তাহার অন্তর মসগুল। পিঞ্জরাবদ্ধ পশু হঠাৎ ছাড়া পাইয়া যেমন অকারণ ছুটাছুটি করিয়া মুক্তির আনন্দটা উপভোগ করে বাঙালীর জীবনও সেদিন নিছক চলার উত্তেজনাতেই মাতিয়া উঠিয়াছিল। সেই চলার ঘূর্ণিপাকে পথের লক্ষ্য সরিয়া গেল, শুধু কেবল জাগিয়া রহিল এক ঘূর্ণিত বিক্ষোভের চক্রাবর্ত। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন, সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম আন্দোলন সেদিন বাঙালী জীবনকে এরূপ নিত্যনূতন আঘাতে আলোড়িত করিয়া তুলিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই চঞ্চল উত্তেজনা একটু শান্ত হইয়া আসিল, সুস্থিত জাতীয় মন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল,—বুঝিল মুক্তি শুধু সংহারে নহে, সৃষ্টিতেও বটে। এই সৃষ্টি-কর্ম প্রথম আরম্ভ হইল জাতীয়তার ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী গর্ভাঙ্কে আমরা সেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই সৃষ্টিকর্মের পূর্ণতর পরিচয় পাইলাম জাতির আত্মিকক্ষেত্রে, অর্থাৎ তাহার নবায়িত ধর্মচেতনায়।

১৮৮০ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ধর্মচেতনা বাঙালীর ভাব-সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক অনন্য প্রভাবজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল। অবশ্য এই ধর্মচেতনার মূল উৎস ছিলেন

ধর্মাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁহার কর্মযোগী শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। দক্ষিণেশ্বরের এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণ পুরোহিত সেদিন যে অদৃশ্য আলোকের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সেই আলোকের কাছে শিক্ষিত, সভ্যতাভিমানী বাঙালীর জ্ঞান-বুদ্ধি, যুক্তিতর্কের সব আলোকই নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সেই আলোকের বাণী বিশ্বজয়ী বীর বিবেকানন্দের দ্বারা দেশদেশান্তরে বিকীর্ণ হইল। অবহেলিত ধর্মবিশ্বাস অদম্য শক্তি লইয়া জাতির চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিল। কিন্তু এই ধর্মবিশ্বাস শুধু কেবল অতীন্দ্রিয় অনুভূতি-গ্রাহ্য হইয়া রহিল না, ইহা যুক্তির বর্মে আবৃত হইয়া এবং বিচারের কষ্টিপাথরে নিরীক্ষিত হইয়া বহির্জীবনের এক শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল। এই যুক্তিবিচারের ক্ষেত্রে অগ্রণী হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যগণ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষদিকের তিনখানি উপন্যাস, যথা, 'আনন্দমঠ' ( ১৮৮২ ), 'দেবীচৌধুরাণী' ( ১৮৮৪ ) ও 'সীতারামে' ( ১৮৮৭ ) জাতীয়তাকে ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিলেন। বঙ্গদর্শনের লেখকদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ধর্মতত্ত্বের ঐতিহাসিক ভিত্তি আবিষ্কার করিলেন ও চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুত্বের গৌরব লইয়া আলোচনা করিলেন। হেমচন্দ্রের কাব্যে পৌরাণিকী মহিমা নবীন গৌরবে ছন্দোবদ্ধ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' ( ১৮৯২ ) ও 'ধর্মতত্ত্ব' ১৮৮৮ ) এবং নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক' ( ১৮৮৭ ), 'কুরুক্ষেত্র' ( ১৮৯৩ ) ও 'প্রভাস' ১৮৯৬ ) ভাগবত-ধর্ম ও মানব-ধর্মকে এক উদার সূত্রে বাঁধিয়া দিল। আর একজনের কথা উল্লেখ না করিলে এই যুগের ধর্মপ্রাণতার কথা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। তিনি হইলেন ধর্মিষ্ঠ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মজ্জমান আদর্শকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহার দৃঢ় বলিষ্ঠ বাহু প্রসারিত করিলেন, সেই বাহুতে ছিল জলন্ত বিশ্বাস ও কুশাগ্র যুক্তির অমিত তেজ।

এই সর্বাঙ্গীণ ধর্মপ্লাবন হইতে বাংলার নাট্যসাহিত্যও দূরে থাকিতে পারিল না। কিছুকাল পূর্বে ( ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ) সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছে। নাট্যশালা এখন আর মুষ্টিমেয় ধনশালী লোকের বিলাসভূমি নহে। ইহা সর্বসাধারণের সম্মিলিত আনন্দভোগের ক্ষেত্র। যে ভাবাদর্শের আবেগে এই সর্বসাধারণ মাতিয়া উঠিয়াছিল তাহা তাহাদের আনন্দ রসের আঙিনাতেও অতি স্বাভাবিক কারণেই আত্মপ্রকাশ করিল। ভাবোন্মত্ত জাতির সাগ্রহ সম্বর্ধনায় সেদিন নাট্যক্ষেত্র তীর্থক্ষেত্রেই পরিণত হইল। এই সময় নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব। তিনি ধর্মভাব ও পৌরাণিক আদর্শের প্রতি জনসাধারণের প্রবল অনুরক্তি লক্ষ্য করিলেন। শুধু তাহাই নহে, অন্তরের গভীরে তিনি এক অলৌকিক স্পর্শ অনুভব করিলেন। সেই স্পর্শে তাঁহার সমগ্র সত্তা অকপট ভক্তির রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। যুক্তিদর্পিত, নাস্তিক গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের অহেতুকী কৃপায় ভাবতন্ময় ভক্ত গিরিশচন্দ্রে পরিণত হইলেন। ১

১। রামকৃষ্ণদেবের কৃপা সম্বন্ধে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র বলিয়াছেন, "অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা পতিত-পাবনের অপার দয়া—সেইজন্ত আমার আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার চিন্তার কোন কারণ নাই। জয় রামকৃষ্ণ।"

বাহিরে ও ভিতরে এই ধর্মভক্তির প্রেরণা লইয়া গিরিশচন্দ্র নাটক রচনা করিতে সুরু করিলেন।' সেজন্য জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী যেমন নাটকের বিষয়বস্তুকে তিনি পৌরাণিক জগতে লইয়া গেলেন, তেমনি অন্তরের ভক্তিরসে সেই নাটকের প্রাণকেন্দ্রকে অভিষিক্ত করিয়া তুলিলেন। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে গিরিশচন্দ্র সামাজিক-নাটক, ঐতিহাসিক-নাটক, এমন কি প্রহসন পর্যন্ত রচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার খাঁটি ও স্বাভাবিক ক্ষেত্র হইল পৌরাণিক নাটক—এখানে দর্শকের রুচি ও নাট্যকারের ইচ্ছা এক হইয়া গিয়াছে।১ গিরিশচন্দ্রের সহবর্তী ও অনুবর্তী নাট্যকারগণও এই সর্বজনীন ধর্মাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথমেই নাম করিতে হয় রাজকৃষ্ণ রায়ের। তিনি অসংখ্য পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সেই সব নাটকের শিল্পগুণ যাহাই থাকুক না কেন সমসাময়িক ভক্তিমত্ত দর্শকের কাছে তাহাদের অনাদর হয় নাই। আর দুইজন নাট্যকারের উল্লেখ এখানে করা উচিত, তাঁহারা হইলেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। এইসব উল্লেখযোগ্য নাট্যকারের বিষয় ও ভাব অবলম্বন করিয়া যে-সব নাট্যকার নাট্যক্ষেত্রে প্রবগলীলা সুরু করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। অর্থহীন ভাব, অকারণ উচ্ছ্বাস ও অসংলগ্ন দৃশ্যে পরিপূর্ণ হইয়া এইসব নাটক ক্ষণকালের জন্য দর্শকদের ভক্তিবিভোর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যেই তাহাদের প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তবে এইসব অসার্থক নাট্য-প্রচেষ্টার মধ্যে একটি মূল মনোভাব সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে—তাহা হইল পৌরাণিক জগতের দৈবলীলার প্রতি এক অন্ধ আনুগত্য।

এই আনুগত্যের ফলে আমাদের সনাতন অধ্যাত্ম-জীবনের মুক্তি হইয়াছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান বস্তুজীবনের মধ্যে আমরা বন্ধন আনিয়া ফেলিলাম। আমাদের ধর্ম শুধু ঈশ্বর সাধনার উপায় ও অঙ্গ নহে, ইহা আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক-জীবনের সম্বন্ধকেও নিয়ন্ত্রণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নব-ধর্ম-জাগরণের ফলে আমাদের আত্মার প্রভূত উন্নতি ঘটিল বটে, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্র-নির্দেশিত জীবন-প্রণালীকে পুনঃস্থাপিত করিবার চেষ্টা হইল বলিয়া আমাদের সামাজিক অগ্রগতি অকস্মাৎ রূঢ় আঘাত পাইল। উনবিংশ শতাব্দীর নব-বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রভাবে নবায়িত মুক্ত-জীবনের আদর্শ আমাদের সমাজ-ক্ষেত্রকে উন্নত ও প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র-শাসনে পুনরায় ক্ষুদ্র ও সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অধ্যাত্মসাধনা ও আত্মোপলব্ধির পথ অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু মানুষের গড়া সমাজের পথ কখনই এক ও অভিন্ন থাকে না। যুগে যুগে প্রাকৃতিক ও বাস্তব অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পথ ও লক্ষ্যস্থল পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। কিন্তু অনেক সময় আমরা

(১) ধর্মপ্রাণ পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র নিজে বলিয়াছেন, 'ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জুন, ভীম প্রভৃতিকে চিনে, সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব।'

মানুষের আইনে ভগবানের দোহাই দিই, রক্ষণশীলতাকে ধর্মের বর্মে অভেদ্য করিতে চাই, তখনই হয় সমস্যার উদ্ভব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এই সমস্যারই উদ্ভব হইয়াছিল। সমাজ সব সময়েই গতিশীল, সেই গতি কখনো প্রগতি আবার কখনো বা পরাগতি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজে এই প্রগতি দেখা গিয়াছিল, কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষ-ভাগেই প্রগতি পরাগতিতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। যে বিধবা-বিবাহের সমর্থনে এককালে বহু গ্রন্থাদি রচিত হইতে দেখিয়াছি সেই বিধবার প্রণয় ও পরিণয় কঠোরভাবে নিন্দিত হইল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও গিরিশচন্দ্রের নাটকে। যে নারীকে আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল করিয়া মাইকেল ও দীনবন্ধু সূর্যালোকিত মুক্তজগতে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহাকেই আবার শাস্ত্রের অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া অসূর্যম্পশ্যা গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসাইয়া গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল নিশ্চিন্ত হইলেন। শুধু তাহাই নহে, পৌরাণিক আদর্শপ্রাপ্ত সতীত্ব ও স্বামী-ভক্তির এক ধন্বন্তরি-সুধা খাওয়াইয়া তাহাকে নিস্তেজ ও সম্মোহিত করিয়া রাখিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল, অন্নপূর্ণা, কিরণময়ী, জোবি, জহরা ও অমৃতলালের তরুবালা প্রভৃতি চরিত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য-ভাবের সংঘাতে আমাদের মুক্তিপাগোল চিত্তের যে শৃঙ্খল-ঝঙ্কার শুনা গিয়াছিল, তাহাতে দৈববিধানের বিরুদ্ধে পরুষ প্রতিবাদের সহিত মিশিয়াছিল মানবতার জয়দৃপ্ত উল্লাস। দৈবকে ছাড়িয়া মানবতার প্রতিষ্ঠা করা সহজ নহে। ইহাতে দৃঢ়তা ও কাঠিন্য প্রয়োজন, অথচ ইহার ফল অশান্তি ও অনিশ্চয়তা। এই দৃঢ়-কঠিন, অশান্ত ও অনিশ্চিত মানবাত্মার যে-বেদনা আমরা দেখিলাম মধুসূদনের রাবণ-চরিত্রে সেই রকম চরিত্রের সন্ধান উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখি না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে মানব-চরিত্রের তীব্রতম দ্বান্দ্বিক রূপ পরিস্ফুট করিয়াছেন, সেজন্য সেই চরিত্র ট্র্যাজিক মহিমা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এরূপ ট্র্যাজিক-চরিত্র আমরা নাট্য-সাহিত্যে বিশেষ দেখি না। তখন মানুষের মন মানুষকে ছাড়িয়া পুনরায় দেবতার দিকে ঝুঁকিয়াছে। সেজন্য তৎকালীন নাটকে দৈব-শক্তির অলঙ্ঘ্য অনিবার্যতা ও মানুষী-শক্তির ব্যর্থ পরাজয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়া দেবতার প্রতি একটা নিশ্চিন্ত নির্ভরতার ভাব জাগ্রত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

গিরিশ-যুগের সামাজিক নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। তখনকার বাঙালী-সমাজের ভিত্তি ছিল একান্নবর্তী-পরিবার। এই একান্নবর্তী-পরিবারের বিভিন্ন পুরুষ ও স্ত্রীলোক সমাজ-নিয়ন্ত্রিত পারস্পরিক সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করে। সেই পরিবারের সামগ্রিক সত্তার মধ্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত, বিশেষত পরিবারের সকল লোক মূল-কর্তার চালনাধীন। সেজন্য পরিবার-নিরপেক্ষ কোন স্বাধীন-মানবসত্তার সমস্যাময় প্রকাশ তখনকার সমাজে ছিল না, পারিবারিক অংশগুলির আভ্যন্তরীণ অমিল ও অসামঞ্জস্যের ফলেই যত কিছু জটিলতার উদ্ভব হইত। আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। তখনো আমাদের সমাজে খণ্ডখণ্ড পরিবারগত চাকরীজীবী

জীবন প্রসার লাভ করে নাই, যৌথ-সম্পত্তির আয়ের উপরেই সমগ্র পরিবারকে নির্ভর করিতে হইত। সেজন্য সম্পত্তি-সংক্রান্ত গোলমাল—জাল-জুয়াচুরি, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি সমস্যাই সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করিত। এই সাজাজিক পট-ভূমির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার সমসাময়িক নাট্যকারদের নাটক বিচার করিতে হইবে।

## রাজকৃষ্ণ রায়

ধর্মনিষ্ঠ, ভক্তিপ্লাবিত বাংলাদেশে পৌরাণিক কাহিনীমূলক তরল নাট্যধারা চিরদিন অবারিত প্রশ্রয় পাইয়াছে, ইহা আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও লক্ষ্য করিব। আমাদের দেশে রঙ্গমঞ্চ প্রবর্তিত হইল, বস্তুতান্ত্রিক নাটকের রচনা আরম্ভ হইল, কিন্তু জনসাধারণের মন নিরবচ্ছিন্ন নাট্যরস অপেক্ষা অবাস্তব দৃশ্যসমন্বিত, অলৌকিক ভাবময় ভক্তিরসের প্রতি উন্মুখ হইয়া রহিল। গ্রামে যাত্রার আদর বজায় রহিল, এবং শহর-বাজারেও নাট্যরীতির ছদ্মবেশে ভূষিত হইয়া ধর্মাত্মক যাত্রাভাব অব্যাহত পোষকতা লাভ করিতে লাগিল। মনোমোহনের দ্বারা অপেরা জাতীয় নাটকের সূচনা হইয়াছিল, সেই আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। মনোমোহনের পরে বহুতর নাট্যকার এই ধরণের নাটক লিখিয়া তাঁহাদের অপরিমিত কলরবের দ্বারা নাট্য-সাহিত্যের অঙ্গন অতি মাত্রায় মুখর করিয়া তুলিয়াছিলেন।১ এই শ্রেণীর নাটক বাংলা সাহিত্যে এত লেখা হইয়াছে যে তাহাদের সংখ্যা অনুমান করাও অসাধ্য ব্যাপার। এই রকম নাটক লিখিতে হইলেও বিশেষ কোনো নাট্যকলা-কৌশলের দরকার হইত না; সাধারণত কতকগুলি গান বসাইয়া, জোড়াতালি দিয়া কয়েকটি অসংলগ্ন ও অসমঞ্জস দৃশ্যের সমাবেশ করিয়া দর্শকদের মনের মধ্যে ভক্তিমত্ততা উদ্রেক করিতে পারিলেই নাট্যকারদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। সেজন্য এই নাট্যরচনার ক্ষেত্রে বহু অক্ষম ও অনভিজ্ঞ নাট্যকার খিড়কীপথে অনধিকার প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। গীতাভিনয় লেখকদের অনেকের পরিচয় ও আলোচনা ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের অমূল্য তথ্যবহুল গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে' (২য় খণ্ড) রহিয়াছে।

মনোমোহন বসু গীতাভিনয় রূপ যে নাট্যধারার সূত্রপাত করেন তাহারই পরিণতি হয় রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকে। রাজকৃষ্ণ রায় বহুসংখ্যক নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সহজ স্বতঃস্ফূর্তির মধ্যে তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি নানা ধরণের নাটক লিখিলেও,

১। 'গীতাভিনয় অর্থব্যয় সাধ্য, তাহার উপর বক্তৃতাময় ও গীতিবহুল হওয়াতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই মনোরম। এই কারণে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রভাব বদ্ধমূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গীতাভিনয়ের পালা অজস্রভাবে রচিত হইতে লাগিল।'

'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড), পৃঃ ৩৪৪।

পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকেই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ হইতে প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করিয়াই তিনি অধিকাংশ নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কাহিনীর কোনো নূতনত্ব সম্পাদন করিয়া অথবা বিশেষ কোনো নাটকীয় ভাবপূর্ণ ঘটনাকে রঞ্জিত ও চিত্রিত করিয়া কাহিনীর নাটকত্ব সঞ্চার করিতে তিনি দৃষ্টি দেন নাই। ঘটনা সংস্থাপনের কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব তিনি দাবী করিতে পারেন না। যাত্রা এবং অপেরা-লেখকগণ অনেক সময় স্থূলরুচি দর্শকদের চিত্তরঞ্জনের জন্য পৌরাণিক নাটকেও মাঝে মাঝে পৌরাণিক ভাব ও পরিবেশের প্রতিকূল নিতান্ত আধুনিক ও সাংসারিক চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ করিয়া ফেলেন, ইহাতে পৌরাণিক নাটকে দর্শক দেবলীলার সহিত সামাজিক রস একসঙ্গে উপভোগ করিতে পারেন। সূক্ষ্মদর্শী দর্শকের কাছে এইরূপ ভাবময় অলৌকিক বৃত্তান্তের সহিত বাস্তব-জগতের সাংসারিক বিষয়ের সমাবেশ বিসদৃশ, বেমানান ও রসহানিকর মনে হইবে, কিন্তু সাধারণ লোক ইহাতে দোষ ও অসঙ্গতি ধরিতে পারে না। রাজকৃষ্ণ অনেক স্থলে হাস্য-রসের পরিবেষণের জন্য এমন অনেক প্রাত্যহিক তুচ্ছতা মিশ্রিত-অবিমিশ্র ভাঁড়ামির দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন, যে সব জায়গায় আমাদের উচ্চ পৌরাণিক গগনবিলাসী ভাবতন্ময় চিত্ত অকস্মাৎ পরিচিত আবেষ্টনীর পঙ্কে নিপতিত হয়।

যাত্রা ও গীতাভিনয়ের যে উদ্দেশ্য রাজকৃষ্ণের নাটকেও তাহা সুপরিস্ফুট। অর্থাৎ তাঁহার নাটকও তরল ভক্তিরসে প্লাবিত। পুরাণের দেবলীলার মত তাঁহার নাটকেও দেবলীলা অনেক স্থলে সাধারণ ধারণার পরিপন্থী, এবং মানবীয় বুদ্ধির পক্ষে দুরধিগম্য, অথচ সর্বত্র দেবলীলার প্রতি আমাদের প্রশ্নহীন ভক্তি আকর্ষণ করা হইয়াছে। যে ভক্তির পিছনে কেবল শাস্ত্রনির্দেশ এবং গতানুগতিক সংস্কার রহিয়াছে, যাহা প্রাণের সাগ্রহ সম্মতি হইতে উৎসারিত হয় না তাহার প্রভাব এবং স্থায়িত্ব বেশি নহে। রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকে প্রদর্শিত ভক্তি অনেক সময়েই আমাদের চিত্তে কোনো সাড়া সঞ্চার করিতে পারে না।

গীতাভিনয়ের প্রধান লক্ষণ গানের আতিশয্য রাজকৃষ্ণের নাটকেও যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। গীতাভিনয় লেখকগণ বাঙালী দর্শকের সঙ্গীতপ্রীতির সুযোগ লইয়া স্থানে অস্থানে অনর্গল গানের সমাবেশ করিয়া যান। রাজকৃষ্ণও অনেক সময়ে এমন অনেক চরিত্রের মুখে গান দিয়াছেন যাহা নিতান্ত অশোভন ও বিসদৃশ বোধ হয়। অথচ গীতাভিনয়ে এরকম সর্বময় সঙ্গীত প্রবাহ লেখক ও দর্শকের কাছে অসঙ্গত মনে হয় না।

রাজকৃষ্ণ গদ্য ও পদ্য—উভয় ভাষা রীতির মধ্যেই তাঁহার নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নাটকের ন্যায় তাঁহার নাটকে ভাব অনুযায়ী সুস্পষ্ট ভাষা বিভাগ নাই। অনেক জায়গাতেই তিনি গদ্য কথোপকথনের মধ্যে হঠাৎ পদ্য কথোপকথন নিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ গদ্য পদ্যের আকস্মিক সমাবেশে রসভোগের ব্যাঘাত হয় সন্দেহ নাই। পদ্য রচনায় ভাঙ্গা মিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনে রাজকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে।

'হরধনুর্ভঙ্গ' হইতে তিনি ঐরূপ ছন্দে নাটক লিখিয়াছেন। 'হরধনুর্ভঙ্গে'র ভূমিকায় তিনি ঐ ছন্দ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।১

রাজকৃষ্ণ রামায়ণের কাহিনী লইয়া কয়েকখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, সেগুলির নাম 'অনলে বিজলী', 'হরধনুর্ভঙ্গ'', 'রামের বনবাস', তরণীসেন বধ' ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে 'অনলে বিজলী' (১৮৭৮) শ্রেষ্ঠ। রাবণের মৃত্যুর পর সীতার অগ্নিপরীক্ষা অবলম্বন করিয়া নাটকখানি রচিত। ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ তিনি পরে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। মাইকেলী ছন্দ ও ভাষার প্রভাব নাটকের মধ্যে বিদ্যমান। ইহার কথোপকথন অত্যন্ত দীর্ঘ, অভিনয়ের উপযোগী নহে।

'প্রহ্লাদ চরিত্র' (১৮৮৪) বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। অথচ নাটক হিসাবে ইহা উৎকৃষ্ট, এমন কি বিশেষ উল্লেখযোগ্যও নহে। ইহাতে কেবল অপরিমিত ভক্তিরসের প্লাবন, কোনো দ্বন্দ্ব নাই, চরিত্রসৃষ্টিও নাই। বার বার প্রহ্লাদকে হত্যা করিবার চেষ্টা একটু একঘেয়ে এবং চিত্তবিকর্ষক হইয়াছে। যাত্রার ন্যায় স্থূল, অসংলগ্ন, এবং গ্রাম্য হাস্যরস উদ্রেকের চেষ্টা আছে।

'নরমেধ যজ্ঞ' (১২৯৮) পৌরাণিক নাটক হইলেও ইহাতে সামাজিক ভাব ও বিষয় প্রাধান্য পাইয়াছে। রত্নদত্ত চরিত্রের মধ্যে সমাজের কুসীদজীবীর প্রকৃতি কিরূপ জঘন্য হইতে পারে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।২ তবে রত্নদত্তের শাস্তি তাহার মন হইতে উৎসারিত হয় নাই, নিতান্তই একটা বাহ্য ঘটনার মধ্য দিয়া জোর করিয়া তাহাকে দৈহিক শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। যযাতি পিতা নহুষের প্রেতাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য নরমেধযজ্ঞ করিতে আদিষ্ট হন, অথচ তাঁহার কোমল দয়াপ্রবণ চিত্ত কিছুতেই অষ্টমবর্ষীয় শিশুকে হত্যা করিতে দিতে পারে না—এই মানসিক সংগ্রাম ভালোভাবে বিকশিত হইয়াছে। নাটকে গানের আতিশয্য দ্বারা করুণ রস ও ভক্তিরস সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে। সকলেই গান গাহিতেছে, এমন কি কুশধ্বজের মা কাত্যায়নী পর্যন্ত।

'বামন ভিক্ষা' (১৮৮৫)র মধ্যে বিষ্ণুর বামন লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে। বামনের জন্ম, বাল্যলীলা ও উপনয়ন ঘটা করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরিশেষে বামন বলির কাছে যাইয়া

---

১। "শুভক্ষণে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ দেখা দিয়াছিল, এবং অভিনয়ক্ষেত্রে অভিনীত হইয়াছিল। নহিলে আধুনিক 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ' বাংলায় হইত কিনা সন্দেহ। এই ছন্দ আভিনয়িক নাটকের পক্ষে 'জলবৎ তরল' এবং লেখকের পক্ষে তাহাই ; লোকের অনুরোধে বা নিজের ইচ্ছায় দুইচারিদিনের মধ্যে এক একখানা বড় বড় নাটক পদ্যে লিখিতে হইলে এই জলবৎ তরল ছন্দই—এই অমিত্রাক্ষর-ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দই বিশেষরূপে উপযোগী।"

'হরধনুর্ভঙ্গের' ভূমিকা।৮"

২। রাজকৃষ্ণ নিজে জীবনে ঋণ করিয়া ও দারিদ্র্যের নিপীড়নে এইশ্রেণীর লোকের স্বভাবের পরিচয় ভালো ভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য এই চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকারের ব্যক্তিগত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা রঙ ফলাইয়াছে। 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে 'নরমেধ যজ্ঞে'র অভিনয় দেখিয়া জনৈক জনৈক সুদখোর মহাজন রাজকৃষ্ণের সমস্ত সুদ রেহাই দিয়াছিলেন।"

তাহাকে কায়দায় জব্দ করিয়া পাতালে প্রেরণ করেন ও দেবগণের স্বর্গরাজ্য ফিরাইয়া দিলেন।

'যদুবংশ ধ্বংসে' ( ১২৯০ ) বর্ণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ নিজ বংশীয় দিগকে প্রভাসে লইয়া যান, এবং সেখানে পরস্পরে বিবাদে মত্ত হইয়া তাহারা যদুবংশ ধ্বংস করিয়া ফেলে। কৃষ্ণের লীলা সাধারণের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়, যাদবগণের ধ্বংসে তাঁহারই হাত রহিয়াছে, অথচ বলরাম সে রকম নহেন, বলরাম যাদবদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন।

সাধক ও ভক্তের জীবনী লইয়া রাজকৃষ্ণ 'মীরাবাই', 'হরিদাস ঠাকুর' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক লেখেন। 'মীরাবাই'এর (১২৯৬) মধ্যে মীরাবাইএর ভক্তি-সাধনা অপেক্ষা রসকুম্ভের চক্রান্তে কুম্ভসিংহের স্ত্রীর সতীত্বে সন্দেহ এবং আত্মজ্বালাই বেশি ফুটিয়াছে। ভক্তি ভাব নাটকে গৌণ হইয়া গিয়াছে। 'হরিদাস ঠাকুর' (১২৯৫) নাটকের মধ্যে ব্রহ্মার অবতার মহাপুরুষ হরিদাসের প্রতি স্বধর্মাবলম্বিদের নিগ্রহ এবং তাঁহার অসাধারণ দৈন্য ও সহিষ্ণুতা দেখানো হইয়াছে।

ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়া অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ যে নাটকগুলি লিখিয়াছিলেন সেগুলিকে কখনো প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না। ঐতিহাসিক নাটকের ভাব ও পরিবেশ ঐ সব নাটকের মধ্যে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'রাজা বিক্রমাদিত্য' (১৮৮৪) নাটকেরউল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা কিংবদন্তীর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনা কিছুই ইহাতে নাই। মানুষ এবং দেবতার লীলা ইহাতে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

রাজকৃষ্ণ কয়েকখানি অনালোচ্য গীতিনাট্য এবং প্রহসনও লিখিয়াছিলেন।

# গিরিশচন্দ্র ঘোষ

## (ক) ভূমিকা

গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বাংলার নাট্যভারতী অভিজাতের অন্তঃপুরে ভীরু পাদক্ষেপে সঞ্চরণ করিতেছিলেন। গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম তাঁহাকে প্রকাশ্য দরবারে আনিয়া তাঁহার অনিন্দ্য সৌন্দর্য ও অপূর্ব মহিমা সর্বসমক্ষে অনাবৃত করিয়া দিলেন। কিছুকাল পূর্বেই বঙ্গে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই সব রঙ্গালয়ে সাধারণের সহজ প্রবেশাধিকার ছিল না। সুতরাং নাটকীয় রস মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যক্তি নিচয়ের পক্ষে মাত্র আস্বাদ্য হইয়া রহিল, দেশের সর্বসাধারণের হৃদয়ে ইহার সচল ব্যাপ্তি ঘটিল না। যে শুভদিনে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইল,[১] সেইদিন হইতে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় সূচিত হইল। রঙ্গালয়ের প্রসারেই নাটকের প্রচার সম্ভব হয়। দীনবন্ধু প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ নাটকাদি পূর্বে রচিত হইলেও তাহাদের প্রকৃত এবং যথাযোগ্য সমাদর সাধারণ নাট্যশালার প্রশংসামুখর জনগণের দ্বারাই হইয়াছিল। এই সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে গিরিশচন্দ্র বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় অম্লান তেজে আমৃত্যু বিরাজ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নাট্যগগনকে সমুদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র এবং তাঁহার সহযোগিবৃন্দ দ্বারা বাংলা দেশের নাটকীয় আন্দোলন চূড়ান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা, রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা এবং অভিনয়-শিল্পের শিক্ষা দানে গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ লোক বাংলায় কেহ জন্মান নাই। গিরিশচন্দ্র অনেক নাটক লিখিয়াছেন বটে, এবং তিনি একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তাহাও সত্য, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বড় কথা বোধ হয় এই যে, তিনি রঙ্গমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ও পরিচালক। তাঁহার পূর্বে রঙ্গালয়ের নিতান্ত শৈশব অবস্থা, এবং তাঁহার পরেই আবার ইহার অকাল বার্ধক্যের সূচনা দেখা গিয়াছে। রঙ্গালয়ের গৌরবময় যৌবন কেবল গিরিশচন্দ্রের সময়েই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। অধ্যক্ষ এবং অভিনেতা, ইহাই গিরিশচন্দ্রের প্রকাশ্য আদি রূপ, এবং হয়তো একমাত্র এই রূপেই তাঁহার জীবনের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটিত, কিন্তু রঙ্গালয়ের প্রয়োজনেই তাঁহার প্রতিভার অপর দিকটী প্রকাশিত হইল, এবং তখন হইতেই কীর্তিমান নটের জনমুখর লীলার সহিত খ্যাতনামা নাট্যকারের নিভৃত সাধনার যোগাযোগ হইয়া গেল। গিরিশচন্দ্র লেখনী ধারণ করিবার পূর্বে মাইকেল, দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নাটকীকৃত উপন্যাসগুলি রঙ্গালয়ের চাহিদা মিটাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেইগুলি পুরাতন হইয়া আসিল, এবং দর্শকগণ নূতন নাটকের অভিনয় দেখিবার আকাঙ্ক্ষা জানাইতে

---

১। ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

লাগিল। দর্শকগণের এই ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, এবং রঙ্গালয়গুলিকে নূতন রসে সঞ্জীবিত করার আশা লইয়া গিরিশচন্দ্র নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।১ তখন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার অক্লান্ত লেখনী অবিরাম ভাবে নিত্য নূতন নাটক সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এই সব নাটক তৎকালীন রঙ্গমঞ্চগুলিকে নব নব রসে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল।২ গিরিশচন্দ্রের ন্যায় এত অধিক সংখ্যক নাটক বাংলায় কোনো নাট্যকার লেখেন নাই, সৃষ্টির এই অনন্যসাধারণ বহুলতা যথার্থই সকলের মনে সপ্রশংস বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিব, তবে গোড়াতেই একথা অকুণ্ঠচিত্তে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, তিনিই বোধ হয় বাংলা দেশের সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান নাট্যকার। আমাদের দেশের অনেক ভাগ্যহীন নাট্যকার শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী হইয়াও সমালোচকের কাছে প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা পান নাই, দৃষ্টান্তস্বরূপ দীনবন্ধুর নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পক্ষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। নাট্য সমালোচনার ক্ষেত্রে অবিসংবাদিত রত্ন-সিংহাসনের অধিকার মাত্র তাঁহারই ভাগ্যে জুটিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের বহু ভক্ত সমালোচক তাঁহার মস্তকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের ঈর্ষিত মুকুট দান করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই নাট্যকারের সমসাময়িক এবং নিকটজন ছিলেন। সেইজন্য পরিচালক, ব্যবস্থাপক, শিক্ষক এবং সর্বোপরি অসাধারণ অভিনায়ক গিরিশচন্দ্র ইঁহাদের প্রশংসমান দৃষ্টিকে এমনিভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন যে নাট্য-সমালোচনায় ইঁহারা অপক্ষপাতী বিশ্লেষক দৃষ্টি সজাগ করিয়া রাখিতে পারেন নাই। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয় যে, 'নাটকের শাশ্বত সাহিত্যমূল্য ততটুকুই যতটুকু দ্বারা ইহাতে মানবজীবনরস কালদেশাতিশায়ী শিল্প সৌন্দর্য লাভ করিতে পারে'।৩ আমরা যথাসম্ভব নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়া সেই মূল্য নিধারণ করিবার চেষ্টা করিব।

১। শ্রীযুক্ত কুমুদ বন্ধু সেনের সহিত কথোপকথনের সময় গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে তিনি নাটক রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন 'দায়ে পড়ে—Out of sheer necessity' যখন মাইকেল বঙ্কিম প্রায় dramatised করা শেষ হল, ষ্টেজে আর কোনও অভিনয়োপযোগী নাটক মিললো না, তখন বাধ্য হয়ে নাটক রচনা করতে হ'ল।'

'গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য,' পৃঃ ১৮

২। অপরেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' নামক পুস্তক বলিয়াছেন—'গিরিশচন্দ্র এ দেশের নাট্যশালায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানে—তিনি অন্ন দ্বারা ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন; ইহার মজ্জায় মজ্জায় রস সঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন; আর এই জন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the Native Stage—ইহার খুড়ো জ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিল না।'

পৃঃ ৪৩।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪

গিরিশচন্দ্র যে সময়ে নাটক রচয়িতার আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন বাংলা নাট্যসাহিত্যের শৈশব ও কৈশোর অতিক্রান্ত হইয়া যৌবনের সূচনা দেখা গিয়াছে। তাঁহার পূর্বেই প্রতিভাবান নাট্যকারবৃন্দ বিভিন্ন নাট্যধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র সেই সব নাট্যধারা আরও পুষ্ট করিয়া অগ্রগতির পথে চালিত করিয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব। তিনি সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক অনেক প্রকারের নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তিনি তাঁহার অগ্রবর্তী পথিকৃতের সুনির্দেশিত পথ বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। সামাজিক নাটকে তিনি দীনবন্ধুর নাটক বিশেষ করিয়া 'নীলদর্পণে'র দ্বারা প্রভাবান্বিত। করুণ রসের প্রাবল্য, অকারণ মৃত্যুর আতিশয্য এবং চরিত্রের অতিরঞ্জন প্রভৃতি 'নীলদর্পণে'র বৈশিষ্ট্যগুলি গিরিশচন্দ্রের নাটকে সমভাবে বিদ্যমান। ঐতিহাসিক নাটকে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবপুষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে যে বীররসের পরিস্ফুরণ এবং স্বদেশী ভাবোদ্দীপন লক্ষ্য করা যায় গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকেও সেই সব বিশেষত্ব রহিয়াছে। ধর্মপ্রবণ বাংলা দেশে পৌরাণিক নাটকের অপ্রতুল দেখা যায় নাই বাঙালীর হৃদয় জয় করিতে হইলে পৌরাণিক নাটক লেখা দরকার গিরিশচন্দ্রও ইহা বুঝিয়াছিলেন। মনোমোহন বসু হইতে রাজকৃষ্ণ রায় পর্যন্ত যে পৌরাণিক গীতাভিনয়, অপেরা প্রভৃতির ধারা বহিয়া আসিয়াছে, তাহা দ্বারা তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাট্যক্ষেত্রও সেচন করিয়াছেন। অবশ্য পৌরাণিক নাটকে তাঁহার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহা একেবারে যাত্রা কিংবা গীতাভিনয়ের স্তরে নামিয়া যায় নাই। যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক নাটকে রামায়ণ এবং মহাভারত হইতে বহুতর কাহিনী গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ বাঙালীর ন্যায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতই তাঁহার মানসিক সংস্কৃতি গঠন করিয়াছিল। এই রামায়ণ ও মহাভারতের ভাব ও ভাষা তাঁহার অনেক নাটকেই অবিকল অনুসৃত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের পূর্বে মাইকেল মধুসূদন রাম এবং রাবণ চরিত্রের পরিকল্পনায় অভিনব মৌলিকত্ব দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্যের জন্য তিনি মধুসূদনকে অনুসরণ করেন নাই, এবং তাঁহার রাম, রাবণ প্রভৃতি চরিত্র খাঁটি কৃত্তিবাসী চরিত্রের অনুরূপ হইয়াছে। স্বয়ং নাট্যকারও কৃত্তিবাস ও কাশীরাস দাসের প্রতি তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।১

গিরিশচন্দ্রের নাটকে দেশীয় এবং জাতীয় ভাবই বেশি পরিমাণে বিদ্যমান। তবে বিদেশী ভাব ও সাহিত্যের আদর্শও তিনি কিছুটা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে শেকসপীয়ারের নাট্যাদর্শই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।২ শেকসপীয়ারের ন্যায়

১। 'কিন্তু মহাকবি কাশীরাম দাস কৃত্তিবাস আমার ভাষার বনিয়াদ। আমার লেখায় তাঁদের প্রভাবও দেখতে পাবে।'

'গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য'—কুমুদবন্ধু সেন, পৃঃ ৭৮।

২। 'মহাকবি সেক্সপীরই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেছি।' ঐ, পৃঃ ৭৮।

তিনিও নাটকের পঞ্চাঙ্ক বিভাগ সর্বত্র মানিয়া চলিয়াছেন। শেকসপীয়ারকে অনুসরণ করিয়া তিনি আদিম প্রবৃত্তির সংঘাত এবং প্রবল ভাবের (passion) অতিশয্য বর্ণনা করিয়াছেন। মানব সমাজে যতরকম অন্যায় ও দুষ্কৃত আছে শেকসপীয়ার নির্ভীক লেখনীর দ্বারা সব কিছু অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন।১ গিরিশচন্দ্রও নাটকে ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, প্রতিহিংসা, ব্যভিচার, নরহত্যা প্রভৃতি সর্বরকম অপরাধ ও পাপ দেখাইয়াছেন। বিদূষক প্রভৃতি চরিত্রের উপরেও শেকসপীয়ারের Foolএর প্রভাব পড়িয়াছে। শেকসপীয়ারের ন্যায়২ গিরিশচন্দ্রও লঘু ও হাস্যরসাত্মক ভাবপ্রকাশের জন্য গদ্য এবং গম্ভীর ও ওজস্বী বিষয় ব্যক্ত করিবার জন্য পদ্য ব্যবহার করিয়াছেন। শেকসপীয়ারের 'জুলিয়াস সিজার', 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ' প্রভৃতি নাটকে যেমন প্রেতাত্মার অস্তিত্ব আছে, গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড' 'কালাপাহাড়' ইত্যাদি নাটকেও তেমনি অশরীরী ছায়ামূর্তির আবির্ভাব দেখান হইয়াছে। শেকসপীয়ারের সহিত এসব সাদৃশ্যসত্ত্বেও একথা জোর করিয়া বলা যায় যে, গিরিশচন্দ্রের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সহিত তাঁহার নাট্যগুরুর আদর্শের গুরুতর প্রভেদ বিদ্যমান। গিরিশচন্দ্রের সমস্ত নাটক ধর্মভাব ও নীতিভাবে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহাই তাঁহার সর্বপ্রধান নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তাঁহার নাটকের মধ্যে দেশের অন্তঃশায়ী ভাব ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত, এবং তাঁহার নাটকীয় রীতিও সর্বতোভাবে শেকসপীয়ারের অনুযায়ী নহে। সুতরাং শেকসপীয়ারীয় নাটকের সহিত তাঁহার নাটকের ঐক্য বেশি দূর পর্যন্ত অন্বেষণ করা সঙ্গত হইবে না।

ভাষা এবং ছন্দের দিক দিয়াই গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকের সর্বাপেক্ষা বেশি সংস্কার করিয়াছিলেন। মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি নাট্যকারের গদ্য সংলাপ সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে নিতান্ত আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক ছিল। গিরিশচন্দ্রই নাটকীয় সংলাপ সর্বপ্রথম সচল ও সাবলীল করিতে সক্ষম হইলেন, নাটকীয় চরিত্রগুলি তাহাদের নিজেদের ভাষা ব্যবহার করিবার অধিকার পাইল। কিন্তু স্বাভাবিক হইলেও তাঁহার ভাষার মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার অভাব, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নাট্যকারের ভাষায় যে wit এবং অপরূপ কারুকার্য লক্ষ্য করা যায় গিরিশচন্দ্রের ভাষায় তাহা নাই। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক প্রভৃতি যেমন প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্তা বলে, গিরিশচন্দ্রের বিদূষক প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক চরিত্রও তেমনি কলিকাতা অঞ্চলের ইতর ভাষা ( slang ) ব্যবহার করে। গম্ভীর এবং মার্জিত ভাষার সহিত বৈপরীত্য দেখাইয়া নাট্যকার এই ভাষা হাস্যরস উদ্রেক করিবার জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন বটে, তবে একই ধরণের চরিত্রের মুখে প্রত্যেক নাটকে একই ভাষা একঘেয়ে এবং বৈচিত্র্যহীন হইয়াছে।

---

১। শেক্সপীয়ারের ট্রাজেডিগুলির বিষয় সম্বন্ধে A. H. Thorndike বলিয়াছেন, Their themes are revenge, madness, tyranny, conspiracy, lust, adultery and jealousy. They abound in villainy, intrigue and slaughter.'

—*Tragedy*, p. 165.

২। শেক্সপীয়ারের নাটকের ভাষা সম্বন্ধে A W Schlegel-এর উক্তি প্রণিধান যোগ্য—In the use of verse and prose Shakespeare observes very nice distinction according to the ranks of the speakers, but still more according to their characters and disposition of mind.'

—*Dramatic Art and Literature*, p, 374

গিরিশচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁহার গৈরিশী ছন্দ। অবশ্য তিনি এই ছন্দের সর্বপ্রথম আবিষ্কর্তা নহেন তাহা ঠিক; কারণ তাঁহার পূর্বেই কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'য়, ব্রজমোহন রায় 'দানব-বিজয়' গ্রন্থে এবং রাজকৃষ্ণ তাঁহার কাব্যে এই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রই এই ছন্দ সংস্কার এবং নাটকের উপযোগী করিয়া ইহার অমরত্ব দান করিয়া যান। তাঁহার পরেও বাংলা নাটকে ইহার ব্যাপক ব্যবহার দেখা গিয়াছে। নাটকের পক্ষে দীনবন্ধু-ব্যবহৃত পয়ার এবং মাইকেল-প্রবর্তিত চতুর্দশ অক্ষরবিশিষ্ট অমিত্রাক্ষর ছন্দ কোনটাই অনুকূল নহে, কারণ ঐ দুই ছন্দে ভাবের দ্রুত এবং অবিরাম গতি সম্ভবপর নহে, কিন্তু গৈরিশী ছন্দের মধ্য দিয়া নাটকীয় ক্রিয়া এবং চরিত্র দ্রুতগতি চলিষ্ণুতা প্রাপ্ত হয়, এবং কথোপকথন কখনো দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর মনে হয় না। গিরিশচন্দ্রের এই মৌলিক এবং নাটকীয় ছন্দের জন্যই তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলি গতানুগতিক একঘেয়েমি হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র যখন নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন তখন বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের গৌরবময় নবোত্থানের যুগ। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র কালাপাহাড়ী দিনগুলি অতিক্রান্ত হইয়াছে, এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের সাময়িক চাঞ্চল্যও স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। বাঙালী পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া নিজের ধর্ম ও সমাজ সংরক্ষণে ব্রতী হইয়া উঠিয়াছে। তখন হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র ভারতের পৌরাণিক কাহিনী লইয়া মহাকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিশালী লেখনী বৈজ্ঞানিকভাবে হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব অনুশীলনে নিরত রহিয়াছে। এই রকম সর্বজনীন ধর্মপ্লাবন গিরিশচন্দ্রের ধর্মভাবকে পরিপোষণ করিলেও, তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রভাব আসিয়াছিল ধর্মগুরু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দুর্লভ সঙ্গ হইতে। অশেষ সৌভাগ্যক্রমে তিনি রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের নিকট সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, এবং এই দুই মহাত্মা ধর্মনেতা তাঁহার মতবাদ এবং দৃষ্টিভঙ্গি এমনি ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন যে তাঁহার সমস্ত নাটকে ভক্তিভাবের অবারিত উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। 'বিল্বমঙ্গলে'র পাগলিনী, নসীরাম, এবং 'কালাপাহাড়ে'র চিন্তামণি প্রভৃতি কয়েকটী চরিত্রের উপর রামকৃষ্ণ-দেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। 'জনা'র বিদূষক, 'পাণ্ডব-গৌরবে'র কঞ্চুকী, 'গৃহলক্ষ্মী'র অবধূত প্রভৃতি ধর্মমূলক চরিত্রগুলিও রামকৃষ্ণের আদর্শ অনুসারে কল্পিত হইয়াছে। 'ভ্রান্তি'র রঙ্গলাল, 'মায়াবসানে'র কালীকিঙ্কর, 'বলিদানে'র কিশোর এবং 'শান্তি কি শান্তি'র পাগল প্রভৃতি চরিত্র স্বামী বিবেকানন্দের প্রেম ও সেবাধর্মের মূর্তিমান আদর্শরূপে চিত্রিত হইয়াছে।১ ভক্তিমূলক কোনো বিশেষ চরিত্র নাটকের অঙ্গহানি করে না, এবং পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকে ভক্তিরসের আধিক্য দোষাবহ নহে। কারণ এই ধরণের নাটক হইতে ধর্ম ও ভক্তির আদর্শ গ্রহণ করিবার জন্যই দর্শক আশা করিয়া থাকে। 'রূপ-সনাতন', 'ধ্রুব-চরিত্র'

---

১। গিরিশচন্দ্রের নাটকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত 'গিরিশ-প্রতিভা'য় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পৃঃ ১৭০-২১৭ এবং ২৪১-২৫৩ দ্রষ্টব্য।

'প্রহলাদ চরিত্র', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি নাটকে ধর্মভাবের আধিক্য দর্শকের মনকে বরং আপ্লুত করে। কিন্তু যখন এই ধর্মভাব সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রভৃতি বাস্তব নাটকে সংক্রামিত হইয়াছে, তখনি ইহা নাটকীয় রসের পরিপন্থী হইয়াছে। আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং ধর্মাদর্শ গিরিশচন্দ্রের মনপ্রাণকে এমনিভাবে সমাচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল যে বাস্তব রাজ্যের স্থূল বিষয়ে তিনি তাঁহার দৃষ্টি অধিকক্ষণ নিবদ্ধ রাখিতে পারিতেন না। বিভিন্ন স্রোতস্বিনী যেমন ইতস্তত প্রবাহিত হইয়াও অবশেষে একই সাগরে পরিণতি লাভ করে, তাঁহার নাটকের বিচিত্র ভাবও কিছুক্ষণ ঘাত প্রতিঘাতে আলোড়িত হইয়া ধর্মের পারাবারে নিমজ্জিত হয়। মনে হয় বাস্তব চরিত্র ও ঘটনাগুলি এক অদৃশ্য ধর্মশক্তির দ্বারা অমোঘভাবে আকর্ষিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সব নাটক কিছুক্ষণ দেখিয়াই তাহাদের সুনিশ্চিত পরিণতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হইয়া যায়। গিরিশচন্দ্রের এই সর্বব্যাপী ধর্মভাব ধর্মপ্রাণ হিন্দুর কাছে তাঁহার নাটককে আদরণীয় করিয়াছে. আবার বাস্তবনিষ্ঠ সমালোচকের কাছে ইহাকে দোষাবহ করিয়া তুলিয়াছে। এই ধর্মভাবের প্রাবল্য তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক অশোক', 'কালাপাহাড়' প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা নষ্ট করিয়াছে, এবং সামাজিক নাটক 'শাস্তিকি শান্তি', 'মায়াবসান' প্রভৃতিকে অনর্থক ভারাক্রান্ত করিয়াছে। অনেক সময়েই তিনি পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়া তাঁহার অভীষ্ট ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়া তাঁহার স্বরূপ নাটকের মধ্যে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। নাট্যকারকে এইভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিয়া দর্শকের মন অনেক স্থলেই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে।

গিরিশচন্দ্রের এই প্রবল ধর্মভাব ও নীতিভাবের জন্য নাটকের চরিত্রগুলি তাঁহার মানসিক আদর্শ অনুযায়ী পরিণতি লাভ করিয়াছে। তিনি তাঁহার নাটকে পাপী এবং পুণ্যাত্মা দুই রকম চরিত্রই অংকন করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম ও নীতির জয় এবং গৌরব দেখাইবার জন্যই ইহাদের চরিত্র বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। পাপের পরাজয় এবং ধর্মের জয় ঘটিয়া থাকে ইহা সাধারণ নীতিশাস্ত্রের কথা। ইহা প্রদর্শন করিয়া আমাদের নীতিবোধ ও ধর্মবোধকে হয়তো পরিতৃপ্ত করা যায়, কিন্তু ইহার মধ্যে শিল্পকলার সূক্ষ্ম নৈপুণ্য নাই। অবশ্য বড়ো সাহিত্যিক বিশ্বজনীন মানবনীতিকে কখনো অগ্রাহ্য করেন না বটে, কিন্তু সেই নীতি খুব গূঢ় এবং গভীর। সাধারণ মানুষের ভালো লাগা—মন্দ লাগা এবং পাপপুণ্য বোধ দ্বারা ইহার পরিমাপ করা যায় না। সেইজন্য অনেক সময়েই অপরাধী এবং পাপীও তাঁহার কাছে সহানুভূতি ও দরদ পাইয়া থাকে, এবং ভয়াবহ পরিণতির মধ্যে সব সময়ে তাঁহাদের চরিত্র পরিণতি প্রাপ্ত হয় ন। শাইলক নিষ্ঠুর নরাধম চরিত্র, কিন্তু তাহার চরিত্রও দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, 'King Lear' এর Edmund চরিত্র মানব সমাজের জঘন্য অপরাধে অপরাধী, কিন্তু তবুও মনে হয় যে সমাজের কাছ হইতে সে কেবল ঘৃণা ও ধিক্কার পাইয়াছে বলিয়াই সে সমাজের প্রতি এরূপ প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের চরিত্রমাত্রই এরূপ জটিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের চরিত্রগুলি নিতান্ত সরল ও সহজবোধ্য, হয় তাহারা খুব ভাল, অথবা নিতান্ত মন্দ। মন্দ চরিত্রগুলির পরিণতি হয়

তাহাদের প্রাপ্য শাস্তিতে, অথবা তাহাদের আমূল পরিবর্তনে। গিরিশচন্দ্রের অনেক মন্দ চরিত্র কঠোর শাস্তি ও ভয়াবহ পরিণাম লাভ করে নাই সত্য কিন্তু তাহারা নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত খুবই সৎ ও ধার্মিক হইয়া উঠিয়াছে। 'হারানিধি'র মোহিনী, 'মায়াবসানে'র যাদব ও মাধব এবং 'বলিদানে'র মোহিত ও দুলাল প্রভৃতি এইভাবে ধর্মের স্পর্শ পাইয়া নূতন মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ পরিণতি দিতে না পারিয়াছেন, ততক্ষণ গিরিশচন্দ্রের ধর্ম ও নীতিবোধ সন্তুষ্ট হয় নাই। অনেক পতিতা চরিত্রও তাঁহার নাটকে সাধু ও ধর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সোণা, কাদম্বিনী, গঙ্গা, সাহানা চিন্তামণি, প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে গিরিশচন্দ্র বার্ণার্ড শ'এর ন্যায় পতিতা সমস্যা নিয়া আলোচনা করেন নাই, ১ এবং শরৎচন্দ্রের ন্যায় পতিতার সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিশ্লেষণ করেন নাই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া গিরিশচন্দ্র পতিত ও অভাজনে কৃপা করিবার মহৎ প্রবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেজন্য লাঞ্ছিতা, হতভাগিনী পতিতাদিগকে ধর্মপথে নিয়োজিত করিয়া তিনি তাহাদের আধ্যাত্মিক মুক্তির উপায় বিধান করিয়াছেন।২ সোণা, গঙ্গা, চিন্তামণি প্রভৃতি সকলেই ধর্ম আশ্রয় করিয়া তাহাদের বেশ্যা-জীবনের কলুষ এবং কলঙ্ক ধৌত করিবার বাসনা করিয়াছে। সুতরাং পতিতাদের প্রতি গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি পতিতপাবক মহাপ্রাণের দৃষ্টির সহিত অভিন্ন। পতিতাজীবনের প্রেম এবং সমাজ-ব্যবস্থার সহিত সংঘাত, সেই জীবনের করুণ ট্র্যাজেডি গিরিশচন্দ্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চান নাই। যে সব পতিতা নাট্যকারের অনুকম্পা লাভ করিয়াছে তাহারা সকলেই মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত ধর্মব্রতী সন্ন্যাসিনী। কেবল 'মোহিনী-প্রতিমা'য় গিরিশচন্দ্র সাহানাকে ধর্মার্থিনী যোগিনী না করিয়া তাহার জীবনের অতি মধুর অথচ বেদনাময় স্পর্শটুকু ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সাহানা তাহার প্রেমাস্পদকে অন্যের হাতে সঁপিয়া দিয়া যে চরম আত্মত্যাগ করিল তাহাতে তাহার চরিত্র নিতান্ত ট্র্যাজিক অথচ মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছে। সাহানা শরৎচন্দ্রের সাবিত্রী, বিজলী, চন্দ্রমুখী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চরিত্রকে মনে করইয়া দেয়। নাটকখানি গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক সৃষ্টি।

১। বার্ণার্ডশ 'Mrs. Warren's Profession' নাটকে পতিতাবৃত্তির অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

১। রঙ্গালয়ের মধ্য দিয়া গিরিশচন্দ্র পতিতাদের জীবন পরিশোধন করিতে চেষ্টা করিতেন। অভিনেত্রীর কটাক্ষ নামক প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—'নালার জল গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়া গঙ্গাজল হইয়া যায়, পরশমণি স্পর্শে ব্যাধ-গৃহের লৌহও কাঞ্চনে পরিণত হয়; সাধুসঙ্গে কুচরিত্রা সন্ন্যাসিনী হন; ভগভক্ত হরিদাসকে ছলনা করিতে গিয়া বেশ্যা মোহিনী পরমা বৈষ্ণবী হইয়াছিল। আমাদেরও আশা; সদাশয় ব্যক্তির পদার্পণে রঙ্গালয় পবিত্র হইবে, ও ঘৃণিত অভিনেত্রীরাও স্বীয় শিশ্নানুরাগিণী মাতৃদুগ্ধে পরিপুষ্ট বৃত্তি পরিহার পূর্বক সাধুজনের কৃপায় ভাজন ও প্রশংসার পাত্রী হইবে।'

গিরিশচন্দ্রের জীবনী এবং নাটকাদি আলোচনা করিলেই মনে হয় যে জীবন সম্বন্ধে তাঁহার গভীর ও দার্শনিক ধারণা ছিল। তাঁহার তত্ত্বসন্ধিৎসু চিত্ত জীবনের সব সমস্যার মূল অনুসন্ধান করিয়াছিল। তাঁহার ধর্মপ্রবণতা এবং সাধুসঙ্গ তাঁহাকে জীবন সম্বন্ধে আরও বেশি জিজ্ঞাসু করিয়া তুলিয়াছিল। সেইজন্য জীবনের হাল্কা এবং হাস্যতরল দিকটা, রামধনুর বিচিত্র রঙের ছটার ন্যায় যাহা গুরুগম্ভীর জলভারানত মেঘের উপরিভাগ ক্ষণকালের জন্য রঞ্জিত করিয়া রাখে—গিরিশচন্দ্রের সহিত তাহার কোনো যোগ ছিল না।১ দীনবন্ধু কিংবা অমৃতলালের ন্যায় গিরিশচন্দ্রের নাটক সেইজন্য জীবনের পরিহাস-মধুর, চপল; চটুল মুহূর্তগুলির পরিচয় পাওয়া যায় না। করুণ রস অথবা ভক্তিরসের গম্ভীর এবং সমাহিত ধ্বনি তাঁহার সমস্ত নাটকে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।২ সেইজন্য প্রাণ খুলিয়া তিনি কখনো হাসিতে এবং হাসাইতে পারেন নাই। তাঁহার নাটকের মধ্যে যেখানে একটু আধটু হাসির অবকাশ আছে, সেখানে আমাদের অতি সন্তর্পণে থাকিতে হয়, কি জানি আমাদের লঘু চাপল্যের জন্য কখন নাট্যকার রক্তচক্ষু হইয়া তাঁহার গুরুভাবের লগুড় দ্বারা আঘাত করিয়া বসেন। বিদূষক প্রভৃতি চরিত্রের হাস্যরসের তারল্য ধর্মভাবের প্রাবল্যে সমাধি লাভ করিয়াছে। তিনি যে পঞ্চরংগুলি (Extravaganza) লিখিয়াছেন সেগুলির মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও কদর্য রসিকতা আছে, কিন্তু বিমল হাস্যরসের স্নিগ্ধ ধারা নাই।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে দোষত্রুটি থাকিলেও তাহাতে অকপট আন্তরিকতার অভাব কেহই লক্ষ্য করিতে পারিবেন না। তিনি নিজে যাহা দেখিয়াছেন, যাহা বুঝিয়াছেন, অকুণ্ঠ লেখনীর মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।৩ ধর্মগুরুর সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাটকে ধর্মভাবের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়, আবার বেশ্যা-সংসর্গেও বাস করিতে হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের কথাও তিনি লিখিয়াছেন।

১। 'গিরিশচন্দ্রের কল্পনা উচ্চধ্যানে ও উচ্চ আদর্শ চিন্তায় সর্বক্ষণ বিভোর হইয়া থাকিত। এজন্য প্রহসনের নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতে চাহিত না।'

গিরিশচন্দ্রের জীবনী—দেবেন্দ্রনাথ বসু।

২। গিরিশচন্দ্র একদিন শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেনকে বলিয়াছিলেন—'আমার dramaগুলো light reading নয় serious moodএ seriously think না করলে সব বুঝতে পারবে না। superficially আমার drama পড়া চলবে না।'

—'গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য', পৃঃ ৭৩।

৩। আমি বই লিখতে লোককে ফাঁকি দিই নি। যেটা feel করেছি, যে সত্য practical lifeএ realise করেছি, যা জীবনে মরণে পরম সত্য ব'লে জেনেছি তাই সবার ভিতরে বিলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

ঐ, পৃঃ ৭৩।

## পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটক

গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার উন্মেষ এবং পরিণতি হইয়াছে পৌরাণিক নাটকে। নাটকের মধ্য দিয়া যে ধর্মমূলক পৌরাণিক আদর্শ প্রচারণের ব্রত তিনি 'রাবণ-বধে' গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন 'তপোবলে'। গিরিশচন্দ্র সামাজিক ঐতিহাসিক প্রভৃতি বিভিন্ন-প্রকারের নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু পৌরাণিক নাটকে তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগ যেমন উল্লসিত, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তেমন আর কোথাও হয় নাই। সাধারণ বাঙালীর প্রাণধারার সহিত তাঁহার মানসভঙ্গির এমন একটা নিবিড় অকপট সঙ্গতি ছিল যে নাটক লিখিতে যাইয়া ব্যবসায়ের অঙ্কুশ-আঘাতে তাঁহাকে অবহিত থাকিতে হয় নাই, অন্তরের সুবিপুল আবেগে তাঁহার লেখনীর মুখ দিয়া সাবলীল নাট্যধারা নিঃসৃত হইয়াছে, এবং তাহাতেই তৎকালীন দর্শকের হৃদয়-সিংহাসনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের মানসিক ভাবপ্রবাহের ক্রমবিকাশ যদি আমরা বিশেষভাবে অনুধাবন করি, তবে ইহা লক্ষ্য করিব যে আশৈশব পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল প্রভাবে তাঁহার মনে পৌরাণিক আদর্শ চিরস্থায়ীরূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। বাল্যকালে তিনি খুল্লপিতামহীর কাছে রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণের নানা কাহিনী আগ্রহসিক্ত কৌতূহলের সহিত শুনিতেন।১ বয়োবৃদ্ধির সহিত সেই সব কাহিনী এবং গল্প সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যাত্রা কথকতা, হাফ-আখড়াই প্রভৃতির রস-উপভোগের মধ্য দিয়া তাঁহার ধর্মানুরাগ এবং ভক্তিপরায়ণতা পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পরবর্তীকালে তিনি বিদেশী ভাবধারাবাহিত নানা মত ও তত্ত্বের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে রসধারার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল যাত্রা, পাঁচালী ও কথকথার মধ্য দিয়া, তাহা তাঁহার মনপ্রাণের সহিত এমনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল যে যাহা কিছু তিনি লিখিয়াছেন তাহাতেই সেই রসধারা মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের পূর্বে মনোমোহন বসু হইতে রাজকৃষ্ণ রায় পর্যন্ত অনেক নাট্যকার বহুতর অপেরা, গীতাভিনয় প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙালী দর্শকগণ তাহাদের ধর্মালু ভাবোন্মাদনা চরিতার্থ করিবার জন্য এই সব অনুল্লেখ্য নাটকের অবাধ প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছিল। গিরিশচন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তিনি

---

১। গিরিশচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—'গিরিশচন্দ্রের খুল্লপিতামহী রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণের কথা অতি চমৎকার করিয়া বলিতে পারিতেন। বালক গিরিশচন্দ্র সন্ধ্যার পর তাঁহার কাছে বসিয়া সেই সকল গল্প শুনিতেন, এবং উহা তাহাকে এরূপ অভিভূত করিত যে, তিনি সকল সময়েই সেই কল্পনায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে পৌরাণিক চিত্রসকল মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে পরিণত বয়সে উৎকৃষ্ট পৌরাণিক নাটকাদি লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার ভিত্তি এইখানে।' 'গিরিশচন্দ্র'—পৃঃ ১৮।

বুঝিয়াছিলেন যে 'হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে'।১ তিনি 'নাট্যকার' নামক প্রবন্ধে একস্থলে লিখিয়াছেন যে নাটক-রচয়িতাকে দেশীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। এই বিধান অনুযায়ী তিনি ভারতের দেশীয় ভাবধর্মের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিলেন এবং দেশীয় জনসাধারণের মনে অক্ষয় আসন লাভ করিয়াছিলেন। আরও একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে গিরিশচন্দ্রের যুগ—ধর্মমূলক জাতীয়তার যুগ। দেশের মন তখন হিন্দুধর্ম ও পুরাণ প্রভৃতির দিকে ঝুঁকিয়াছে, এবং পৌরাণিক কাহিনী উপাখ্যান প্রভৃতির প্রতি লোকে আগ্রহপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক অতি সহজেই সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু সমসাময়িক লোকের কাছে সমাদর লাভ করিলেই সমালোচনার শাশ্বত কষ্টিপাথরে চিরন্তন মূল্য নির্ধারিত হইয়া যায় না। দাশরথি রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি কবি একদিন সাহিত্যের আঙ্গিনা জাঁকিয়া বসিয়াছিলেন কিন্তু আধুনিক সমালোচনায় তাঁহাদের সেখান হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের বহু-সমাদৃত পৌরাণিক নাটকের সাহিত্যিক মূল্য কি তাহা আমাদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচনা করা উচিত।

পৌরাণিক নাটকে নাট্যকার পুরাণ অথবা প্রাচীন কোন ধর্মগ্রন্থ হইতে কোনো বিশেষ কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাট্যরূপ দান করিয়াছেন। সাধারণত এই সব কাহিনী বহু-প্রচলিত এবং অন্যান্য বহুতর গ্রন্থে আশ্রিত, সুতরাং এই সব নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনো অভিনব মৌলিকত্ব নাই। গিরিশচন্দ্র প্রাচীন পুরাণ এবং ধর্মগ্রন্থে অটুট আস্থাবান ছিলেন, সেইজন্য কোনো কাহিনীর রূপান্তর করিয়া তিনি নাটকের উদ্দেশ্য সাধন করিতে চান নাই। কিন্তু কোনো বিশেষ ঘটনা কি আখ্যান কথোপকথনের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিলেই তাহা নাটক হইল না। নাটকের মধ্যে একটা জটিল ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়া চরিত্রগুলিকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। যে নাটকে দ্বন্দ্ব সংঘাত নাই, যেখানে কোনো বিশেষ দেবমাহাত্ম্য অথবা ধর্মভাব পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্য থাকে তাহা নাটক নয়, যাত্রা। যাত্রার মধ্যে কোনো চরিত্রের স্বাধীন বিকাশের সুযোগ নাই, সেখানে দেবতা ও মানবের সীমারেখা অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেবতারা মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত করিয়া থাকেন। সেজন্য ইহাতে মানব জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা দেখিয়া দর্শক হৃষ্ট অথবা দুঃখিত হইতে পারে না। যাত্রার উদ্দেশ্য লোকের মনে ধর্মভাব জাগ্রত করা, সুতরাং ধর্মভাবের পরিপূর্তির জন্যই লোকে যাত্রা দেখিতে যায় মানবজীবনের জটিল সমস্যার পরিচয় পাইতে যায় না। সুতরাং যে পৌরাণিক নাটকে কোনো ভাব অথবা ভক্তিরই প্রাধান্য, যেখানে ঘটনা চমৎকারী এবং চরিত্রগুলি দ্বন্দ্বমূলক নয়, তাহা যাত্রার স্তরে অবনীত হইয়া পড়ে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকসমূহ আলোচনা করিলেই মনে হইবে যে সেইগুলি অনেকাংশে যাত্রা লক্ষণাক্রান্ত। যাত্রার ন্যায় তাঁহার নাটকেও

১। 'পৌরাণিক নাটক'—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ভক্তিরসের প্রাবল্য, এবং অলৌকিক, অপ্রাকৃত ব্যাপারের অবাধ সমাবেশ রহিয়াছে। নাটকের চরিত্রগুলিরও কোনো স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা ফুটিয়া উঠে নাই, তাহাদের ক্রিয়া কর্ম নিরন্তর কোনো ধর্মভাব অথবা দেবমাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার জন্যই বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। 'জনা' নাটকের জনা চরিত্র ও 'পাণ্ডবগৌরবের' ভীম প্রভৃতি দুই একটি ভূমিকা স্বাধীন ক্ষমতা ও আত্মনিষ্ঠার দ্বারা জীবন্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের শেষ পরিণতি যাত্রার অনুরূপ হইয়াছে। এই সমস্ত নাটক দেখিয়া ধর্ম ও ভক্তির মহিমা এবং পাপ ও অধর্মের পরাভাব সম্বন্ধে দর্শকের শিক্ষা হয় বটে, কিন্তু সে কখনো মনে করিতে পারে না ইহাদের সহিত তাহার পার্থিব জীবনধারার কোনো সংযোগ আছে, ইহাদের চরিত্র তাহার মনের আবেগতন্ত্রীগুলিকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারে না। সে সব সময়েই মনে করে যে চরিত্রগুলির অদৃষ্ট সুনিধারিত রহিয়াছে, কোনো ঘটনা বিপর্যয়ে কিংবা চরিত্রের কোনো অভিনব বৃত্তির পরিস্ফুরণে সেই অদৃষ্টের ব্যতিক্রম ঘটিবে না। গিরিশচন্দ্র চৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি কয়েকজন মহাপুরুষের জীবনলীলা অবলম্বন করিয়া কয়েকখানা নাটক লিখিয়াছেন, ইহাদের মানবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ধর্মজীবনের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি লইয়া তিনি চমৎকারভাবে নাটকীয় রস সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্তু নানা অপ্রাকৃত ও অতিলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করিয়া তিনি ইহাদের চরিত্র মানবীয় কৌতূহল ও ধারণার অতীত করিয়া দিয়াছেন, সেইজন্য ইহারা নাটকীয় রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠে নাই। এই সব নাটক পাশ্চাত্য দেশের Miracle playর সদৃশ, ধর্মভাব প্রচারই ইহাদের মূল লক্ষ্য। পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের মৌলিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার ভাষা ও ছন্দে এবং দুই এক প্রকার অভিনব চরিত্র সৃজনে। গৈরিশ ছন্দের মধ্যে এমন একটা নাটকীয় গতি ও ব্যঞ্জনা আছে, যাহাতে তাঁহার নাটকের রসাভাস মাঝে মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিদূষক প্রভৃতি চরিত্র অঙ্কনেও নাট্যকার নূতনত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সব কারণে তাঁহার পৌরাণিক নাটক একেবারে যাত্রার স্তরে নামিয়া যায় নাই, ইহা যাত্রা ও প্রকৃত নাটকের মাঝামাঝি স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকগুলি আলোচনা করিলেই ইহাদের মধ্যে দুইটী সুস্পষ্ট স্তর সহজেই লক্ষ্য করা যাইবে। প্রথম স্তরের নাটকগুলির বিষয় তিনি রামায়ণ, মহাভারত অথবা অন্য কোনো পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়া অবিকল সেই সব কাহিনীর নাট্যরূপ দান করিয়া গিয়াছেন। এই সব নাটকের মধ্যে ভক্তির আতিশয্য প্রকাশ করিয়া নাট্যকার নিজেকে ধরা দিয়া ফেলেন নাই। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের নাটকগুলির মধ্যে ভক্তি-রসের প্রাবল্য এবং গ্রন্থকারের নিজের ধর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ দেবের আধ্যাত্মিক সঙ্গ লাভ করিবার পর হইতে গিরিশচন্দ্রের নাটকের এই দ্বিতীয় স্তরের সূত্রপাত। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই যুগকে 'নামভক্তি প্রচারের যুগ' বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। এই যুগের নাটকে পৌরাণিক কাহিনীর অনুবর্তন নাই। কোনো মহাপুরুষের লীলা উপলক্ষ করিয়া ধর্মতত্ত্ব প্রচারই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রথম স্তরের নাটকগুলির মধ্যে 'রাবণ বধ', 'সীতার বনবাস', 'লক্ষ্মণ বর্জন', 'সীতার বিবাহ', 'রামের বনবাস', এবং 'সীতাহরণ'—এই কয়েকখানি নাটক কৃত্তিবাসী রামায়ণের যথাযথ অনুসরণে রচিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ গিরিশচন্দ্রের কাছে কত প্রিয় ছিল তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। রামায়ণের কাহিনী গ্রহণ করিতে যাইয়া তিনি কৃত্তিবাসের ভাব ও ভাষাই আত্মসাৎ করিয়াছেন। ঘটনা সংস্থাপনের কোনো কৃতিত্ব, কিংবা চরিত্রসৃষ্টির কোনো বৈচিত্র্য তাঁহার নাই। তাঁহার প্রথম নাটক 'রাবণ বধ' (১৮৮১) রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় হইয়াছিল, এবং সমালোচকরাও একবাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু 'রাবণ বধে'র রাম, রাবণ চরিত্র প্রভৃতি সব কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদর্শে অঙ্কিত। রাবণের দর্প, তেজস্বিতা, প্রচ্ছন্ন ভক্তি—এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য কৃত্তিবাসে যেমন আছে, গিরিশচন্দ্রেরও তেমনি রহিয়াছে। 'রাবণ-বধে'র ঘটনার পারম্পর্যও কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করিয়া নাট্যকার হুবহু রক্ষা করিয়াছেন। 'রাবণ বধ' নাটকের মধ্যে সীতার অগ্নিপরীক্ষার দৃশ্য অবান্তর এবং রস-পরিপন্থী হইয়াছে। রাবণকে ঘিরিয়া যে আগ্রহ ও কৌতূহল নাটকের মধ্যে গড়িয়া উঠে, রাবণের মৃত্যুতে তাহার অবসান হয়। সীতার অগ্নিপরীক্ষায় দৃশ্যে পুনরায় দর্শকের মনে আগ্রহ ও উদ্বেগ উদ্রেক করা উচিত হয় নাই। গিরিশচন্দ্র এইখানে সূক্ষ্ম নাট্যকলার পরিচয় দেন নাই। 'সীতার বনবাসে'ও (১৮৮২) নাট্যকার কৃত্তিবাসের অনুবর্তন করিয়াছেন। সীতাকে বনবাসে প্রেরণের পর অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের সহিত লব কুশের যুদ্ধ, সীতা, লব কুশের অযোধ্যায় গমন, এবং অবশেষে সীতার পাতালে প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনা যেমন রামায়ণে আছে, গিরিশচন্দ্রও তেমনি নাটকের সহিত বজায় রাখিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। নাট্যকার চরিত্র ও ঘটনার কোনো নাটকীয় স্থল বিশেষ ভাবে রঞ্জিত করিয়া তুলেন নাই। সেইজন্য কাহিনীর মধ্যে কোনো চমৎকারিত্ব নাই। তবে ঈর্ষাপীড়িত রামের চরিত্র ভালোভাবে দেখান হইয়াছে বটে। 'লক্ষ্মণ বর্জন' (১৮৮২) নিতান্ত সংক্ষিপ্ত অনুল্লেখ্য নাটক। 'সীতার বিবাহে'র মধ্যে নাট্যকারের কথঞ্চিৎ মৌলিকতা আছে, কারণ এই নাটকে ভৃত্য, সৈন্য, নেয়ে, পুরস্ত্রী প্রভৃতি ইতর লোকের মধ্য দিয়া হাস্যরস সৃজনের চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার পূর্বে কোনো নাটকে এই ভাবে হাস্যরস প্রবর্তন করা হয় নাই। সীতা ও রতির কথোপকথনও গ্রন্থকারের নিজস্ব সৃষ্টি। 'রামের বনবাসে'ও (১৮৮২) এতো বিভিন্ন ঘটনার শিথিল সমাবেশ যে, কোনো একটী ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া নাটকীয় রস জমাট হইয়া উঠিতে পারে নাই। দশরথের আক্ষেপ এবং নাটকের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাটকীয় সংস্থান, তবে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে পুত্র-বিচ্ছেদাকুল, নিরুপায়-দুঃখ-কাতর দশরথের চিত্র কৃত্তিবাসও অতি মর্মস্পর্শী ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই নাটকেই সর্বপ্রথম গিরিশচন্দ্র হাস্যরসাত্মক চরিত্র কঞ্চুকীকে আনয়ন করিয়াছেন। অবশ্য ঐ চরিত্র এখানে অপরিস্ফুট, সে নিতান্তই অবজ্ঞেয় হাস্যাস্পদ ভাঁড়, নিজের স্থূল অসঙ্গতি দিয়া সে সকলের মনে অনুকম্পামিশ্রিত হাসির উদ্রেক করে। 'সীতাহরণে'ও (১৮৮২) ঘটনাগুলি ঘটিয়া গিয়াছে মাত্র, নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে জমিয়া উঠে নাই।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠক মাত্রই নাটকখানির আদ্যন্ত না পড়িয়াই ধারণা করিতে পারেন। নাটকের মধ্যে লক্ষণীয় চরিত্র হইল শূর্পনখার। শূর্পনখার কথাগুলি অত্যন্ত চমকপ্রদ—

নিটোল দুটো ছোঁড়া গো
নিটোল দুটো ছোঁড়া!
খালি বিষের গোড়া গো
খালি বিষের গোড়া!

এই ধরণের ছড়ার মত কথা তাহার মুখে দিয়া নাট্যকার এই চরিত্রটীকে বড়ই সরস করিয়া তুলিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার পাত্র পাত্রীর ভাষা প্রয়োগ করিবার বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ও তীক্ষ্দৃষ্টি ছিলেন। তাঁহার গৈরিশ ছন্দ কেবল গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে; তরল, হাস্যরসাত্মক ভাবের জন্য হয় গদ্য অথবা সমিল কোনো চপল ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র রামায়ণ-কাহিনী লইয়া যে নাটকগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে রাম চরিত্র তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র সদৃশ করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামের ন্যায় তাঁহার রামও সত্যসন্ধ, ভক্তবৎসল, ক্ষমা ও করুণার অবতার; বাল্মীকি ও তুলসীদাসের রামের ন্যায় তিনি কুলিশ-কঠোর, মহাশক্তিধর বীর-পুরুষ নহেন। গিরিশচন্দ্রের সীতাও কৃত্তিবাসের সীতার ন্যায় নবনীত-কোমলা, লাবণ্য ও কারুণ্যের উর্মি নিতান্ত বাঙালী ললনা।

'অভিমন্যু বধ' এবং 'পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস' এই দুইখানা নাটক গিরিশচন্দ্র মহাভারতের মূল কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। 'অভিমন্যু বধ' (১৮৮১) তাঁহার শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক সমূহের অন্যতম। বীররস এবং করুণ রসের এইরূপ একত্রিত পরিস্ফুরণ তাঁহার খুব কম নাটকেই লক্ষ্য করা গিয়াছে। নাটকের প্রথম ভাগে সুভদ্রা ও উত্তরার আশঙ্কা, গণকের অমঙ্গল গণনা প্রভৃতি ভবিষ্যৎ সর্বনাশের কৃষ্ণ ছায়াপাত করিয়া দর্শকের মন আগ্রহ ও উদ্বেগে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে। যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে উত্তরার কাতর মিনতি ট্রোজান বীর হেক্‌টরের পত্নী অ্যাণ্ড্রোমাকির করুণ আলাপের সহিত সাদৃশ্য জাগাইয়া দেয়। অদৃষ্টের বিরুদ্ধাচারী, পুরুষকারের প্রত্যক্ষ আধার, সিংহ-শাবকসম সমরে দুর্বার অভিমন্যু যখন অন্যায় সমরে অসহায় ভাবে ভূপতিত হয় তখন দর্শকের ভাবাবেগ সম্বরণ করা শক্ত হইয়া পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য খুবই বীররসাত্মক হইয়াছে। বোধ হয় একমাত্র 'অভিমন্যু-বধ'ই পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে ট্র্যাজিক অথবা বিয়োগান্তক হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত ক্রোড় অঙ্ক অথবা কোনো স্বর্গীয় দৃশ্যের দ্বারা ইহার ট্র্যাজেডি নষ্ট হয় নাই। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে কীচক বধ ও কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ এই দুইটী প্রধান ঘটনা। প্রথম অংশে ভীম মুখ্য চরিত্র, এবং দ্বিতীয় অংশে অর্জুন। দ্রৌপদীর ক্রোধ ও প্রতিশোধ-স্পৃহা সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রিত ও চরিত্র গুলিকে চালিত করিয়াছে। 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে মূল চরিত্র দক্ষ অনমনীয় দৃঢ়তা, পরুষ কাঠিন্য ও সুকঠোর সংকল্পে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই নাটকখানার উপর ভারতচন্দ্রের অন্নদার মঙ্গলের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। এমন কি কোনো কোনো পংক্তিতে পর্যন্ত এই প্রভাব স্পষ্ট

হইয়া উঠিয়াছে। 'কে-রে, দে-রে সতী দে আমার' ভারতচন্দ্রের প্রসিদ্ধ অংশ 'সতী দে দে দক্ষ দে রে সতী' ইত্যাদির প্রতিধ্বনি মাত্র।

গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় স্তরের পৌরাণিক নাটকে যে ভক্তি-বন্যা প্রচারিত হইয়াছে তাহার আভাস 'ধ্রুব-চরিত্রে' লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র প্রথমে বিদূষক চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার পূর্বেই 'রামের বনবাসে' এই ধরণের কঞ্চুকী চরিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। 'ধ্রুব চরিত্র' এবং 'নল-দময়ন্তী'র বিদূষক সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের অনুরূপ মূর্খ, ঔদরিক ও রাজার প্রেম ব্যাপারে সহায়ক। কিন্তু 'শ্রীবৎস-চিন্তা'র বাতুল হইতে এই ধরণের চরিত্র পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বাতুল, 'অশোক' নাটকের আকাল, 'জনা'র বিদূষক, 'পাণ্ডব গৌরবে'র কঞ্চুকী, 'চণ্ড' নাটকের পূর্ণরাম ভাট চরিত্রগুলি গিরিশচন্দ্রের বিশিষ্টতার পরিচয় দেয়। ইহারা ইতর গ্রাম্য ভাষায় কথা বলে, বাহ্যত ইহারা মূর্খ ও নির্বোধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুত ইহারা সূক্ষ্ম বুদ্ধিশালী ও অনুভূতি-প্রবণ, এবং ইহাদের তরল হাস্যোদ্দীপক কথার অন্তরালে সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাঁটাগুলি গুপ্ত হইয়া থাকে। এই সব চরিত্রের সহিত শেক্‌সপীয়রের Fool অথবা Jesterএর সাদৃশ্য আছে।১ গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা প্রচ্ছন্ন ভক্তিভাবে আগাগোড়া অভিষিক্ত হইয়া রহিয়াছে। বাতুলের লক্ষ্মী-নিন্দা এবং জনার বিদূষকের কৃষ্ণ-বিদ্বেষ ব্যাজস্তুতি বই আর কিছুই নয়।

'কমলে-কামিনী' চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে রচিত বিশেষত্বহীন নাটক। 'নল-দময়ন্তী (১৮৮৭), এবং 'শ্রীবৎস-চিন্তা'র কাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। প্রথমখানিতে নল কলির দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়খানিতে শ্রীবৎস শনির দ্বারা দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। দুই নাটকের পরিণতিও একইরূপ মিলনান্তক হইয়াছে।

'শ্রীবৎস-চিন্তা'য় গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের যুগ শেষ হয়, এবং তাহার পরে তিনি যে নাটকগুলি লিখিয়াছিলেন সেইগুলিকে ঠিক পৌরাণিক নাটক বলা চলে না কারণ সেই সব নাটকের অধিকাংশ মূল চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক পুরুষ, তবে ভক্তিরসই তাহাদের প্রাণ। সেইজন্য এই নাটকগুলিকে ভক্তিমূলক নাটক বলা সঙ্গত। অবশ্য এই যুগে 'প্রভাস-যজ্ঞ', 'জনা' 'পাণ্ডব-গৌরব' প্রভৃতি কয়েকখানা পৌরাণিক নাটক আছে বটে, কিন্তু এই সব নাটকের সহিত পূর্ব স্তরের পৌরাণিক নাটকের পার্থক্য আছে। পূর্বেকার নাটকগুলিতে নাট্যকার পৌরাণিক কাহিনীকে কোনো প্রকারে রঞ্জিত কিংবা বিশেষ রসে সিক্ত করেন নাই, কিন্তু এই যুগের নাটকের কাহিনী সর্বত্র উচ্ছ্বসিত ভক্তি

১। Shakespeare's fools, along with somewhat of an overstraining for wit, which can not altogether be avoided when wit becomes a separate profession, have for the most part an incomparable humour, and an infinite abundance of intellect, enough indeed to supply a whole host of ordinary wise men.

*Dramatic Art and Literature* by Schlegel, p. 373.

রসে প্লাবিত, নাটকগুলির মধ্যে নাট্যকারের ভক্তিবিহ্বল চিত্তই যেন অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। রামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক প্রভাবের ফলেই গিরিশচন্দ্রের নাটকের এই রূপান্তর ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।১ 'চৈতন্য-লীলা' এই প্রভাবের পূর্বে লিখিত হইলেও এইখান হইতেই ভক্তিরসের সূচনা হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা অবলম্বন করিয়া 'চৈতন্য-লীলা' (১৮৮৬) রচিত হইয়াছিল। নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয় হইলেও ২ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার মধ্যে নাটকত্ব খুব কম আছে। চৈতন্যদেবের মানবীয় লীলা বঙ্গের জনসাধারণ চিরকাল মুগ্ধ করিয়াছে, কিন্তু নাট্যকার তাঁহাকে অলৌকিক শক্তির আধার—ভগবানের অবতাররূপে বর্ণনা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নাটকীয় কৌতূহল নষ্ট করিয়াছেন। মনে হয় চৈতন্যের বাল্যলীলা গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্য-ভাগবত' অনুসরণ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পাপ, কলি, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতির উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া নাট্যকার সম্ভব অসম্ভব সমস্ত সীমার পরপারে এক ধ্যানগ্রাহ্য জগতে আমাদিগকে লইয়া গিয়াছেন। 'চৈতন্য-লীলা'র দ্বিতীয় ভাগ 'নিমাই-সন্ন্যাসে' সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে। হয়তো বিচ্ছেদে নাটকের শেষ হয় ভাবিয়া নাট্যকার সর্বশেষে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাই-এর 'ভাব-সম্মিলন' করাইয়াছেন। 'নিমাই-সন্ন্যাসে' গুরু তত্ত্বের আলোচনা খুব বেশি, সেইজন্য সাধারণ দর্শক সর্বত্র ইহার রস গ্রহণ করিতে পারে না। 'রূপ-সনাতন' (১৮৮৮) নাটকে গোস্বামীপ্রবর সনাতনের ভক্তিতন্ময়তা ভক্ত বৈষ্ণবের হৃদয় দ্রাবিত করে সন্দেহ নাই।

গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় স্তরের ধর্মমূলক নাট্যরচনার সময় তিনি ধর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছিলেন। ধর্মাদ্রচিত্তে তিনি নানা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। সেইজন্য এইসব বিষয়ের আলোচনা তিনি নাটক মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই রকম আলোচনা 'নিমাই-সন্ন্যাস' হইতে আরম্ভ হইয়া 'শঙ্করাচার্যে' পরিণতি লাভ ক'রয়াছে। রামকৃষ্ণদেবের পুণ্য প্রভাবে তিনি পাপী ও পতিতাদের প্রতিও সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন, সেজন্য হিরণ্যকশিপু কৃষ্ণদ্বেষী হইয়াও কৃষ্ণের চরণ রেণু পাইবার অভিলাষী। প্রহ্লাদের মুখে কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে; এবং 'প্রভাস যজ্ঞে' রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক নীতিবিগর্হিত সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় মহিমময় করার চেষ্টা হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের ধর্মসম্বন্ধে উদারতা ছিল, 'যত মত তত পথ'— এই মন্ত্রের সাধকের কাছে এই উদারতা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্য বৌদ্ধধর্ম, নাথ ধর্ম, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ —সব কিছু সম্বন্ধে তিনি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। 'বুদ্ধদেব-চরিতে' বুদ্ধদেবকে নারায়ণের অবতার বলিয়া দেখান সত্ত্বেও সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের spirit বজায় রাখা হইয়াছে।

১। গিরিশচন্দ্র লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২। 'চৈতন্য লীলার অভিনয় দর্শনে সমস্ত বঙ্গদেশ হরিনামে নাচিয়া উঠিয়াছিল।'
'গিরিশচন্দ্র'—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮৯।

॥ **বিল্বমঙ্গল (১৮৮৮)** ॥ 'বিল্বমঙ্গল' গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক নাটকগুলির মধ্যে বোধ হয় সর্বাধিক জনসম্বর্ধনা লাভ করিয়াছে বিল্বমঙ্গল। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'বিল্বমঙ্গল Shakespear এরও উপরে গিয়াছে, আমি এরূপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।' 'বিল্বমঙ্গল' যে একদিন বাঙালী দর্শকের চিত্রে এতখানি অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, ইহার কারণ কি? নিশ্চয়ই নাটকখানির নাট্যোৎকর্ষ নহে, কারণ 'বিল্বমঙ্গলে' নাট্যগুণের অভাব না থাকিলেও কোন অসাধারণ নাট্যনৈপুণ্য ইহাতে পরিস্ফুট হয় নাই। ইহার জনপ্রিয়তার কারণ সন্ধান করিতে হইবে দর্শকদের মানস প্রকৃতি ও যুগানুগত প্রবণতার মধ্যে। ধর্মপ্রাণ বাঙালী ধর্মসাধনায় জ্ঞান-নিম্বফল অপেক্ষা প্রেমাম্রমুকুল খাইতেই অনেক অধিক আসক্তি দেখাইয়াছে। এই প্রেমাম্রমুকুলের আস্বাদনা রহিয়াছে বিল্বমঙ্গল নাটকে। সেইজন্য এই নাটক প্রেমাপ্লুত ভক্ত বাঙালী-হৃদয়ে এতখানি উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছে। আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অলৌকিক আকর্ষণেই সমাজ-মন যখন উর্ধ্বে আকৃষ্ট হইয়াছে তখন মানুষের সংসার-লীলা অপেক্ষা বৈরাগ্য-লীলাই যে তাহার কাছে অধিকতর সত্য ও জীবন্ত মনে হইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। যেদিন হইতে সমাজ-মন পুনরায় বস্তুমুখী হইয়াছে সেইদিন হইতেই 'বিল্বমঙ্গলে'র সমাদর কমিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক নাটকগুলিতে নাট্যকারের ব্যক্তিসত্তা কখনও নিরপেক্ষ দূরত্ব বজায় রাখিতে পারে নাই। তাঁহার গভীরতর মর্ম হইতে অনুভূতির অবিরত আবেগ-ধারাই নাটকীয় ঘটনা ও চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইত; সুতরাং এই সব নাটক নাট্যকারের বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় ধর্মজীবনের আলেখ্য হইয়া উঠিয়াছে। 'বিল্বমঙ্গলে'র কাহিনী তিনি 'ভক্তমাল' হইতে লইয়াছিলেন সত্য কিন্তু ইহা কি তাঁহারই আত্মকাহিনী নহে? নাট্যকার বিল্বমঙ্গলের মতই ভোগাসক্ত ছিলেন, বিল্বমঙ্গলেব মতই তিনি পথের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার মানসিক ব্যাকুলতা নিজের মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন, 'বন্ধু-বান্ধবহীন চারিদিকে বিপজ্জাল, দৃঢ়পণ শত্রু সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছে এবং আমারই কার্য তাহাদের সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবিলাম, ঈশ্বর কি আছেন; তাঁহাকে ডাকিলে কি উপায় হয়। মনে মনে প্রার্থনা করিলাম যে, হে ঈশ্বর, যদি থাক এ অকূলে কূল দাও।' বিল্বমঙ্গলের মতই তিনি অবশেষে সদ্‌গুরুর কৃপায় পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভগবানের অহেতুকী কৃপার ফলে লম্পট ও পতিতাও ত্রাণ পাইয়া যায়, ইহাই গিরিশচন্দ্রের জীবনের অনুভূত বাস্তব সত্য। সেই সত্যই তো তিনি প্রকাশ করিয়াছেন বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণি চরিত্রে। পাগলিনী চরিত্র যে পরমহংসদেবের লীলাকীর্তন করিয়া লিখিত, তাহাও অতি স্পষ্ট। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত 'গিরিশ-প্রতিভা'য় লিখিয়াছেন যে, 'এক পাগলী প্রায়ই রামকৃষ্ণদেবের কাছে আসিত, রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তদের ভিতর কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই পাগলীই বিল্বমঙ্গলের পাগলিনীতে পরিস্ফুট হইয়াছে।'

পরমহংসদেবের আদর্শ এখানে স্ত্রী-চরিত্রে কল্পিত হইয়াছে তাহা অস্বাভাবিক হয়

নাই ; কারণ তাহার মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি-ভাবের সমান বিকাশ হইয়াছিল। বিল্বমঙ্গলের মধ্যে যে বৈষ্ণব-ধর্ম-সাধনা মুখ্যবস্তু হইয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত গিরিশচন্দ্রের কতখানি অন্তরের যোগ ছিল সে প্রশ্ন আমাদের মনে আসা স্বাভাবিক। ধর্মবিশ্বাসে গিরিশচন্দ্র বৈষ্ণব ছিলেন কি শাক্ত ছিলেন সে বিচার নিরর্থক ; কারণ আর পাঁচজন বর্তমান বাঙালীর ন্যায় তিনি শাক্ত ছিলেন আবার বৈষ্ণবও ছিলেন। তবে বৈষ্ণবধর্মের প্রেমাপ্লুত ভক্তি-বন্যার প্রতি তাঁহার একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তাঁহার অধিকাংশ নাটকই এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে ; 'চৈতন্য-লীলা', 'জনা', 'পাণ্ডব গৌরব' প্রভৃতি নাটক দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'বিল্বমঙ্গলে'র ধর্মতত্ত্বই মুখ্য। কিন্তু সেই ধর্মতত্ত্বের স্বরূপ কি সে আলোচনা এখন করা আবশ্যক। নাটকখানি প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাটকরূপে কথিত হইয়াছে, এই প্রেম ও বৈরাগ্য কথা দুইটির মধ্যে নাটকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সংসার- বৈরাগ্যের মহিমা ইহাতে দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য নহে, কারণ সাধারণত সংসারের বাহিরেই ধর্মপথের আরম্ভ। আসলে আলোচ্য নাটকের মূল ভাব-বস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে প্রেমতত্ত্বটিকে অবলম্বন করিয়া। ধর্মসাধনার মধ্যে প্রেমতত্ত্বের অবতারণা আমাদের কাছে নূতন নহে। মহাপ্রভুর রাগানুগা ভক্তি বাঙালীর মানসক্ষেত্রে এক নবায়িত ভক্তির আলোকপাত করিয়াছে ; সেই আলোকে ভগবানের প্রেম-মাধুর্যমণ্ডিত রূপ চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। সেই প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণই 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের আরাধ্য দেবতা। বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, বণিক, অহল্যা, পাগলিনী সকলের কাছেই ভগবানের এই প্রেমরূপই একান্ত আকাঙ্ক্ষিত। বিল্বমঙ্গল সখারূপে, অহল্যা মাতৃরূপে ও পাগলিনী প্রণয়িনীরূপে শ্রীকৃষ্ণকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য রাগের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশ্য পাগলিনীর মধ্যে শুধু কেবল রাগ নহে তত্ত্বেরও সমাবেশ হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলার সহিত যাহাদের পরিচয় রহিয়াছে তাহারা সহজেই পাগলিনীর আপাত-অসংলগ্ন উক্তির রহস্য ভেদ করিয়া প্রকৃত মর্মে পৌঁছিতে পারিবে ; কিন্তু তত্ত্বের জন্য নহে, চরিত্রটির আর্তি ও অভিমান-জড়িত লীলাময় ভাবের জন্যই ইহা এত আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। সোমগিরি বিল্বমঙ্গলের গুরু হইয়াও কৃষ্ণকে সহজে পান নাই অথচ বিল্বমঙ্গল অতি অল্পকালের মধ্যেই কৃষ্ণের অহেতুকী কৃপা লাভ করিলেন, ইহার কারণ কি ? ইহার কারণ, অধ্যাত্মরাজ্যের তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে অবারিত প্রেমের মন্দাকিনী বৈকুণ্ঠ অভিমুখে চলিয়াছে তাহার পরিপূর্ণ সন্ধান তিনি পান নাই, সেই সন্ধান পাইয়াছেন বিল্বমঙ্গল। সেইজন্য কৃষ্ণের সন্নিধানে পৌঁছিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

কিন্তু শুধু প্রেমের আধ্যাত্মিক রূপ নহে, ইহার বাস্তব মানবিক রূপও 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে দেখান হইয়াছে। সেজন্যই এই প্রেমতত্ত্ব এত জটিল ও তাৎপর্যপূর্ণ। চিন্তামণির প্রতি বিল্বমঙ্গলের যে প্রেম তাহা গভীরতম পার্থিব প্রেমের দৃষ্টান্ত। বিল্বমঙ্গল বৈরাগ্য অবলম্বন

করিয়াও সেই প্রেম অন্তর হইতে বিসর্জন দেন নাই, অবশ্য পার্থিব প্রেম তখন অপার্থিব জগতের সন্ধান পাইয়াছে, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছায় রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রেমের এই ক্রমবিকশিত রূপ – মানব-প্রেমের ভাগবত প্রেমে মুক্তি, ইহাই নাটকের প্রেমতত্ত্বটির প্রকৃত পরিচয়।

নাটকের মূল তত্ত্ববস্তুটি নায়ক বিল্বমঙ্গলের চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে এবং তাহারই পরিপূরক পটভূমি রচিত হইয়াছে অন্য চরিত্রগুলির ভাব ও আচরণের দ্বারা। বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝা যাক। প্রথমেই চিন্তামণির প্রতি বিল্বমঙ্গলের আসক্তি। এই আসক্তি এত তীব্র যে তাহার ধর্মাধর্ম, মান-মর্যাদা সব ইহাতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দুর্ব্বার মোহের আকর্ষণে যখন সে প্রবল দুর্যোগ অগ্রাহ্য করিয়া নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত তখন পাগলিনী তাহার চৈতন্য জাগ্রত করিতে চাহিলেন। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের হৃদয়-মন জুড়িয়া চিন্তামণির রূপের দীপ্তি-জ্বালা, পাগলিনী তাহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। কিন্তু যাহার জন্য এই দুর্নিবার মোহ তাহার কাছেই আঘাত খাইয়া ইহা বেদনা ও বৈরাগ্যে মর্ম্মরিয়া উঠিল। চিন্তামণির তিরস্কার ও গলিত শবের দৃশ্য দেখিয়া পার্থিব প্রেমের প্রতি বিল্বমঙ্গলের নির্বেদ জন্মিল। কিন্তু প্রেমের লক্ষ্য পরিবর্ত্তিত হইল বটে, তবে প্রেম রহিয়া গেল। যে প্রেম আগে এক নারীকে বিমুগ্ধ বিহ্বল ভাবে বলিয়াছিল 'তুমি অতি সুন্দর', তাহাই এখন বিশ্বরূপ ভগবানের সন্ধানে উন্মাদ ? 'কে তুমি, তোমার কি রূপ, অবশ্যই তুমি পরম সুন্দর'। প্রেমপাগল বিল্বমঙ্গল গুরুর কাছে পথের সন্ধান জানিতে চাহিলেন, কিন্তু গুরু বুঝিলেন পথের আলোক রহিয়াছে শিষ্যেরই অন্তরের মধ্যে, তাই সেই আলোক তিনি তাহাকে জ্বালিয়া রাখিতে বলিলেন। বিল্বমঙ্গলের সাধনা সুরু হইল বটে, কিন্তু তখনও পূর্ব্ব সংস্কার প্রবল। তখনও তাহার উদ্বেলিত অনুরাগ ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে দোদুল্যমান। অহল্যার অনিন্দিত রূপ দেখিয়া ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গলের দ্বন্দ্ব এখন নয়ন ও মনের ভিতরে। মনের আশা বিশ্বরূপের দিকে, কিন্তু নয়নের নেশা এখনও নারীর রূপের প্রতি। এই নয়নই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু, তাই এই নয়ন যখন গেল তখন—

'বাসনা মলিন আঁখি কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়
আঁধার হৃদয় নীল উৎপল চিরদিন রবে পায়।'

এই আঁখিহীন দৃষ্টি দিয়াই তিনি পরম সুন্দর বংশীধারী বনমালীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার এতদিনকার সৌন্দর্য-তৃষ্ণা চরিতার্থ হইল।

বিল্বমঙ্গল ভক্তিসাধক চরিত্র হইলেও তাঁহার মানসিক ভাবাবেগের দ্বান্দ্বিক বিকাশ দেখান হইয়াছে, তাহার ফলে এই ভক্তিতত্ত্বমূলক নাটকের মধ্য নাটকীয় রসের কোন অভাব ঘটে নাই। বস্তুত নাটকটির মধ্যে একদিকে অধ্যাত্মরাজ্যের আকুতি, অন্যদিকে বাস্তব সমাজের আলেখ্য। বেশ্যাসক্ত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণমুগ্ধ বেশ্যা, শ্মশানচারিণী পাগলিনী, ভিক্ষুক চোর, কপট সাধু প্রভৃতি চরিত্র নাটকের মধ্যে যথেষ্ট বিচিত্র রস আনিয়াছে সন্দেহ নাই। একদিকে ভক্তিভাব ও গিরিশচন্দ্রের ভক্তিভাবনা উর্দ্ধ্ব আধ্যাত্মিক গগনে বিহার করিয়াছে,

অপরদিকে সমাজদ্রষ্টা গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি সমাজের কুটিল জীবন পথে সঞ্চরণ করিয়াছে। এই দুই ব্যবহিত জগতের একত্রিত সমাবেশের ফলে নাটকটি এত সজীবতা ও সরসতা লাভ করিয়াছে। নাটকের সংলাপেও রহিয়াছে একদিকে গৈরিশী ছন্দের দূরাস্তৃত গতি আবার অন্যদিকে কথ্য ভাষার বাস্তব ইতরতা। অবশ্য নাটকের পরিণতি অলৌকিক দেবলীলায়। পঞ্চম অঙ্কে এই লীলার আকর্ষণে চরিত্রগুলির সামাজিক মানবত্ব একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু 'বিল্বমঙ্গলে' সামাজিক মানবের চিত্ত-সংঘাতে আধ্যাত্মচেতনার উদ্ভব হইয়াছে এবং সেইজন্যই নাটক হিসাবে ইহা নিকৃষ্ট হইয়া যায় নাই।

বিল্বমঙ্গলের ন্যায় 'করমেতিবাই'ও (১৮৯৫) কৃষ্ণভক্তি-রসাশ্রিত নাটক। করমেতি মীরাবাইএর মত কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী ও তন্ময়িনী হইয়া সংসার ও সমাজকে ভুলিয়াছে। নাটকের মধ্যে মানুষ ও দেবতার ভেদাভেদ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

'পূর্ণচন্দ্র', 'নসীরাম', 'বিষাদ' ও 'কালাপাহাড়'—এই কয়খানা নাটক ভক্তিমূলক হইলেও ইহাদের বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপর সমাবেশিত হইয়াছে। সুতরাং ভক্তিরস থাকিলেও উহাদের কাহিনীর স্বতন্ত্র চমৎকারিত্ব এবং ক্রমবিকাশ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। ভাবতন্ময়তা এবং ভক্তিবিহ্বলতা না থাকিলে এই নাটকগুলি খাঁটি নাটকের মর্যাদা-সম্পন্ন হইত, কারণ ইহাদের প্রত্যেকখানির বিষয় যথেষ্ট নাটকীয়ভাবাত্মক। এই নাটকগুলির কাহিনী এবং চরিত্রের মধ্যেও সাদৃশ্য রহিয়াছে। নাটকগুলির মধ্যে যে প্রেমের বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে তাহা অসুস্থ ও বিকৃত ; প্রত্যেক নাটকেই একটি বেশ্যাচরিত্র রহিয়াছে। সুন্দরা, সরস্বতী, বিরজা প্রভৃতি স্ত্রী চরিত্রগুলি স্বাতন্ত্র্যশালিনী এবং বুদ্ধি ও চাতুর্যবতী। গোরক্ষনাথ, চিন্তামণি, নসীরাম ইত্যাদি একজন কেন্দ্রীয় মহাপুরুষের চরিত্র প্রত্যেক নাটকে বিদ্যমান আছে।

উপরি উক্ত নাটকগুলির মধ্যে 'পূর্ণচন্দ্র' (১৮৮৮) শ্রেষ্ঠ। ধর্মমূলক হইলেও নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের সুতীব্র আলোড়নে কাহিনীটি বিশেষ চিত্তচাঞ্চল্যকারী হইয়া উটিয়াছে। পুত্রের কাছে কামান্ধ বিমাতার অতি নগ্ন প্রেম নিবেদন, এবং ঈর্ষাহত পিতার হৃদয়বিপ্লবের দৃশ্যের ন্যায় হৃদস্পন্দনরহিতকারী বাস্তব দৃশ্য গিরিশচন্দ্রের খুব কম নাটকেই আছে। শেষের দিকে ধর্মাচ্ছন্ন হইয়া নাটকটী দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকের যে লক্ষণগুলি খুবই সাধারণ, যথা—বেশ্যাসক্তি, বিষপ্রয়োগ, হত্যা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি—সে সব 'বিষাদ' নাটকে (১৮৮৯) থাকা সত্ত্বেও ইহা উঁচু দরের নাটক নয়। সরস্বতীর বহুদিনকার ছদ্মবেশের পরে রাজার সহিত তাহার মিলনের মুহূর্তে হঠাৎ তাহার প্রাণ বিসর্জনের দৃশ্য অসঙ্গত হইয়াছে। মনে হয় কমেডির দিকে যে নাটকের স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল তাহাকে জোর করিয়া যেন ট্র্যাজেডির দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'বিষাদে' ভক্তিরসের সূত্র খুবই ক্ষীণ। বয়স্য মাধবের চরিত্রও অভিনব, নিজের মৃত্যুতেও সে তাহার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। 'নসীরামে'র (১৮৯৬) কাহিনীর চমৎকারিত্ব থাকা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক ভক্তিরসে ইহার নাটকত্ব ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। নসীরামের নামে নাটকের নামকরণ

হইলেও ইহা অসংকোচে বলা যায় যে তাঁহার চরিত্র পার্শ্বপ্রাধান্য লাভ করিতে পারে মাত্র, মূল কাহিনীর সহিত তাঁহার অবিচ্ছেদ্য যোগ নাই। তিনি নাটকের চরিত্রগুলিকে ধর্মাভিমুখী করিয়াছেন; বাস্তবজীবনের সীমাক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তিনি অবাস্তব রাজ্যের মোহন প্রাণমাতানো সঙ্গীত শুনাইয়াছেন বটে, কিন্তু পশ্চাদ্বর্তী ধূলিমলিন বাস্তব রাজ্যের পথচলার ইঙ্গিত তিনি দিতে পারেন নাই। অধিকাংশ ধর্মমূলক নাটকের ন্যায় এই নাটকেরও শেষ হইয়াছে অলৌকিক দৃশ্যে।

'কালাপাহাড়' (১৮৯৬) নাটকের মধ্যে যদিও ক্ষীণ ঐতিহাসিক সূত্র রহিয়াছে, কিন্তু তবুও ধর্মতত্ত্বের পীড়াদায়ক আলোচনা এবং ভক্তিনির্ঝরের উচ্ছ্বসিত প্রবাহে সেই ঐতিহাসিকতা ভাসিয়া গিয়াছে। নাটকখানির মধ্যে ঘটনার ঐক্য, চরিত্রের বিকাশ কিছুই নাই, অসঙ্গতি এবং অসংলগ্নতা দোষে ইহা নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন এবং ক্লান্তিজনক হইয়াছে।

॥ জনা (১৮৯৪) ॥ 'জনা' এবং 'পাণ্ডব-গৌরব' গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'জনা'র বিষয়বস্তুর মূল কাশীরাম দাসের মহাভারতে থাকিলেও নাট্যকার খুব সম্ভবত মাইকেল মধুসূদনের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' কবিতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। জনা চরিত্রেরগৌরবময় মাতৃত্ব, স্বদেশহিতৈষণা, তেজস্বিতা এবং সর্বোপরি তাঁহার জীবনের করুণ ট্র্যাজেডি মধুসূদন তাঁহার সংক্ষিপ্ত কবিতায় সুঅঙ্কন করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের সংহত এবং সংক্ষিপ্ত চরিত্র গিরিশচন্দ্রের নাটকে বিস্তৃত এবং বিশ্লেষিত হইয়াছে। 'জনা'র প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক নাটকের প্রস্তাবনা বলা যাইতে পারে, কারণ এই দৃশ্যে নাটকের বর্ণিতব্য বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। প্রবীর এবং তাহার তেজস্বিনী মাতার প্রবল পাণ্ডব-বিরোধিতা ও অনমনীয় দৃঢ়তার সহিত মদনমঞ্জরী ও নীলধ্বজের যুদ্ধবিমুখতা এবং পাণ্ডব প্রীতির চমৎকার সংঘাত নাট্যকার সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুত প্রবীরের আকস্মিক চিত্ত-চাঞ্চল্যের পূর্বে নাটকের মধ্যে কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় না। দুর্বার এবং দুর্ধর্ষ বীর প্রবীরের বিরুদ্ধে যখন দেবচক্রান্ত শুরু হইল তখন হইতে নাটকীয় প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। ছলচাতুরীর মধ্য দিয়া প্রবীরের বলবীর্য হরণের ব্যাপার নাটকের ভাবগভীরতা এবং বিষাদময়তা নষ্ট করিয়াছে। প্রবীরের মৃত্যু যেমন অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের কোন বীরত্ব এবং গৌরব প্রকাশ করে না, তেমনি আমাদের মনের মধ্যে কোনো বিস্ময়মিশ্রিত ভয় এবং সহানুভূতিরও উদ্রেক করে না। এক কথায় বলিতে গেলে প্রবীরের মৃত্যুকে ট্র্যাজেডি বলিতে পারি না। প্রকৃত ট্রাজিক হইয়াছে জনার চরিত্র। জনা আদর্শ বীরাঙ্গনা এবং বীরমাতা, তিনি নিজের সন্তানকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চিত বিপদের মধ্যে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন, স্বামী এবং সেনাপতি, মন্ত্রী প্রভৃতির নিশ্চেষ্ট জড়তা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, এবং পুত্রহা রিপুদের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছেন। নাটকের মধ্যে প্রত্যেক চরিত্রই লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের লীলারসে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন। এই সর্বব্যাপী ভক্তি-বিমূঢ়তার বিরুদ্ধে তাঁহার একেশ্বর সংগ্রাম আমাদের চিত্তকে আবেগ-কম্পমান করিয়া রাখে। পুত্রহারা, হৃতসর্বস্বা প্রতিহিংসাময়ী জনার ক্রুদ্ধ হৃদয়জ্বালা নাটকের

মধ্যে একটা দমকা হাওয়ার ন্যায় সকলকে ভীত, ত্রস্ত করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। সর্বশেষে নিরুপায়, নিরবলম্ব জনা তাঁহার সংকল্প সিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া যখন জাহ্নবী-বক্ষে ঝাঁপ দিয়া নিজের হতাশ, জ্বলমান চিত্তকে শান্ত করিয়াছেন তখন নাটকের চরমোৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি হইয়াছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের পরিণতি কখনো বিয়োগান্ত করিতে চান নাই। সেই জন্য এই নাটকেও একটী ক্রোড় অঙ্ক সংযোজিত করিয়া নাটকের বিষাদঘন গম্ভীরভাব ভক্তির তরল ধারায় ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। কোনো কোনো সমালোচক বলিয়াছেন যে, এইরূপ ভক্তিমিশ্রিত শান্তরসের উদ্দীপনাই এই নাটকের অনিবার্য পরিণাম হওয়া উচিত।১ কিন্তু ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে জনা নাটকের চমৎকারিত্বের মূলে মানবীয় সংঘাত ও ভাবদ্বন্দ্ব, ভক্তিরস কিংবা দেবলীলা নয়। যাত্রায় হয়ত এইরূপ পরিণতি আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু নাটকে ইহা সম্পূর্ণ রসাভাসের সৃষ্টি করে।

॥ পাণ্ডব গৌরব (১৯০০) ॥ 'পাণ্ডব-গৌরবে'র কাহিনীর উৎপত্তি যদিও দণ্ডী এবং উর্বশীকে লইয়া হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রধান চরিত্র হইতেছে ভীমসেন এবং সুভদ্রা। কৃষ্ণের প্রতি অবিচল ভক্তি থাকা সত্ত্বেও শরণাগতকে রক্ষা করিবার সুদৃঢ় সংকল্প এবং ঐকান্তিক আয়োজন ইহাদের চরিত্রকে বিশেষ মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। নাটকের মধ্যে দুই পক্ষের যে বিরাট আয়োজন এবং অষ্টবজ্র সম্মেলনের যে পৌনঃপুনিক আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে খুব একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপারের জন্য আমাদের মন প্রস্তুত হইতে থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতি লঘু পরিণতিতে নাটকের উপসংহার হইয়াছে। মনে হয় এতোক্ষণ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত মেঘের যে গুড়্ গুড়্ ধ্বনি আমাদের মনকে আতংকিত করিতেছিল, এক মুহূর্তের ফুৎকারে যেন তাহা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র এতোদিন পর্যন্ত ভক্তিরসাশ্রিত নাটক লিখিয়াছেন, কিন্তু 'শঙ্করাচার্য'(১৯১০) নাটকে তিনি অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। নাট্যকার নিজে বলিয়াছেন যে স্বামীজীর আদর্শে তিনি শঙ্করাচার্যের চিত্র অংকন করিয়াছেন।২ নাটকখানি আগাগোড়া দুরূহ তত্ত্ব-আলোচনায় পরিপূর্ণ। নাট্যকার হয়তো কোনো ভাবানুপ্রাণনায় নাটক লিখিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ দর্শকদের পক্ষে খুব সূক্ষ্ম ধর্মনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বুঝা কষ্টকর।৩

১। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ রায় 'গিরিশ নাট্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যে' বলিয়াছেন, 'গিরিশের ঐ সব নাটকের অন্তিমে যদি শোক-দুঃখের দীর্ঘ শ্বাস দ্বারা 'চমৎকার' উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পাইত, তবে তাহা আখ্যান ধারার অনিবার্য্য পরিণাম হইত না ; কারণ ঐসব আখ্যান ধারার মূল কথা—ভক্তি সাধনের সার্থকতা। পৃঃ ৪৩।

২। গিরিশবাবু শ্রীযুক্ত কুমুদ বন্ধু সেনকে বলিয়াছিলেন—'দেখ শঙ্করাচার্য্য নাটকে যা দেখানো হয়েছে, তা ঠিক হয়েছে। আমি inspirationএ লিখেছি। ঠাকুর বলতেন সব শিয়ালের এক রা। প্রত্যেক মহাপুরুষ এক সত্যের প্রচার ক'রে থাকেন। তবে স্বামিজীকে দেখে আমি শঙ্করের ছবি উপলব্ধি করেছি।'

'গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য'—পৃঃ ১০০।

৩। গিরিশবাবু কুমুদবাবুকে বলিয়াছিলেন—'এই যে ভিতরের দ্বন্দ্ব internal dramatic action—যা সামান্য স্থূল ভাবে বাইরে প্রকাশ পায়, সেই internal actions এঁকে দেখানোই best literary art.

ঐ, পৃঃ ৬০।

যাহা দৃশ্যমান, স্থূল বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই নাটকের বিষয়বস্তু হইতে পারে। উপন্যাসে কিংবা কবিতায় চিন্তা এবং কল্পনা দ্বারা আমরা অনেক কিছু বিশ্বাস করিতে পারি, বুঝিতে পারি, কিন্তু নাটকের দ্রুত-ধাবমান ঘটনাপুঞ্জ দর্শন করিবার সময় সেই চিন্তা এবং কল্পনার অবসর নাই। বাহ্য ক্রিয়া এবং ঘটনা না থাকিলে দৃশ্যকাব্য কখনো জমিতে পারে না।

## (গ) সামাজিক নাটক

কলিকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের কাহিনী লইয়া গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি রচিত হইয়াছে। সাধারণত এই সমস্ত ঘরের নিরুপদ্রব এবং গতানুগতিক জীবন-ধারার মধ্যে নাটকীয় উপাদান খুব কমই বিদ্যমান। সেইজন্য গিরিশচন্দ্র সাধারণ এবং স্বাভাবিক জীবনের যতরকম ব্যাঘাত এবং বিকৃতি ঘটিতে পারে সব নাটকের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। এই কারণেই তাঁহার নাটকে জাল, জুয়াচুরি, প্রতারণা, হত্যা প্রভৃতির এতো বাড়াবাড়ি। বাঙালী ঘরের বধূ সহনশীলা এবং পতিপরায়ণা, সেইজন্য এই পবিত্র দাম্পত্য-জীবনের পাশে সর্বত্র বেশ্যা জীবনের কদর্যতা দেখাইয়া তিনি ঘটনা বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুতান্ত্রিক সামাজিক নাটকে মোটা মোটা পাপের এত বাড়াবাড়ি কখনো স্বাভাবিক নহে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস এবং নিম্নস্তরের সাহিত্যে যে রকম লোমহর্ষণ উত্তেজক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া সস্তায় বাজি মাৎ করিবার চেষ্টা থাকে, গিরিশচন্দ্রের নাটকেরও সেইদিকে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইহা ধারণা করা কষ্টকর নহে যে গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাট্যগুরু শেকস্‌পীয়ারের নাটকে সর্বপ্রকার পাপের প্রাচুর্য দেখিয়া নিজেও সেই সব দেখাইয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের পাত্রপাত্রী অসাধারণ, সেখানকার পটভূমিকা বিস্তৃত। সুতরাং ঐরূপ নাটকে বড়ো বড়ো ঘটনার সমাবেশ অসঙ্গত নহে। কিন্তু সামাজিক নাটকের পাত্রপাত্রী নিতান্ত সাধারণ এবং অতি সামান্য পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত; সেখানে ঘোর চক্রান্ত, নিষ্ঠুর নরহত্যা প্রভৃতি চরম ঘটনার সন্নিবেশ অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত। আসল কথা গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর অসাধারণ প্রভাবশালী নাটক 'নীলদর্পণে' প্রবর্তিত নাট্যধারাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সেইজন্য নীল-দর্পণে'র দোষ ও গুণ তাঁহার নাটকে এতো স্পষ্ট বোধ হয়। বহিরঙ্গনে যেখানে মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে, সেখানে গিরিশচন্দ্র লেখনী লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি অন্তঃপুরের দ্বার ঠেলিয়া সূক্ষ্ম হৃদয়লীলার তীক্ষ্ণ সংঘাত দেখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সামাজিক রীতিনীতি, বিধিসংস্কার প্রভৃতির ঘূর্ণ্যমান আবর্তে সাধারণ নরনারীর জীবন কিভাবে আবর্তিত হইতে থাকে, মানুষের ধর্মবোধ, নীতিবোধের সহিত তাহার দুর্দম কামনা এবং দুর্বার প্রবৃত্তির কি রকম নিদারুণ সংগ্রাম অহরহঃ ঘনাইয়া উঠে তাহার পরিচয় গিরিশচন্দ্রের নাটকে নাই। কোনো প্রসিদ্ধ সমালোচক গিরিশচন্দ্রের নাটকের সহিত নরওয়ের যুগান্তকারী নাট্যকার ইবসেনের নাটকের তুলনা করিয়াছেন।[১] কিন্তু ইহা অতিরঞ্জিত উক্তি ছাড়া আর

---

১। 'একমাত্র ইবসেনের সামাজিক নাটকের সঙ্গেই গিরিশের সামাজিক নাটকের বিচার সম্ভব।'
গিরিশচন্দ্র—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, পৃঃ ১১৪

কিছুই নয়। কারণ ইবসেনের নাটকে যে গভীর সমাজচেতনা এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুতীব্র বিদ্রোহ দেখা যায় গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাহা নাই! 'শাস্তি কি শাস্তি' এবং 'বলিদানে'র মধ্যে তিনি সামাজিক সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি কোথাও সমস্যার অন্তস্তলে প্রবেশ করেন নাই, কেবল বাহিরের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন মাত্র। গিরিশচন্দ্রের সমাজ জীবন সম্বন্ধে কোনো ব্যাপক এবং বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ছিল না, সেইজন্য তাঁহার সব নাটকে একই রকম ঘটনা এবং একই ধরণের চরিত্রের পুনরাবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকখানি নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হইতেছেন পরিবারের কর্তা, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার আঘাতে তিনি বিকৃত-মস্তিষ্ক ও অসংলগ্নপ্রলাপী হইয়া উঠিয়াছেন। যোগেশ, হরিশ, করুণাময়, প্রসন্নকুমার, কালীকিঙ্কর এবং উপেন্দ্রনাথ—ইহারা সকলে মূলত একই চরিত্র। এই ধরণের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র খুব মনোহর অভিনয় করিতেন, সম্ভবত তিনি নিজের অভিনয়োপযোগী ভূমিকার কথা চিন্তা করিয়াই প্রত্যেক নাটকে একই রকম চরিত্র বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

॥ প্রফুল্ল (১৮৮৯) ॥ 'প্রফুল্ল' তাহার সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক। নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে অশেষ সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছে এবং সমালোচকদের অকৃপণ প্রশংসাও ইহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। ইহার নাট্যমূল্য বিচার করিবার পূর্বেই একটি বিষয় উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। 'প্রফুল্ল' হইতে আরম্ভ করিয়া গিরিশচন্দ্র যতগুলি সামাজিক নাটক লিখিলেন তাহাদের প্রায় সবগুলিই বিয়োগান্ত ও করুণরসাত্মক। ইহার কারণ কি? কেন তিনি জীবনের কুশ্রী ও করুণ দিকগুলি নাটকের মধ্যে এমন প্রধান করিয়া তুলিলেন? ইহার কতকগুলি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমত, গিরিশচন্দ্রের অন্তর-প্রেরণা দুঃখের নিত্য প্রবাহে অভিষিক্ত হইয়াছিল। সেই প্রেরণা যখন সাহিত্যের কাহিনীকে আশ্রয় করিল তখন স্বভাবত তাহা কারুণ্যের কলতানে ভরিয়া উঠিল।২ দ্বিতীয়ত, গিরিশচন্দ্র প্রায়ই বলিতেন যে, তিনি শেকসপীয়ারকে আদর্শ করিয়াই নাটক রচনা করিতেন। শেক্‌সপীয়ারের ট্র্যাজেডি যে তাঁহাকে দুঃখময় নাটক লিখিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তৃতীয়ত, গিরিশচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, 'মিলনান্ত নাটক আনন্দপ্রদ হইলেও করুণ রসাশ্রিত নাটক অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ।'৩ চতুর্থত, গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক রচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা আসিয়াছিল 'নীলদর্পণ' ও বিশেষ করিয়া 'সরলা' নাটক হইতে। 'সরলা'র অভিনয় নাট্যজগতে যুগান্তর আনিয়াছিল এবং এই

১। গিরিশচন্দ্র একবার অমৃতলাল বসুকে বলিয়াছিলেন, 'এসব realistic বিষয় নিয়ে নাটক লেখা আর নর্দামা ঘাঁটা এক।'

রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—অপরেশ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৭

২। 'এই সদানন্দময় পুরুষের জীবন সহচর ছিল দুঃখ। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ছিল—বিশাল এবং উজ্জল; কিন্তু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে মনে হইত, সে চোখের পিছনে শোক যেন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে।'

'গিরিশচন্দ্র'—দেবেন্দ্রনাথ বসু (ক.বি.)—৭

৩। ঐ, পৃঃ ২৮

নাট্য সাফল্য দেখিয়া ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ গিরিশচন্দ্রকে একখানি সামাজিক নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন।১ 'সরলা'র প্রভাবে 'প্রফুল্ল' রচিত হইয়াছিল বলিয়া চরিত্র, কাহিনী, রস এমন কি নামকরণের দিক দিয়াও দুইখানি নাটকের মধ্যে সমধর্মিতা দেখা যায়। 'প্রফুল্ল' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাটি স্মরণ না করিলে পূর্ববর্তী নাটকগুলির প্রতি অবিচার করা হইবে।

অধিকাংশ সমালোচক 'প্রফুল্ল' নাটক সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা একখানি সার্থক করুণ রসাত্মক নাটক অথবা ট্র্যাজেডি। আপাত দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্ত খুবই যুক্তিসহ মনে হয়। কারণ এই নাটকে বাঙালী সমাজের একটি পরিবার দুঃখময় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কিরূপে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া এক অন্তিম হাহাকারে নিঃশেষ হইয়া গেল তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে। পরিবারের কর্তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার সুযোগে কিভাবে এক ঘোর স্বার্থান্বেষী বিষাক্ত শক্তির ক্রিয়ায় একটি সাজান বাগান শুকাইয়া গেল তাহারই এক জ্বালাময় বৃত্তান্ত ইহাতে রূপায়িত হইয়াছে। এরূপ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক ও সুবিধাজনক, কিন্তু যাহা শাদা চোখে দেখা যায় না তাহা বিশ্লেষণের পরকলায় ধরা পড়ে। তখন দেখা যায় যে, চমকপ্রদ কার্যের পিছনে বিশ্বাসযোগ্য কারণ নাই, দুঃখের বন্যাধারা অনিবার্য বেগে প্রবাহিত হয় নাই এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা, নাটকখানি করুণ রসাত্মক হইলেও ট্র্যাজেডির মর্যাদা লাভ করে নাই। এই বিষয়গুলিই আমরা বিচার করিয়া দেখিব।

প্রথমেই একটি কথা স্বীকার করা দরকার যে, ট্র্যাজেডির বিচারে নায়ক চরিত্রকেই মুখ্য আলোচ্য বিষয় করিতে হইবে। ট্র্যাজেডির মধ্যে প্রায় সর্বত্রই একটি কি দুইটি চরিত্রের অনন্য প্রাধান্য ঘটিয়া থাকে—ইডিপাস, অরিষ্টিস, ইলেক্ট্রা, মিডিয়া, ম্যাকবেথ, ওথেলো, হ্যামলেট, লীয়র প্রভৃতি নাটকের কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।২ সেজন্য যোগেশ চরিত্রকে অবলম্বন করিয়াই প্রধানত আমাদিগকে 'প্রফুল্ল' নাটকের ট্র্যাজিক ধর্ম বিচার করিতে হইবে।

ট্র্যাজিক নাটকের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হাইয়া এ্যারিস্টোটল বলিয়াছেন যে, কোন মারাত্মক ভ্রান্তির ফলেই সে সুখ সমৃদ্ধি হইতে দুঃখ-দুরবস্থার মধ্যে পতিত হয়।৩ এই

১। 'সরলার' অভিনয় প্রায় এক বৎসর সমান ভাবেই চলিয়াছিল এবং ষ্টার সম্প্রদায় এই পুস্তকে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। সামাজিক নাটকের এই আদর দেখিয়া ষ্টারের কর্তৃপক্ষগণ গিরিশবাবুকে একখানি সামাজিক নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন ; এই অনুরোধের ফল—প্রফুল্ল।

রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—পৃঃ ১১২

২। নিকলের মত প্রণিধানযোগ্য—'It is to be observed that commonly tragedy 'differs from comedy in selecting some one or two figures who by their greatness and by their inherent interest dominate the other dramatis personae.'

Theory of drama, P. 141

৩। Such a person is one who does not excel in virtue and righteousness, nor is he brought into adversity through wickedness and depravity, but through some error,'

Aristotle's Poetics—Tr. by Bouchier p. 33

ট্র্যাজিক ভ্রান্তি অথবা 'hamartia' যোগেশের বেলায় কোথায় ঘটিয়াছে ? কেহ কেহ বলেন যে, যোগেশের ট্র্যাজেডির কারণ সাময়িক উন্মত্ততা Temporary insanity )।১ কিন্তু সেই উন্মত্ততার কারণ ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া। সুতরাং এই মত গ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াকেই ট্র্যাজেডির কারণ বলিয়া মনে করিতে হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় যোগেশ চরিত্রের প্রকৃতিগত দুর্বলতাকেই ট্র্যাজেডির কারণ স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।২ বন্ধুবর সাধনকুমার ভট্টাচার্যও যোগেশের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার মধ্যেই ট্র্যাজেড়ির মূল অনুসন্ধান করিয়াছেন।৩ এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতার বিষয়টি আলোচনা করিতে গেলে দুইটি প্রশ্ন মনের মধ্যে আসে। প্রথমত, এই দুর্বলতা সত্যই অন্তর্নিহিত ছিল কিনা, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পূর্বেও ইহা তাঁহার মনে জাগ্রত অথবা সুপ্ত অবস্থায় ছিল কিনা। দ্বিতীয়ত, এই দুর্বলতাকে স্বীকার করিলে যোগেশ চরিত্রের ট্র্যাজিকধর্ম কিরূপে এবং কতখানি বজায় থাকে। প্রথম প্রশ্নটি বিচার করিলে মনে হয়, ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পরে যোগেশের দুর্বলতা বিশেষ ভাবে প্রকট হইলেও ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পূর্বে এরূপ দুর্বলতা যে তাহার চরিত্রের মধ্যে ছিল এমন কোন আভাস অন্তত নাটকের ভিতর হইতে পাওয়া যায় না। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পূর্বে যোগেশের যে পরিচয় তাঁহার এবং অন্যান্য সকলের মুখে পাওয়া যায় তাহাতে তো ধারণা হয় যে, তিনি ছিলেন পুরুষকারের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তখন তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী ও অকলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে জ্ঞানদার মুখে শুনিলাম, 'বাবা ভ্যালা কাজ শিখেছিলে কিন্তু। কাজ! কাজ! কাজ! মনিষ্যির শরীরে একটু সক্ নেই!' কিছুক্ষণ পরেই যোগেশ নিজে বলিলেন, 'সমস্ত দিন খেটে যখন রাত্তিরে কাজ করতে আলস্য বোধ হত, তোমরা সেই খোলার ঘরের ভেতর শুয়ে—ফিরে দেখতুম আর আমার দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়তো ; সেই উৎসাহই আমার উন্নতির মূল।' দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে পুনরায় যোগেশ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, 'সেদিন ছিল যখন আমি সত্যবাদী ছিলেম, যখন আমি বাঙ্গালীর আদর্শ ছিলেম, যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্তি লোকে আমায় জানত।' এই দৃঢ়চেতা, আদর্শবাদী, কর্মিষ্ঠ পুরুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত দুর্বলতা কোথায় ? তাহা হইলে মানিয়া লইতে হয়, পরবর্তী দুর্বলতা যোগেশের অন্তর্নিহিত নহে, ইহা একটি আকস্মিক ঘটনার দ্বারা তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত হইয়াছে এবং বলা বাহুল্য সেই আকস্মিক ঘটনা হইল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া। যদি কোন আকস্মিক ঘটনাই মাত্র চরিত্রের কোন অতর্কিত পরিবর্তন আনিয়া ফেলে এবং সেই পরিবর্তনের ফলেই যদি তাহার ট্র্যাজেডি সম্ভাবিত হয় তবে সেই ট্র্যাজেডির মূল্য কতটুকু ?

---

১। অপরেশ মুখোপাধ্যায়—রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—১২২।

২। 'মূলত তিনি ছিলেন দুর্বলপ্রকৃতি, শ্লথবুদ্ধি, ভাববিহ্বল ও কর্মক্ষেত্রে যন্ত্রস্বরূপ। কি আপনাতে কি ভগবানে তাঁহার প্রত্যয় ছিল শিথিল। এত বড় ট্র্যাজেডি সম্ভব হইয়াছে ঐ জন্যই।'

গিরিশ প্রতিভা—পৃঃ ৩০০।

৩। নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার (২য় খণ্ড)—পৃঃ ১৩৩-১৩৪।

আমাদের উত্থাপিত দ্বিতীয় প্রশ্নটির বিচার করিতে হইলে বলিতে হয় যে, যোগেশ চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা স্বীকার করিলেও সেই দুর্বলতার প্রকাশ নাটকের মধ্যে যে ভাবে হইয়াছে তাহাতে তাহাকে ট্র্যাজিক রসোত্তীর্ণ চরিত্র কখনই বলা চলে না। নায়ক যদি তাহার অনিবার্য দুর্ভাগ্যের জন্য প্রধানত দায়ী না হয়,১ যদি সেই দুর্ভাগ্যকে রোধ করিবার জন্য তাহার প্রাণান্তকর সংগ্রামের পরিচয় না দেয়, যদি তাহার পতন একটি অলঙ্ঘ্য বিশ্ববিধানের প্রতি আমাদের শোকাহত দৃষ্টিতে উন্মীলিত না করিয়া তোলে তবে তাহার দুঃখভোগের মধ্যে ট্র্যাজিক মহিমা কোথায়? যোগেশের মধ্যে এই ট্র্যাজিক নায়কের কোন চিহ্নই নাই। তাহার সক্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চূর্ণ হইয়াছে এবং সেই চূর্ণ ব্যক্তিত্ব ক্লীবের ন্যায় রমেশের ষড়যন্ত্র-জালে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যোগেশ চরিত্রের আর যাহা কিছু বাকি থাকিল তাহাতে রহিয়াছে কুৎসিত মাতলামি, কদর্য নিষ্ঠুরতা ও নিষ্ক্রিয় দুঃখবিলাস। এত বড় একজন সচেষ্ট, সক্ষম পুরুষ হঠাৎ এরূপ একটি নিশ্চেষ্ট জড় পিণ্ডে পরিণত হইলেন এবং তাহাও শুধু ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার জন্য! ইহা আকস্মিক পক্ষাঘাত, ট্র্যাজেডি নহে। সাধনবাবু যোগেশের নিষ্ক্রিয়তা বা নিশ্চেষ্টতার অভিযোগ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু যোগেশের সক্রিয়তা বা সচেষ্টতার একটি প্রমাণও তো আমরা পাই নাই। যোগেশ যদি সেরূপ হইতেন তবে নাটকের অনেক দুঃখময় ঘটনাই নিবারণ করা যাইত। যে ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার ফলেই যোগেশের এই ক্লৈব্যপ্রাপ্তি, সেই ব্যাঙ্ক পুনরায় টাকা দিতে সুরু করিয়াছে, অথচ যোগেশের মানসিক সুস্থতা ফিরিয়া আসে নাই। (ইহাতে মনে হয় একটি লঘু ও নিবার্য ঘটনাকেই যেন অনাবশ্যক দুঃখের ফানুসে ভর্তি করা হইল।) (তারপর পীতাম্বরের সহিত যোগেশ যখন ব্যাঙ্কে যাইতেছিলেন তখনই নাটকের দুঃখ-গতি প্রায় থামিয়া আসিয়াছিল কিন্তু যোগেশের অনির্দেশ্য ও অশ্রদ্ধেয় নিষ্ক্রিয়তা সেই গতিকে পুনরায় মুক্ত করিয়া দিল। যাঁহার অভিমান এতই টনটনে, একটি ইতর স্ত্রীলোকের মুখে অকারণ জোচ্চোর অপবাদ শুনিয়াই যিনি দিশাহারা হইয়া পড়েন তিনি তো সামান্য একটু স্বপ্রতিষ্ঠ হইলেই সব অপবাদ ঘুচাইতে পারিতেন। যিনি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে সুনামের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছেন, দুর্নামে তাহার অতখানি আতঙ্ক ও মর্মবেদনা একপ্রকার অপটু আত্মাভিমান ছাড়া আর কিছুই নহে।) সামান্যতম ঘটনাকে আয়ত্ত করিবার শক্তি যাঁহার নাই, যিনি বিক্ষিপ্ত শক্তিপুঞ্জের অনিয়ন্ত্রিত খেয়ালের কাছে নির্বিবাদ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন ট্র্যাজিক নায়করূপে তাঁহার মূল্য কতটুকু? এ্যারিস্টোটল বলিয়াছেন, চরিত্রের কোন বিশেষ বিশেষ গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার সুখদুঃখ তাহারই ক্রিয়ার ফলে ঘটিয়া থাকে।১ যোগেশের দুঃখ তাঁহার কোন্ ক্রিয়ার ফলে

১। ট্র্যাজেডির বিষয় সম্বন্ধে এ্যারিস্টোটলকে অনুসরণ করিয়া ডিক্সন বলিয়াছেন—'One type of subject, and one only, the familiar type of Nemesis following guilt or error, in which the hero at least contributes to his own misfortune.'

Tragedy—P 131.

ঘটিয়াছে ? নিষ্ক্রিয় হইলেও ট্র্যাজেডির নায়ক হওয়' চলে সাধন বাবু এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি লীয়র ও হ্যামলেট নাটক দুখানির নাম করিয়াছেন। লীয়র সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে, তিনি নাটকের শেষ দিকে নিষ্ক্রিয় দুঃখভোগী ( more sinned against than sinning ) হইলেও ট্র্যাজেডির সূচনা কিন্তু তাঁহারই অহঙ্কৃত মনোভাব ও ভ্রান্ত আচরণের ফলেই হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অধিকন্তু দুঃখের আঘাতে অসহায় ভাবে তাড়িত বিতাড়িত হইলেও শেকসপীয়ারের অদ্বিতীয় লেখনী তাহার সমুন্নত ট্র্যাজিক মহিমা বজায় রাখিতে পারিয়াছে, কিন্তু যোগেশের সেই মহিমা কোথায় ?১ হ্যামলেটের সহিত যোগেশের যে সাদৃশ্য তাহাও নিতান্তই বাহ্য ও মৌহূর্তিক। প্রথমত, হ্যামলেট বাহ্যজগতে একেবারে ক্রিয়াহীন নহে, সে বীর ও শক্তিমান, অন্যায় প্রতিবিধান করিতে সে সম্পূর্ণ সক্ষম—শেষ দৃশ্যে মৃত্যুর পূর্বে সে তাহা দেখাইয়া গিয়াছে। তাহার আত্যন্তিক মানসিক দ্বন্দ্ব ও চিন্তাপ্রবণতাই তাহার সক্ষম ক্রিয়া-শক্তির অন্তরায় হইয়া তাহার ট্র্যাজেডি ঘটাইয়াছে।

Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms agninst a sea of troubles.
And by opposing end them ?

ইহাই হ্যামলেটের দ্বন্দ্ব। এই সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব যোগেশের কোথায় ? নাটকের মধ্যে যোগেশের অন্তর্দ্বন্দ্বময় মনোজগৎ একেবারেই অপরিস্ফুট।

নাটকের মধ্যে যোগেশের চরিত্র যেভাবে দেখান হইয়াছে তাহাতে তাহার ভাগ্য-বিপর্যয়ের একটি কারণ নির্দেশ করা যায়, যাহা সমালোচকগণ সজোরে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন এবং যাহা সম্ভবত নাট্যকারেরও অভিপ্রেত ছিল না—তাহা হইল যোগেশের মদ্যাসক্তি। এই মদ্যাসক্তি এক 'অন্তর্নিহিত দুর্বলতা' রূপে তাঁহার সুস্থ ও সমৃদ্ধ অবস্থার মধ্যেও ছিল। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পূর্বেও তাহাকে বোতল হইতে এই বিষামৃত ঢালিতে দেখিয়াছি। জ্ঞানদার মুখে আমরা শুনিয়াছি 'তোমার সব গুণ—ঐ একটু ঢুক ক'রে

1. 'Now, persons possess certain qualities in virtue of their characters, but are happy or the reverse in virtue of their actions.'

Poetics—Tr. by Bouchier. p. 20

১। নিকলের উক্তি উল্লেখযোগ্য—'It was only a Shakespeare who could present a Lear majestic and exalted in the midst of his affliction and misery'.

—Theory of Drama—p. 153.

২। F. L. Lucas তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে হ্যামলেটের 'Hamartia' অথবা ট্র্যাজিক ভ্রান্তি লইয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা অনুধাবনযোগ্য—'Hamlete's Tragic error in his failure to act; and this is doubtless a moral flaw, such as it is usual to suppose that the hamartia' must always be.'

—Tragedy by F. L. Lucas, (Hogarth) p. 101

খাওয়া কেন ?' তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে পুনরায় জ্ঞানদা বলিয়াছেন, 'যদি এই ছাই না খান তা' হ'লে কি ওর তুল্য মানুষ আছে !' ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পরে এই সুরাসক্তি সমস্ত মাত্রা ও সংযম হারাইয়া ফেলিল এবং চতুর্দিক হইতে তখন বিপর্যয়ের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় এবং আরও অনেকে বলিয়াছেন, সুরাপান ট্র্যাজেডির কারণ নহে, পরিণাম। আমাদের কিন্তু ঠিক বিপরীতটাই মনে হয়, অর্থাৎ সুরাপানই ট্র্যাজেডির (?) কারণ, পরিণাম নহে। নিমচাঁদ ও যোগেশের দুঃখসমস্যা একই, বরং নিমচাঁদ বোধ হয় অধিকতর উন্নত ও অনুভূতিশীল। সমগ্র 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যেই মদ্যপায়ী লোকের একটি ইতর মাতলামির পরিচয়, তাহার ব্যক্তিসত্তার অন্যসব চিন্তা ও চেতনা একেবারেই বিলুপ্ত। এই বিরক্তিকর সুরাসক্তির ফলে তাহার দুঃখবেদনা আমাদের অনিবার্য সহানুভূতি লাভ করিতে পারে না। এই সুরাসক্তিই যদি যোগেশের পতনের কারণ হইয়া থাকে তবে তাহার দুঃখ ট্র্যাজেডির অপ্রতিরোধ্য শক্তি হারাইয়া ফেলিয়া নিতান্তই লঘু ও বহিঃসর্বস্ব হইয়া পড়ে।

যোগেশ চরিত্রের যে সব দোষত্রুটি পূর্বে উল্লেখ করা হইল তাহাতে কখনই তাহাকে ট্র্যাজিক চরিত্র বলা চলে না এবং নাটকখানিকেও খাঁটি ট্র্যাজেডির মর্যাদা দেওয়া যায় না। অতিরঞ্জিত দুঃখময় ঘটনার অবতারণা দ্বারা ইহাকে অনাবশ্যক কারুণ্য-পীড়িত করা হইয়াছে মাত্র। যোগেশের দুঃখে যে অনিবার্যতা নাই তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। আর একটি দুঃখভোগের দৃষ্টান্তেও এই অনিবার্যতার অভাব লক্ষ্য করা যায় তাহা হইল সুরেশের চরিত্র। প্রকৃত চুরি নহে, অথচ স্বেচ্ছা-গৃহীত চুরির বদনাম স্বীকার করিয়া অকারণে অমানুষী দুঃখভোগ করিয়াছে সুরেশ। পরিবারস্থ এক অতি নিকট আত্মীয়ার নিকট হইতে সদুদ্দেশ্যে দুইটি মাকড়ি লইয়া সুরেশকে জেলে পাথর ভাঙ্গিতে হইল, এই সমগ্র ব্যাপারটির মধ্যেই এমন এক হাস্যকর অবিশ্বাস্যতা রহিয়াছে যে, এই দুঃখের প্রতি সহানুভূতির পরিবর্তে এক বিরূপ সন্দেহ জাগিয়া উঠে। অধিকন্তু সুরেশের দুঃখ তাহাতেই শেষ হয় নাই, ইহা সমগ্র পরিবারকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। যোগেশ এই অমূলক চুরির অপবাদ শুনিয়া আরও মতিচ্ছন্ন হইয়াছেন এবং উমাসুন্দরী বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া পড়িয়াছেন। একটি ভিত্তিহীন কারণ হইতে এতখানি অতিশয়িত দুঃখের জাল বিস্তার করা হইয়াছে। জ্ঞানদার মৃত্যু দীর্ঘকালীন দুঃখভোগের পরিণাম বলিয়া ব্যাখ্যা করা গেলেও প্রফুল্লের মৃত্যু কিন্তু স্থানকালের পরিবেশে নিতান্তই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। ইহা একটি অপঘাত-মৃত্যু মাত্র, এবং এই অপঘাতের জন্য কোন প্রস্তুতি নাই—না নাটকের ভিতরে, না দর্শকের মনে। এতগুলি দুঃখভোগের কারণ ঘটনার কোন অলঙ্ঘ্য সংঘাত নহে, নিয়তির কোন অপ্রতিষেধ্য লীলা নহে। চরিত্রগুলির কোন অনতিক্রম্য দুর্বলতাও নহে—কারণ সর্বনিয়ন্তা রমেশের সর্ববিস্তারী চক্রান্ত। এই রমেশ কি সাংসারিক জগতের কোন স্বাভাবিক চরিত্র, না নারকীয় জগতের কোন শয়তানী চরিত্র ? সন্দেহ হয়। সংসারের কাহারও প্রতি ইহার আকর্ষণ নাই, ইহার নিষ্ঠুরতা উপায় না হইয়া উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে ! যোগেশ যেমন নিষ্ক্রিয়তার

একটি নির্জীব দৃষ্টান্ত, রমেশও তেমনি নৃশংসতার একটি অতিজীব দৃষ্টান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

'প্রফুল্ল' নাটকের আর একটি গুরুতর অসঙ্গতি রহিয়াছে ইহার নামকরণে। প্রফুল্ল এই নাটকে কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া আছে? চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত যে অল্প কয়বার তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে তাহাতে তাহাকে পরিবারের একজন সরলা, স্নেহময়ী বধূ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কিন্তু তখনও ঘটনার নেপথ্যে তাহার অবস্থান মাত্র। তাহার অন্তরের কল্যাণীশক্তি অন্তরেই আবদ্ধ রহিয়াছে, বাহিরের চলমান ঘটনার মাঝে সেই শক্তির কোন সক্ষম আত্মপ্রকাশ আমরা দেখি নাই। কেবলমাত্র পঞ্চম অঙ্কে মদনের মতি পরিবর্তনে ও যাদবের প্রাণরক্ষায় তাহার সক্রিয় ব্যক্তিত্বের রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু ততক্ষণে অনিবার্য দুঃখের গ্রাস পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে যাদবকে বাঁচাইতে পারিল বটে, কিন্তু আর কাহাকেও বাঁচাইবার সাধ্য তাহার ছিল না। একজন সমালোচক বলিয়াছেন, 'আমাদের প্রেমপূর্ণ প্রাচীন সংসারের আদর্শ ফিরাইয়া আনিবার জন্য স্নেহময়ী প্রফুল্লর আত্মবিসর্জনই এই নাটকের মেরুদণ্ড এবং সেই জন্যই নাট্যকার ইহার নাম দিয়াছেন —প্রফুল্ল।' এই যুক্তির বিরুদ্ধে প্রথমেই বলিতে হয়, প্রফুল্লের মৃত্যুকে আত্মবিসর্জন বলা যায় কিনা সন্দেহ। ইহা আকস্মিক হত্যা, পূর্ববর্তী ঘটনার মধ্যে ইহার কোন সম্ভাবনা ও প্রস্তুতি নাই। রমেশ ও প্রফুল্লের সম্বন্ধ পূর্বে পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়া তাহার হাতে প্রফুল্লের হত্যা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত একটি লোমহর্ষণ ঘটনা বলিয়া মনে হয়। প্রফুল্লের মৃত্যুকালে অনেক ভালো ভালো আদর্শের কথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার জীবিত অবস্থান এই সব আদর্শের সহিত কোন কঠোর সংঘাত ঘটিতে নাটকের মধ্যে আমরা দেখি নাই। এই নাটকের ট্র্যাজেডি বিশেষভাবে যোগেশেরই ট্র্যাজেডি - আকস্মিক অবস্থা বিপর্যয়, মদ্যাসক্তি ও রমেশের কৃতঘ্ন ষড়যন্ত্র এই ট্র্যাজেডি ঘটাইয়াছে। যোগেশের সঙ্গে তাহার আশ্রিত পারিবারিক চরিত্রগুলিও সর্বনাশের মুখে পড়িয়াছে। প্রফুল্ল যোগেশের সাজানো বাগানের একটি সেরা ফুল। বাগানের অনেক ফুলের সঙ্গে এই ফুলটিও শুকাইয়াছে, কিন্তু তাহাই চরম বেদনা নহে। চরম বেদনা বাজিয়াছে বাগানের মালীকের বুকে যাহার চোখের সম্মুখেই একটি একটি করিয়া ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে, মৃত্যুর বেদনা বড় নহে, কিন্তু মৃত্যু ভোগ করিবার বেদনাই বড়। সেই বেদনাই প্রফুল্ল নাটকের মূলকথা।

॥ হারানিধি (১৮৯০) ॥ 'হারানিধি' নাটকের বিষয় বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা হইতে গঠিয়াছে। মোহিনী নরপিশাচ পাষণ্ড হইলেও সে একেবারে রমেশের মতো স্নেহলেশহীন অমানুষ নহে, তাহার একমাত্র স্নেহের পাত্রী ছিল তাহার কন্যা হেমাঙ্গিনী, এবং এই কন্যার অসুখেই তাহার মতিগতি পরিবর্তিত হইয়া গেল, আর নাটকখানির ঘটনা ঘুরিয়া গিয়া মিলনান্ত পরিণতি লাভ করিল। হেমাঙ্গিনীর মস্তিষ্ক বিকৃতি দুইপক্ষের মিলন ঘটাইল বটে, কিন্তু তাহার এই মস্তিষ্ক বিকৃতির তেমন জোরালো কোন কারণ নাই। হেমাঙ্গিনী সখী সুশীলার সহিত বেশ রসের কথাবার্তা বলে, আবার অন্য সময়ে সে একেবারে ছেলেমানুষের মত সরল ও অনভিজ্ঞ

—তাহার চরিত্রের এই ভাবানৈক্য খুবই চোখে পড়ে। 'হারানিধি' নাটকের ক্রিয়া এবং ঘটনা একতরফা নয়, মোহিনী শক্তিশালী দুর্বৃত্ত হইলেও তাহার প্রতিপক্ষও প্রবল। নব, অঘোর এবং কাদম্বিনী মোহিনীকে পাল্টা জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহাতে একঘেয়ে করুণ রসের অত্যাচার হইতে আমরা রক্ষা পাইয়াছি। 'প্রফুল্ল'র ন্যায় 'হারানিধি' একেবারে হাস্যরস বিবর্জিত নয়। অঘোরের চমকপ্রদ ক্রিয়াকলাপ এবং witty কথাবার্তা সমস্ত নাটকখানিকে স্নিগ্ধ এবং উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তাহার ন্যায় সরস, ধারালো এবং হাস্যরসাত্মক চরিত্র গিরিশচন্দ্র খুবই কমই সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। নাটকের সর্বাপেক্ষা কৃত্রিম এবং আড়ষ্ট চরিত্র নীলমাধব। 'নীলদর্পণে'র নবীনমাধবের ন্যায় সে কেবল হিতোপদেশ আওড়ায়, কোনো উত্তাপ উত্তেজনা যেন ইহার নাই।

॥ মায়াবসান (১৮৯৮) ॥ সামাজিক নাটক হিসাবে 'মায়াবসানে'র কোনোই উৎকর্ষ নাই। গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম এবং ক্ষমাধর্মের আদর্শে ধর্মনৈতিক ঐক্য বিধান করা দেশের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর।১ 'মায়াবসানে'র মধ্যে তিনি তাহারই আভাস দিয়াছেন। উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া নাটকখানির মধ্যে ধর্ম ও নীতিকথার কচকচি বড় বেশি আছে। দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া ধর্ম ও নীতির আদর্শ অনেকেই প্রচার করিয়াছেন। এইরূপ বক্তৃতা অনেক স্থলেই ক্লান্তিকর ও বিরক্তিজনক হইয়াছে। এই নীতিতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে অন্নপূর্ণা চরিত্রে। সে হঠাৎ যেন স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া মৃত স্বামীর জন্য শোকাকুল হইয়া উঠিল। ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির ন্যায় স্বামীদেবতার জন্য তাহার 'কোথা প্রভু', 'কোথা প্রভু' ইত্যাকার ভাববিহ্বল উন্মাদনা নেহাত হাস্যকর হইয়াছে। কালীকিংকরের প্রতি রঙ্গিণীর ভালোবাসা অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের (abnormal psychology) অন্তর্গত। তাহার প্রেম 'শেষপ্রশ্নে'র আশুবদ্দির প্রতি নীলিমার অনুরাগের কথা মনে করাইয়া দেয়। রঙ্গিণীকে রক্তমাংসের দেহধারী মানুষ বলিয়া মনে হয় না; তাহার চরিত্রের মধ্যে কোনো দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, আবেগ, বেদনা কিছুই নাই, সে যেন নিষ্কাম কর্ম এবং সেবাধর্মের একটা idea মাত্র। তত্ত্বকথা বলিতে কেহই ছাড়ে না, এমন কি ভৃত্য শান্তিরামও বাদ যায় না। বিজ্ঞ পণ্ডিতের মত কথা না বলিলে এই চরিত্রটী ভালোই হইত। কালীকিঙ্করের ভূমিকায় চূড়ান্ত অসংলগ্নতা ও অসঙ্গতি রহিয়াছে। একটা চরিত্র পাগোল

---

১। গিরিশচন্দ্র কুমুদবাবুকে বলিয়াছিলেন—'আমার বিশ্বাস দেশ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের আর আদেশের অনুসরণ না করলে কিছুতেই অগ্রসর হবে না। তিনি বারবার দেশকে ব'লে গেছেন যে ভারতবর্ষের জাতীয়তার মূল প্রাণ ধর্মে। বার বার তিনি সাবধান ক'রে গেছেন যে বিদেশীয় অনুকরণে রাজনীতির আন্দোলনে দেশকে চালিত করো না—করলেই ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্ট হবে।'

গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য', পৃঃ ৭-৮।

'মায়াবসানে'র প্রথম অংকের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে কালীকিংকরও বলিতেছে—'আমার মতে ভারতের রিলিজন ইউনিটি ভিন্ন অপর কোন ইউনিটি হ'তে পারে না।'

হইতে পারে, কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে সেই পাগলামিরও একটা বিশেষ ঢং ও রীতি থাকা আবশ্যক। কালীকিঙ্করের পাগলামিও স্বাভাবিক নহে। তিনি নেহাত ভাণ করিয়া পাগোল হইয়াছিলেন, এবং রঙ্গিণীর অনুরোধেই হঠাৎ ভালো হইয়া উঠিলেন। কালীকিঙ্করের শিষ্যা রঙ্গিণী বটে, কিন্তু নাটকের মধ্যে তিনিই রঙ্গিণীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ক্ষমাধর্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

॥ বলিদান (১৯০৫) ॥ 'বলিদান' সমস্যামূলক নাটক, এবং বোধ হয় একমাত্র এই নাটকেই গিরিশচন্দ্র সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে প্রগতিমূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। কন্যার বিবাহ সমস্যা আমাদের সমাজের এক অতি বাস্তব সমস্যা, এবং অদ্যাপি সেই সমস্যা তিরোহিত হয় নাই। করুণাময়ের ন্যায় অনেক পিতা কন্যার বিবাহে সর্বস্বান্ত হইয়া সারা জীবনে চির অশান্তি ভোগ করিয়াছে, এবং কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীর ন্যায় বহু হতভাগিনী বাঙালী ললনার জীবন শোচনীয় পরিণতি লাভ করিয়াছে। বাঙালী সমাজের কন্যা যে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের পাত্রী এবং বাপের বাড়িরও গলগ্রহ নাট্যকার তাহা নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন। বস্তুত নারী চরিত্র-গুলি অঙ্কনে তিনি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁহার উদ্দেশ্যের সহিত নাট্যকলার সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই। তিনি হয়তো ভাবিয়াছেন যে ট্র্যাজেডির কারুণ্য আনিতে না পারিলে সমস্যা সম্বন্ধে দর্শককে সম্যক্‌ভাবে অবহিত করা যাইবে না; সেইজন্য যে নাটকের মিলনান্ত পরিণতি হইতেছিল, অকস্মাৎ জবরদস্তি করিয়া তিনি তাহাকে বিষাদের মধ্যে ডুবাইতে চাহিয়াছেন। রূপচাঁদ এবং মোহিতমোহনের সহিত করুণাময়ের মিলনে এবং কিশোর ও জ্যোতিময়ার সুখকর পরিণয়ে বিষাদের সুরগুলি আনন্দের ঝঙ্কারে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু অকস্মাৎ এক বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। ছেঁড়া তারগুলি পুনরায় বাঁধিয়া যে বীণায় সুর সংযোজন করা হইল, কে যেন এক টানে সেই তারগুলি সজোরে ছিঁড়িয়া লইল। গিরিশচন্দ্র শাস্ত্রবিহিত সতীত্বধর্মকে রমণীর অক্ষয় শিরোভূষণ বলিয়া সর্বত্র দেখাইয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার স্ত্রী চরিত্রমাত্রই স্বামীর চিন্তা ও ভক্তিতে তন্ময় এবং বিভোর। কিরণময়ী এবং জোবির স্বামী নরাধম পাষণ্ড হইলেও স্ত্রীর কাছে পরম আরাধ্য দেবতা। ইহারা স্বামীকে চেনে না, জানে না, বুঝে না - স্বামীরূপ ideaকেই ইহারা শ্রদ্ধা কয়িয়া, ভালোবাসিয়া যায়। 'বলিদান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র পূর্বালোচিত অনুরূপ চরিত্রগুলি অপেক্ষা অনেক বেশি বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাঁহার মধ্যে নিরুপায় প্রলাপের আতিশয্য নাই। কন্যাদের দুর্দশায় তাহার হৃদয় শতধা ছিন্ন হইয়া গেলেও তিনি নীরবে সমস্ত দুঃখ সহ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং কন্যাদের প্রতি স্নেহপ্রাবল্য গোপন করিয়া এক কঠোর ভাব অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন।

॥ শাস্তি ও শান্তি (১৯০৮) ॥ 'শাস্তি কি শান্তি' সমাজের বিধবা-সমস্যা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। বিধবার প্রেম এবং বিবাহ লইয়া বাংলা সাহিত্যে অনেক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে; বংকিমচন্দ্র হইতে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বিভিন্ন লেখক সমস্যাটী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বংকিমচন্দ্র সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে প্রাচীনপন্থী এবং রক্ষণশীল ছিলেন, সেইজন্য বিধবার

চিত্তদৌর্বল্য এবং বিবাহ তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই,১ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং বিশেষ করিয়া শরৎচন্দ্র বিধবা জীবনের করুণ ট্র্যাজেডি মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র বংকিমচন্দ্রের ন্যায় বিধবাকে হৃদয়চালিত না দেখিয়া, শাস্ত্রশাসিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেইজন্য বিধবা চরিত্র আলোচনা করিতে যাইয়া অমঙ্গলের ক্লেদ-পঙ্ক ঘাঁটিয়া দুর্গন্ধে সমস্ত নাটক ভরপূর করিয়া তুলিয়াছেন। আর্টের তুলিকা ফেলিয়া তিনি নীতির কশা ধরিয়াছেন এবং সেইজন্য চরিত্রগুলির মনোহর চিত্র না আঁকিয়া, তাহাদিগকে নির্দয় আঘাতে মারিয়া ফেলিয়াছেন। ভুবনমোহিনী এবং প্রকাশের প্রেমের আদানপ্রদান এবং দ্বন্দ্ব তিনি বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখাইতেছিলেন বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার মনে হইল যে এইরূপ অমার্জনীয় স্খলনের জন্য সাজা প্রয়োজন, এবং সাজা তিনি দিয়াছেনও, অবশ্য একটু বেশি কঠোরভাবে। প্রমদার পুনরায় বিবাহ হইয়াছে কিন্তু বিবাহিত বিধবার সুখী হইতে নাই —এই দুর্লঙ্ঘ্য বিধান অনুযায়ী সে তাহার বিবাহিত জীবনকে ধিক্কার দিয়া এক রাত্রিকার স্বামীর স্বর্গীয় স্মৃতি বুকে করিয়া জীবন সফল করিয়াছে। নীতিশাস্ত্রে হয়তো ইহার খুব মূল্য ও মর্যাদা আছে, কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে ইহা অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিক। গিরিশচন্দ্রের আদর্শ বিধবা নির্মলা, যে হৃদয়ের দ্বারে পাথর চাপা দিয়া কৃচ্ছ্রতা ও ব্রহ্মচর্যের ক্ষুরধার পথে অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হইতে পারে। বংকিমচন্দ্র বিধবাদের শাস্তি দিয়াছিলেন—কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া এবং রোহিণীকে পিস্তলের গুলিতে বধ করিয়া। কিন্তু গিরিশচন্দ্র একটা মৃত্যুতে সন্তুষ্ট নহেন, নাটকখানিকে করুণ এবং বিষাদান্ত করিতে তিনি শেষ দৃশ্যে পটাপট মৃত্যু ঘটাইয়া দিয়াছেন, যেন কে কত ছুরিকাঘাত করিতে পারে তাহারই প্রতিযোগিতা সেখানে চলিয়াছে।

॥ গৃহলক্ষ্মী (১৯১২) ॥ গিরিশচন্দ্রের সর্বশেষ সামাজিক নাটক 'গৃহলক্ষ্মী'। নাটকখানির পঞ্চম অঙ্ক গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃস্বস্রেয় দেবেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়া দেন। দেবেন্দ্রবাবু গিরিশচন্দ্রের নাট্যরীতি খুব ভালোভাবেই বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি গিরিশ বাবুর অন্যান্য নাটকের অনুকরণে এই নাটকেও প্রলাপ, খুন, দারোগা-পুলিশ প্রভৃতি অতি সাধারণ ব্যাপারগুলি আমদানী করিয়াছেন। 'গৃহলক্ষ্মী' ঘটনা এবং চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়া 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি নাটকের পুনরাবর্তন মাত্র। তবে এই নাটকের চরিত্রগুলি খুব সজীব ও সক্রিয় হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের নারীচরিত্র হয় সতী চূড়ামণি, অথবা সমাজচ্যুত বেশ্যা, কিন্তু এই নাটকের চরিত্রগুলি অত স্পষ্ট ও সরল নয়। গৃহলক্ষ্মী বিরজাই প্রকৃতপক্ষে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিরজা সকলের প্রতি অশেষ স্নেহময়ী এবং মমতাময়ী অথচ গৃহকর্ত্রীর শক্তি এবং দৃঢ়তাও তাঁহার আছে, সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সবল প্রচেষ্টা সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। যাহাদের সহিত তিনি ঝগড়া করেন তাহাদের জন্যই তাঁহার অপরিসীম মমতা হৃদয় সঞ্চিত রহিয়াছে। বিরজার ন্যায় ব্যঞ্জনাময় কৌতূহলোদ্দীপক নারী চরিত্র গিরিশচন্দ্র বেশি

১। গিরিশচন্দ্র যে ঋষিদিগের সিদ্ধান্ত এবং আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।' 'গিরিশচন্দ্র'—অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৫৯।

সৃজন করেন নাই। তরঙ্গিণী পুত্রের সহায়তায় স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে—ইহাতেও একটু নূতনত্ব আছে। কারণ গিরিশচন্দ্রের নাটকে স্বাভাবিক স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে—এইরূপ ঘটনা সুলভ নহে। কুমুদিনী চরিত্রের মধ্যে বেশ্যা জীবনের জঘন্য বাস্তবতা চিত্রিত হইয়াছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলির মধ্যে কোনো অভিনবত্ব নাই।

## (ঘ) ঐতিহাসিক নাটক

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক এবং সামাজিক নাটক যেমন অসাধারণ জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক তেমন হয় নাই। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গেলে তৎকালীন জনসাধারণের মানসিক প্রবণতা এবং চাহিদার দিকে লক্ষ্য করিতে হয়। গিরিশচন্দ্রের যুগ নব ধর্মোত্থানের যুগ। ধর্মাদর্শ এবং প্রাচীন সংস্কৃতি তখন সর্বসাধারণকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ধর্মবিচ্ছিন্ন জাতীয়ভাব তখন লোকের চোখে গৌণ হইয়া আসিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকাবলী দেশের মধ্যে স্বদেশী ভাব উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙালীর সেই প্রথম জাতীয় উন্মাদনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পর স্বদেশী ভাব-প্লাবন সাময়িক ভাবে শান্ত ও নিরুদ্ধগতি হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯০৪-১৯০৫ সালে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক 'প্রতাপাদিত্য' রচনার পর হইতে আবার ঐতিহাসিক নাটকের যুগ আরম্ভ হইল১ এবং ইহাই ঐতিহাসিক নাট্যসাহিত্যের স্বর্ণময় যুগ। গিরিশচন্দ্র এই সময়ে তাঁহার বিখ্যাত নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' প্রণয়ন করেন। তখন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সময়, বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন সুরু হইয়াছে—পুরুষসিংহ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, সর্বত্র উত্তেজনা এবং বিক্ষোভের আর অন্ত নাই। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে বাঙালীর অতীত স্বাধীনতা সূর্যের অস্তরাগের করুণ রশ্মিগুলি ফুটাইয়া তুলিলেন, উৎসাহিত জনগণ সাদরে তাহা বন্দনা করিয়া লইল।২ 'সিরাজদ্দৌলা'র পরে তিনি 'মীরকাশিম' এবং 'ছত্রপতি শিবাজী'— এই দুইখানা নাটক রচনা করেন এবং ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে এই তিনখানা সর্বাপেক্ষা সার্থক সৃষ্টি।

গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকের একটী প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি যথাসম্ভব ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিয়াই নাটক লিখিতেন। কোনো ঐতিহাসিক কাহিনী সম্বন্ধে নাটক লিখিবার পূর্বে তিনি সেই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিশেষ

১। অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'—পৃঃ ৯৬ দ্রষ্টব্য।
২। ঐ, পৃষ্ঠা ১০৭—১১০ দ্রষ্টব্য।

অভিনিবেশ সহকারে পড়াশুনা করিতেন।১ ইহাতে তাঁহার নাটকগুলি ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে একটা উন্নত মহিমময় grandeur থাকা প্রয়োজন এবং গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাহা ভালোভাবেই আছে। বীররস পরিস্ফুরণে তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। ঘটনার তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতে এবং শক্তিশালী ভাষার প্রয়োগে নাটকগুলি বীররসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকে গদ্য এবং পদ্য উভয় প্রকার ভাষা-রীতিই আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে পদ্য একেবারে বর্জিত হইয়াছে এবং ভাষায় তাহা সম্পূর্ণরূপে আধুনিকতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক নাটক 'চণ্ড'।২ টডের 'রাজস্থান'-অন্তর্ভুক্ত Annals of Mewarএর সপ্তম পরিচ্ছেদে চণ্ডের কাহিনী বর্ণিত আছে। সেই কাহিনীর সহিত ঐক্য রাখিয়া গিরিশচন্দ্র নাটক রচনা করিয়াছেন। কাহিনীটার মধ্যে নাটকীয় উপাদান যথেষ্ট রহিয়াছে, এবং নাট্যকার নাটকীয় সংস্থান সৃষ্টি করিতে বিশেষ কলাকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। নাটকের মধ্যে প্রেম ঈর্ষা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির লীলা থাকিলেও মেবার ও রাঠোরের বিরোধের বিষয়টী ভালোভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। নাটকখানি অমিত্র ছন্দে রচিত এবং মাঝে মাঝে গদ্যও আছে। অমিত্র ছন্দ ব্যবহারে গিরিশচন্দ্র পরিপূর্ণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বীর রস পরিস্ফুটনে এই ছন্দ বিশেষ কার্যকর হইয়াছে। 'চণ্ডে'র মধ্যে অবান্তর ও দুর্বল অংশ খুব কমই আছে। দৃঢ় সংহত ঘটনারাশি যেন ঝড়ের বেগে বহিয়া গিয়াছে। চণ্ডের আক্রমণ-দৃশ্যের মত উত্তেজনাপূর্ণ বীররসাত্মক দৃশ্য খুব কম নাটকেই আছে। চণ্ড বীরত্ব ও মহত্ত্বের আধার, ভীষ্মের ন্যায় ত্যাগী এবং উদার—সে কামাতুর পিতার বিবাহ দিয়াছে, নিজে রাজ্যভোগের সব আশা ত্যাগ করিয়াছে এবং প্রকৃত বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় ভ্রাতার রাজ্য চালাইয়াছে। যে বিমাতা এতো অন্যায় করিয়াছে তাহার প্রতি চণ্ডের ভক্তি শ্রদ্ধার আর সীমা নাই। চণ্ডের চরিত্র আগাগোড়া যদি এরূপ থাকিত তবে হয়তো মহাপুরুষ বলিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিতাম, কিন্তু হৃদয়বান প্রবৃত্তিময় মানুষরূপে তাহাকে দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু শেষে চণ্ডের দুর্জয় প্রতিশোধস্পৃহা এবং অমিত বীর্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে, বহ্নি ভস্মাচ্ছাদিত থাকে বলিয়াই তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নাই। চণ্ডের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাঠোরাধিপতি রণমল্ল। তৃষ্ণার্ত অজগরের মত ক্রূর জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া সে সমস্ত মেবার-বংশকে শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছিল।

১। তাঁহার লিখিবার একটা পদ্ধতি ছিল এই যে তিনি যে বিষয় লিখিতেন, সে বিষয়ের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না জানিয়া 'শ্রীদুর্গা' কাঁদিতেন না।'

'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'—পৃঃ ১২৮।

২। অবশ্য 'আনন্দরহো' সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটক হইলেও, ইহা নিতান্ত অক্ষম রচনা বলিয়া আলোচনার যোগ্য নহে।

অন্তিম দৃশ্যে তাহার স্পর্ধিত বীরত্ব দেখিয়া আমরা বুঝি যে সে কামান্ধ নির্দয় দুর্বৃত্ত হইতে পারে কিন্তু কখনো কাপুরুষ নয়। তাহার মৃত্যুর সময় মনে হয় যেন একটা অশুভ নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। নাটকের মধ্যে রঘুদেবজীর সামান্য অংশই আছে। কিন্তু জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর পরও যেমন তাহার ভাব (spirit) নাটকের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তেমনি রঘুদেবের স্মৃতি এই নাটকেও সব চরিত্রগুলিকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে।১ বিজরীর প্রেম এবং প্রতিহিংসা নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি। বিজরীর চরিত্র অঙ্কন করিয়া নাট্যকার রঘুদেবের মৃত্যু এবং রণমল্লর পতনের সঙ্গত কারণ দেখাইয়াছেন। বিজরী সব ঘটনাগুলিকে দৃঢ় রজ্জুর দ্বারা একত্রে বাঁধিয়াছে।

॥ ভ্রান্তি (১৯০২) ॥ 'ভ্রান্তি' নাটকখানাকে ঐতিহাসিক নাটক বলা হয়তো সঙ্গত হইবে না, কারণ নাটকের মধ্যে ঐতিহাসিক বাঁধুনি খুবই আলগা এবং অসংলগ্ন, কোনো ইতিবৃত্ত-মূলক ঘটনার প্রাধান্যও ইহাতে নাই। ইতিহাসের ছায়া থাকিলেও ইহাকে প্রেম এবং ঈর্ষামূলক রোমান্টিক নাটক বলাই বোধ হয় সমীচীন। নাটক হিসাবে ইহা নিতান্ত নিকৃষ্ট। ইহার ঘটনা সংস্থাপন, চরিত্র-চিত্রণ, কথোপকথন কিছুই উল্লেখযোগ্য নহে। নাটকের যে মূল ভ্রান্তি তাহা নিতান্ত তুচ্ছ ও সামান্য। নিরঞ্জন যদি ললিতার নাম মাধুরী বলিয়া ভুল না করিত, তবে এই বিরাট নাটকের এতো ব্যাপার কিছুই ঘটিত না। গ্রীকগণ ভুলকে পাপ বলিয়া মনে করিতেন বটে, এবং ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতেন।২ কিন্তু সেই ভুল সর্বত্র বিশেষ গুরুতর ও মারাত্মক হইত। ইডিপাসের মতো চরম ভুল যে করিয়াছে, তাহার চরিত্রই কেবল ট্র্যাজেডিতে অবসিত হইয়াছে। কিন্তু 'ভ্রান্তি' নাটকের ভুল নিতান্তই অতি সাধারণ আকস্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নিরঞ্জন এবং ললিতার মধ্যে কয়েকবার দেখা হইয়াছে, কথাবার্তা হইয়াছে, অথচ যাহা মুখের একটি কথাতেই উড়িয়া যাইত, তাহাকেই অনর্থক পাকের পরে পাকে ঘোরালো করা হইয়াছে। কোনো ঘটনারই যৌক্তিকতা নাই। নাট্যকার গায়ের জোরে যেন কতকগুলি দৃশ্য ঢুকাইয়া দিয়াছেন। আকস্মিক কিংবা দৈব ঘটনা কমেডির বিষয় হইতে পারে। আলোচ্য নাটকের ভ্রান্তিও চমৎকার কমেডি সৃষ্টি করিতে পারিত, নাট্যকার নাটকখানাকে ট্র্যাজেডি করিতে যাইয়া সব মাটি করিয়াছেন।

* 'Raghudeva was so much beloved for his virtues, courage and manly beauty, that his murder became martyrdom, and obtined for him divine honours, and a place amongst the 'Dii Patres' (Pitri deva) of Mewar',

'Annals of Mewar' (*Rajasthan).*

গ্রীক ট্র্যাজেডির আলোচনা প্রসঙ্গে W. M. Dixon বলিয়াছেন—

'We shall not be far wide of the truth if we say that for the clear-eyed intellectualism of the Greeks error was sin and sin error, miscalculation, in short, a form of guilt, for which Nature had no forgiveness'

*Tragedy*—p. 131- 32.

॥ সৎনাম (১৯০৪) ॥ মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যে সৎনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ হইয়াছিল সেই কাহিনী লইয়া গিরিশচন্দ্র 'সৎনাম' বা 'বৈষ্ণবী' নাটক প্রণয়ন করেন। স্বাধীনতাকামী, ব্রতধারী সম্প্রদায়ের আশা ও আশাভঙ্গের কথা নাটকে চমৎকার ফুটিয়াছে। প্রদীপ্ত স্বদেশপ্রেমের সহিত হৃদয়-বৃত্তির দুর্বল তাড়নার দ্বন্দ্ব কি ভাবে মহৎ ব্রতভঙ্গ করিয়া দিতে পার তাহার শোচনীয় দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছিলেন আনন্দ-মঠের ভবানন্দ চরিত্রে, এবং গিরিশচন্দ্র দেখাইলেন রণেন্দ্র চরিত্রে। কিন্তু ভবানন্দ শেষপর্যন্ত স্বাধীনতার যুদ্ধে নিজের দুর্বলতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, আর রণেন্দ্র যেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও দুর্বলতার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। 'আনন্দমঠে'র ন্যায় 'বৈষ্ণবী' নাটকেও স্বদেশ-প্রেমের প্রবল জলপ্রবাহের মধ্যে হৃদয়ের দুষ্প্রতিরোধ্য সনাতন প্রবৃত্তি এক একটা জটিল ঘূর্ণ্যাবতের সৃষ্টি করিয়াছে, এবং সেই আবর্তের মাঝে শক্তিধর ব্রতনিষ্ঠও তলাইয়া গিয়াছে। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, ব্রতচ্যুত, হতগৌরব সম্প্রদায়িদের দুর্দশা দেখিয়া বিদ্রোহের মূল চালক ফকিররাম যে মর্মবিদারী খেদোক্তি করিয়াছে, তাহাতে মনে হয় আমাদের পঞ্জরের একটার পর একটা হাড় যেন খসিয়া যাইতেছে। নাটকখানির সর্বপ্রধান ত্রুটি হইতেছে মৃত্যুর বাহুল্য, পর পর সাতটি চরিত্রের পতন ও মৃত্যু ঘটাইয়া গিরিশচন্দ্র নাটকখানির সর্বনাশ করিয়াছেন,ট্র্যাজেডির গম্ভীর মাহাত্ম্য নিতান্ত হাস্যকর ছেলেমানুষীতে পর্যবসিত হইয়াছে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বৈষ্ণবী শক্তিশালী বীরাঙ্গনা হইলেও রণেন্দ্র, ফকিররাম, চরণদাস প্রভৃতি অনেকগুলি প্রধান ভূমিকার পাশে তেমন একচ্ছত্র স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারে নাই। চরণদাসের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কৌশল এবং গুরুর প্রতি তাঁহার অহেতুকী ভক্তি এই ভূমিকাটিকে বেশ সরস ও প্রাণবান করিয়াছে। গুলসানার প্রেম এবং প্রতিহিংসার দ্বন্দ্ব ও বিশেষ চমৎকারিত্বপূর্ণ হইয়াছে। তবে মনে ঘটনা এবং চরিত্রগুলি যেন তাহার বড়ো বেশি বশীভূত হইয়াছে। সৎনামীরা তাহাকে সর্বনাশের কারণ জানিয়াও যেন নিঃশক্তি হৃতবল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে যেন অলঙ্ঘ্য শক্তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তাহাকে দমন করিবার তেমন চেষ্টা করে নাই।

'বাসর' এবং 'অশোকে'র প্রধান চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক, সেই জন্য ঐতিহাসিক নাটকের সহিত ইহাদের আলোচনা করা হইতেছে; কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই নাটক দুইখানির মধ্যে ঐতিহাসিক ভাব এবং আবহাওয়ার (atmosphere) একান্ত অভাব। ঐতিহাসিক নাটকের অঙ্গীভূত বীররসও ইহাদের মধ্যে নাই; 'বাসরে'র মধ্যে গীতি এবং হাস্যরস ও 'অশোকে'র মধ্যে ধর্মের প্রাধান্য পরিস্ফুট হইয়াছে। 'বাসর'কে রোমান্টিক এবং 'অশোক'কে ধর্মমূলক নাটক বলিলে অন্যায় হয় না।

॥ বাসর (১৯০৬) ॥ 'বাসর' নাটকের কাহিনীটি বিশেষ চমকপ্রদ, বিক্রমাদিত্যের পরিচয় বিম্বাবতীর কাছে অপরিজ্ঞাত রাখিয়া নাট্যকার যে suspenseএর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা খুব কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। নাটকটীর মধ্যে অনেকগুলি গীত আছে। ছেলে ভুলানো ছড়ার মতো গীতগুলি কানের মধ্যে যেন কেবলি অনুরণিত হইতে থাকে। হাস্যরসাত্মক চরিত্র নাটকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হাস্যরস উদ্রেক করে।

॥ অশোক (১৯১১) ॥ ইতিহাসের প্রতি যথাযোগ্য বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়া, নিজের মৌলিক কল্পনাও খানিকটা মিশাইয়া গিরিশচন্দ্র 'অশোক' নাটক রচনা করিয়াছেন।১ অশোক সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রধান ঘটনাগুলি বর্ণনা করিতে যাইয়া নাট্যকার নাটকীয় ঐক্য অনেক স্থলে নষ্ট করিয়াছেন, এবং চরিত্রগুলি ক্রমবিকসিত রূপ লাভ করিতে পারে নাই। ঐতিহাসিক নাটক-হইলেও ধর্মভাবের প্রাধান্য ইহার মধ্যে বিশেষ ভাবেই আছে। শেষদিকে বৌদ্ধ ধর্মাপ্লব নাটক খানিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মার ও তৃষা গ্রন্থের মধ্যে অতিশয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং সেইজন্য এই দুইশক্তির সহিত ধর্মাশ্রিত ব্যক্তিদের ধর্মমূলক দ্বন্দ্বই নাটকের মধ্যে যেন বক্তব্য তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'অশোক' নাটকে ব্যভিচার, নিষ্ঠুরতা, হত্যা প্রভৃতি সর্বপ্রকার বীভৎস পাপলীলার বর্ণনা আছে, কিন্তু অসংলগ্ন ভাবে ঘটিয়াছে বলিয়াই এই সব ঘটনা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অশোক চরিত্রের দুই রূপ—চণ্ডাশোক এবং ধর্মাশোক। নাটকের মধ্যে অশোক বহুতর নৃশংস কাজ করিয়াছেন, এমন কি ধর্মত্ব লাভ করিয়াও তিনি জৈনদের উপর অকথ্য অত্যাচার, বেশ্যাসক্তি প্রভৃতি পাপ-কর্মে লিপ্ত হইয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্যমণ্ডিত, শ্রদ্ধাব্যঞ্জক দিকটা তেমন বিকসিত হয় নাই। শেষ দৃশ্যেই অশোক পরিপূর্ণ ধর্মভাব লাভ করিয়াছেন। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে বীতশোক চরিত্রটী চমৎকার হইয়াছে। আকালের ন্যায় প্রভুভক্ত হাস্যরসিক চরিত্র গিরিশচন্দ্র বহু সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য এই ভূমিকার মধ্যে নূতনত্ব নাই।

॥ সিরাজদ্দৌলা (১৯০৬) ॥ গিরিশচন্দ্র যখন 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক রচনা করেন তখন ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণযুগ সুরু হইয়াছে। নবজাগ্রত বাঙালীর চিত্তবিক্ষোভ সে-সময় দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যপ্রতিভাকে অনুরণিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্রও সমসাময়িক নাট্যপ্রবণতার দিকে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না, কিছু কালের জন্য ভক্তিসিক্ত পৌরাণিক জগৎ ও অশ্রুপ্লুত সামাজিক সংসার হইতে তাঁহার দৃষ্টিকে ফিরাইয়া লইয়া উদাত্তভাবরঞ্জিত ঐতিহাসিক লীলাভূমির দিকে প্রসারিত করিলেন। এই নূতন নাট্য-সাধনাতেও তিনি সাফল্য লাভ করিলেন। তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক সিরাজদ্দৌলা প্রশংসিত ও সম্বর্ধিত হইল—স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের কথায়, 'আমার সিরাজদ্দৌলা যে জনপ্রিয় হইয়াছে শুনিতে পাই, তাহা আমার সৌভাগ্য।' পরবর্তিকালের ফেনকল্লোলিত ঐতিহাসিক নাট্যধারায় সিরাজদ্দৌলার দুঃখভারাক্রান্ত জাতীয়তাবাদ যে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই।

১। সে সময় অশোক সম্বন্ধে যাহা কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল, গিরিশচন্দ্র তন্ন তন্ন তাহার অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন. তবে নাটক ইতিহাস নহে, ইতিহাসকে নাটকে পরিণত করিতে যাহা কিছু আবশ্যক, গিরিশচন্দ্র নিঃশঙ্কচিত্তে সে সকল গ্রহণ করিয়াছেন।

'গিরিশচন্দ্র'—অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পৃঃ ৫৭২।

'সিরাজদ্দৌলা' রচনা করিবার পূর্বে গিরিশচন্দ্র বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বাংলার এই হতভাগ্য নবাব সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশী লেখকদের ইতিহাস হইতে কোন কোন ঘটনা গ্রহণ করিলেও দেশী লেখকদের, বিশেষ করিয়া অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও নিখিলনাথ রায়ের নবলব্ধ ঐতিহাসিক তথ্যই তাঁহার নাটকের মূল প্রেরণা জোগাইয়াছে। জাতীয়তাবাদী বাঙালী ঐতিহাসিকদের সত্যসন্ধিৎসা তাঁহাকে এতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছিল যে, তাঁহার নাটক পড়িলেই মনে হয়, নানা যুক্তি ও বিচারের দ্বারা বিপক্ষ মত খণ্ডন করিয়া একটি নূতন ঐতিহাসিক সত্য উদ্‌ঘাটন করা যেন তাঁহারও উদ্দেশ্য। সেজন্য তাঁহার নাটকে অনেকস্থলেই রসাশ্রয়ী কথা ও কাহিনীর পরিবর্তে ইতিবৃত্তমূলক ঘটনা ও বক্তৃতার প্রাধান্য দেখা গিয়াছে—ঐতিহাসিক আসিয়া যেন নাট্যকারের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসের প্রতি এতখানি আগ্রহ ও আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহার নাটকীয় রসের প্রেরণা ও পরিণতির মধ্যে প্রকৃত ইতিহাসের মর্যাদা কতখানি রক্ষিত হইয়াছে সে আলোচনাই এখন আমরা করিব।

সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন-প্রাপ্তির সময় হইতে নাটকের আরম্ভ এবং তাঁহার শোচনীয় পরিণতির পর মীরজাফরের মসনদলাভে ইহার সমাপ্তি ঘটিয়াছে। বাংলার এই শেষ স্বাধীন নবাব যে অশুভ মুহূর্তে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তখন হইতে চতুর্দিকে যে বিষশ্বসিত অন্তর্বিরোধের কৃষ্ণকুটিল মেঘরাশি সেই সিংহাসনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিল তাহা বাংলার ইতিহাসের চিরন্তন লজ্জা-কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করিয়াছে। সেই অধ্যায় দুঃখবিচলিত নাট্যকারের নাটকে সম্পূর্ণ রূপ লাভ করিয়াছে। সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটী-রাজবল্লভ-মীরজাফর প্রভৃতির ষড়যন্ত্র সওকতজঙ্গের পতন, ইংরাজের সহিত বিরোধ ও পলাশীক্ষেত্রে তাহার দুঃখাবহ পরিণতি, সিরাজের মর্মান্তিক মৃত্যু ইত্যাদি মূল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি প্রায় যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে দুই এক জায়গায় কেবল কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করা হইয়াছে। নাটকের সাধারণ চরিত্রগুলি মোটামুটি ঐতিহাসিক রূপের সহিত অভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে। জায়গায় জায়গায় নাট্যকার ইতিহাসের পূর্ণতর রূপ দেখাইয়াছেন; যেমন দানশা চরিত্রটি। দানশার পূর্ববঙ্গীয় কথা ও তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তির যে সকারণ ঘটনাশ্রিত রূপ নাটকে পরিস্ফুট করা হইয়াছে তাহাতে চরিত্রটির নাটকীয় উপযোগিতা অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। সিরাজ-পত্নী লুৎফউন্নেসার যে দুঃখ-মমতা ও সহিষ্ণুতায় গড়া মূর্তি নাটকে দেখান হইয়াছে তাহাও ইতিহাসের বস্তুময়তা ছাড়াইয়া কারুণ্যের রসলোকে প্রবেশ করিয়াছে।[১] কিন্তু আমাদের অভিযোগ এই যে, নাট্যকার প্রধান তিনটি চরিত্রের বেলাতেই ইতিহাসকে হয় আচ্ছন্ন,

১। নাট্যকার সম্ভবত নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনীর 'লুৎফ-উন্নেসা' ও 'খোসবাগ' প্রবন্ধ দুইটি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া লুৎফউন্নেসার চরিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন।

আর না হয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই তিনটি চরিত্র হইল নায়ক সিরাজদ্দৌলা। প্রধান পার্শ্ব-চরিত্র করিমচাচা ও নাটকের প্রলয়ঙ্করী নিয়ন্ত্রী শক্তি জহরা।

সিরাজদ্দৌলা সম্বন্ধে নাট্যকার কিরূপ ধারণা গঠন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভূমিকাতেই উল্লিখিত হইয়াছে। দেশীয় ঐতিহাসিকগণ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজে'র যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন তাহাই নাট্যকারের মানসকল্পনায় অঙ্কিত হইয়া ছিল। নাট্যকার সিরাজের মুখে শুনাইলেন,

'রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার,
নবাব রাজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে ;
প্রজার মঙ্গলকার্য সতত সাধন,
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।'

নাটকের শেষে করিমচাচা জহরাকে বলিয়াছে, 'বাহাদুরী তো নিলে, কিন্তু যে নবাব, হোসেনকুলিকে কেটেছিল, তার কিছু করতে পারলে না। সে ছিল মাতাল,—আর এ হচ্ছে প্রজাপালক নিরীহ নবাব'! এই সব উক্তির মধ্য দিয়া সিরাজচরিত্রের উপর যে আলোকপাত করা হইয়াছে তাহা কি সত্যই প্রকৃত ইতিহাস-সম্মত? বিদেশী ঐতিহাসিক বিদ্বেষচালিত হইয়া প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করিয়াছিলেন তাহা সত্য কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকগণও এককালে জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিরূপ সত্যকে ভাবের মায়াজালে রঙীন ও মধুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমরা ঐতিহাসিক নহি, ইতিহাসের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র সিরাজের যে চরিত্র চিত্রিত করিলেন তাহার সহিত নবাবের সমসাময়িক অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণের কোন মিল খুঁজিয়া না পাইয়া বিভ্রান্ত হই। সিরাজ সিংহাসন প্রাপ্তির পরেও মোটেই নিরীহ ও প্রজাবৎসল ছিলেন না, তাহা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের মুতক্ষরীণে বার বার উল্লেখ করা হইয়াছে। মুতক্ষরীণে সিরাজ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ, অতিশয় নির্বোধ ও দাম্ভিক এবং হিতাহিত ও পাপপুণ্য-জ্ঞানশূন্য ছিলেন।১ সিরাজের বিরুদ্ধে যে তৎকালীন প্রায় সমস্ত প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি দায়ী স্বয়ং নবাব। রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্য ও সেনাপতি এবং সম্মানভাজন ব্যক্তিগণ সিরাজের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত

১। As for himself, he was ignorant of the world, and incapable to take a reasonable party, being totally destitute of sense and penetration and yet having a head so obscured by the smoke of ignorance, and so giddy and intoxicated with the fumes of youth and power and dominion that he knew no distinction betwixt good and bad, nor betwixt vice and virtue.'

Seir Mutaqherin ( Vol II ), p. 188-189

হইয়াই তাঁহার শাসন উচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।১ তাঁহাদের কার্য কোন-ক্রমে সমর্থন করা যায় না, কিন্তু সিরাজের আচরণও কিছুতেই প্রশংসা করা চলে না। শুধু কেবল প্রধান ও পদস্থ ব্যক্তিগণ নহেন, সাধারণ লোকও তৎকালে এই বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী নবাবকে যে খুব সমর্থন করিত তাহাও মনে হয় না। পলাশীক্ষেত্র হইতে পলায়নের পর সিরাজ রাজকোষের সমস্ত ধন ও রত্নরাশি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াও সাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিলেন না।২ রণক্ষেত্রে ও রাজদরবারে সিরাজের কোন অসাধারণ সাহস ও স্বদেশহিতৈষণার পরিচয়ও ইতিহাসে পাওয়া যায় না। নাটকে সিরাজের মুখে আমরা শুনি—

শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার ;
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার,
স্বার্থপর চাহে মাত্র রাজ্য-অধিকার।
হও সবে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত।

কিন্তু ইতিহাসে এসব কথার কোন প্রতিধ্বনি আমরা খুঁজিয়া পাই না। মুতক্ষরীণে লেখা আছে যে অত্যন্ত অনিচ্ছা ও অনুৎসাহের সহিতই সিরাজ পলাশীক্ষেত্রের দিকে রওনা হইয়াছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণের বিশৃঙ্খলা ও পলায়ন দেখিয়া নিতান্ত কাপুরুষের মতই পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন।৩ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াও সিরাজ নিজের নিরাপত্তার জন্য যতখানি ব্যাকুল হইযাছিলেন রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য ততখানি ব্যাকুল হন নাই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সিরাজচরিত্র জাতীয় দৃষ্টিতে অত্যন্ত করুণ ও শোকাবহ। সেই কারুণ্য ও শোকাবহতা ফুটাইতে যাইয়াই নাট্যকারকে ইতিহাসের অপ্রীতিকর সত্যকে আচ্ছন্ন করিতে হইয়াছে।

নাটকের অপর দুইটি প্রধান চরিত্র যে সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক তাহা নাট্যকারও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের মধ্যে এই অনৈতিহাসিক স্বীকৃতি অত্যন্ত হাস্যকর হইয়াছে। করিমচাচা জহরাকে বলিয়াছে, 'এত করেও ইতিহাসে স্থান পেলে না চাচী, নাটক আর গল্পের

১। ...all commanders of character, all deserving the utmost regard, and all thoroughly estranged from him by his harsh language, and his shocking behaviour nor were the principal citizens of Morshod-abad better used.—Ibid, p. 193.

২। He had never thought of being liberal, nor ever had entertained any thoughts about restraining either his tongue or hand from injuring and oppressing people, and now that the day of retribution was already at hand, the day when he was in his turn to suffer all kinds of torments in his own person, he betook himself to a distribution of treasures.

Ibid, p. 235.

৩। Confounded by that general abandoument, he joined the runaways himself, and after marching the whole night, he the next day at about eight in the morning arrived at his palace in the city.' Ibid, p. 234.

কেতাবেই শোভা পাবে! বেইমান কালিতেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভরে যাবে, তোমার আমার জায়গা হবে না।' এই উক্তি নাট্যকারের মুখে মানায় কিন্তু করিমচাচার মুখে এই ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে সম্ভব? নাটক ইতিহাস নহে, সে জন্য রসপূর্তির প্রয়োজনে ইতিহাসকে সামান্য পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিবার অধিকার নিশ্চয়ই নাট্যকারের আছে। কিন্তু নাটকের মূলশক্তি যদি কোন অনৈতিহাসিক ঘটনা কিংবা চরিত্র হয় তবে সেই নাটকের ঐতিহাসিকতা কিরূপে রক্ষিত হয়? আমাদের বিশেষ আপত্তি জহরা চরিত্রটি সম্বন্ধে। এই চরিত্রটির প্রতি নাট্যকারের অনুচিত পক্ষপাতিত্বের ফলে নাটকের সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার শক্তি ও সংঘাত যেন শিথিল ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। মনে হয় সমস্ত গুরুতর ঐতিহাসিক কার্যকারণের উপরে একটি প্রতিহিংসাময়ী নারীর প্রলয়ংকরী শক্তি জ্বলিয়া উঠিয়াছে আর বাংলা ও বাংলার নবাব সেই বহ্নিজ্বালায় পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের অসংগত বিকৃতি সন্দেহ নাই। একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলিয়াছেন, 'এরূপ অদ্ভুত চরিত্র বোধ হয় সেক্সপিয়রও কোন নাটকে সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।'১ সেক্সপিয়রের চরিত্র আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের চরিত্রটি যে সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জহরা সর্বগ ও সর্বজ্ঞ—সে যেমন নিমেষের মধ্যে ঘসেটী, মীরজাফর, করিম, ক্লাইভ, ওয়াটস্ সিরাজ সকলের কাছেই উপস্থিত হইতেছে, তেমনি এক আশ্চর্য শক্তির বলে সব কথা ও কাজই যেন জানিয়া লইতেছে—রাজনীতি, কূটনীতি, রণনীতি, ধর্মনীতি কোন নীতি জানিতেই তাহার আর বাকি নাই। তাহার চরিত্র সর্বাপেক্ষা অসহনীয় হইয়া উঠে তখন যখন গোটা বাংলা দেশটা সর্বনাশের মুখে সঁপিয়া দিবার পর তাহার মুখে একটা তরল গরিমান্বিত কৈফিয়ত শুনিতে পাই—'নারীর পতি সর্বস্ব, পতি সার, পতি ধর্ম, পতি স্বর্গ, আমি সেই পতির তৃপ্তির জন্য দুর্নীতি-কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, আর তোমরা স্বার্থপর।' অর্থাৎ পতিভক্তির তরণী লইয়া জহরা বুক ফুলাইয়া বৈতরণী পার হইয়া গেল এবং আর সকলে সেই বৈতরণীতে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। যে পতি ঘসেটী ও আমিনার দ্বৈঃপ্রেমে মজিয়াছিলেন তাঁহার আত্মার তৃপ্তির জন্যই এত বড় অপরাধ, আর সেই অপরাধের এতখানি গৌরবান্বিত স্বীকৃতি! ইহাতে নাটকখানির ঐতিহাসিকতা যেমন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তেমনি এক হাস্যকর অসংগতিতে চরিত্রটি ভরিয়া উঠিয়াছে।

নাটকের আর একটি প্রধান অনৈতিহাসিক চরিত্র হইল করিমচাচা। করিমচাচার ভূমিকায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র অবতীর্ণ হইতেন বলিয়া ভূমিকাটির গুরুত্ব ও খ্যাতি অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। চরিত্রটি অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে ইহা সরস হইলেও অভিনব নহে। কারণ চরিত্রটি দেখিলেই সঙ্গে সঙ্গে বাতুল, আকাল বিদূষক, কঞ্চুকী, পূর্ণরাম ভাট, বরুণচাঁদ, ভজহরি প্রভৃতি বহু চরিত্রের কথা মনে পড়িয়া যাইবে।

১। গিরিশ প্রতিভা—হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত—২৮১

বাহ্যত ইহারা নির্বোধ, নিষ্কর্মা ও নেশাখোর কিন্তু আসলে ইহারা সহৃদয়, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ও সূক্ষ্ম-অনুভূতিশীল। পৌরাণিক নাটকে ভক্তি, সামাজিক নাটকে পরোপকার ও ঐতিহাসিক নাটকে দেশপ্রীতিই হইল ইহাদের মূল ধর্ম। করিমচাচার হাস্যবিদ্রূপের অন্তরালে লাঞ্ছিত বঙ্গদেশ ও তাহার ভাগ্যবিড়ম্বিত নবাবের প্রতি যে বিষণ্ণ সমবেদনা বর্তমান তাহা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। তাহার আপাত-তরল উক্তির আবরণ উন্মোচন করিলেই বিরোধী পক্ষের প্রতি তাহার তীব্র নিন্দা এবং সিরাজের প্রতি সতর্কীকরণের ভাব লক্ষ্য করা যায়। জহরার মত করিমেরও একটা সবজান্তা শক্তি আছে, অথচ একটা নিষ্ক্রিয় জড়তায় তাহার সমস্ত সুপ্রবৃত্তি আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেজন্য অনিবার্য ঘটনার উপর কোথাও তাহার সক্ষম ক্রিয়াশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় নাই। করিম নাট্যকারের মুখপাত্র। সেজন্য তাহার বক্তৃতা বক্তব্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং নাটকের সংলাপ বহু স্থানেই ইতিহাসের ভাষ্যে পরিণত হইয়াছে। চরিত্রটি কর্মে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে মাত্র শেষদিকে, যেখানে সিরাজকে রক্ষা করিবার জন্য সে তাহার সহিত পোষাক অদলবদল করিয়াছে। অসহায় নবাবকে বাঁচাইবার জন্য তাহার একমাত্র সুহৃদের এই সর্বশেষ চেষ্টা আমাদের অন্তঃকরণ নিঃসন্দেহে এক করুণ বেদনায় পূর্ণ করিয়া তোলে।

'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের বোধ হয় সর্বপ্রধান ত্রুটি হইল ইহার ঘটনা ও চরিত্রের অত্যধিক বহুলত্ব। ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নাট্যকারকে এত বেশি আকর্ষণ করিয়াছিল যে নাটকের প্রয়োজন অনেক স্থলেই উপেক্ষিত হইয়াছে। সিরাজের পারিবারিক পরিবেশ, সওকতজঙ্গের বিবরণ, বিদ্রোহী নায়কদের বর্ণনা এবং ইংরাজদের বৃত্তান্ত সব এই নাটকে বিস্তৃতভাবে দেখান হইয়াছে। সেজন্য নাটকের মূলসূত্র অনেক স্থলেই হারাইয়া গিয়াছে এবং অবান্তর ও বিক্ষিপ্ত ঘটনারাশির মধ্যে কোন সুনিবিড় রসের ঐক্য জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। সিরাজের চরিত্র নাটকে অনন্য প্রাধান্যলাভ করে নাই বলিয়া দর্শকদের সহিত তাহার কারুণ্য-সম্পর্ক ঘনীভূত হইয়া উঠিতে পারে নাই। বিশেষত সিরাজের মৃত্যুর পর ক্লাইভ ও মীরজাফর বৃত্তান্ত আমাদের রসবেদনাকে লঘু ও বিভক্ত করিয়া ফেলে।

ইতিহাসে যাহাই থাকুক. নাটকের মধ্যে সিরাজদ্দৌলাকে আমরা এক স্নেহপূর্ণ, ক্ষমাশীল ও স্বদেশবৎসল নবাব রূপেই দেখিতে পাই। মাঝে মাঝে একটু খেয়ালী ও অশোভন আচরণ দেখা গেলেও কোন গুরুতর অপরাধের স্পর্শ তাঁহার চরিত্রে নাই। উচ্ছ্বসিত স্বদেশপ্রীতি ও সুতীব্র ইংরাজবিদ্বেষ তাঁহার চরিত্রকে গভীর জাতীয়তায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তাঁহার চরিত্র যতখানি আদর্শায়িত হইয়াছে ততখানি রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠিতে পারে নাই। বহু চরিত্রের ভিড় যেমন তাঁহার আত্মপ্রকাশে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে তেমনি দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাবে তাঁহার চরিত্রের সচল শক্তিমত্তার দিকটি অপরিস্ফুট রহিয়াছে। তাঁহার পরিণতি অত্যন্ত ট্র্যাজিক কিন্তু এই ট্র্যাজেডি কোন আন্তরসংঘাতের অনিবার্য ফল নহে, ইহা বাহিরের শক্তিসংঘাতের সুকরুণ পরাজয়।

## (ঙ) পঞ্চরং এবং গীতিনাট্য

গিরিশচন্দ্র কতকগুলি প্রহসন রচনা করিয়াছেন, এইগুলি পঞ্চরং নামে প্রসিদ্ধ। 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'বেল্লিকবাজার', 'বড়দিনের বখশিস', 'সভ্যতার পাণ্ডা' প্রভৃতি পঞ্চরংগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। সাধারণত পূজা অথবা বড়দিন উপলক্ষে হীন আমোদ-প্রমোদ লইয়া এইগুলি রচিত। ইহাদের আকার খুব সংক্ষিপ্ত, এবং ঘটনা নিতান্ত সাধারণ ও সরল। অধিকাংশ প্রহসনগুলিই ইতর পল্লীর কদর্য আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ। পাত্রপাত্রীগুলি কুৎসিত পঙ্কে নিমগ্ন, তাহাদের কথাবার্তা সেই পঙ্কের দুর্গন্ধ বাতাসে কলুষিত। নাট্যকার অনেকগুলি প্রহসনে আধুনিক সভ্যতাভিমানী উন্মার্গগামী, সমাজের রীতিনীতির কমলবনে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিহারী বাবুদের ব্যঙ্গ করিয়াছেন। সেই ব্যঙ্গের আঘাত প্রহসনগুলিতে আছে, সেইগুলিতে স্নিগ্ধ হাস্যরসের উচ্ছল প্রবাহ নাই। পঞ্চরং-গুলির ভাষা কলিকাতার ইতর সমাজের ভাষা, রসিকতার শব্দ এবং বাক্যগুলিও সেই সমাজ হইতে আহৃত।

গিরিশচন্দ্র কয়েকখানা গীতিনাট্যও রচনা করিয়াছেন। 'মলিনমালা', 'মলিনা বিকাশ'. স্বপ্নের ফুল', 'দেলদার' প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ। তাঁহার শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গীতিনাট্য আবুহোসেন। 'আবুহোসেনে'র কাহিনীটি যেমন কৌতুকাবহ ইহার মধ্যস্থ রোমান্টিক এবং হাস্যরসাত্মক সুরও তেমনি উপভোগ্য।

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'সপ্তমীতে বিসর্জ্জন' নামক প্রহসনের আলোচনা প্রসঙ্গে এই জাতীয় নাটকের ধর্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন।—'ইংরাজীতে যাহাকে Extravaganza বলে, ইহা সেই প্রকৃতির। ইহা সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সামাজিক ন্যটক বাস্তব সংসারে ঘটনা ও চরিত্র লইয়া রচিত হয়, এইরূপ বিদ্রূপাত্মক প্রহসনের গল্প এবং চরিত্র সম্ভব রাজ্যের প্রান্ত সীমা হইতে আহৃত হইয়া থাকে—ইহার সকলই উচ্ছৃঙ্খল।'

'গিরিশচন্দ্র'—পৃঃ ৩০৫।

# অমৃতলাল বসু

## (ক) ভূমিকা

গিরিশচন্দ্রের ন্যায় অমৃতলালও নাটক রচনা করিবার পূর্বে অভিনেতারূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। যে সমস্ত অভিনেতা নটগুরু গিরিশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন অমৃতলাল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। স্বীয় গুরুর কাছে দুর্লভ শিক্ষা লাভ করিয়া ইনি পরবর্তীকালে নাট্যাচার্য এবং মঞ্চাধ্যক্ষের সম্মানিত আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের শিষ্য হইলেও নাটক রচনা বিষয়ে অমৃতলাল স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের ভাবনিষ্ঠ, তত্ত্বসন্ধানী দৃষ্টি জীবনের গূঢ় এবং গভীর বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিত। কিন্তু তরল ও হাল্কা জীবনের বিপর্যয় এবং বিকৃতির দিকেই অমৃতলালের তীক্ষ্ণ এবং বক্র দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। গুরু এবং গম্ভীর বিষয়ে তাঁহার আসক্তি ও প্রবণতা ছিল না, সেইজন্য গভীর ভাবমূলক নাটক তিনি খুব কম লিখিয়াছেন, যে দুই একখানা আছে তাহাও প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত নহে। দীনবন্ধুর ন্যায় তাঁহারও প্রতিভার উৎস হইতেছে হাস্যরস। এই উৎস হইতে অজস্র ধারা নির্গত হইয়া তাঁহারা রচনাবলীকে স্নিগ্ধ ও সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু দীনবন্ধু এবং অমৃতলালের হাস্যরস একরূপ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরস প্রকৃত Humourএর পর্যায়ে পড়ে। তাঁহার সহিত হাসিতে হাসিতে আমাদের অন্তঃকরণ আর্দ্র এবং চক্ষু সিক্ত হইতে থাকে, কিন্তু অমৃতলালের হাস্যরস তীব্র তীক্ষ্ণ চাবুকের ন্যায় আমাদিগকে আঘাত করে, আঘাতের বেদনায় আমাদের স্বাভাবিক আনন্দময় হাসি কাষ্ঠহাসিতে পরিণত হয়। ইংরাজীতে যাহাকে Satire বলে তাঁহার অধিকাংশ প্রহসন সেই শ্রেণীভুক্ত। কমেডির যত রকম বিভাগ আছে Satire অথবা বিদ্রূপাত্মক প্রহসন তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। অনাবিল অনর্গল হাস্যরসই কমেডির প্রাণ, কিন্তু Satire-এর মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক আঘাতের জন্য সেই হাস্যরস ব্যাহত হয়।১ বিশুদ্ধ কমেডির মধ্যে আমরা হাসি বটে, কিন্তু সেই হাসিতে লেখক, পাঠক, শ্রোতা, পাত্রপাত্রী সকলেই যোগ দেয়, সেখানে সকলেই উপহাসের ভাগী, এবং সকলেই সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু যখন আঘাতটা অতি স্পষ্ট এবং অব্যর্থ এবং যেখানে তাহা আমাদের ক্ষমাশীল সহানুভূতি উদ্রেক করে না সেখানে Satireএর পর্যায়ে হাস্যরস অবনীত হয়।২ খাঁটি

১। The purest of comedy, usually rules satire in any form out of its province, The appeal of this pure comedy is solely to the laughing force within us.'

*The Theory of Drama*—by A. Nicoll, p. 191.

২। If you detect the ridicule, ahd your kindness is chilled by it, you are slipping into the grasp of satire.'

*The Idea of Comedy*—by George Meredith, p. 79.

হাস্যরসিক সমাজের ত্রুটি ও ভ্রান্তি লইয়া পরিহাস করেন বটে, কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে কখনো তাঁহার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয় না। ভালো মন্দ দুইদিকই তিনি হাসির তুলিকা দ্বারা রঞ্জিত করিয়া দেন। কিন্তু বিদ্রূপাত্মক প্রহসনে লেখক তাঁহার নির্দয় কশা দ্বারা ভ্রান্ত, পতিত মানব জীবনকে আঘাত করিয়া সত্য ও যথার্থ পথ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেন। সমাজের নৈতিক দায়িত্ব এবং আবর্জনা নিষ্কাসনের ভার যেন তাঁহার উপর পড়িয়াছে।১ তাঁহার এই শিক্ষা দিবার আত্যন্তিক প্রচেষ্টা কিন্তু আমরা আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিতে পারি না, কারণ তাঁহার হৃদয়ের নির্মমতা আমাদিগকে তাঁহার কাছ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। আমাদের হাসির সুযোগ তিনি নষ্ট করিয়াছেন এইজন্য তাঁহার প্রতি আমরা বিরূপ হইয়া পড়ি।২ অমৃতলালের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ প্রহসন যথা—'বিবাহ-বিভ্রাট', বাবু', 'বৌমা', 'একাকার' প্রভৃতিতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কাঁটাগুলি অতি তীক্ষ্ণ, অতি মর্মান্তিকভাবে রহিয়াছে। এইগুলি পড়িবার পর মন বিষণ্ণ, ক্লিন্ন এবং গ্লানিময় হইয়া উঠে। আমরা নির্দোষ এবং নিরপরাধ হইলেও পাত্রপাত্রীদের শাস্তিতে যেন আমাদের মন ভারগ্রস্ত হইয়া থাকে ; মনে হয়, বুঝি হাসির বাষ্পে সমস্যাটী উড়াইয়া দিলেই ভালো হইত, ইহা যেন জগদ্দল পাথরের মত আমাদের বুকে চাপিয়া রহিয়াছে। অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, অমৃতলাল হইতেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য।৩ কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অমৃতলালের প্রহসনের মধ্যে লক্ষণীয় প্রভেদ বিদ্যমান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনের প্রাণ ঘটনার অদ্ভুত চমৎকারিত্বের উপর নির্ভর করিয়াছে এবং কোনো স্থলেই তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপের খোঁচা জ্বালাময় হয় নাই। কিন্তু অমৃতলালের অনেক প্রহসনেই কাহিনীর কোনো জটিল বৈচিত্র্য নাই। দৃশ্য-পরম্পরা যুক্ত করিয়া এবং কয়েকটী পাত্রপাত্রীকে আনিয়া লেখক তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সব প্রহসনে উদ্দেশ্যই মুখ্য, কাহিনী গৌণ। সেইজন্য প্রহসন হিসাবে ইহাদের মূল্য বেশি নয়। 'খাসদখল' এবং 'তাজ্জব ব্যাপারে'র মত প্রহসন তিনি খুব কমই লিখিয়াছেন, যে সব গ্রন্থে ব্যঙ্গ এবং রঙ্গ সরস ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আতিশয্য অমৃতলালের দোষ হইলেও তাহা অপেক্ষাও বড়ো দোষ মাঝে মাঝে দেখা গিয়াছে যেখানে গ্রন্থকার অতি প্রকাশ্যভাবে গ্রন্থের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। অনেক সময়ে তিনি পাত্রপাত্রীর মুখে লম্বা বক্তৃতার মধ্য দিয়া সামাজিক দোষ ও অসঙ্গতি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। হাস্যাত্মক রচনায় এইরূপ জবরদস্তি নিতান্ত

---

১। The satirist is a moral agent, often social scavenger, working on a storage of bile

*Ibed*, p. 82.

২। It is the laughter we look for in comedy, nor the sense of moral right or moral wrong, not the purpose or the significance of the play.

*The Theory of Drama*—by A. Nicoll, p. 193.

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড—পৃঃ ৩৭৫।

দোষাবহ। পরোক্ষ ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া আঘাত করিবার অধিকার সাহিত্যিকের আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে প্রচার করিবার দায়িত্ব তিনি নিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে তাঁহার রচনা রসসৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া পড়ে। অমৃতলালের অনেক প্রহসনেই এমন একটী চরিত্র আছে যাহার কাজ গ্রন্থকারের বক্তব্য ব্যক্ত করা। 'বাবু' প্রহসনের তিনকড়িমামা এবং 'বৌমা' প্রহসনের মতিলাল এইরূপ মুখপাত্র। অনেক সময়ে এই ধরণের চরিত্র একেবারে বিনা কারণে প্রহসনের মধ্যে চাপানো হইয়াছে। 'একাকারে'র রাধানাথ এবং 'সম্মতি-সঙ্কটে'র সার্বভৌমের দীর্ঘ নৈতিক বক্তৃতা অকারণ গ্রন্থগুলিকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে। ইহারা নাট্যকারের দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছে, ইহাদের দ্বারা শিল্পকৌশল সম্বন্ধে তাঁহার আস্থাহীনতা সূচিত হইয়াছে।

অমৃতলালের প্রহসনগুলি অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে, তাঁহার বিদ্রূপের লক্ষ্য সর্বত্র পাশ্চাত্যভাব-বিকৃত পুরুষ ও স্ত্রী সমাজ। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া আমাদের সমাজ কিভাবে সনাতন আদর্শ ও ব্যবস্থা হারাইয়া ঘোর অধঃপাতের পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে তাহারই চিত্র বার বার আমরা তাঁহার প্রহসনে দেখিয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দের দ্বারা নব হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান হওয়াতে দেশের লোকের দৃষ্টি পুনরায় অতীতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে প্রসারিত হইয়াছিল, সেই বিষয় আমরা গিরিশ-প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যবিলাসী জাতিধর্মচ্যুত নরনারীগণ ধিক্কৃত হইতে লাগিল। গিরিশচন্দ্রের নাটকে আমরা সনাতন ধর্ম ও আদর্শের প্রতি অটুট আস্থা লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার পঞ্চরংগুলিতে পাশ্চাত্য-অনুকরণপ্রিয় যুবক সমাজকে নিন্দা করা হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের পরে অমৃতলাল এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গাত্মক রচনায় এই সমাজকে নির্মমভাবে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। পাশ্চাত্য ভাব ও আদর্শের প্রতি এককালে দেশের যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল তাহার পূরাপূরি প্রতিক্রিয়া এই সময়ে দেখা গিয়াছিল। মাইকেল এবং দীনবন্ধুর প্রহসনেও ইংরাজী-শিক্ষিত অধঃপতিত সমাজকে উপহাস করা হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'সধবার একাদশী' লিখিয়াছিলেন তাঁহারাই আবার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'জামাইবারিক', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' রচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী যুগের নাট্যকারদের মধ্যে সংস্কারপক্ষপাতী উন্নত মতবাদ লক্ষিত হইয়াছিল। রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র এবং মনোমোহন বসু প্রভৃতি নাট্যকারের নাটক এবং প্রহসনে কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বৈধব্য প্রভৃতি প্রাচীন প্রথার দোষ ও অনিষ্টকারিতা দেখান হইয়াছে। গিরিশ যুগের প্রতিক্রিয়াপন্থী নাট্যকারদের মধ্যে এই সব কুপ্রথার সম্বন্ধে কোনো নিন্দাবাদের পরিবর্তে বরং সমর্থনের ভাব লক্ষ্য করা যায়। অমৃতলালের প্রহসনেও নির্বিচারে সর্বত্র নব্যতন্ত্র উপহসিত এবং প্রাচীনতন্ত্র প্রশংসিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র বিধবা বিবাহের কুফল দেখাইয়াছিলেন, অমৃতলালও 'খাসদখল', 'বাবু' প্রভৃতি নাটকে বিধবা বিবাহ যে নিতান্ত একটী হাস্যকর অসঙ্গত ব্যাপার তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ আন্দোলন বঙ্কিম-গিরিশ-অমৃতলালের হাতে এই পরিণাম লাভ করিল! 'তরুবালা' নাটকে অমৃতলাল বালবিধবার ব্রহ্মচর্য ও কৃচ্ছ্রতা গৌরবান্বিত করিয়াছেন; অথচ এক মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করাতে অন্যায় এবং দোষের কিছুই দেখিতে পান নাই। তাঁহার নিষ্ঠুর রক্ষণশীলতার সর্বাপেক্ষা শোচনীয় দৃষ্টান্ত 'একাকার' প্রহসন। যে জাতিভেদ এবং উচ্চ-নীচ বৈষম্যবোধ হিন্দুসমাজকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে তাহাই লেখক অদ্ভুত যুক্তির সহিত রক্ষা করিবার মত প্রকাশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাব আমাদের সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় কোনো যে ত্রুটি ও গলদ ছিল না এমন কোনো কথা নহে; সুতরাং সেই সমাজব্যবস্থার প্রতি যুক্তিহীন আনুগত্য সঙ্কীর্ণ একদেশদর্শিতা ছাড়া আর কিছুই নহে। অমৃতলালের সর্বাপেক্ষা বেশি ক্রোধ স্ত্রীশিক্ষা এবং স্বাধীনতার প্রতি। এই বিকৃত স্ত্রী-প্রগতির চূড়ান্ত অতিরঞ্জন হইয়াছে 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রহসনে। তাঁহার উপহাসের দ্বিতীয় লক্ষ্য পাশ্চাত্য ভাবচালিত নব্য যুবকবৃন্দ, যাহারা স্বদেশী আন্দোলন, ভোট, স্বায়ত্তশাসন, সমাজসংস্কার প্রভৃতি লইয়া মত্ত থাকিলেও আসলে নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য উন্মার্গগামী অধঃপতিত সমাজের দৃষ্টান্ত। লেখকের মতে অধুনা যে সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হইতেছে তাহাদের মূল্য এবং উপযোগিতা কিছুই নাই। বার বার সমাজের একই ধরণের নর নারীর চিত্র আঁকিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রহসনে একই রকম পাত্রপাত্রী ও ঘটনার পুনরাবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অমৃতলাল অধঃপতিত সমাজের বিষয় বর্ণনা করিলেও তাঁহার প্রহসনে যৌনবিকৃতি এবং অশ্লীল ব্যাপারের অবতারণা লক্ষ্য করা যায় না। নব্যতন্ত্রী সমাজের সব দোষ দেখাইলেও এই দিকটা তিনি দেখান নাই। একমাত্র 'চোরের উপর বাটপাড়ি' ছাড়া অন্য কোনো প্রহসনে গর্হিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না।

অমৃতলালের প্রহসনে Wit এবং Pun-এর যথেষ্ট প্রাচুর্য রহিয়াছে।১ অনেক সময়েই লেখক শাণিত কথার বিদ্যুৎ দীপ্তিতে আমাদিগের বিস্মিত এবং হতভম্ব করিয়া দেন। শব্দের ধ্বনি বৈচিত্র্যের সহিত গূঢ় ব্যঞ্জনার এমন সাদৃশ্য বহু স্থলে দেখা গিয়াছে যাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। শব্দ ভাণ্ডারের উপর অবিচল অধিকার এবং নানা বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান না থাকিলে শব্দের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা যায় না। লেখকের তাহা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল বলিয়া তাঁহার সংলাপ বিদগ্ধ রসিক সমাজের কাছে বিশেষ প্রীতিপ্রদ ও রুচিকর হইয়া

* অমৃতলালের ইংরাজী সংলাপের মধ্যেও অনেক স্থলে শ্লেষ এবং অনুপ্রাসের অদ্ভুত চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

And have you condistanted to confirm the inestimable grass of honourable honour on this City of palaces and policies? This sanitarium of stables and statues? On this Town of Taxes and Taxicabs? of Rates and Rats, of Riches and Ditches, of Rupees and রূপসীজ—'

'খাসদখল'—'পূর্বরঙ্গ'।

উঠিয়াছে। তাঁহার রচনার সরসতার মূলে এই রসাল কথার মারপ্যাঁচ রহিয়াছে, ঘটনা কি কাহিনীর গভীর প্রদেশ হইতে ইহা উৎসারিত হয় নাই।

অমৃতলালের লেখায় গানের বাহুল্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। থিয়েটারের অভিজ্ঞতায় বাঙালী দর্শকের চাহিদা তিনি জানিতেন, এবং সেই অনুসারেই তিনি এতো অধিক গীত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মাঝে মাঝে ছড়ার আকারে পদ্য রচনাও আছে। গান এবং ছড়া রচনার সরসতা বৃদ্ধি করিবার জন্যই ব্যবহার করা হইয়াছে।

## (খ) প্রহসন

অমৃতলালের প্রহসনগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—১। বিদ্রূপাত্মক প্রহসন (Satire) এবং ২। বিশুদ্ধ প্রহসন (Farce)। বিশুদ্ধ প্রহসনগুলির সংখ্যা খুবই কম, এবং 'তাজ্জব ব্যাপার' ও 'কৃপণের ধন' ব্যতীত অন্য কোনোখানিই প্রসিদ্ধ নহে। বিদ্রূপাত্মক প্রহসনগুলি প্রথমে আমরা আলোচনা করিব।

॥ বিবাহ বিভ্রাট (১৮৮৪) ॥ 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'সম্মতি-সঙ্কট', 'কালাপানি', 'বাবু', 'একাকার', 'বৌমা', 'গ্রাম্যবিভ্রাট', 'বাহবা বাতিক', 'খাসদখল'—এই কয়খানা প্রহসনের বিষয়বস্তু এবং পাত্রপাত্রী প্রায় একই ধরণের, এবং এইগুলির মধ্যে লেখকের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। 'বিবাহ-বিভ্রাট' অমৃতলালের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ প্রহসন। এই বইখানা লিখিয়াই প্রহসনকাররূপে তাঁহার নাম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কাহিনীর মধ্যে তেমন জটিলতা কিছুই নাই, কেবল নন্দের দ্বারা গোপীনাথকে প্রতারণার মধ্যে যে irony আছে তাহাই উপভোগ্য। বিজাতীয় ভাবাপন্ন নব্য সমাজ এবং পুত্রের বিবাহে পণ আদায় করিবার অসঙ্গত জুলুম–এই দুইটী বিষয়ের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে। ব্যঙ্গাত্মক প্রহসনে সাধারণত কোনো অন্যায়ের জন্য অপরাধী ব্যক্তিকে বেয়াকুব ও নাকাল করিয়া হাস্যরসের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আলোচ্য প্রহসনের শেষে গোপীনাথ এইভাবে জব্দ হইয়া শিক্ষালাভ করিল, কিন্তু নন্দের স্বভাব পরিবর্তিত হইল না। প্রহসনকার গোপীনাথকে শাস্তি দিয়া তাহার সহিত আপোষ করিয়া লইলেন, কিন্তু নন্দলালের অপরাধ বাঁচাইয়া রাখিয়া গেলেন, তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। শিক্ষিতা স্ত্রী বিলাসিনী কারফরমা জাতীয় চরিত্র গ্রন্থকারের আঘাতের অতি কাম্য পাত্রী। বিলাসিনী আলোকপ্রাপ্তা মহিলা, পরপুরুষের সহিত তাহার অবাধ সংসর্গ, তাহার স্বামী মসলা পেষে, খানা পাকায়। এই রকম অস্বাভাবিক বৃত্তিবিপর্যয়ের চরম দৃষ্টান্ত পরে 'তাজ্জব ব্যাপারে' দেখান হইয়াছে। মিষ্টার সিংএর কথা শুনিয়া তাহার প্রতি আমাদের বিরাগ সঞ্জাত হইলেও তাহার কথার মধ্যে বেশ একটা ঝলসানো প্রখরতা আছে যাহা চমৎকারিত্ব উৎপাদন করে। প্রহসনের মধ্যে ঝিকে অত্যধিকবার আনা হইয়াছে। সর্বত্র, সকলের মধ্যেই সে আছে। গোপানাথ, নন্দলাল, মিষ্টার সিং, বিলাসিনী—

ইহাদের ভিতরকার ব্যাপার, ইহাদের আসল চরিত্র ঝি-এর দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ঝি লেখকের মন্তব্য এবং দর্শকের মানসিক প্রতিক্রিয়ার ভাষা জোগাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অকারণ সংস্থান এবং অসঙ্গত কথাবার্তা সর্বত্র স্বাভাবিক হয় নাই।

বাল্যবিবাহ নিরোধ করিবার জন্য যে আন্দোলন হইয়াছিল তাহা নিন্দা করিয়া সম্মতি-সঙ্কট' রচিত হইয়াছিল। প্রহসনখানা উদ্দেশ্য মূলক কথোপকথনের মধ্যে লেখকের মত অত্যন্ত স্পষ্ট। কাহিনী বলিতে ইহার মধ্যে কিছুই নাই এবং দৃশ্যগুলিও নিতান্ত অসংলগ্ন। একমাত্র অধ্যাপকদের দৃশ্য ব্যতীত কোথাও কৌতুক-রসের কিছুই নাই। নব্য যুবকদের বিলাত যাওয়ার নেশা এবং হুজুগমত্ততা লইয়া 'কালাপানি' (১৮৯৩) লিখিত। 'হিন্দু মতে বিলাত যাত্রা' এই নামটার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রহিয়াছে। আধুনিক অনেক পহশ্চাত্যবিলাসী লোক মনে প্রাণে, কর্মে এবং আচরণে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইলেও বাহিরে হিন্দুয়ানির একটা ঠাঠ বজায় রাখিতে চান বাস্তবিক তাহা যে 'নামাবলীর প্যাণ্টালুনের' মতই হাস্যকর অসঙ্গতিপূর্ণ লেখক তাহা দেখাইতে চাহিয়াছেন। এই নব্য হিন্দুয়ানিও আসলে একটা নবতন হুজুগ ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং একটা না একটা হুজুগে মাতিয়া উঠাই আধুনিক যুবক সমাজের ধর্ম। নিনকড়ি ভিখারী দমনের হুজুগ তুলিয়া দিল বলিয়াই বিলাত যাওয়ার হুজুগটা আপাতত মুলতুবী রহিল। অমৃতলালের অধিকাংশ প্রহসনের ন্যায় এই প্রহসনের মধ্যেও অবান্তর দৃশ্য ও অপ্রয়োজনীয় নরনারীর 'অবণাগবণ' বড়ো বেশি, খামোকা বিচিত্র নরনারী বার বার আসিযা গীত আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এই রকম সংক্ষিপ্ত একখানা প্রহসনেও ১২।১৩ খানি গীত রহিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে হাস্যরসাত্মক ভূমিকা পণ্ডিতের অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইংরাজী বিশেষ কৌতুকপূর্ণ—'রাউণ্ড গুডস ডু ন গোলমাল করো না'। এই রকম সরস ইংরাজী পণ্ডিতের মুখে আমরা অনেক শুনিয়াছি।

॥ বাবু ( ১৮৯৪ ॥ 'বাবু' প্রহসনে কাহিনীর কোনো অবিচ্ছিন্ন গতি নাই। ষষ্ঠীকৃষ্ণ, সজনীকান্ত ও বাঞ্ছারাম কন্দর্প এবং আজিনা, স্কুলের ছেলেরা প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন ভাবে এক একটি দৃশ্যে সমাগত হইয়াছে। কেবল শেষ দৃশ্যে সব চরিত্রকে একত্রিত করা হইয়াছে, এবং 'সেলার' ঘটিত দৃশ্যের মধ্যে হাস্যরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পূর্বে হাসি ফুটিতে পারে নাই, আঘাতের পরে আঘাতে হাসিকে ম্রিয়মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অমৃতলালের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এখানে স্নধু কঠোর নয়, হিংস্র, ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না। তাঁহার পরিহাসের কথা বিস্ফোরকের টুকরার ন্যায় প্রবল বেগে ছুটিয়া লক্ষ্য বস্তুতে বিঁধিয়াছে। লেখক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সংস্কার-পন্থী ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন উভয় বিষয়ের বিকৃত এবং আসল মর্ম উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। ষষ্ঠীকৃষ্ণ বড়ো বক্তৃতার মধ্য দিয়া জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম ছড়াইলেও, আসলে সে অনুকরণ-প্রিয়, আত্মসর্বস্ব দাম্ভিক ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাহার "স্বাধীনতা আন্দোলনের অর্থ স্কুলের অপরিপক্ক ছাত্রের মস্তকচর্বণ এবং নারী প্রগতির অর্থ স্ত্রীর প্রতি অযাচিত অনুগ্রহ এবং মার প্রতি অকারণ নিগ্রহ। সজনীকান্ত, বাঞ্ছারাম, দামোদর, কন্দর্প প্রভৃতি চরিত্রকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ অঙ্কন করিয়া অতি নির্দয় ভাবে ব্যঙ্গ করা

হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজ এককালে শিক্ষিত লোকের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হইলেও কালক্রমে হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ইহার প্রভাব এবং প্রতিপত্তি কমিতে থাকে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে কৃত্রিমতা এবং আতিশয্য ছিল, কিন্তু ইহা যে হিন্দুধর্ম ও সমাজের অনেক কুপ্রথা এবং কুসংস্কার দূর করিতে সহায়ক হইয়াছিল সেই বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। ব্রাহ্মদের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার আন্দোলন চালিত হইয়াছিল সেইগুলি সম্বন্ধেও আলোচ্য গ্রন্থমধ্যে উপহাস করা হইয়াছে। অশ্লীল বলিয়া পিতার নাম উচ্চারণ করিতে সংকোচ, এবং চিত্তবিকারের ভয়ে চোখ বাঁধিয়া বহির্গমনের মধ্যে সরস অতিরঞ্জন আছে। কিন্তু স্ত্রীর প্রথম বিবাহজাত সন্তানের 'ছোট বাবা' 'ছোট বাবা' বলিয়া ডাকা, স্ত্রীকে বার বার ভগিনী বলিয়া সম্বোধন এবং মাতামহীকে পুনর্বিবাহ দিবার সংকল্পের মধ্যে শালীনতার সীমা অতিক্রম করা হইয়াছে। তিনকড়ি এবং ফটিক গ্রন্থকারের মুখপাত্র, তাঁহার কটূক্তিগুলি ইহাদের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। ইহাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই।

॥ একাকার (১৮৯৫) ॥ হিন্দু সমাজের জাতিভেদের উৎপত্তিমূলে হয়তো স্বধু কর্মবিভাগ ছিল, হয়তো সমাজের স্নুবিধার জন্যই প্রথমে শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বৃত্তি যখন বংশগত হইয়া উঠিল, এবং একশ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর সকল যোগাযোগ রহিত হইয়া আসিল, তখন হইতে সমাজের উন্নতি এবং বর্ধিষ্ণুতা রুদ্ধ হইয়া গেল। সামাজিক ভেদাভেদ দূর করিতে না পারিলে হিন্দুসমাজের উন্নতির আশা নাই, এ কথা প্রত্যেক দেশহিতৈষী এবং সমাজতত্ত্ববিদ বলিয়া থাকেন। কিন্তু অমৃতলাল এই একাকার সমর্থন করেন না, যার যা সনাতন ব্যবসা তার তাই নিয়া থাকা উচিত, এবং কেবল বর্ণ অনুসারেই সামাজিক মান এবং মর্যাদা নির্ণীত হওয়া সঙ্গত ইহাই লেখকের বক্তব্য। কলু এবং ধোপার পক্ষে জাত ব্যবসা ছাড়িয়া অফিসের বড়বাবু এবং মুন্সেফ হওয়া অশোভন, অসঙ্গত এবং হাস্যকর, 'একাকার' প্রহসনে তাহাই দেখানো হইয়াছে।১ এই প্রহসন খানার মধ্যে কেবল হুলের খোঁচা, মধু একবিন্দুও নাই। কাহিনী বলিতে কিছুই নাই, এক দৃশ্যের সহিত অন্য দৃশ্যের কোনই যোগ নাই।

॥ বৌমা ( ১৮৯৭ ) ॥ নব্য তরুণ-তরুণী এবং ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ 'বৌমা' প্রহসনেও আছে, তবে ইহাতে সরস কৌতুকের স্নিগ্ধতায় ব্যঙ্গের আঘাত উগ্র হইয়া উঠিতে পারে নাই। হিড়িম্বা এবং তাহার অনুগত স্বামী বামাদাসের চিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া উপহাস করিবার জন্যই দেখানো হইয়াছে, উহারা না থাকিলেও প্রহসনের মূলধারার কোন হানি হইত না। ব্রাহ্ম ধর্মের ভ্রাতা ভগিনী সম্বোধন লইয়া এখানেও পরিহাস করা হইয়াছে। নভেল পড়া

১। লেখকের মুখপাত্র রাধানাথ বলিয়াছে, 'কিন্তু বংশগত জাতিভেদের বন্দোবস্ত ভারী পাকা, ভারী কায়েমী, এই জাতিভেদই সাম্য।'

১ম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রোমান্সময়ী রমণী গৃহস্থঘরে কি অপরূপ বিপর্যয় ঘটাইয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত বৌমা কিশোরী। কিশোরী অথবা উলাঙ্গিনী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু' প্রহসনের হেমাঙ্গিনীর ন্যায় বঙ্কিমের নভেলগুলি পড়িয়া নিজেকেও একজন নায়িকা মনে করে, এবং নভেলী নায়িকাদের মত সেও সংসার-সম্পর্ক ছিন্না প্রণয়-সর্বস্বা হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর গ্রেফতারে তাহার রোমান্টিক অভিনয়ের পরম সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং নিতান্ত নাটকীয় ধরণে যখন সে সখীদের লইয়া 'জ্বল জ্বল চিতা' প্রভৃতি বিখ্যাত স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল তখন তাহা বিশেষ হাস্যকৌতুকপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের বিদ্রূপের উদ্দেশ্য আধুনিক মতে স্বামী-স্ত্রীর যে নাটুকে প্রণয় দেখা যায় তাহা তিনি অপছন্দ করেন তিনি সনাতন মতে স্বামী-সেবা স্বামী-ভক্তিই স্ত্রীর কর্তব্য বলিয়া মনে করেন।১ প্রহসনের শেষে মতিলালের দীর্ঘ বক্তৃতায় যে হঠাৎ কিশোরী ও সখীদের শিক্ষা হইল তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়না। মতিলাল বরাবর বাবুরাম ও কিশোরী প্রভৃতিকে ভৎ'সনা করিয়া আসিয়াছে এবং তাহারা সমান অবজ্ঞার সহিত তাহা গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার উপদেশাত্মক শেষ বক্তৃতা যে তাহারা শিরোধার্য করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইবে তাহা অস্বাভাবিক। মতিলালের কঠোর উপদেশ এবং কটু তিরস্কার প্রহসনের কৌতুকাবহ রসের মধ্যে বিরক্তিকর হইয়াছে।

মিউনিসিপাল শাসনকে ব্যঙ্গ করিয়া 'গ্রামাবিভ্রাট' (১৮৯৮) ও 'সাবাস আটাশ' (১৯০০) রচিত হইয়াছে। 'বাহবা বাতিকে'র মধ্যে দরখাস্ত এবং আবেদন নিবেদনের মধ্য দিয়া আধুনিক যুবক যুবতীর সংকল্প সিদ্ধ করার চেষ্টাকে উপহাস করা হইয়াছে।

আধুনিক সমাজ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া অমৃতলালের যে প্রহসনগুলি রচিত হইয়াছিল উপরে তাহাদের আলোচনা করা হইল। ঐগুলি ছাড়া বিভিন্ন বিষয় লইয়া আরও কয়েকখানা অপ্রধান বিদ্রূপাত্মক প্রহসন আছে, যথা, 'তিলদর্পণ,' 'রাজা বাহাদুর' এবং 'অবতার'। 'তিলদর্পণে' (১৮৮১) অমৃতলাল তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের যবনিকার অন্তরালে যে সমস্ত ব্যাপার ঘটিত তাহার সরস চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ঐতিহাসিক অসংলগ্নতা এবং সস্তায় বাজি মাত করিবার যে সব সুলভ উপকরণ লইয়া অনেক ঐতিহাসিক এবং রোমান্টিক নাটক লেখা হইত লেখক সেই সব নাটককে হাস্যাস্পদ করিয়া উপস্থাপন করিয়াছেন।২ বাপ্পারাও এবং আলিবর্দিখাঁকে এক সময়ে আনিয়া 'তিলদর্পণে'র গ্রন্থকার

১। লেখকের প্রতিনিধি মতিলালের উপদেশ উল্লেখযোগ্য—"প্রণয়, প্রণয়"—রমণী জন্ম কি কেবল বুকে মাথা রেখে শুতে—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে আর ঈর্ষায় জ্বলতে? শেখাতে পার নি যে পতিকে ভক্তি করতে হয়, দাসী হ'য়ে তাঁকে নিজের বশীভূত করতে হয়'।

দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

২। 'তিল-তর্পণে'র গ্রন্থকার তাঁহার নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'এখানি হচ্ছে Farcical Tragi-Comedy de Pantomimic Operctta......এতে Wit আছে, Humour, চিতোর, Blank verse আছে। নাচ, গান, গালাগাল, ভারত, যবন, মূর্চ্ছা, কালিওড়ান, ভুত নাবান, চিতোর, সাহেব মারা সব আছে, অশ্লীল নাই।'

যে রকম অদ্ভুত ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন সেই রকম দৃষ্টান্ত তখনকার অনেক নাট্যকারদের মধ্যেই দেখা যাইত। এককালে ঐতিহাসিক নাটকের বন্যায় রঙ্গভূমি প্লাবিত হইয়াছিল, সেই সব নাটকের অধিকাংশই যে অনৈতিহাসিক, অসংলগ্ন, বিকৃত এবং দোষগ্রস্ত ছিল অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' নামক গ্রন্থে সেই বিষয় নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য নাটকের যে সব দোষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সব দোষ অল্প পরিমাণে আমাদের নাট্যকার স্বয়ং অমৃতলালের মধ্যেও আছে। পাড়াগেঁয়ে মূর্খ ক্ষুদে জমিদার রাজাবাহাদুর উপাধি পাইবার জন্য কিভাবে নাকাল ও বেয়াকুব বনিয়াছে তাহার রঙ্গপূর্ণ চিত্র 'রাজাবাহাদুর' (১৮৯১) প্রহসনে দেখানো হইয়াছে। মাণিক্য এবং তাহার পিতা মাণিক্যের পূর্ববঙ্গীয় কথোপকথন বিশেষ সরস ও উপভোগ্য। এই প্রহসনখানা পড়িলে অনেক খেতাবপ্রার্থী অপদার্থ লোকের চৈতন্য হওয়ার সম্ভাবনা। 'অবতার' (১৯০২) বহু অবান্তর দৃশ্যসমন্বিত বিরক্তিকর প্রহসন। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙ্গরস এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অম্লমধুর উপাদান থাকিলেও সুনিপুণ রন্ধনের সুস্বাদু আস্বাদ নাই। অবতার ভূমিকায় নকল বৈষ্ণবকে উপহাস করা হইয়াছে।

'চোরের উপর বাটপাড়ি', 'ডিসমিস', 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে', 'তাজ্জব ব্যাপার' এবং 'কৃপণের ধন'—এই প্রহসনগুলিকে বিশুদ্ধ প্রহসন (Farce) বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন স্থলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আঘাত আছে বটে, কিন্তু সেই আঘাত কখনো পীড়াদায়ক নয়, স্নিগ্ধ হাস্যরসেই ইহাদিগকে সরস ও সজীব করিয়া রাখিয়াছে। উগ্র শ্লেষ এবং উচ্চ উপদেশের ঘটা না থাকাতে এই সমস্ত প্রহসন দর্শনে কোথাও বিরক্তি ও অসন্তোষ জন্মিতে পারে না। বিদ্রূপাত্মক প্রহসনগুলির কোন খানাতেও তেমন রসাল, জটিল কাহিনী নাই, কিন্তু এই প্রহসনগুলির প্রত্যেকখানাতে ঘটনার বৈচিত্র্য এবং চমৎকারিত্ব বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক।

॥ চোরের উপর বাটপাড়ি (১৮৭৬)॥ একজন দুশ্চরিত্র বিষয়ী ব্যক্তি এক বেকার যুবকের দ্বারা কোনো ভদ্র স্ত্রীলোককে ফুসলাইতে যাইয়া কিভাবে জব্দ হইল, এবং তাহার নিযুক্ত ব্যক্তি তাহারই স্ত্রীকে ফুসলাইয়া বসিল সেই বিষয় লইয়া 'চোরের উপর বাটপাড়ি' রচিত। প্রহসনখানার ঘটনার সরস জটিলতা এবং রুচি-গর্হিতি পাশ্চাত্য প্রহসন বিশেষ করিয়া মলিয়েরের প্রহসনের সম্ভাব্য প্রভাব মনে জাগাইয়া দেয়। আলোচ্য প্রহসনের মধ্যে কৌতুকের চমৎকারিত্ব এইখানে যে, নারায়ণ অঘোরের কাছে 'রসোদ্‌গার' করিয়াছে, অথচ অঘোর তাহাকে ধরিতে যাইয়া প্রতিবারই ব্যর্থ এবং বেয়াকুব হইয়াছে। মলিয়েরের 'The School for Wives', (L'Ecole drs Femmes) প্রহসনে ঠিক এইরূপ একটি ব্যাপার আছে। Agnesএর প্রেমিক Horace তাহার গূঢ় প্রেমের কথা বার বার তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী Agnesএর পালয়িতা প্রেমপ্রার্থী Arnolph এর কাছে বলা সত্ত্বেও Arnolph প্রতিবার Horaceকে ধরিতে

ও শান্তি দিতে বিফল হইয়াছে। আলোচ্য প্রহসনখানাতে স্বল্প পরিসরের মধ্যে কৌতুকরস বেশ জমাট হইয়া উঠিয়াছে।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অমূলক সন্দেহ এবং কৌতুকময় ঘটনার মধ্য দিয়া সেই সন্দেহের নিরসন 'ডিসমিস'(১৮৮৩) প্রহসনের কাহিনীর ভিত্তি। এই প্রহসনের সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র সাদৃশ্য আছে। তবে ইহাতে ঘটনার বুনন ভালো হয় নাই, অনেক বাজে ব্যাপারের সমাবেশ রহিয়াছে।

॥ চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে ( ১৮৮৪ )॥ একটীমাত্র দৃশ্য লইয়া 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে' রচিত হইলেও, ইহারই মধ্যে একটা সরস বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু কাহিনীটি খুব সম্ভবত লেখকের মৌলিক কল্পনা-প্রসূত নহে। ইংরাজী সাহিত্যে Sir F. Burnadএর 'Cox and Box' এবং J. M. Mortonএর Box and Cox' নামে দুইখানা প্রহসন আছে। ঐ প্রহসন দুইখানার বিষয় একই। Mrs Bouncer Box এবং Coxকে একই ঘর ভাড়া দেয়, উহাদের একজন দিনের বেলায় এবং অপরজন রাত্রিতে সেই ঘরে থাকে। Cox একদিন ছুটী পাইয়া ফিরিয়া আসাতে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। দুইজনে আবিষ্কার করে যে উভয়ে একই বিধবাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে। যাহা হউক গোলমাল এবং রাগারাগির পরে উভয়ের মিলন হয়। 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে'র কাহিনী অবিকল উপরিউক্ত কাহিনীর অনুরূপ। লেখকের সংলাপের মধ্যে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব আছে।

॥ তাজ্জব ব্যাপার ( ১৮৯০ )॥ 'তাজ্জব ব্যাপারে'র মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া চরম পরিহাস করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঘটনার আত্যন্তিক উদ্ভটত্ব প্রহসনের মধ্যে ব্যঙ্গ অপেক্ষা রঙ্গকেই প্রধান করিয়া তুলিয়াছে। যখন আমরা দেখি যে পুরুষেরা মেয়েদের কাজ, এবং মেয়েরা পুরুষদের কাজ বেশ সহজ গাম্ভীর্যের সহিত করিতেছে, তখন আমাদের হাস্যরস সম্বরণ করা শক্ত হইয়া পড়ে। মহিলাদের সভার বর্ণনাটীও খুব কৌতুকাবহ হইয়াছে।

॥ কৃপণের ধন ( ১৯০০ )॥ 'কৃপণের ধন' মলিয়েরের 'The Miser' ( L'Avare ) নামক প্রহসনের দ্বারা প্রভাবান্বিত। মলিয়েরের প্রহসনে Harpagonএর কার্পণ্য-দোষের সহিত তাহার ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা দেখানো হইয়াছে, এবং পরস্পর-সংযুক্ত জটিল প্রেম কাহিনীও সেই সঙ্গে রহিয়াছে। 'কৃপণের ধনে'ও হলধরের কার্পণ্য এবং নারীসম্পর্কিত দুর্বলতা— এই দুই প্রকার দোষ বিদ্যমান এবং মন্মথ ও কুন্তলার প্রণয় ব্যাপার হলধরের কাহিনীর সহিত যুক্ত হইয়া আছে। মধু এবং ইচ্ছা ষড়যন্ত্র করিয়া হলধরকে সম্পত্তিশালিনী বিধবার কথা বলিয়া জব্দ করিত মতলব করিল। হলধর যদি ঐ বিধবাকে হাত করিতে যাইয়া বেয়াকুব এবং অপদস্ত হইত তবেই তাহার অন্যায় লোভের যথোপযুক্ত সাজা হইত। কিন্তু টাকা স্লেনা করিবার আর একটী ব্যাপার আনিয়া তাহাকে জব্দ করা হইল। ইহাতে পূর্বের ষড়যন্ত্র এবং হলধরের নারী আসক্তি চাপা পড়িয়া অর্থহীন হইয়াছে। হলধরের কার্পণ্য দোষের পরিণাম দেখিলাম; কিন্তু তাহার চরিত্রের অপর দোষটীর কোনো সমাধান দেখিলাম না। যে কৃপণ

একসঙ্গে পাঁচ টাকা বাহির করিতে মর্মান্তিক ক্লেশ বোধ করে,১ তাহার পক্ষে কল্পনা করিয়াও লক্ষ হাজার টাকা অন্যের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়াটা যেন কেমন অস্বাভাবিক বোধ হয়।

## (গ) নাটক

অমৃতলালের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হাস্যরসের অবতারণায়, গম্ভীর বিষয়ের বর্ণনায় নহে। সেইজন্য তাঁহার নাটকগুলি একেবারেই বিশেষত্ব-বর্জিত সাধারণ স্তরের। 'খাসদখল' এবং 'নবযৌবন' এই দুইখানা পুস্তক নাটক হইলেও হাস্যরসের অতি মধুর, কোমল এবং স্নিগ্ধ ধারা নাটক দুইখানাকে সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে, অথচ প্রহসনও ইহাদিগকে বলা চলে না; কারণ ইহাদের আয়তন দীর্ঘ এবং কাহিনী রোমান্টিক ভাবাপন্ন। ইংরাজীতে যে শ্রেণীর নাটককে 'Comedy of Romance' বলা হইয়া থাকে, আলোচ্য নাটক দুইখানা সেই শ্রেণীভুক্ত। এই ধরণের কমেডির আবেদন মনের গভীর অনুভূতিময় প্রদেশে এবং ইহাদের অন্তর্গত হাস্যরস সর্বত্র চাপা এবং মৃদুভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে।২ 'খাসদখল' এবং 'নবযৌবন' অমৃতলালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

॥খাসদখল (১৯১২)॥ 'খাসদখলে'র মধ্যে সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থাকিলেও ইহাতে কাহিনীর আগ্রহোদ্দীপকতা ও চমৎকারিত্ব অক্ষুণ্ণভাবে গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত অটুট রহিয়াছে। মোক্ষদা অনেকাংশে 'বৌমা' প্রহসনের কিশোরীর সদৃশ, ঘরের বৌ লেখাপড়া শিখিয়া এক কিম্ভূত রোমান্টিক প্রকৃতি আয়ত্ত করে—মোক্ষদা তাহারই উদাহরণ। লোকেন এবং মোক্ষদার কাহিনী অবলম্বন করিয়া লেখক বিধবা বিবাহ এবং চিকিৎসকের সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু মোক্ষদার কাহিনীর পাশে কুসুমকোমলা গিরিবালার রহস্যময় আখ্যান মৃদু সৌরভের মত অগোচরে প্রাণে আনন্দের সঞ্চার করে। বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি বিতর্কমূলক বিষয় লইয়া যেভাবে অপ্রীতিকর গ্লানির বাষ্প সঞ্চিত হইতেছিল লোকেনের আকস্মিক আগমনে পরম পরিতোষের ঝড়ে তাহা উড়িয়া গিয়াছে। প্রভুভক্ত, পাগলাটে নিতাইএর চরিত্র উপভোগ্য বটে, তবে তাহার 'ইজদি'র অতিরিক্ত আধিক্য অত্যন্ত কর্ণকটু হইয়াছে।

---

১। ইচ্ছাকে পাঁচ টাকা দিবার সময় হলধর মনের দুঃখে নিরুপায় হইয়া যাহা বলিয়াছে তাহা বিশেষ কৌতুকপূর্ণ—'দেখছেন, কাঁদছেন—মা কাঁদছেন, আমার সিন্দুক ছেড়ে যেতে মহারাণীমার চক্ষু দুটী দিয়ে জল গড়িয়ে টাকা চাঁদের বুক ভেসে যাচ্ছে।'

২। 'All of these Comedies of Romance are full of appeals to our meditative faculties and to our emotions. The laughter is subded into a kind of feeling of contentment, a happiness of spirit rather than an ebullition of outward merriment. Wherever the laughter is called forth it is immediately stilled or crushed out of existence by some other appeal.

*The Theory of Drama by Nicoll, P. 216-17.*

ঠাকুরদা লেখকের মুখপাত্র হইলেও তিনি রূঢ় এবং কঠোর নহেন, তাঁহার ক্ষমাশীল মহত্ব সর্বত্র অনুভূত হইয়াছে। এই ধরণের ঠাকুরদা চরিত্র রবীন্দ্রনাথের নাটকে বিশিষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

॥ নবযৌবন ( ১৯১৪ ) ॥ 'নবযৌবন' উচ্ছল প্রাণময় সরস কৌতুকোজ্জ্বল কমেডি। ইহাতে মধুর প্রণয়লীলার কোমল বারিপ্রবাহের উপর বিদগ্ধ এবং বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের আলোকসম্পাত হওয়াতে বিশেষ চমৎকারিত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। কাহিনীর রহস্যময়তা শেষপর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া লেখক আমাদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য অবিচলিতভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। দুইটী অভিন্নমুখী ধারা এই নাটকের কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছে। জটিল আখ্যান বস্তুর মধ্যে যদি ঘটনা সমূহের গতি একই দিকে থাকে .তবে সেই গতিকে নাটকীয় ভাষায় 'Similar Motion' বলা হইয়া থাকে। অলকা এবং সুকুমারের প্রণয় ব্যাপার পরস্পরের সহযোগীরূপে একইভাবে অগ্রসর হইয়াছে। Portiaর পাশে Nerissaর প্রেম এবং Rosalindএর পাশে Celiaর প্রেম এইরূপ পরস্পর-সম্পৃক্ত এবং সহযোগী। অলকা এবং সুকুমার শেকসপীয়রের Portia, Rosalind প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাদের ন্যায় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যময়ী, সুচতুরা রমণী। বসন্ত এবং অলকার কথার মধ্যে সুপ্রখর বুদ্ধি এবং সুমধুর রসের খেলা বিশেষ চিত্তচমৎকারী হইয়াছে। মূর্খ, নির্বোধ অথচ দাম্ভিক দর্পনারায়ণ এবং তাহার যোগ্য মোসাহেব ভজনলালের চরিত্র স্থূল হাস্যকৌতুকের সৃষ্টি করিয়াছে। নাটকের সঙ্গীত এবং সংস্কৃত শ্লোকগুলি ইহার বর্ণিত জগৎ এবং জীবনকে এক রোমান্টিক ভাবময় পরশে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

॥ তরুবালা ( ১৮৯১ ) ॥ 'তরুবালা' সরস সামাজিক নাটক। লেখকের স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকরসে বইখানা আগাগোড়া অভিষিক্ত থাকায় ইহা বিশেষ সুখপাঠ্য হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়ের রসিকতা, হারাণের দুঃসহ প্রণয়জ্বালা, বেণী এবং দামিনীর সরস কলহ এবং মাতাল বিহারীর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ নাটকখানার সর্বজনীন হাস্যরসের সম্মিলিত ধারা সৃষ্টি করিয়াছে। অখিল অনেক নভেলপড়া বিদ্যা অর্জন করিয়া পবিত্র প্রণয় করিবার জন্য স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছে, স্ত্রীকে ভালোবাসা সে ব্যভিচার বলিয়া মনে করে—এই ব্যাপারের মধ্যে তাহার যে অসংগতি ও নির্বুদ্ধিতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাও বিশেষ হাস্যাবহ। শিক্ষিতা পতিতা পারুল এবং তাহার মাতার বাহ্য ভদ্রতার খোলসের সহিত আন্তর কদর্যতার বৈষম্য দর্শন করিয়াও আমরা যথেষ্ট আমোদ পাই। 'তরুবালা'র মধ্যে বিধবা-বিবাহ সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার বহুবার-জ্ঞাপিত অভিমত পুনরায় আমাদের শুনাইয়াছেন। শান্ত তাঁহার মতে বিধবা-শিরোমণি। সে কৃচ্ছ্রতা এবং ব্রহ্মচর্যের তাপে দেহকে শুষ্ক করিয়া এক আধ্যাত্মিক বাষ্পে পরিণত করিতে চাহিয়াছে, ভাসুরের নাম ধরিতে হয় বলিয়া কালীসিংহের মহাভারতকে ফালীসিংহের মহাভারত পর্যন্ত বলিয়া থাকে। অতিবৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় তৃতীয়বার বিবাহ করা সত্ত্বেও বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রমাফিক ফতোয়া দিয়া

থাকেন—ইহাতে অন্যায় কিংবা অসংগতি কিছুই নাই! মৃত্যুঞ্জয়কে সুরসিক এবং উপযুক্ত স্বামী দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার স্ত্রীর সহিত তাঁহার নর্ম-পরিহাসের আলাপ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন যাহা নাতনীর সহিত করিলেই শোভন এবং সংগত হইত। 'তরুবালা' গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্লর ন্যায় আদর্শ পতিব্রতা স্ত্রী কিন্তু নাটকের মধ্যে তাহার প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতা নিতান্ত নগণ্য এবং অনুল্লেখ্য।

'বিমাতা' বা 'বিজয় বসন্ত' (১৮৯৩) রূপকথার কাহিনীর উপরে ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। কামান্ধা প্রতিহিংসাময়ী বিমাতা দুর্জয়ময়ীর চরিত্র তীব্র বাস্তবতাপূর্ণ। সপত্নী পুত্রের প্রতি তাহার নগ্ন প্রেম নিবেদন সম্ভবত গিরিশচন্দ্রের 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকের প্রভাবে রচিত। রাজার সুগভীর মনস্তাপ ও অন্তর্জ্বালার দৃশ্যও ভালোভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। বিজয় ও বসন্তের শিক্ষাদাতা বাৎসল্যপূর্ণ বলবন্ত বর্মার পক্ষে অকস্মাৎ ঘাতকের কঠোরতা আয়ত্ত করা অসংলগ্ন বোধ হয়।

'আদর্শ বন্ধু' (১৯০০) গিরিশচন্দ্রের আদর্শে রচিত নাটক। অমৃতলাল ইহাতে গৈরিশ ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাট্যগুরুকে অনুকরণ করিতে যাইয়া তিনি এক অতি বিকৃত, কৃত্রিম এবং হাস্যকর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। চটসাঁইএর ভূমিকার উপরেও গিরিশ-চন্দ্রের বিদূষক জাতীয় চরিত্রের অতি সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের ন্যায় সেও ইতর ভাষায় গূঢ় ব্যঞ্জনাময় ভাব প্রকাশ করে। আলোচ্য নাটকের কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় উদ্বেগ ও গতি সঞ্চার করিবার সুযোগ ছিল কিন্তু সংলাপের দুর্বলতায় কিছুই সুপরি-ব্যক্ত হয় নাই। মাঝে মাঝে ষ্টেজ-মাতানো সস্তা বীররস ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে। দিন-করের ছুরিকা আক্রমণের ব্যাপারটা যেন নেহাত জোর করিয়া আনা হইয়াছে। ইহার পিছনে কোন গভীর উদ্দেশ্যজাত প্রেরণা নাই। ক্ষণিক উত্তেজনাপ্রসূত ঘটনাকে কাহিনীর মূল নিয়ামক করিয়া দেখানো সঙ্গত হয় নাই।

'হরিশচন্দ্র' এবং 'যাজ্ঞসেনী'—এই দুইখানা অমৃতলালের পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক। হরিশচন্দ্রের কাহিনী লইয়া বাংলা সাহিত্যে অনেকগুলি নাটক রচিত হইয়াছে। মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের সমালোচনা আমরা করিয়াছি। অমৃতলালের নাটকখানিও (১৮৯৯) ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' অনুসরণ করিয়া লিখিত। তবে দৃশ্য সংস্থাপনের স্থানে স্থানে তাঁহার মৌলিকতা আছে। কামন্দক এবং বিদূষক গ্রন্থমধ্যে হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বামিত্রের শিষ্য কামন্দকের সহিত মনোমোহনের 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের পাতঞ্জলের সাদৃশ্য আছে।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন, গ্রীক সাহিত্যে যে Damon এবং Pythus এই দুই বন্ধুর কাহিনী আছে তাহা অবলম্বন করিয়া 'আদর্শ বন্ধুর' আখ্যান বস্তু পরিকল্পিত হইয়াছে। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে R. Edwards-এর 'Damon and Pythus' নামক একখানা নাটকও আছে।

॥ যাজ্ঞসেনী ( ১৯২৮ ) ॥ 'যাজ্ঞসেনী' গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের অনুরূপ পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত নাটক। গিরিশচন্দ্রের ন্যায় অমৃতলালও পদ্য ও গদ্য উভয় ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। নাটকখানির নাম সার্থক নহে। মহাভারত অনুসরণে লিখিত কৌরব ও পাণ্ডবগণের বিবাদমূলক কাহিনীকে 'যাজ্ঞসেনী' নাম দেওয়া যথার্থ হয় নাই। একমাত্র বস্ত্রহরণের দৃশ্য ব্যতীত নাটকের মধ্যে কোথাও নূতনত্ব ও চমৎকারিত্ব নাই। যাজ্ঞসেনী নিজেকে অগ্নির ঘৃত বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি কি করিয়া অগ্নিকে লেলিহান করিয়া দিলেন তাহার কোনো বর্ণনা গ্রন্থমধ্যে নাই। যাজ্ঞসেনী গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্রও নহেন। গ্রন্থের কাহিনী তিনি তন্মুখী করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভিতরকার কোনো দ্বন্দ্বও নাটকের মধ্যে দেখানো হয় নাই। তাঁহার প্রতিহিংসার চরিতার্থতা দেখাইলেই নাটকখানি সম্পূর্ণ হইত। নাটকখানির মধ্যে নাটকত্বের একান্ত অভাব। কোন বিশেষ ঘটনা কি উদ্দেশ্য রঞ্জিত, ভাবাবেগময় করিয়া দেখান হয় নাই। নাটকের মধ্যে তেমন কোনো আকস্মিক ও ও আগ্রহজনক ঘটনাও নাই। কৃষ্ণের চরিত্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' ও নবীন সেনের কৃষ্ণের প্রভাব বিদ্যমান। শান্তি ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ব্যাসের মিলন নবীন সেনের কাব্যের প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। তবে এই নাটকে কৃষ্ণও মূলত কাহিনীর নিয়ামক হন নাই। পাণ্ডবগণের মধ্যে ভীমের চরিত্র সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব গৌরব' ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটক দুইখানি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ন্যায়নিষ্ঠ অথচ দুর্বলচিত্ত পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মানী, বলদর্পী ও পাণ্ডবদ্বেষী দুর্যোধনের চরিত্রের পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ক্রূর, স্বার্থসন্ধানী, কূট, রাজনীতিজ্ঞ শকুনির চিত্র ভালোই ফুটিয়াছে।

অমৃতলালের গদ্য কথোপকথন নিতান্ত আধুনিক ও ঘরোয়া হইয়াছে। নাট্যকার অনেকস্থলেই আধুনিক ভারতীয় সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চরিত্রগুলি অঙ্কন করিয়াছেন। ঐক্যবদ্ধ, উদার, স্বাধীন ভারতের কল্পনা তিনি করিয়াছেন। অমৃতলাল নাটকের মধ্যে কোনো অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করেন নাই। এই দিক দিয়া গিরিশচন্দ্রের ত্রুটি তিনি কাটাইয়া উঠিয়াছেন।

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

### ( ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণযুগ—আধুনিক নাট্যধারার সূচনা )

### দ্বিজেন্দ্র-যুগ

উনবিংশ শতাব্দীর অন্ত্যভাগে পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের অতিশয়িত উদ্ভব ও তাহার কারণ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই এই নাটকের গতি ভিন্ন পথে চালিত হইল এবং তাহার ভিত্তিভূমি স্থানান্তরিত হইল পৌরাণিক জগৎ হইতে ঐতিহাসিক জগতে। যে ধর্মসন্ধ দৃষ্টি অলৌকিক দৈবলীলার মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছিল তাহাই মুক্তিসন্ধানী দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হইয়া লৌকিক মানবলীলায় নিবদ্ধ হইল। নাটকের এই দৃষ্টি-পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে তৎকালীন জাতীয় প্রতিবেশ লইয়া একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমরা পূর্বে কয়েকস্থানে দেখাইয়াছি, সমাজ পরিবেশের বিশিষ্টতা অনুযায়ী বাংলা নাটকের ভাব ও রূপের মধ্যে বিশিষ্টতা দেখা গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলার সমাজ-মন কখনও সংস্কার-আন্দোলন, কখনও ধর্ম-আন্দোলন আবার কখনও বা জাতীয়-আন্দোলনে আলোড়িত হইয়াছে; এবং সেই সঙ্গে বাংলা নাটকের সামাজিক, পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক রূপের বিকাশ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় ভাবাত্মক ঐতিহাসিক নাটকের পিছনে যে নবোত্থিত জাতীয় প্রেরণার অস্তিত্ব ছিল সেই বিচার আমরা পূর্বে করিয়াছি। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ঐতিহাসিক নাটকের যে গৌরবময় পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখা গেল তাহার মূলেও ছিল এক স্মরণীয় জাতীয় আন্দোলনের অনিবার্য প্রভাব। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হইলেও, তাহা শুধু এক আদর্শায়িত মানসবৃত্তিতেই পরিণত হইয়াছিল। স্বদেশহিতব্রতী মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের জাতীয় কর্তব্য শুধু কেবল সভাক্ষেত্রে ও সাহিত্যক্ষেত্রেই সীমায়িত ছিল। অবশ্য ইহারও প্রয়োজন ছিল। কর্মযোগের পূর্বে ভাবযোগ প্রয়োজন, উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়ভাবান্বিত সাহিত্যিক ও নেতৃবৃন্দ অতীত ইতিহাসের আলোচনা করিয়া, পরাধীন দেশবাসীর মর্মবেদনা উদ্ঘাটন করিয়া এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নলব্ধ গৌরবের চিত্র অঙ্কন করিয়া জাতির চিত্তকে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ্য সংগ্রাম ও আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। ভারত-সভা স্থাপিত হইল, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইল, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে জাতির মনোদীক্ষা হইয়া গেল। কিন্তু তখনও শক্তিসংগ্রহ ও সংহতিস্থাপনের কাল। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইয়া গেল, বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভ হইল—ভাবযুগের অতিক্রান্তির পর সুরু হইল কর্মযুগের। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ফলে ধূমায়মান জাতীয় বিক্ষোভ এক সর্বগ্রাসী অগ্নিবিপ্লবে পরিণত হইল—ভাববিলাসের উত্তুঙ্গ পরিমণ্ডল হইতে মুক্তিকামী জীবন নামিয়া আসিল দুঃখ ও ত্যাগলিপ্ত

বাস্তব সংগ্রামক্ষেত্রে। এক অভূতপূর্ব জাতীয় মাদকতায় দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা মাতিয়া উঠিল। জাতীয় নাট্যশালা এই মাদকতা হইতে দূরে থাকিতে পারিল না। জাতির প্রবল ভাবোদ্দীপনা অন্তরে অনুভব করিয়া তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ জাতীয় ভাবানু-প্রাণিত নাটক রচনা করিলেন। দর্শকগণ তাহাদের রাষ্ট্রিক সংগ্রামের প্রেরণা পাইল নাটকের মধ্যে, সুবিপুল উৎসাহে সেই নাটককে তাহারা সম্বর্ধনা জানাইল। আনন্দ-রসের প্রেক্ষাগৃহ ও আন্দোলনের রাজপথ এক প্রাণের যোগে সম্মিলিত হইয়া গেল। বাঙালী ভীরুতার অপবাদ ফুৎকারে উড়াইয়া দিল, সে বীরত্বের আস্বাদ পাইল, বীরত্বের মহিমা বুঝিল, সেই বীরত্বের সন্ধান করিল জাতীয় ইতিহাসে। নাট্যকারগণ তাঁহাদের নাটকে সেই বীরত্বের রূপ ফুটাইয়া তুলিলেন, বাঙালী দর্শকগণ তাহাদের জাতীয় বীর বলিয়া করিয়া লইল প্রতাপাদিত্য, সিরাজদ্দৌলা, রাণাপ্রতাপ প্রভৃতি চরিত্রকে। এই সব ঐতিহাসিক বীরপুরুষদের সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের কাহিনী স্বদেশের মুক্তিকামী যোদ্ধাদের অন্তরে অন্তরে এক জীবন্ত প্রেরণা আনিয়া দিল। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ শুধু কেবল নাট্যকার ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন জাতীয় মুক্তিযজ্ঞের মহাঋত্বিক।

কিন্তু সাহিত্য শুধু প্রভাব বিস্তার করে না, তাহা প্রভাবিত হয়ও বটে। নাট্যকার-গণও জাতীয় মনকে চালিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জাতীয় মনের দ্বারা তাঁহারা নিজেরাও চালিত হইয়াছিলেন। সেজন্য জাতীয় ভাবাবেগের কাছে অনেক স্থলেই তাঁহারা নাটকের প্রয়োজন বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অহেতুক বীরদর্প, অকারণ ভাবোচ্ছ্বাস, অসংলগ্ন ঘটনা-সমাবেশ ও অসঙ্গত চরিত্র-পরিণতি এই কারণেই তখনকার অনেক নাটকে অত্যধিক আতিশয্য লাভ করিয়াছিল।[১] সমসাময়িক ভাবোচ্ছ্বসিত দর্শকদের কাছে সেগুলি হয়তো বহুক্ষেত্রে বাহবা পাইত, কিন্তু পরবর্তী যুগের ভাবাবেগ-বর্জিত নিরপেক্ষ রসদৃষ্টিতে সেগুলি খুবই বিসদৃশ ও হাস্যকর হইয়া পড়িল। যুগের প্রতি অনুগত থাকিয়াও যুগাতিচারী রসচেতনা বজায় রাখিতে পারিলেই শিল্পের যথার্থ সার্থকতা, ভাবাবেগের দাবী পরিপূরণ করিতে যাইয়া এই সার্থকতা অনেক স্থলেই ক্ষুণ্ণ করিতে হইয়াছে।

১। ঐতিহাসিক সত্য নিষ্কাষণ, ঐতিহাসিক চরিত্রের যথাযথ মর্যাদা রক্ষণ, এ সকল ভাব ঐতিহাসিক নামধেয় নাটক হইতে ক্রমশঃ সরিয়া গিয়াছে। Sensation বা উত্তেজনাই ঐতিহাসিক নাটকের মূলমন্ত্র হইয়া নাট্য-সাহিত্যকে এমনই হীন স্তরে নামাইয়া দিয়াছে যে, সে কথা স্মরণ করিতেও লজ্জা হয়। সত্য অপেক্ষা মিথ্যা আস্ফালন এবং মিথ্যা অভিমানই বহু ঐতিহাসিক নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। দেশময় তখন একটা উত্তেজনার প্রবল তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে। সেই উত্তেজনাকে অবলম্বন করিয়া বাংলার নাট্যশালা উদর পূরণ করিয়াছে, কিন্তু মনের খোরাক বিশেষ কিছু আহরণ করিতে পারে নাই।

রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—অপরেশ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩৮।

নাট্যকারগণ জাতীয় ভাবাবেগের প্রশ্রয় দিতে যাইয়া ঐতিহাসিক সত্যকে অনেক সময়েই প্রচ্ছন্ন অথবা বিকৃত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা আদর্শ জাতীয় বীররূপে যাঁহাদের চরিত্র চিত্রিত করিলেন তাঁহাদের প্রকৃত জীবনের দোষ ও দুর্বলতা আদর্শের স্বর্ণ-জালের অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া গেল। ইহাতে সেই সব চরিত্রের জাতীয় রূপ প্রকাশ পাইল বটে, কিন্তু ব্যক্তিরূপ অস্ফুট অথবা অসত্যরঞ্জিত হইয়া রহিল। এইরূপ দুইটি অসত্যরঞ্জনের দৃষ্টান্ত প্রতাপাদিত্য ও সিরাজদ্দৌলা চরিত্র। ক্ষীরোদপ্রসাদ ও গিরিশ চন্দ্রের নাটক দুইখানি জাতীয় সম্বর্ধনার স্বর্ণমুকুট লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য ও সিরাজদ্দৌলার প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটিত হয় নাই। প্রতাপাদিত্যের যে পরিচয় রামরাম বসুর গ্রন্থে, সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক আলোচনায়, এমন কি ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটকেও রহিয়াছে তাহাতে প্রশংসা করিবার, শ্রদ্ধা করিবার মত কিছুই তাঁহার মধ্যে নাই। অথচ নাট্যকার ও দর্শকগণের ভাবরঞ্জিত নেত্রে তাঁহার ব্যক্তি-চরিত্রের সমস্ত অপরাধ এক উদার ক্ষমাশীলতার প্রসন্ন দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বোধ হয় ভাবাবিলদৃষ্টিমুক্ত হইয়া নিরপেক্ষ সাহসিক আলোচনা করিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে ও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে। সিরাজদ্দৌলাকে লইয়াও আমাদের জাতীয় ভাবোন্মত্ততার অনেকখানি অপচয় হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা আদর্শের সুন্দর প্রতিমূর্তি কিন্তু ইতিহাসের সত্য মূর্তি নহে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার জাতীয়তাবাদ বিশেষভাবে হিন্দুর গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাস ও সার্বভৌম ধর্মবোধকে অবলম্বন করিয়া উন্মেষিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার প্রয়োজন তখনও অনুভূত হয় নাই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলন সাম্প্রদায়িক মিলনের ভিত্তিতে সমৃদ্ধ হইয়া সার্থকতা লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। সেজন্য তৎকালীন জাতীয় ভাবাত্মক নাটকেও এইরূপ একটি আদর্শ সাম্প্রদায়িক মিলন স্থাপনের উদ্দেশ্য অনেক স্থলেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। সিরাজদ্দৌলাকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আদর্শ জাতীয় বীর রূপে চিত্রিত করিবার পিছনে সাম্প্রদায়িক মিলনেচ্ছাই বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালেরও বহু নাটকে সাম্প্রদায়িক প্রীতি স্থাপনের আদর্শ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কর্ণসিংহ ও সাজাহানের বন্ধুত্ব, মহাবৎ খাঁর প্রতি কল্যাণীর নিষ্ঠা, শক্ত সিংহের সহিত মুসলমানী নারীর বিবাহ প্রভৃতি বিষয় অবতারণা করিয়া নাট্যকার হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টাই করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ সাম্প্রদায়িক মিলন স্থাপনের আগ্রহাতিশয্যে অনেক সময় নাট্যকারগণ সুবিদিত ঐতিহাসিক বৃত্তান্তকেও বিকৃত ও পরিবর্তিত করিয়া ফেলিতেন। সাময়িক ভাবাবেগের প্রবল প্রেরণায় এসব গুরুতর অসঙ্গতি নিন্দিত না হইয়া বরং প্রশংসিতই হইত। ক্ষীরোদপ্রসাদের সুপ্রসিদ্ধ নাটক 'আলমগীরে'র কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। নাট্যকার চির-হিন্দু-বিদ্বেষী

আলমগীরের মুখে হিন্দু-মুসলমানের তরল মিলন-স্বপ্ন ব্যক্ত করিয়া ইতিহাসের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু জাতীয় ভাবাচ্ছন্ন দর্শকদের কাছে উচ্ছ্বসিত করতালির কোন অভাব তাঁহার হইত না। আলমগীর রাজসিংহকে বলিলেন—'তবু এ মিলনের অভিলাষ - হে কবি, বছর যাক, যুগ যাক, বহু শতাব্দী চ'লে যাক, শতাব্দীর পারে একদিন তোমার তুলিকামুখে আলমগীরের এ মিলন-অভিলাষ—হিন্দু মুসলমানের মিলন-অভিলাষ মুখর হ'ক, এস ভাই, জগতের অলক্ষ্যে, এই ( ভীমসিংহকে দেখাইয়া ) চির-জাগ্রত সত্যাশ্রয়ীর সম্মুখে, এই রহস্যময় গুহামধ্যে পরস্পরকে—হিন্দু-মুসলমানে—একবার আলিঙ্গন করি।' রাতের পর রাত বাঙালী দর্শকগণ ইতিহাসের এই অপরূপ ভাষ্য শুনিয়া আনন্দোল্লাসের মধ্য দিয়া তাহাদের মোহবদ্ধ জাতীয়তার পরিচয় দিয়াছে।

গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ তিনজনে একই সময়ে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিভার ধর্ম ছিল বিভিন্ন; সেজন্য বিষয়বস্তুর অনুরূপতা থাকিলেও তাঁহাদের ঐতিহাসিক নাটকের ভাবপ্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। 'সিরাজদৌলা', 'মিরকাশিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' গিরিশচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক নাটক হইলেও, ইহাদের পূর্বেও তিনি 'চণ্ড', 'ভ্রান্তি', 'সৎনাম', 'বাসর', 'অশোক' প্রভৃতি ইতিহাসমূলক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিবেশ অথবা উদাত্ত জাতীয় উদ্দেশ্য অপেক্ষা ঐ সব নাটকে ব্যক্তি-কাহিনী ও ধর্মভাবই অধিকতর প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে। সমসাময়িক নাট্যকারদের সহিত প্রতিযোগিতার জন্য যদিও তাঁহাকে ঐতিহাসিক নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে তাঁহার প্রতিভায় ঐতিহাসিক নাটকের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ছিল না। ভক্তি ও বিশ্বাসের দূরাস্তৃত জগৎ অথবা চলমান বাঙালী সংসারের সীমায়িত পরিধির মধ্যে তাঁহার কল্পনা ও প্রাণশক্তি যেরূপ সাবলীল প্রকাশ লাভ করিত; ঘাত-প্রতিঘাতময়, ঊর্মিমুখর উদাত্ত ঐতিহাসিক পরিবেশে সেরূপ লাভ করিত না। প্রতাপাদিত্য ও প্রতাপসিংহের পর তিনি ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তাঁহার লেখনীকে নিয়োজিত করিলেন বটে, কিন্তু তখন তাঁহার মনে কর্তব্যপালনের তাগিদ যতখানি ছিল, সৃষ্টির অবারিত আবেগ হয়তো ততখানি ছিল না।

ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ণতম রূপটি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা-স্পর্শের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে ঐতিহাসিক নাটক রচিত হইয়াছিল। তাঁহার পরেও ঐতিহাসিক নাটক রচনা হইয়াছে, কিন্তু উহার মণিভাণ্ডারের শেষ চাবিটি শুধু ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের কাছেই। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা যখন তাহার শেষ রশ্মিগুলি বিকীর্ণ করিতেছিল নাট্যাকাশের পূর্বদিগন্তে তখন নব স্বর্ণজাল রচনা হইতেছিল।১ গিরিশচন্দ্র নাটক রচনায়

১। একদিন দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'আপনার উপরে আমার অগাধ আশা। ভবিষ্যতে আপনিই এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার—আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ ভরসা, এ বিষয়ে কি আর কোন রকম সন্দেহ আছে? এই অল্প কয়েকটি বছরের ভিতরে আপনি যা দেখাইলেন, আমাদের সারাটা জীবনের সাধনায়ও তেমনিটি হইল না। ......আমাদের তো দিন ফুরাইয়া আসিল; এখন আপনার উপরেই সব ভার।'
দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৬২৪।

শেক্‌সপীয়র প্রভৃতি পাশ্চাত্য নাট্যকার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তবুও ইহা একান্ত সত্য যে, তাঁহার নাটকে দেশের প্রাণবস্তুই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। চিন্তা, সংস্কার ও আঙ্গিক-পরিকল্পনা ও রসচেতনা সব দিক দিয়াই তিনি দেশের মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য নাটকের প্রাণসত্তা বলিষ্ঠরূপের প্রকাশিত হইল দ্বিজেন্দ্র-লালের নাটকে। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের প্রত্যক্ষ প্রেরণা পাইয়াছিলেন খাস বিলাতের মাটিতে।১ তিনি যখন দেশে ফিরিলেন তখন ইংরাজের ভাব, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার জীবনকে ভরিয়া রাখিয়াছিল। শুধু কেবল আহার বিহারে নহে, কাব্যে গানেও তিনি ইংরাজের জগতের সহিতই যুক্ত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্যের সহিত এই মানসযোগ লইয়াই তিনি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। সেজন্য ঘটনা-সংহতি, গতিবেগ, ভাবসংঘাত, ট্র্যাজিক রসচেতনা প্রভৃতি দিক দিয়া তাঁহার নাটক এত ঘনিষ্ঠভাবে পাশ্চাত্য নাটকের প্রাণধর্মের সহিত যুক্ত। পাশ্চাত্যের প্রতি এতখানি আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও এই পাশ্চাত্য সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত পরিচয়ের ফলেই তাঁহার মধ্যে জাতীয় ভাব উন্মেষিত হইয়াছিল। তৎকালীন সমাজের দিকে তাকাইয়া তিনি দেখিলেন, সেখানে রহিয়াছে এক সর্বব্যাপী ক্লীবত্ব, একদিকে পুরাতনের প্রতি তামসিক মোহ, অন্যদিকে সংস্কারের নামে স্বেচ্ছাচার আর জাতীয়তার কৃত্রিম ও কপট অভিনয়। এই মোহ ও বিকৃতিকে তিনি আঘাত করিলেন, কিন্তু সেই আঘাতের পিছনে ছিল হিতৈষী মনের সুগভীর মর্মবেদনা।২ তাঁহার বলিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম প্রকাশের পর্যাপ্ত ক্ষেত্র পাইল ঐতিহাসিক জগতে। সেখানকার বিচিত্র উত্থান পতনময় কাহিনীর মধ্যে তিনি তাঁহার উদাত্ত স্বদেশপ্রেম ঢালিয়া দিলেন। রাজপুত কাহিনী পরাধীন দেশের মুক্তিকামী জনগণের নিজেদের কাহিনী হইয়া উঠিল।

কিন্তু শুধু কেবল দেশপ্রেম নহে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এক উদার সর্বজনীন প্রেমে দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্ত অনুপ্রাণিত ছিল।৩ সেজন্য উগ্র জাতিবৈরিতা অপেক্ষা মানবের সামগ্রিক কল্যাণ ও মৈত্রী স্থাপনে তাঁহার আদর্শায়িত দৃষ্টি অধিকতর আগ্রহান্বিত ছিল। 'মেবার পতন' নাটকে তিনি বিশ্বপ্রীতির মহৎ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন।

১। 'বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি, এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।'

আমার নাট্য জীবনের আরম্ভ—নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭।

২। 'কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে দুদিনও মিশত সেই মুগ্ধ হত দেখে তিনি গভীর বেদনা বোধ করতেন দেশবাসীর মনে প্রাণে অসাড়তায়—স্বাধীন চিন্তার দৈন্যে—সর্বব্যাপী ক্লীবত্বে। তার উপর এ বেদনা ছিল কবির বেদনা—বিদ্রূপীর বেদনা নয়। তাই তিনি বিদ্রূপ ছেড়ে ধরেছিলেন নাটক ও দেশাত্মবোধের গান গেয়েছিলেন, আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা' চেয়েছিলেন 'আবার' আমরা মানুষ হই।'

উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল—দিলীপকুমার রায়—পৃঃ ৩৩৭।

৩। দ্বিজেন্দ্রলালের এ স্বদেশ-ভক্তি সর্বজনীন দয়া, মৈত্রী ও শুভেচ্ছার। এ দেশভক্তির পরম পরিণতি দেশ কাল পাত্র নির্বিশেষে এ সমগ্র জগন্মঙ্গলেচ্ছার। তাঁহার দেশভক্তি কোন জাতি বা দেশের উপর ঘৃণার উদ্রেক করে না।'

—দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায় চৌধুরী, পৃঃ ৭৩৭।

দ্বিজেন্দ্রলাল ভগবানের প্রতি উদাসীন ছিলেন, কোন অলৌকিক আধ্যাত্মিক রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁহার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। অথচ মানুষের প্রতি এক সীমাহীন বেদনা ও মমত্বে তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ ছিল। সেজন্য স্বর্গের চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণরাজ্য ছাড়িয়া তিনি মর্ত্যের ধূলিতলে সমস্যা সংঘাত-জড়িত মানবের দিকে আগ্রহ-সিক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অধ্যাত্ম-জীবন হইতে এই যে বস্তুজীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত, ভগবান অপেক্ষা মানুষের প্রতি এই যে গভীরতর কৌতূহল ইহারই ফলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে আধুনিক নাট্যধারার সগৌরব প্রবর্তনা ঘটিয়া গেল। আধুনিক কালে সমাজের বিভেদ-বিরোধ দূর করিয়া যে সাম্যনীতি স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে তাহার সুস্পষ্ট রূপ দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই। এই সাম্যনীতির প্রেরণাতেই তিনি হিন্দুসমাজের ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা ও শ্রেণীবৈষম্যকে এরূপ কঠোর ভাবে আঘাত করিয়াছেন।

✓মানবতার মহৎ গৌরব দেখাইতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল মানবতার বেদনাও গভীরভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। বড় গৌরবের জন্য বড় মূল্যও দেওয়া প্রয়োজন। দুঃখকে যে বরণ করিয়া নিল সেই তো অপরাজেয় গৌরব অধিকার করিতে পারিল। দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুঃখের মহিমা দেখাইয়াছেন,—দেখাইয়াছেন প্রতাপের দুঃখভোগ, সগরসিংহের অন্তর্জ্বালা, যশোবন্তসিংহের মৃত্যুবরণ, মহাবৎ খাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব। কিন্তু শুধু কেবল আদর্শ-গত দুঃখ নহে, মানব-চরিত্রের মানসিক বাসনা ও প্রবৃত্তির নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলে যে দুঃখ অনিবার্য আঘাতে চিত্তকে বিচলিত করে তাহার রূপও নাট্যকার দেখাইয়াছেন। সাজাহানের ক্রুদ্ধ হৃদয়জ্বালা, নুরজাহানের শোচনীয় পরাজয়, চাণক্যের নিরুদ্ধ বেদনা ও দারার মর্মান্তিক মৃত্যু আমাদের হৃদয়ে এক ঘনীভূত ট্র্যাজিক অনুভূতির সৃষ্টি করে। বাঙালীর কোমল, অশ্রুতরল চিত্তভূমিতে ট্র্যাজেডির রুক্ষ-কঠোর মূর্তি স্থান পায় না, কিন্তু দ্বিজেন্দ্র-লালের তুলিকায় এই মূর্তি তাহার অসামান্য মহিমা লাভ করিল—অশ্রুর লাবণ্যে-সিক্ত হইয়া নহে, অশ্রুহীন আগুনে দগ্ধীভূত হইয়া। দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনের এই ট্র্যাজিক রূপ দেখাইতে সমর্থ হইলেন, কারণ তিনি জীবনকে দেখিলেন পরিপূর্ণভাবে। বেদনার প্রবল আবর্ত বাহিরে দৃশ্যমান নহে, তাহা চলে অদৃশ্যভাবে অন্তরের অভ্যন্তরে। যিনি এই অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিলেন তিনিই তো গভীরতম বেদনার রূপটি চিনিতে পারিলেন। এই দৃষ্টি দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল, সেজন্য তাঁহার নাটকে বহির্জগতের বিবাদ অপেক্ষা অন্তর্জগতের বিপ্লবই প্রধান হইয়া উঠয়াছে। এ পর্যন্ত দেউড়ির প্রান্তে দাঁড়াইয়া আমরা অনেক হাঁকডাক শুনিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদিগকে রস ও রহস্যেভরা অন্তঃপুরের দ্বারে পৌছাইয়া দিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদও স্বদেশী ভাবপ্রেরণা লইয়া নাটক রচনা করিয়া ছিলেন। তাঁহার 'প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি নাটক জাতীয় ভাবোদ্দীপিত দর্শকদের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু ভাবাদর্শের দিক দিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত তাঁহার পার্থক্য গুরুতর। দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি বস্তুজগতে নিবদ্ধ কিন্তু

ক্ষীরোদপ্রসাদের দৃষ্টি অলৌকিক জগতের রহস্য ও মহিমায় কৌতূহলী। তিনি আধুনিক উদার মতবাদে বিশ্বাসী হইলেও ধর্ম ও শাস্ত্র-নির্দেশিত পুরাতন পথের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের কাহিনী অপেক্ষা চরিত্র-সৃষ্টির দিকেই অধিকতর লক্ষ্য রাখিতেন। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের দৃষ্টিতে চরিত্র অপেক্ষা কাহিনী-বর্ণনার প্রাধান্য ছিল বেশী। দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রগুলি গাঢ় ও উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের চরিত্রগুলি একটু অস্পষ্ট, অস্ফুট, দুর্বোধ ও বিবর্ণ। দ্বিজেন্দ্রলালের ঘটনার দৃঢ়-সংহতি ও কেন্দ্রমুখিতা ক্ষীরোদপ্রসাদে নাই। অসংলগ্ন দৃশ্য ও অবান্তর চরিত্রের আধিক্যের ফলে তাঁহার নাটক দীর্ঘ, শিথিল ও অভিনয়ের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। তাঁহার সংলাপে মাঝে মাঝে কাব্যময় উচ্ছ্বাস থাকিলেও শাণিত দীপ্তি এবং ক্ষিপ্র গতিবেগ নাই। তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকেও উদাত্ত-গম্ভীর বীর্যদীপ্ত পরিবেশ জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। প্রায়ই তাঁহার চরিত্রগুলি অন্তর্নিহিত রহস্যে জটিল, ভাবাতুর ও অব্যবস্থিত-চিত্ত।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কিছুকালের জন্য ঐতিহাসিক নাটকের বহুল ব্যাপ্তি দেখা গেল বটে, কিন্তু শুধু কেবল এই জন্যই তৎকালীন নাট্যযুগ স্মরণীয় নহে। এই সময়কার নাটকের মধ্য দিয়া আধুনিক নাট্যধারার প্রবর্তনা হইয়াছে, ইহাই এই যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়। মানবতার গৌরবায়ণ, বস্তুজগতের প্রতি নবজাগ্রত কৌতূহল, চরিত্রদ্বন্দ্ব ও ট্র্যাজিক রসের অবতারণা, গতিবেগ ও ভাবসঙ্গতির দিকে মনোযোগ, রঙ্গমঞ্চের সহিত ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ-স্থাপন—এ সব দিক দিয়া আধুনিকতার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছিল। এই যুগচেতনা অল্পবিস্তর প্রায় সকল নাট্যকারের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু এই যুগ-প্রবর্তক অবিসংবাদিত-ভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল।

———

# দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

## (ক) ভূমিকা

গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলালের ন্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গালয়ের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন না। অভিনেতৃ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহার নাট্যজীবন পুষ্টিলাভ করে নাই। গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল প্রভৃতি নাট্যকার নাটক লিখিবার কালে প্রেক্ষাগৃহের পরিচিত দর্শক-বৃন্দের কথা চিন্তা করিয়া লইতেন, এই সব দর্শকের রুচি ও মর্জি খুশি করিবার লক্ষ্য ছিল বলিয়াই তাঁহাদের অধিকাংশ নাটক সাময়িকভাবে রঙ্গমঞ্চে সার্থ সম্বর্ধনা লাভ করিত বটে, কিন্তু অনাবশ্যক দৃশ্য, অবান্তর নাচ-গান এবং অশোভন ভাঁড়ামি প্রভৃতি সেই সব নাটকের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিয়া ফেলিত। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে সাময়িক কোনো রুচি ও চাহিদার অনুকূল সুলভ উপাদানের সদ্ভাব ছিল না। সেইজন্য দর্শকের মানসিক বিবর্তনের ফলে তাঁহার নাটকসমূহ অপ্রিয় হইয়া যায় নাই।

নাটক পঠন এবং দর্শনের দ্বারা ক্রমে ক্রমে দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে নাট্যপ্রতিভা উন্মেষিত হয়। বিলাতে এবং এই দেশে বহু নাটকের অভিনয় দেখিয়া নাটকের প্রতি তাঁহার আগ্রহ জন্মিতে থাকে। প্রসিদ্ধ নাট্যকারদের নাট্যাদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার বিচিত্র শতদল তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রহসন এবং নাট্য-কাব্যের সময়ে ইহা অস্ফুট কোরকের ন্যায় অপূর্ণ ছিল, ধীরে ধীরে ইহার পাঁপড়িগুলি প্রসারিত হইয়া ঐতিহাসিক নাটকে পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া চতুর্দিকে সৌরভ ছড়াইতে লাগিল, এবং অবশেষে সামাজিক নাটকে ইহা ম্লানায়মান শুষ্কপ্রায় হইয়া পড়িল। তিনি যখন প্রহসনগুলি লিখিয়াছিলেন, তখন হাসির গানের যুগ, স্ত্রী এবং বন্ধুবর্গের মধুময় সংসর্গে তাঁহার জীবনের কৌতুক এবং আনন্দরস শতধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, রঙ্গব্যঙ্গের চাপল্যে তিনি প্রাণ খুলিয়া মাতিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু হাসির গান লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও প্রকৃত প্রহসনের প্রতিভা তাঁহার ছিল না। সেইজন্য প্রহসনের ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠা স্থায়ী হয় নাই। প্রহসনের পর শেক্স্‌পীয়ারের আদর্শে তিনি অমিত্র ছন্দে কয়েকখানা নাট্য-কাব্য রচনা করেন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের প্রভাব তখনো প্রবল। সেই প্রভাবে চালিত হইয়াই হয়তো তিনি পৌরাণিক নাটক লেখা আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার যুক্তিবাদী, বস্তুনিষ্ঠ, আধ্যাত্মিকতাবিরোধী মনের উপযুক্ত ক্ষেত্র পৌরাণিক নাটক ছিল না। অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক লিখিয়া তিনি বুঝিলেন যে, ইহাতে তাঁহার সম্যক অধিকার নাই, নাটকের পক্ষে পদ্য স্বাভাবিক নয় তাহাও তাঁহার মনে হইল।[১] সেইজন্য তিনি গদ্যে ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে সুরু করেন। এতোদিন পরে

১। দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের উক্তি উল্লেখযোগ্য—

'তদুপরি নাটক অভিনয় করিবার জিনিষ। অভিনয়ে ঘটনাগুলি যত প্রত্যক্ষবৎ হয় ততই ভাল। সেইজন্য উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক হয় (ভাষার মর্যাদা রক্ষা করিয়া অবশ্য) ততই শ্রেয়ঃ। লোকে কথাবার্তা পদ্যে করে না, গদ্যে করে। এতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্তিগুলি অস্বাভাবিক ঠেকিবেই।'

(আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ—নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭)

তাঁহার গৌরবময় সিদ্ধির পথ তাঁহার পক্ষে প্রশস্ত হইয়া উঠিল পদ্যরচনার কৃত্রিমতা হইতে মুক্ত করিয়া তিনিই সর্বতোভাবে বাংলা নাটককে আধুনিক পদবাচ্য করিয়া তুলিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু মনে হয় ঐতিহাসিক নাটক এতোদিন চরম সার্থকতা লাভ করিবার আশায় দ্বিজেন্দ্রলালের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল. বুঝি তাঁহার পূর্বে কেহ আর ইহাকে একচ্ছত্র মহিমায় ভাস্বর করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার পরেই আবার ঐতিহাসিক নাটকের যুগ শেষ হইয়া আসিয়াছে। হয়তো আর তাহার অভ্যুত্থান হইবে না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশককে ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণ-যুগ বলা যাইতে পারে। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটকসমূহ এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে যে তুমুল বিক্ষোভ এবং প্রবল আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল এই সমস্ত জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক তাহা শক্তিশালী করিয়া রাখিতে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।১

যে স্বদেশী উন্মাদনার সূচনা হইয়াছিল 'প্রতাপাদিত্যে', তাহারই পূর্ণ পরিণতি দেখা গেল 'প্রতাপসিংহ,' 'দুর্গাদাস,' 'মেবার পতন' প্রভৃতি নাটকে। জাতীয় মন্ত্র-দীক্ষিত দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীনতার ক্ষুব্ধ জ্বালা ও অপরিসীম বেদনার কথা ফুটাইয়া তুলিয়া ভবিষ্যতের আশা ও আলোকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইলেন। তাঁহার নাটকে মহাপ্রাণের আত্মবলিদানে, চারণের শোক সংগীতে এবং স্বাধীনতাব্রতী জাতির বিরাট ত্যাগের মধ্যে মর্মান্তিক কারুণ্য প্রকাশ পাইলেও সঙ্গে সঙ্গে আত্মোৎসর্গের মহিমা, স্বার্থ-ত্যাগের গৌরবে মন ভরিয়া উঠে, পুনরায় মহাব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্য হৃদয়ে দুর্বার প্রেরণা বোধ করা যায়। ভারতবাসীর শত প্রকার দুঃখ-লাঞ্ছনার মধ্যেও নাট্যকার আবার আমাদিগকে মানুষ হইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন, এই সুগভীর আশাবাদ তাঁহার নাটকগুলিকে অমূল্য জাতীয় সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

ঐতিহাসিক নাটকের অনুকূল পরিবেশ সৃজন করিতে দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় আর কেহও সক্ষম হন নাই। তাঁহার নাটক আমাদের চোখের সম্মুখে ইতিহাসের পাতা হইতে এক বিরাট জগৎকে জীবন্ত করিয়া উপস্থাপিত করে, সেখানে সাংসারিক জীবনের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা এবং দৈনন্দিন জীবনের সাধারণতা নাই—সেখানকার পাত্র-পাত্রী সব অসাধারণ উপাদানে গঠিত, তাহাদের কথাবার্তা, চালচলন, হৃদয় ও মনের লীলা এক সমুন্নত মহিমা এবং অনুপম

1. 'The above movements too would have proved short lived, were not the aforesaid dramas produced at that time. At such time of the greatest need, these dramas acted like a great inspiration and changed the servile mentality of the people.

*The Indian Stage*, (Vol. IV).—H. N. Das Gupta.

ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা প্রেমে অপ্রতিম, শৌর্যে সীমাহীন, আবার ক্রোধে প্রচণ্ড, হিংসায় দুর্বার। তাহাদের উত্থানপতন আমাদের হৃদয়ে মৃদু কম্পন জাগায় না, সজোর আঘাতে ইহাতে দ্রুত স্পন্দন সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক ভূমিকাগুলিতে মানব-চরিত্রের এক একটী দিক পূর্ণ এবং চরমরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতাপসিংহের স্বদেশপ্রেম, দুর্গাদাসের মহত্ত্ব, গোবিন্দসিংহের সুদৃঢ় সংকল্প, মহাবৎখাঁর কর্তব্যপরায়ণতা, কাশিমের প্রভুভক্তি—মানবজীবনের এক একটি আদর্শকে অভ্রান্তভাবে রূপায়িত করিয়াছে। ঐতিহাসিক নাটকে বীররস ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা থাকা দরকার এবং এই ক্ষমতা দ্বিজেন্দ্রলালের সমধিক পরিমাণে ছিল বলিয়াই তাঁহার নাটকগুলি এইরূপ সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। রমেশ দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বীরত্ব ও শৌর্যের বর্ণনায় তাঁহার চিত্ত উল্লসিত থাকিত। তাঁহার নাটকীয় চরিত্রগুলির কথায় এবং আচরণে সর্বত্র একটা দৃপ্ত পৌরুষের এবং অটল গাম্ভীর্যের ভাব প্রকাশিত। কিন্তু এই বীররসের আধিক্য আবার অনেক স্থলে তাঁহার নাটকের গুরুত্ব নষ্ট করিয়া দিয়াছে, অনেক সময়েই অকারণ বীরত্ব দেখাইতে যাইয়া তাঁহার চরিত্রগুলি হাল্কা এবং হাস্যকর হইয়া পড়িয়াছে। তখন মনে হয় তাহাদের উত্তেজনাটা কৃত্রিম, এবং তাহাদের গম্ভীর বীরত্ব প্রকৃতপক্ষে শূন্যগর্ভ আস্ফালন বই আর কিছুই নয়। তরবারির নিষ্কাসন এবং এবং চালন তাঁহার নাটকে বড়ো বেশি দেখা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সার্থক এবং জনপ্রিয় হইবার প্রধান কারণ, ইহার অপরূপ অনবদ্য ভাষা। তাঁহার পূর্বে এইরূপ শক্তিশালী, কবিত্বপূর্ণ এবং নাটকীয় ভাষা আর কেহ ব্যবহার করিতে পারেন নাই। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেহও ভাষার দিক দিয়া তাঁহার সমকক্ষ নহেন। তাঁহার পূর্বতন নাট্যকারবৃন্দের ভাষা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে ইহা সর্বাংশে নাটকীয় নয়। নাটকের ভাষা নিরাবেগ কথার সমষ্টি নয়, ইহা দ্বারা চরিত্র বিশ্লেষণ এবং ঘটনার গতি বিধান করিতে হইবে, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা ভালোভাবেই জানিতেন। সেইজন্য তাঁহার ভাষার মধ্যে সর্বত্র একটা গতির আবেগ, এবং ভাবের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। সংলাপের প্রতিটী কথা যেন এক একটা তীক্ষ্ণফলা ছুরিকার ন্যায় ঝকমক করিতেছে, যেন নিমেষগতিতে দর্শকের হৃদয়ে ইহা আমূল বিদ্ধ হইয়া যাইবে। শব্দ ভাণ্ডারের উপর তাঁহার অবিচল অধিকার ছিল বলিয়া ভাষাকে তিনি নানা রত্ন-আভরণে সাজাইয়া অনিন্দ্যসুন্দরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। মানসিক ভাব ও দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিতে হইলে ভাষার শব্দসমষ্টি নানা ভাবে কাটছাঁট করিতে এবং সাজাইতে হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বাক্যপ্রণালী স্থানে স্থানে ইংরাজী ধরণের হইয়া পড়িয়াছে, নাটকের দিক দিয়া ইহা মোটেই দোষাবহ হয় নাই। অনেক সময়ে একবার কোন বাক্য বলিলে তাহা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়

ডাঃ সুকুমার সেনের একটু কঠোর মন্তব্য উল্লেখ্য—

'এই নাটকগুলি উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকের মতো অত্যন্ত melo-dramatic, প্রায় প্রত্যেকটিতে গোলাগুলি ছোঁড়া আছে।'

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,' ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৮।

না। একই ভাবাত্মক কয়েকটী বাক্য পর পর বলিলে তাহা যথেষ্ট আবেগজনক হইয়া উঠে। দ্বিজেন্দ্রলাল ভাষার মধ্যে ভাবের ক্রমোচ্চতা বিধান করিয়া নাটককে বিশেষ সরস করিয়া তুলিয়াছেন। নিম্নে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে —

'উঠুন, দলিত ভুজঙ্গমের মত ফণা বিস্তার ক'রে উঠুন, হৃতশাবা ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠুন; অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন, নিয়তির মত কঠিন হোন, হিংসার মত অন্ধ হোন, শয়তানের মত ক্রূর হোন।'

'সাজাহান'—১ম অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলিয়াছিলেন যে তাঁহার কাব্যশক্তি নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গদ্যে নাটক রচনা করিলেও তিনি গদ্যের ভাষাকে কবিত্বপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন।১ সেই কারণেই তাঁহার ভাষার মধ্যে সুললিত শব্দ-পারিপাট্য, সুষম ছন্দমাধুর্য, এবং সুমনোহর অলঙ্কার-সৌন্দর্য এতো অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময়েই তাঁহার পাত্রপাত্রীর কথার মধ্যে সঙ্গীতের ন্যায় আকস্মিক ভাবোচ্ছ্বাস এবং গূঢ় ব্যঞ্জনা দেখা যায়।২ উক্তির এইরূপ চমৎকারিত্বের জন্য তাঁহার নাটকীয় সংলাপ লোকের মুখে মুখে এরকম অমর হইয়া রহিয়াছে। যেখানে কোনো চরিত্র আত্মগত ভাব প্রকাশ করিতেছে সেখানেই তাঁহার কল্পনা উদ্দাম, এবং ভাষা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। চাণক্য এবং সাজাহানের প্রসিদ্ধ উক্তিগুলির কথা চিন্তা করিলেই এই মতের যাথার্থ্য প্রতীয়মান হইবে। তাঁহার ভাষায় অলঙ্কারের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মালোপমা প্রয়োগ করিয়া তিনি যেমন বাক্যের মধ্যে climax সঞ্চার করিয়াছেন, তেমনি উৎপেক্ষা এবং সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারের দ্বারা ইহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ইংরাজী Epigram ও Oxymoron অলংকারের প্রাচুর্য তাঁহার ভাষার মধ্যে খুব দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় অলংকারের অন্তর্নিহিত বিরোধ এবং আকস্মিকতা তাঁহার ভাষাকে খুব উপভোগ্য করিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় অশেষ গুণ থাকা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে ইহাতে বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতার অভাব আছে। তাঁহার অলঙ্কৃত, ওজস্বিনী ভাষা সকলেই ব্যবহার করিতেছে—স্ত্রী, পুরুষ, উচ্চ নীচ—সর্বশ্রেণীর পাত্রপাত্রীর ইহাই একমাত্র ভাষা। এই ভাষা সর্বত্র জাঁকজমকপূর্ণ দরবারী পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আছে, ইহা যেন 'আটপৌরে' শাড়ী পরিতে পারে না। ইহার মহিমা ও গৌরব আমাদের শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময় উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু ইহার সর্বজনীন স্বাভাবিকতা দ্বারা যেন আমাদিগকে ঘনিষ্ঠ করিতে পারে না। বাহিরের

১। কিন্তু কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।

আমার নাট্য জীবনের আরম্ভ—'নাট্যমন্দির', শ্রাবণ, ১৩১০।

২। 'তাঁহার নাটকীয় পাত্রগুলির কথাবার্তার মধ্যেও অনেক স্থানে সঙ্গীত-জাতীয় উচ্ছ্বাস এবং রসোদ্গারই লক্ষ্য করিবেন; সময় সময় এক একটি কথা অপরূপ বিদ্যুৎ বিভাসের ন্যায়, সঙ্গীতের আকস্মিক আবেগ মূর্ছনার ন্যায়, উচ্ছ্বাস পরিস্ফুট করিয়াই হয়ত অচিরে বিলীন হইতেছে।'

'বঙ্গবাণী'—শশাঙ্কমোহন সেন, পৃঃ ১৪৭।

ক্ষেত্রে যেখানে বড়ো বড়ো ঘটনা ও চরিত্রের বিচিত্র সমাবেশ হইয়াছে সেখানে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে দ্বিজেন্দ্রলাল আসন সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু যে পায়ে-চলা খিড়কীর পথটী দিয়া পরিচিত নরনারীর অমার্জিত কথাবার্তা, অশ্লীল রঙ্গ তামাসা মুখরিত হইয়া উঠিতেছে তাহা তাঁহার জানা নাই। দীনবন্ধু এবং গিরিশচন্দ্র যেমন নাটকীয় চরিত্রের উপযোগী ভাষা প্রয়োগ করিতে অবহিত ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সেরূপ ছিলেন না। সেইজন্য পাত্রপাত্রীর মুখে অনেক সময় ভাষা কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পাত্রপাত্রীর বিশিষ্ট পরিচয় ভাষার মধ্যে নাই— মুসলমান এবং হিন্দুর ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, মোগল সম্রাট এবং একটা সাধারণ লোকের ভাষার বৈষম্য নাই! মোগল দরবারের গায়িকারা যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতেছে, এমন কি সোরাব রুস্তমে সারিয়া ও হামিদা যে একটি বৈষ্ণব কীর্তন পর্যন্ত গাহিয়া ফেলিয়াছে দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি তাহা ধরিতে পারে নাই। ইহাই তাঁহার ভাষার প্রধান ত্রুটি।

দ্বিজেন্দ্রলাল আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের নাট্যকলার সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার নাটকে আধুনিক টেকনিক এত বেশি দেখা যায়। ইবসেনের পর হইতে বর্তমান নাট্যকারদের নাটকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নানা নির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে। বার্ণার্ড শ' এর যে কোনো নাটক খুলিলেই দেখা যাইবে তিনি অভিনয়, রূপসজ্জা এবং মঞ্চব্যবস্থা সম্বন্ধে কতো বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও সম্ভবত ইঁহাদের অনুসরণ করিয়া অভিনেতার ভাবের অভিব্যক্তি এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।১ এইরূপ মঞ্চনির্দেশের ফলে তাঁহার নাটক স্থানে স্থানে উপন্যাসের মতই বর্ণনাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা বুঝা যাইবে—

"পার্বতী তৎক্ষণাৎ শান্তাকে ছাড়িয়া পশ্চাতে হেলিলেন। শান্তা কিন্তু ছোরা হস্তে পূর্ববৎই দাঁড়াইয়া রহিল। ইত্যবসরে প্রায় সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল ও নির্বাক বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, হিরণ্ময়ী নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া শান্তাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—'কে তুমি! কে তুমি!—এই বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল।"

'পরপারে'—২য় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।

আধুনিক নাটকে স্বগতোক্তি কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক বলিয়া বর্জিত হইয়াছে।২ বাংলা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব পর্যন্ত স্বগতোক্তির ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালই সর্বপ্রথম এই অস্বাভাবিক ও দুর্বল নাট্যরীতিটী নাটক হইতে বাদ দিয়াছেন। অবশ্য

1. 'The detailed stage direction so characteristic of him as to be a mannerism point also to a foreign model, and the examples of Shaw and Galsworthy might have supplied him with the hint.'

*Western Influence in Bengali Literature*—by Sen, P. 274.

2. 'The practical disappearance of both formal soliloquy and incidental aside from our greater contemporary drama notwithstanding the fact that this drama is so largely psychological in its interest, is thus a most significant index of a general change in our idas of dramatic technique.'

*The Study of Literature* by Hudson, P. 262.

প্রথম যুগে লিখিত তাঁহার প্রহসনগুলিতে এই স্বগতোক্তির ব্যবহার স্থানে স্থানে রহিয়া গিয়াছে।

গিরিশ-যুগে যে ধর্মভাব এবং আধ্যাত্মিকতা নাট্যসাহিত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল দ্বিজেন্দ্রলাল যেন তাহার দৃপ্ত প্রতিবাদস্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের নবোত্থান-কালে যে ভক্তি ও বিশ্বাসের উচ্ছ্বসিত প্লাবন সুরু হইয়াছিল, তিনি যেন তাহা সজোরে প্রতিরোধ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান এবং আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত চিরকালই ঘোর যুক্তিবাদী এবং সংশয়ী ছিল।১ সাধারণ লোকে সহজাত সংস্কাররূপে যেগুলিকে মানিয়া লয় তাঁহার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোঁচায় এবং প্রবল যুক্তি-তর্কের আঘাতে তাহাদের অস্তিত্ব তিনি উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। শেষ জীবনে যদিও তাঁহার মতের কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বাহিরে কথনো তাহা স্বীকার করেন নাই।২ তাঁহার মনের ছাপ নাটকের মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কোনো নাটকেই আধ্যাত্মিক, কিংবা ভগবদ্-বিষয়ক কোনো তত্ত্ব এবং রহস্য নাই। কোনো স্থানেই চিন্তা এবং কল্পনা দৃশ্য জগতের বাস্তব ধূলামাটি অতিক্রম করিয়া কল্পময় কুয়াসাচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক আকাশে সঞ্চরণ করে নাই। একমাত্র 'পরপারে' ব্যতীত আর কোনো নাটকেই পরলোক সম্বন্ধে আর কোনো কথা বলা হয় নাই,৩ এবং একমাত্র ভবানীপ্রসাদ ব্যতীত আর কোন চরিত্রই ধর্মভাবাত্মক নহে। দারা, শক্তসিংহ, চাণক্য, কালীচরণ প্রভৃতি চরিত্রগুলি সংশয়বাদী নাস্তিক চরিত্রের দৃষ্টান্ত। ভগবান ও ধর্মবিষয়ে উদাসীন এবং উপেক্ষাশীল থাকিলেও তাঁহার দৃষ্টি মানুষের সর্বময় উন্নতি এবং কল্যাণের দিকে নিবদ্ধ ছিল। ভগবানকে যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা সমর্পণ করা যায় তাহা তিনি মানবসমাজের উপর ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার নাটকের সর্বত্র মনুষ্যত্বের সমুন্নত গৌরবের কীর্তনে মুখরিত। ধর্মভাব না থাকিলেও তাঁহার নাটকে কোনস্থলে সবল্ এবং সুদৃঢ় নীতিবোধের অভাব ছিল না। এমন কিছুই তিনি দেখান নাই যাহা আমাদের অসৎ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় অথবা আমাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত এবং বিপথাশ্রয়ী করিয়া তুলে।৪ কিন্তু এরূপ অবিচল নীতিনিষ্ঠা

১। 'মানববুদ্ধির অতীত, যে সকল অতীন্দ্রিয় এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে, সহজাত সংস্কার বা পরিবেশ প্রভাবে, সচরাচর হিন্দু সন্তানের মনে একটা বিশ্বাস ও ধারণা বিদ্যমান দেখা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল তৎসমূহে তিলমাত্রও আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেন না।'

দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৬৮০।

২। 'দ্বিজেন্দ্রলাল'—দেবকুমার রায়চৌধুরী। পৃঃ ৬৯৪।

৩। 'পরপারে' দ্বিজেন্দ্রলালের মানসচরিত্র বিশ্বেশ্বরের মুখ দিয়া একস্থানে নাট্যকার বেশ ভালো ভাবে মনুষ্যত্বের গৌরব প্রচার করিয়াছেন—'ছি ছি! মানুষের নিন্দা কোরো না। মানুষ আমার ভাই! তার নিন্দাবাদ শুন্তে চাই না।'

পরপারে—১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য।

৪। শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়ের উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য—'কবি এইরূপ পুণ্যব্রত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন যে, উহাদের মধ্যে মনুষ্য হৃদয়ের কিংবা তাহার মেরুদণ্ডের অবসাদক কোনরূপ পরামর্শ বা ইঙ্গিত ইসারাও মুখ দেখাইতে পারেন নাই; নিঃসন্দেহে বলা যায়—'He uttered nothing base."

বঙ্গবাণী—পৃঃ ৩৫১।

সত্ত্বেও তাঁহার মধ্যে নীতিবাগীশ মনোবৃত্তির বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব ছিল না। সেইজন্য যাহারা ভ্রান্ত ও পতিত, অবাস্থাবিপাকে যাহারা সমাজচ্যুত, তাহাদের পুনরুত্থানের চিন্তা ও আশা তাঁহার নাটকের ছত্রে ছত্রে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাব ছিল। এই সতীসাধ্বীর দেশে নারীর দুঃখভোগ, আত্মবিলোপ ও নির্বিচার ভক্তির মহিমাই চিরকাল কীর্তিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল নারীর এই আদর্শ-গুলিকে খুব গৌরবান্বিত করিয়া দেখেন নাই। নারী জাতির অপমান, লাঞ্ছনা এবং দুর্ভোগের অবস্থাই তাঁহার চোখে বিশেষ করিয়া লাগিয়াছিল এবং সেইজন্য সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি নারীকে তেজস্বিনী, স্বাতন্ত্র্যময়ী করিয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত নারীচরিত্র অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকা নহে। হেলেন, জাহানারা, নূরজাহান, মহামায়া ইহারা প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী বীরাঙ্গনা, ইহারা পুরুষের কর্মক্ষেত্রে পার্শ্বচরী অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিনী। নারীত্বের এই অভিনব এবং আধুনিক আদর্শ তিনি শাস্ত্রশাসিত সমাজ হইতে পান নাই; নারী এবং পুরুষের সাম্যমূলক ইউরোপীয় শিক্ষা ও ভাবধারা হইতে লাভ করিয়াছিলেন।১

দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব বোধ হয় এইখানে যে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং বিরুদ্ধ ভাব-সংঘাতে অতিশয় প্রাণময় এবং আবেগবান হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পূর্ব পর্যন্ত আমরা বাংলা নাটকে দেখিয়াছি যে চরিত্রগুলি- নিতান্ত স্পষ্ট, এবং সহজ; হয় তাহারা অবিমিশ্র ভালো অথবা নিরবচ্ছিন্ন মন্দ। কিন্তু এইরূপ চরিত্রগুলিকে একবার দেখিলেই কোনো আগ্রহ ও কৌতূহলের অবকাশ থাকে না, তাহাদের অবধারিত পরিণতি যেন চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু মানুষের জীবন যে জলের ন্যায় স্বচ্ছ, স্পষ্ট নহে; ইহা যে গণিতের স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের ন্যায় অবিচল ও অপরিবর্তিত নহে, আধুনিক মনস্তত্ত্বে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মনোবিকলন তত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনায় মানুষের চেতন অচেতন স্তরের মধ্যে নানা বিরুদ্ধ এবং বিস্ময়কর ভাবের অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেও গভীর মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম সংঘাতগুলি অতি সযত্ন চেষ্টার সহিত প্রকাশ করা হইয়াছে। কোনো চরিত্রকে দেখিয়াই আমরা মনের মধ্যে একরূপ ধারণা করিয়া বসি, সেই চরিত্র যদি তাহার কথা এবং আচরণের দ্বারা অকস্মাৎ সেই ধারণার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয় তবে আমরা যেমন চকিত এবং চমৎকৃত হই, তেমনি আবার সেই চরিত্র সম্বন্ধে উত্তরোত্তর আগ্রহশীল হইয়া উঠি। লেখক অপ্রত্যাশিত ভাবের আঘাত দ্বারা আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন, আমরা যাহা ভাবিয়া রাখিয়াছি তাহাই চরম নহে, লোকচরিত্র সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতাই অভ্রান্ত এবং চূড়ান্ত তাহা মনে করিবার কারণ নাই। তিনি দুর্গাদাস ব্যতীত যেমন কোনো দোষাতীত আদর্শ

১। 'তিনি ভাবিতেন ও বিশ্বাস করিতেন যে, আবহমান কাল হিন্দু সমাজ নারীজাতিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা ও হতাদর করিয়া আসিতেছে। আজ যে আমরা এ সম্বন্ধে একটু মর্যাদাশীল হইয়াছি, সে শুধু বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম মাত্র; নতুবা, হিন্দু সভ্যতার চরমোন্নতির সময়েও আমরা ইহাদিগকে গৃহস্থ তৈজসপত্রের ন্যায় নগণ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছি।'

দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী—পৃঃ ৬৭৩-৬৭৪।

চরিত্র অঙ্কন করেন নাই, তেমনি পার্বতী ব্যতীত আর কোনো নির্জলা মন্দ চরিত্রও দেখান নাই। তাঁহার নূরজাহান, আরংজেব, সূর্যমল, চাণক্য—প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চরিত্র—বিচিত্র ভালোমন্দ দোষগুণের মিশ্রিত উপাদানে গঠিত। তাহাদের মধ্যে স্বর্গীয় সুষমা নাই, নারকীয় কালিমাও নাই তাহারা সম্পূর্ণ মানবীয় মহিমার অপূর্ব স্বাভাবিক শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

(দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের আধুনিকতার লক্ষণ আর একটি এই যে, তিনি প্রচলিত নাট্য সাহিত্যকে অনুসরণ করিয়া বিদূষক জাতীয় কোনো চরিত্র অঙ্কন করেন নাই। তিনি মাঝে মাঝে সাধারণ লোকের কথাবার্তার মধ্যে হাস্যরস সৃজন করিতে চাহিয়াছেন বটে, কিন্তু হাস্যরস কোথাও স্বাভাবিক ও স্ফূর্ত হয় নাই। হাসিতে হইলে একটু অবসর, একটু বিশ্রাম, দু' একটা আজে-বাজে কথা বলা দরকার ; কিন্তু যেখানে অবিরত যুদ্ধের রণ-দামামা বাজিতেছে, অস্ত্রের ঝনৎকার, যোদ্ধার বিজয় উল্লাস, আহতের আর্তনাদ চলিতেছে, সেখানে হাসিবার অবসর কোথায়? একটু আধটু হাসির সুযোগ আসিলে মনে হয় হাসাটা অন্যায়, কর্তব্যের ত্রুটি হইয়া যাইতেছে।) দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনের হাস্যরস লইয়া আমরা পরে আলোচনা করিব।

## (খ) প্রহসন

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলিই তাঁহাকে প্রথম সাহিত্য-দরবারে পরিচিত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার হাসির গানগুলি এককালে বিশেষ জনপ্রিয় এবং প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, এবং একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে তাঁহার প্রহসনের কৌতুক ও হাস্যরসের মূলেও গানগুলি রহিয়াছে। গানগুলি বাদ দিলে তাঁহার প্রহসন নীরস ও কৌতুকবর্জিত বোধ হইবে। উদ্ভট এবং বিস্ময়কর ঘটনা সমাবেশে যে হাস্যরস উদ্গত হইয়া উঠে দ্বিজেন্দ্রলাল সেই হাস্যরস সৃষ্টি করিবার অধিকারী ছিলেন না, দীনবন্ধু এবং অমৃতলালের ন্যায় সরস এবং কৌতুকাবহ বাক্য-নির্বাচন করিবার ক্ষমতাও তাঁহার আয়ত্ত ছিল না। বাক্যবিন্যাসের পাকে পাকে যে হাসি জড়াইয়া থাকে তাহা তাঁহার প্রহসনে নাই। তাঁহার প্রহসনে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাঁটাগুলি একটু তীক্ষ্ণভাবেই আছে। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো গোঁড়ামি এবং পক্ষপাত-দোষ ছিল না। প্রাচীন এবং নবীন উভয় সম্প্রদায়ের বিকৃতি ও অনাচারের প্রতি তাঁহার রোষ সমানভাবে ছিল। সেইজন্য তাঁহার আঘাতে কাহারো অসন্তুষ্ট ও অভিযোগী হইবার কারণ থাকে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রহসন 'কল্কি-অবতার' (১৮৯৫)। ইহা ছড়ার মত মিত্রাক্ষরে আদ্যন্ত রচিত। ইহাতে বিলাত ফেরত, ব্রাহ্ম, নব্যহিন্দু, গোঁড়া এবং পণ্ডিত এই পাঁচ সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে। পরিশেষে কল্কিদেব বিবদমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মিলন

ঘটাইয়া দিলেন, এবং সকলেই বুঝিল যে, বিশ্বাস, প্রেম এবং মনুষ্যত্বের উপরই সমাজের প্রকৃত ভিত্তি। প্রস্তাবনায় লেখক বলিয়াছেন যে তাঁহার কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি দ্বেষ কিংবা আক্রোশ নাই, এবং ইহা সত্য,—পরিহাসের মধ্য দিয়া সকলের ত্রুটি ও গলদ ধরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে শোধন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রহসনখানির মধ্যে ঘটনার কোনো অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ নাই, ইহা কাটা কাটা দৃশ্যের সমষ্টিমাত্র। নিতান্ত অসংলগ্নভাবে অকারণ চরিত্রের সমাবেশ করা হইয়াছে। নেগাত বাজে এবং অবাস্তব সংলাপও অনেক স্থলে অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে।

'বিরহ' (১৮৯৭) বিশুদ্ধ প্রহসন। ঘটনা সংস্থানের মধ্যে ইহার হাস্যরস নিহিত। উৎসর্গ-পত্রে লেখক বলিয়াছেন—'আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য – অল্পায়তনের মধ্যে বিরহের প্রকৃত হাস্যরস অংশটুকু দেখানো,' কিন্তু সেই উদ্দেশ্য উত্তমরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মিথ্যা ধারণা এবং ভ্রান্ত সন্দেহ নিরসনের মধ্য দিয়াই প্রহসনখানির কৌতুকরস ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু উপকাহিনীর রহস্যময় রোমান্সে প্রধান কাহিনী গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। 'বিরহে'র গানগুলি ইহার প্রধান সম্পদ।

'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০) আদ্যন্ত নিম্নস্তরের ভাঁড়ামিতে পূর্ণ। জায়গায় জায়গায় হাসির টুকরা ছড়াইয়া থাকিলেও অবিচ্ছিন্ন ঘটনা সংস্থানের মধ্যে হাস্যরস জমিয়া উঠে নাই। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের অলীকবাবুর ধরণে অঙ্কিত ডাক্তার ভূদেবের চরিত্রটী সর্বাপেক্ষা সরস।

'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২) প্রহসনে বিলাত-ফেরত, নব্যহিন্দু এবং শিক্ষিতা রমণীদের লইয়া উপহাস করা হইয়াছে। প্রহসনখানার ভাব এবং বিষয়ের উপর অমৃতলালের প্রভাব বিদ্যমান। শিক্ষিতা রোমান্সগ্রস্তা স্ত্রী-চরিত্রের হাস্যকর অসঙ্গতিও অমৃতলালের প্রহসনগুলি অনুসরণে অঙ্কিত। চম্পটির সহিত রেবেকার বিচ্ছেদে এবং ইন্দুমতীর বিবাহে অনর্থক একটি ঘোরালো সমস্যার সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহাতে হাস্যরসের সর্বব্যাপী আনন্দের ব্যাঘাত হইয়াছে। চম্পটি অকস্মাৎ কি ভাবে খাঁটি হিন্দু বনিয়া গেল তাহারও যথেষ্ট কারণ দেখানো হয় নাই।

॥ পুনর্জন্ম ( ১৯১১ ) ॥ 'পুনর্জন্ম' অনেক পরে রচিত হয়। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, ইহাতে নীতিকথার অভাব নাই। অবশ্য নীতিকথা শিক্ষা করিতে কেহ নাটক ও প্রহসন দেখিতে চায় না। নীতিকথার ছলে লেখক কি-রকম আমাদের হাসাইতে এবং আনন্দ দিতে পারিয়াছেন আমরা তাহাই জানিতে চাই। কৃপণ, দয়াহীন কুসীদজীবীর পরিণতি দেখানই যদি নাট্যকারের অভীষ্ট নীতিশিক্ষা হইয়া থাকে, তবে বলিতে আপত্তি নাই যে তাহা সার্থক হইয়াছে। যাদবের মুখ দিয়া এই নীতি ব্যক্ত হইয়াছে—'মরেছিলাম, এ আমার পুনর্জন্ম, আজ নূতন বিশ্বাস নিয়ে আবার বেঁচে উঠেছি। মৃত্যুর পরে যা যা ঘটবে আজ চক্ষের সম্মুখে তার অভিনয় দেখলাম'। যাদব চক্রবর্তী অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছে যে নিজেকে, আত্মীয়স্বজনকে বঞ্চিত করিয়া, এবং পরের শোষণের মধ্য দিয়া যে অর্থ সঞ্চিত হয় তাহা বিফলে ব্যর্থ হইয়া যায়, এই জ্ঞানই তাহার পুনর্জন্ম। দারোগা কনেষ্টবলের অহেতুক

অত্যাচারের স্বরূপ প্রকাশ করাও নাট্যকারের অন্যতম গৌণ উদ্দেশ্য। মারের চোটে ইহারা মিথ্যাকে কিভাবে সত্য প্রতিপন্ন করে তাহা যাদবের কথার মধ্য দিয়া বর্ণিত হইয়াছে—'যাক, শেষে রুলের তিন গুঁতোয় প্রমাণ হ'য়ে গেল যে আমি যাদব চক্রবর্তী নই, গুঁতার চোটে বাবা বলায়—এ ত তুচ্ছ কথা।' প্রহসনের এই অংশে হাস্যাস্পদ ব্যক্তি যাদব নহে, যাদব এখানে হাস্যরস-উদ্রেক্তা - নাট্যকারের মতের বাহন। অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত, উপহাস-কর্তা যাদব বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু দারোগা-কনেষ্টবল-ঘটিত দৃশ্যের পূর্বে যাদব নিজেই উপহাসাস্পদ ছিল, এবং যাদবের দুর্দশা ও নিজের পরিচয় পরিস্ফুট করিবার জন্য তাহার আত্যন্তিক ব্যগ্রতা দেখিয়া পাঠক ও দর্শকের মনে কৌতুক-রসের সৃষ্টি হয়।

জটিল এবং ঘোরালো ঘটনা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া হাস্যরস উদ্রেক করাই প্রহসনের লক্ষ্য। কিন্তু এই প্রহসনে তেমন ঘটনার জটিলতা ও রহস্যময়তা নাই। ঘটনার একই রূপ সংস্থানের মধ্যে চরিত্রগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রকৃত যাদব কিভাবে কৌতুকপূর্ণ ষড়যন্ত্রের ফলে নকল যাদব বনিয়া গেল তাহা দেখিয়া আমাদের হাসির উদ্রেক হয়। কোনো মন্দ, দুষ্ট লোকের শাস্তি এবং দুর্দশা দেখিলে আমাদের মনের মধ্যে একরকম প্রতিহিংসার চরিতার্থ-জনক আনন্দের উদয় হয়, যাদবের ভাগ্যবিপর্যয়েও আমরা সেই রকম আনন্দ বোধ করিয়া থাকি। যেভাবে 'দশচক্রে ভগবান ভূতে'র ন্যায় যাদব নকল প্রমাণিত হইয়া গেল তাহা অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃত মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রহসনের মধ্যে অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব ঘটনার অবতারণা দোষাবহ নহে, সেই দিক দিয়া আলোচ্য প্রহসনের কোন ত্রুটি নাই। নর্তকীঘটিত দৃশ্যটী নেহাত দর্শকের নিম্নরুচির পরিতৃপ্তির জন্য সংযোজিত হইয়াছে, মূল ঘটনার দিক দিয়া ইহা অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয়।

'পূনর্জন্মে'র পর 'আনন্দবিদায়' (১৯১২) রচিত হয়। বইখানার প্রচার না থাকিলেই ভালো হইত, কারণ ইহা লেখকের এক শোচনীয় ভ্রান্তির লজ্জাকর সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,সেই বিরোধের পঙ্কিল বারি-মন্থনে যে হলাহল উত্থিত হইযাছিল স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালকে তাহা গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল। 'আনন্দবিদায়' সুবিমল দ্বিজরাজের দুরপনেয় কলঙ্ক চিহ্নস্বরূপ।

## ( গ ) পৌরাণিক নাটক

দ্বিজেন্দ্রলাল যে তিনখানা পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছিলেন সেইগুলিকে যথার্থ পৌরাণিক নাটক বলা বোধ হয় সঙ্গত নয়। তাঁহার বস্তুবাদী, ইহসর্বস্ব মন পৌরাণিক ধর্মাদর্শ এবং দেবদেবী চরিত্রের অলৌকিক মহিমা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান ও আগ্রহপরায়ণ ছিল না। সেই-জন্য পুরাণ-অন্তর্গত কোনো ঘটনা এবং চরিত্র লইয়া নাটক লেখা আরম্ভ করিলেও তিনি সেই ঘটনা এবং চরিত্রকে আধুনিক বাস্তবের পরিদৃশ্যমান পটভূমিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

ইহাতে তাঁহার নাটক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমূলক মানবীয় ভাবাত্মক হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু অলৌকিক ভাবপূর্ণ আধ্যাত্মিক মহিমামণ্ডিত হইতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে ধর্মপ্লাবিত গিরিশ-যুগে আমরা পৌরাণিক নাটকের সর্বোচ্চ বিকাশ এবং পরিণতি লক্ষ্য করিয়াছি., এই যুগের পরে ভক্তিভাবাত্মক পৌরাণিক নাটকের প্রসার আর দেখা যায় নাই।

॥ পাষাণী ( ১৯০০ ) ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'পাষাণী'। নাট্যকার রামায়ণের অহল্যা-কাহিনীর এক সম্পূর্ণ অভিনব রূপ দান করিয়াছেন। অহল্যা নাটকের মধ্যে কোথাও পাষাণময় আকৃতি লাভ করেন নাই, সুতরাং 'পাষাণী' নামকরণ যথার্থ হয় নাই। পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে একেবারে সাধারণ মানবের স্তরে আনিয়া ফেলা হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র নাটকে কামার্ত লম্পট পুরুষ হইয়া পড়িয়াছেন। নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চরিত্র গৌতম। গৌতম প্রেম এবং ক্ষমার আধার, এবং সর্বপ্রকার দুঃখ ক্লেশে স্থির ও অবিচলিত। অহল্যা ভ্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও তিনি নির্বিকার প্রশান্তচিত্তে তাহাকে গ্রহণ করিয়া মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। অহল্যার যৌবনের নিষ্ফলতায় ও কামনার ব্যর্থতায় আমাদের সহানুভূতি উদ্রিক্ত হইলেও ইন্দ্রের প্রতি তাহার প্রেমের মধ্যে নির্লজ্জ লালসা যেন সর্পের ক্রূর জিহ্বার ন্যায় লকলক করিতে থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নাট্যকার ইহার পরিণতি ক্ষমাসুন্দর চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। অহল্যার পতনের জন্য তাহার দোষ আছে, কিন্তু অধিকতর দোষ শঠ, প্রতারক, লম্পট পুরুষ জাতির, ইহাই বেশি করিয়া দেখানো হইয়াছে। নারীজাতির প্রতি গ্রন্থকারের শ্রদ্ধা ও দরদ মাধুরী চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়। মাধুরী পতিতা হওয়া সত্ত্বেও সতী শিরোমণি, তাহার সহিষ্ণুতা ও পাতিব্রত্যের তুলনা নাই। কৌতুক-রসের প্রাচুর্য এবং গানের বাহুল্য নাটকখানির গম্ভীর রসের পরিপন্থী হইয়াছে।

॥ সীতা (১৯০৮) ॥ রামায়ণ এবং ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' অনুসরণ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল 'সীতা' প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার আধুনিক দৃষ্টিতে চরিত্রগুলিকে অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্য সাহসিকতার সহিত অনেক মৌলিক দৃশ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নাটকের গুণ বাড়িয়াছে বই কমে নাই। 'সীতা' মিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা, জায়গায় জায়গায় গৈরিশ ছন্দের অনুকরণ আছে। তবে কোনো ছন্দের মধ্যেই তেমন লালিত্য এবং সহজ সাবলীল গতি নাই। সংস্কৃত নাটকের প্রভাব থাকায় পাত্রপাত্রীদের উক্তিগুলি দীর্ঘ এবং বর্ণনাত্মক হইয়াছে, এবং সেই কারণেই নাটকখানি মাঝে মাঝে একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর বোধ হয়। সীতা-চরিত্রের মধ্যে গ্রন্থকার তাঁহার মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। চরিত্রটীকে অতুলনীয়রূপে মহনীয় এবং কমনীয় দেখাইবার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি স্থানে স্থানে স্বাধীনভাবে ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। তাঁহার সীতা বনবাসের কথা অবগত হইয়া স্বামীর সত্য রক্ষা করিবার জন্য স্বেচ্ছায় বনবাসিনী হইয়াছেন। তিনি সম্রাজ্ঞী হইয়াও সুখ ও বিলাসভোগে বিরত, স্বামীর সহিত তপোবনে যে সুখ ভোগ করিয়াছিলেন তাহার চিন্তায় বিভোর। রামের দ্বারা পরিত্যক্তা হইয়াও তিনি স্বামীর চিন্তা অনির্বাণ দীপশিখার ন্যায় নিজের অন্তরে জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। সীতার চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার

বনবাস এবং ক্লেশভোগের জন্য রামচন্দ্রের প্রতি দর্শকের বিরাগ আসা স্বাভাবিক। কিন্তু নাট্যকার কৌশলে বশিষ্ঠকে সমস্ত ব্যাপারের জন্য দায়ী করিয়া রামচন্দ্রের চরিত্র-মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। রামচন্দ্র সীতাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ জানিয়াও বশিষ্ঠের আজ্ঞায় তাঁহাকে বনবাসে পাঠাইয়াছেন, এবং পুনরায় বশিষ্ঠের নির্দেশেই শূদ্রকবধ রূপ অন্যায় কাজ করিয়াছেন। বাল্মীকি এবং বশিষ্ঠের আলোচনাকালে বশিষ্ঠের পরাজয়ে তিনি যে ভ্রান্ত ইহা নাট্যকার প্রমাণ করিয়াছেন।

॥ ভীষ্ম (১৯১৪)॥ দ্বিজেন্দ্রলাল তৃতীয় পৌরাণিক নাটকখানি অনেক পরবর্তী কালে রচিত হয়। ভীষ্ম পরিপক্ক লেখনীর পরিণত রচনা, ভাব ও ভাষার চমৎকারিত্ব নাটকের মধ্যে সুব্যক্ত। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগে এই নাটকেই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি সক্ষম হইয়াছেন। নাটকের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ভারতের এক উজ্জ্বল চিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে ; ইহাতে শৌর্যবীর্য, মহত্ত্ব-উদারতা, প্রেম-ক্ষমার চমৎকারী লীলা আমাদের দৃষ্টিকে বিহ্বল ও আবিষ্ট করিয়া রাখে। ভীষ্মের অনমনীয় সংকল্প, আকাশস্পর্শা উদারতা এবং সমুদ্রোপম বিশালতা নাট্যকার সশ্রদ্ধ নিষ্ঠার সহিত বিকাশ করিয়াছেন। কিন্তু চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত আমাদের আগ্রহ এবং আবেশ যেভাবে জমিয়া থাকে, পঞ্চম অঙ্কে যেন তাহা কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়া যায়। যে যুবক দেবব্রত পিতাকে সুখী করিবার জন্য এত চেষ্টা যত্ন করিলেন তাঁহাকে বৃদ্ধ পিতামহের বেশে দেখিলে আমাদের রসসাম্য নষ্ট হইয়া যায়। অম্বা এবং সত্যবতী এই দুইটি প্রধান স্ত্রী চরিত্রই করুণ এবং দুঃখময়। অম্বার উচ্ছ্বসিত, অবারিত প্রেম বার বার ভীষ্মের অটল সংকল্পে আঘাত খাইয়া ব্যর্থ হইয়াছে। পদস্পৃষ্টা ফণিনীর ন্যায় সে প্রতি-হিংসার ক্রুদ্ধ বিষ ভীষ্মের উপর ঢালিয়াছে। কিন্তু সত্যবতী তাহার প্রতি অবিচারের জন্য কাহারও উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পাবে নাই। নিষ্ফল আক্রোশে কেবল নিজের গাত্র দংশন করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। যে-অনন্তযৌবনা হস্তিনার সম্রাজ্ঞী ক্ষমতা ও প্রভাবের অহঙ্কৃত আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, সেই পরে সকলের উপেক্ষিত, ঘৃণিত ও অনুকম্পার পাত্রী হইয়া পড়িল। তাহার এই শোচনীয় পরিণাম বিশেষ ট্র্যাজিক হইয়াছে। ট্র্যাজেডির এই ঘনকৃষ্ণ মেঘের মধ্যে হাস্যময়ী বিদ্যুৎলতা অম্বিকা এবং অম্বালিকা চকিত দীপ্তিতে আমাদের অন্তঃকরণ উদ্ভাসিত করিয়া রাখে।

## (ঘ) ঐতিহাসিক নাটক

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে পূর্বে সাধারণভাবে আলোচনা হইয়াছে। 'চন্দ্রগুপ্ত' ব্যতীত অন্যান্য নাটকগুলির কাহিনী মোগল আমলের ইতিহাস হইতে লওয়া হইয়াছে। তিনি বিশেষ সাবধান এবং সত্যনিষ্ঠ হইয়া ইতিহাস অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং কেবল নাটকের প্রয়োজনে ইতিহাসের প্রচলিত কাহিনীর ব্যতিক্রম অথবা বিকৃতি করেন

নাই।১ কিন্তু নাটক ইতিহাসের নীরস ঘটনার শুষ্ক অস্থিপঞ্জর নহে, ইহা রূপে-রসে সমৃদ্ধ সৌন্দর্যবান, প্রাণবান দেহ। নাট্যরসকে জমাইয়া তুলিতে হইলে ঘটিত কাহিনী এবং চরিত্রের কোনো স্থানে বর্জন করিয়া, আবার কোনো স্থানে অতিরিক্ত ভাব ও বিষয়ের সমাবেশ করিতে হয়।২ সেইজন্য জায়গায় জায়গায় ইতিহাসের ব্যতিক্রম এবং অতিক্রম নাটকের দিক দিয়া দোষাবহ নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক আলোচনার পূর্বে এই কথাটী স্মরণ রাখা উচিত।

॥ তারাবাই (১৯০৩)॥ 'তারাবাই' দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। যে-যুগে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখিতেছিলেন ইহা সেই যুগের নাটক। ঐতিহাসিক নাটক লেখার দক্ষ ক্ষমতা তখনো তাঁহার আয়ত্ত হয় নাই, সেইজন্য ইহার মধ্যে অনেক দোষ-ত্রুটি পরিস্ফুট। অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁহার অধিকার ছিল না, লম্বা ক্রিয়াপদের প্রয়োগে তাহা নিতান্ত শ্রুতিকটু হইয়াছে। নাট্যকার রাজস্থানে বর্ণিত বিবরণের অবিকল অনুসরণ করিতে যাইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রাজস্থানের বিবরণের মধ্যে নানা ঘটনার বিক্ষিপ্ততা রহিয়াছে। ঐ বিক্ষিপ্ততা নাটকীয় রসের অবিচ্ছিন্ন সমগ্রতা নষ্ট করিয়াছে। নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র হইতেছে সূর্যমল এবং তাহার স্ত্রী তমসা। ইহাদের উপর সম্ভবত ম্যাকবেথ এবং লেডি ম্যাকবেথের প্রভাব পড়িয়াছে। ম্যাকবেথের ন্যায় সূর্যমল রাজ্যলাভের উচ্চাশা পোষণ করিয়াছে, এবং ডাইনীদের ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় চারণীর ভবিষ্যদ্বাণী সেই উচ্চাশাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। লেডি ম্যাকবেথের মত তমসাও দ্বিধাগ্রস্ত চিত্ত উত্তেজিত করিয়া দৃঢ় এবং কঠোর করিতে পারিয়াছে। সূর্যমলের মধ্যে যে নিরুপায় এবং ইতস্ততঃ ভাব, রাজ্যলিপ্সা এবং বাৎসল্যের যে তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাতে চরিত্রটী আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। পৃথ্বীরাজ এবং তারার কাহিনী নাটকের মধ্যে গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। এই নাটক রচনার সময় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন এবং হাসির গানের প্রভাব শেষ হইয়া যায় নাই, সেইজন্য জায়গায় জায়গায় কৌতুকরসের উচ্ছ্বাস ইহাতে রহিয়াছে। পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটকের সংহত গাম্ভীর্য এবং অপচল ভাবাবেগ এখনো আসে নাই।

১। 'তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি অতি সাবধানতার সহিত লিখিত। কোন স্থানেই তিনি ইতিহাসকে একেবারে অতিক্রম করেন নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব, মাত্র সেখানেই তাঁহার মোহিনী কল্পনা অতি নিপুণতার সহিত বর্ণপাত করিয়াছে।' দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৭৫৪।

২। 'His task is, not to paint a copy of some contemporary or 'historical' personage, but to conceive a particular kind of man, acting under the operation of particular circumstances. This conception growing and modifying itself with the progress of the action, also invented by the dramatist, will determine the totality of the character which he creates,'

*Encyclopaedia Britannica* (Cambridge Edition.)

॥ প্রতাপসিংহ ( ১৯০৫ ) ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটকের যুগ আরব্ধ হয় 'প্রতাপসিংহ' নাটকের সময় হইতে। 'প্রতাপসিংহ' হইতেই মহাব্রতনিষ্ঠ, স্বদেশী ভাবরঞ্জিত নাটকীয় যুগের সূচনা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠতম সৈনিক প্রতাপের অতুল বীরত্ব, অনুপম দেশপ্রেম এবং অলৌকিক ত্যাগের চিত্র নাট্যকার সশ্রদ্ধ নিষ্ঠার সহিত ফুটাইয়া তুলিলেন। আধুনিক ধারণায় প্রতাপের সূক্ষ্ম কুলমর্যাদা-বোধ সমর্থনীয় না হইতে পারে, কিন্তু স্বদেশ রক্ষার জন্য এরকম আপ্রাণ, অবিচ্ছিন্ন চেষ্টা কে কোথায় দেখিয়াছে ? সংকল্প-সাধনের জন্য এরূপ দুঃসহ ক্লেশ বরণ করিতে, অসাধ্য ত্যাগ স্বীকার করিতে আর কে কবে পারিয়াছে ? তাঁহার মত দুঃখময় জীবনও বা আর কাহার দেখা গিয়াছে ? রাজা হইয়াও তিনি দীনের হইতে দীন, বংশগৌরব রক্ষার চেষ্টায় তিনি বহু শ্রেষ্ঠ রাজপুত বীরের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইযাছেন, নিজের ভাই শক্তকে পাইয়াও ছাড়িয়াছেন, অন্যায়ের শাস্তি দিতে যাইয়া নিজের পতিপ্রাণা স্ত্রীকে পর্যন্ত হারাইয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের বেদনাময় গৌরব আমাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। প্রতাপের পরই তাঁহার ভ্রাতা শক্তসিংহের চরিত্র উল্লেখ-যোগ্য। শক্তের উল্লেখ রাজস্থানে থাকিলেও ইহার চরিত্রবৈশিষ্ট্য গ্রন্থকারের নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টি। সে বীর, উদ্ধত, বিদ্বান এবং ব্যঙ্গপ্রিয়। জীবনের প্রতি তাহার আসক্তি নাই ; সমাজ ও ধর্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নাই ; প্রেম এবং হৃদয়বৃত্তির সুকোমল লীলার প্রতি তাহার কোনো আকর্ষণ নাই। কিন্তু তাহার চিত্তও অবশেষে দৌলতউন্নিসার প্রেমে বশীভূত হইল। প্রেমের এই মহিমময়ী বিশ্ববিজয়িনী শক্তি লেখক দেখাইয়াছেন। দৌলতউন্নিসা এবং মেহেরউন্নিসার চরিত্র বিশেষ সরসভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। উভয়েই শক্তসিংহকে ভালোবাসিয়াছে, কিন্তু একজন বৃক্ষের ন্যায় স্থির এবং নির্বাক এবং আর একজন তটিনীর ন্যায় চঞ্চল এবং মুখর। তবে মেহেরউন্নিসার পিতার সহিত বিরোধ এবং প্রতাপের আশ্রয় গ্রহণের কোনো জোরালো কারণ নাই, শক্তসিংহের প্রতি তাহার প্রেমও অর্থহীন, তাহার নিজের কথায় ছাড়া ইহা আমরা জানিতে পারি নাই, এবং এই প্রেমের প্রভাবও কোনো স্থলে পরিস্ফুট হয় নাই। আকবরের চরিত্রে লেখক ভালোমন্দের সমাবেশ করিয়াছেন। আকবর উদার ও গুণগ্রাহী, কিন্তু তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং নারীদ্বেষী।

॥ দুর্গাদাস (১৯০৬) ॥ 'দুর্গাদাস' নাটকে ঘটনার অতিরিক্ত আধিক্যে নাটকের ঐক্য এবং সংহতি নষ্ট হইয়াছে। বহুতর চরিত্রের বৈচিত্র্যে এবং নানা ঘটনার বিভিন্নমুখিতায় কোনো বিশেষ কাহিনীর প্রভাব মনের মধ্যে রহিয়া যায় না। জয়সিংহ-কমলা-সরস্বতীর আখ্যান অপ্রয়োজনীয়, শম্ভুজীর ঘটনাও পরিহার্য। সস্তা বীররসের অবতারণায় নাটকের গুরুত্ব এবং গাম্ভীর্য অনেক সময়ে নষ্ট হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের উদারতা এবং অপক্ষপাত-গুণ কাশিম এবং দিলীর খাঁর চরিত্রাঙ্কনে প্রমাণিত হইয়াছে। দিলীর খাঁর মুখ দিয়া তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের অনেক কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। দুর্গাদাসকে তিনি দোষ-দুর্বলতার অতীত আদর্শ চরিত্র করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ইহাতে চরিত্রটী একটু অস্বাভাবিক

এবং অমানবীয় হইয়া পড়িয়াছে। লেখক তাহাকে ট্র্যাজিক চরিত্র বলিতে চাহিয়াছেন।১ কিন্তু ট্র্যাজেডির আবেগময়, বেদনাময়, নিষ্ফল ভাব নাটকের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠে নাই। ঔরংজীবের শেষ বয়সের চিত্র নাটকের মধ্যে দেখানো হইয়াছে। অবশ্য তাহার ক্রূর, কুটিল, দ্বন্দ্বময় চরিত্রের পূর্ণতর রূপ আমরা 'সাজাহান' নাটকে দেখিতে পাইব। এই নাটকেও তিনি কপটী, ধর্মদ্বেষী, গোঁড়া ইসলাম-রক্ষক বটে; কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনের ব্যর্থতা এবং বিষাদময়তা তাঁহার চরিত্রকে করুণ করিয়া তুলিয়াছে।২ এখানে তিনি বলবীর্য এবং প্রভুত্বের গর্বিত আসনে অধিষ্ঠিত নহেন, তিনি রাঠোর এবং রাজপুতের কাছে পরাজিত, দুর্গাদাস এবং দিলীর খাঁর দ্বারা উপেক্ষিত এবং গুলনেয়ারের কাছে ঘৃণাস্পদ। অমিত শক্তিমান ঔরংজীব যেন ইহাদের কাছে নিতান্ত দুর্বল ও ছোট হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাদের দমন করিবার, শাস্তি দিবার ক্ষমতা যেন তাঁহার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ভূমিকা গুলনেয়ারের। ক্লাইটেমনেষ্ট্রা এবং গনেরিলের ন্যায় সে প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী, ইন্দ্রিয়লালসাময়ী নারী চরিত্র। তাহার দুর্দম প্রবৃত্তি প্রচ্ছন্ন চোরাপথে বিচরণ করে না, ইহা ঘূর্ণি হাওয়ার ন্যায় সকলের রোষ ও শাসন উড়াইয়া দিয়া বহিয়া যায়; সে গুরুতর অন্যায় করিয়াও কোনো দিন মাথা হেঁট করে নাই, সম্রাজ্ঞীর দৃপ্ত ভঙ্গিমায় নিজেকে সর্বনাশের মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়াছে।

॥ নুরজাহান (১৯০৮) ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি কোন্‌খানি এ বিষয়ে বিতর্ক হইতে পারে; কিন্তু অনেকেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, ট্র্যাজেডির বিস্তৃতি ও জটিলতা যেমন 'সাজাহানে' সর্বাপেক্ষা বেশি, ট্র্যাজেডির তীব্রতা ও গভীরতা তেমনি 'নুরজাহানে' সকলের তুলনায় অধিক। 'সাজাহানে'র ট্র্যাজেডি সঞ্চারিত হইয়াছে সাজাহান, ঔরংজীব, দারা, সুজা, মহম্মদ, সোলেমান প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে, কিন্তু 'নুরজাহানে'র ট্র্যাজেডি নুরজাহানের চরিত্র অবলম্বন করিয়াই অনন্য মহিমা লাভ করিয়াছে। সেজন্য আলোচ্য নাটকখানি শুধু মাত্র নায়িকা নামাঙ্কিত নহে, সেই নায়িকা পরিপূর্ণভাবে ট্র্যাজিক গৌরবে অধিষ্ঠিত। বাংলা সাহিত্যের আরও অনেক ঐতিহাসিক নাটক নায়িকা নামাঙ্কিত বটে, যথা—'কৃষ্ণকুমারী', 'অশ্রুমতী', 'সরোজিনী' ইত্যাদি; কিন্তু এই সব নাটকের ট্র্যাজিক গুরুত্ব

১। 'ইহার ট্র্যাজিডিত্ব চির জীবনের উপাসনার নিষ্ফলতায়, আজন্ম সাধনার অসিদ্ধতায়, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত চেষ্টার পরাজয়ে। ইহার ট্র্যাজিডিত্ব ঐ এক কথায়—'ব্যর্থ হয়েছে—পারলাম না, এ জাতিকে টেনে তুলতে'।

'ভূমিকা'—দুর্গাদাস।

২। তাঁহার শেষ জীবন সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

'The last years of his life were inexpressibly sad...His domestic life too, was loveless and dreary, and wanting in the benign peace and hopefulness which throw a halo round old age. A sense of unutterable loneliness haunted the heart of Aurangzib in his last years.'

*Aurangzib's Reign*—Sir Jadunath Sarkar, P. 22.

নির্ভর করিয়াছে অন্যান্য চরিত্রগুলির উপরে, নায়িকাদের সুকোমল জীবন নীরব দুঃখভোগের মধ্য দিয়া করুণ হইয়াছে, কিন্তু ট্র্যাজিক হইতে পারে নাই। কিন্তু নুরজাহান ইহাদের ব্যতিক্রম, বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে ইহার ন্যায় সংঘাততাড়িত ট্র্যাজিক নারী-চরিত্র আর একটিও নাই। সমালোচক-প্রবর নিকল বলিয়াছেন যে, ট্র্যাজেডির প্রধান চরিত্র যদি নারী হয়, তবে সেই নারীকেও পুরুষায়িত হইতে হইবে।১ স্নেহ, মমতা, করুণা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি নারীর কোমল গুণ বটে; কিন্তু ট্র্যাজেডির জন্য চাই নির্মম কাঠিন্য, নিষ্করুণ আঘাত ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। সাধারণ নারীর মধ্যে এগুলি সুলভ নহে। কেবল অসাধারণ নারী-চরিত্রের মধ্যে এই গুণগুলি আশ্রয় লাভ করিতে পারে এবং জগতের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি লেখকগণ —ইউরিপিডিস, শেক্‌স্‌পীয়র, কিংবা ইবসেনের নাটকেই ইহাদের স্থান হইতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলালের নুরজাহানও এরূপ একটি অনন্যসাধারণ চরিত্র—ভারতের সর্বময়ী অধীশ্বরী ছিল বলিয়া নহে, দারুণতম অন্তঃসংঘাতের মধ্য দিয়া তাহার জীবন একান্ত দুঃখময় ট্র্যাজিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে বলিয়াই সে অনন্যসাধারণ। সে মিডিয়ার ন্যায় প্রতিহিংসাময়ী, লেডি ম্যাকবেথের ন্যায় অপ্রকৃতিস্থ ও হেড্ডা গ্যাবলারের ন্যায় দুর্দম প্রবৃত্তির বশীভূত। কিন্তু এ্যাগামেমনন-পত্নী ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রার সহিত তাহার সাদৃশ্য সর্বাপেক্ষা বেশি। ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রার ন্যায় বীর ও উদার স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীহন্তাকেই সে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রার ন্যায় সেও কন্যার নিকট হইতে শত্রুর আঘাত পাইয়াছে এবং অন্তত ইউরিপিডিসের ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রার ন্যায় ('Electra' নাটকে) সেও তাহার অন্যায় অপরোধ সত্ত্বেও আমাদের বেদনা-করুণ সহানুভূতির পাত্রী হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালও ইউরিপিডিস ও ইবসেনের ন্যায় তাঁহার নায়িকা চরিত্রে আদিম প্রবৃত্তির নিষিদ্ধ লীলা দেখাইয়া তাহাকে ঘৃণ্য করিয়া তোলেন নাই, এক উদার ক্ষমা-করুণ সহানুভূতির যোগ্য করিয়াই তুলিয়াছেন। নুরজাহান শুধুমাত্র ক্ষমতা-লোভী, লালসাময়ী শয়তানী নহে; সে দুর্দমনীয় আবেগ ও দুষ্প্রতিরোধনীয় বিবেকের নিষ্ঠুর সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত এক অসহায় নারী। ইউরিপিডিসের মিডিয়ার ন্যায় সম্ভবত তাহার রক্তাক্ত হৃদয় আর্তনাদ করিয়াছে—

'Oh,
Of all things upon earth that bleed and grow
A herb most bruised is woman'

সমগ্র নুরজাহান নাটকের মধ্যে আমরা যেন একটি ক্রুদ্ধ ঝটিকার উন্মত্ত অভিযান লক্ষ্য করি। সেই ঝটিকার রক্তচক্ষু ও পক্ষবিস্তারের আভাস প্রথম দৃশ্যেই দেখি এবং শেষ দৃশ্যে তাহার দলিত, বিধ্বস্ত, সর্বহারা রূপ চতুর্দিকে আতঙ্ক বিস্তার করিয়া প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে।

১। The central figure. then of all great tragedies will be a man, or else a woman who like Lady Macbeth or Iphigenia or Medea, has in her temper some adamant qualities and severity of purpose not ordinarily associated with the typically feminine.'
—*The Theory of Drama*, P. 157.

প্রথমেই প্রকাশিত হইল নুরজাহান ও শের খাঁর সুখের দাম্পত্য-চিত্র। নুরজাহান তাহার জীবনের পঙ্কিল আবর্তকে তলদেশে নিরোধ করিয়া তাহার সংসারের সম্মুখে মমতা ও কর্তব্যের এক পূর্ণ বিকশিত পদ্ম মেলিয়া ধরিয়াছিল। সেই পদ্মের সুরভিত সৌন্দর্যে সরল, পত্নীপ্রাণ শেরখাঁর জীবন আত্মহারা হইয়া ছিল। কিন্তু আচমকা ঝড়ের তাড়নায় সেই নিশ্চিন্ত, হাস্যময় পদ্মটি দুলিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সেলিম ভারতের সম্রাট, শেরখাঁর পাঁচ হাজারীর পদ—কিন্তু নুরজাহানের অন্ধকার চিত্ততলে অবরুদ্ধ শয়তানীটির দাপাদাপি সুরু হইয়া গেল। এক উৎসব-চঞ্চল রাতের কামনা-বিলোল কটাক্ষের মধ্য দিয়া এই শয়তানীটি তাহার অন্তরের সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করিয়াছিল, বহুদিন ধরিয়া সেখানে সে নিঃসাড় হইয়াছিল, কিন্তু আবার তাহার ক্ষুধার্ত হুঙ্কার শোনা গেল। আগ্রায় আসিবার পরে পুনরায় সেলিমের সহিত তাহার চোখাচোখি হইল। শয়তানীটির মত্ততা আরও বাড়িয়া গেল। তাহার নখ ও দাঁতের তীক্ষ্ণ আঘাত-বেদনা বুঝি নুরজাহানের বাহ্য আকৃতির মধ্যেও ফুটিয়া উঠিল, সরল ও ক্ষমাশীল শের খাঁর দৃষ্টিও তাহা ধরিয়া ফেলিল। একদিকে স্বামীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধামিশ্রিত আনুগত্য, অন্য দিকে একটি দুর্দম ভোগলোলুপ জিগীষা—এই দুইয়ের প্রাণঘাতী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সে স্বামীকে লইয়া বর্ধমানে পলাইয়া আসিল। তাহার বিবেক বাঁচিল, তাহার সংসারও বাঁচিল। কিন্তু বর্ধমানে আসিয়াই সে বুঝিল, এ তাহার আত্মরক্ষা নহে, এ তাহার আত্মপ্রবঞ্চনা; কারণ অবদমিত হৃদয়াবেগ ততক্ষণে হতাশ আক্ষেপে তাহার অন্তর আকুল করিয়া তুলিয়াছে। শেরখাঁর সঙ্গে শেষ কথাবার্তার সময়ে সে স্বামীর পদে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। এ তাহার অপরাধ নহে, এ তাহার নিরুপায় পরাজয়। ইহার পর শেরখাঁ হত হইল, নুরজাহান আগ্রার প্রাসাদে আনীত হইল, কিন্তু সমস্যা তবুও মিটিল না। বাহিরের দিক দিয়া নুরজাহানের পথ উন্মুক্ত হইল বটে, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া সেই পথ আরও বিঘ্নিত হইয়া উঠিল। নুরজাহান অঙ্কুশ-আঘাতে দিবারাত্র তাহার মনকে তাড়না করিয়া স্বামীর মৃত্যুর জন্য তাহাকেই পরোক্ষভাবে দায়ী করিতে লাগিল এবং জীবনে যে স্বামীকে অন্তর দিয়া ভালবাসিতে পারে নাই, মৃত্যুর পর তাহারই স্মৃতির প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিয়া স্বামীহন্তার বিরুদ্ধে এক ক্ষমাহীন আক্রোশ জাগাইয়া রাখিল, অথচ যখন আগ্রার অবরোধ হইতে মুক্তির সুযোগ ঘটিল তখনই এক অনির্দেশ্য বেদনায় তাহার মন হতাশ হইয়া পড়িল। আশ্চর্য মানুষ, আর তাহা অপেক্ষাও আশ্চর্য মানুষের মন! ইহার পর পুনরায় তাহার সম্মুখে প্রলোভনের পসরা তুলিয়া ধরা হইল—আত্মত্যাগী রেবা ও স্বার্থবাদী আসফ এই পসরা লইয়া আসিলেন। নুরজাহানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তীব্র দাহ জ্বলিয়া উঠিল। তাহার ভিতরে, বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে সর্বত্রই এই দাবদাহ। সে কোথায় পলাইবে? অবশেষে সে সেলিমকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল, নিজের লালসা-তৃপ্তির জন্য নহে, স্বামীহন্তার উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য। যে ভূমিকম্পে সে নিজে কাঁপিতেছিল তাহা এখন সমগ্র রাজ্যখানিকে কাঁপাইতে সুরু করিল। যে শয়তানীটি এতকাল তাহার অন্তরের মধ্যে ছিল এখন তাহারই হাতে সে ক্ষমতার রজ্জু তুলিয়া দিল।

মনে রাখিতে হইবে, ইহাতে প্ররোচনা ছিল তাহার ভাই আসফের ও প্রাথমিক সহযোগিতা ছিল তাহার কন্যা লয়লার। কিন্তু যখন সেই শয়তানীটি সর্বনাশের অতল-পথে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল, তখন আসফ ও লয়লা ফিরিয়া গেল কিন্তু ফিরিবার উপায় ছিল না নুরজাহানের। এই অনিবার্য শক্তির দ্বারা তাড়িত হইয়া সে চারিদিকে নির্বিকার কাঠিন্যের সহিত ধ্বংস ও মহামারীর বীজ ছড়াইতে লাগিল। এই সর্বব্যাপী ধ্বংসলীলার শোষণে তাহার নারীত্ব ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া গেল এবং যে শ্রদ্ধাশীল পতিনিষ্ঠার প্রেরণাতে ইহার উৎপত্তি তাহাও নিঃশেষে শুকাইয়া গেল। যে আগুন সে পরের ঘর পুড়াইবার জন্য জ্বালিয়াছিল তাহা তৃষার্ত জিহ্বা প্রসারিত করিয়া তাহার নিজের ঘরখানিকে নিঃশেষ করিয়া অবশেষে তাহাকেও লেহন করিয়া লইল। দুই একবার হাত-পা আছড়াইয়া নিজেকে সে রক্ষা করিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। শেষ দৃশ্যে এই অগ্নিদগ্ধ নুরজাহানের অপ্রকৃতিস্থ আর্তনাদ এক আতঙ্কিত বেদনায় আমাদের অন্তঃকরণ স্তব্ধ করিয়া দেয়।

এ্যারিস্টোটল বলিয়াছেন, ট্র্যাজিক চরিত্রগুলি ভালো (good) হইবে।১ নুরজাহানের চরিত্রও আলোচনা করিয়া আমরা দেখিলাম, সে অবিমিশ্র পিশাচী কি শয়তানী নহে; স্বাভাবিক নারী-সুলভ গুণ ও ধর্মজ্ঞান তাহার মধ্যেও আছে। কিন্তু দুর্দম প্রবৃত্তির আকর্ষণে সেগুলি তাহার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। এজন্যই তাহার চরিত্র ট্র্যাজিক মহিমা লাভ করিয়া আমাদের সহানুভূতির যোগ্য হইতে পারিয়াছে। 'নুরজাহান' নাটকে যেভাবে আদিম প্রবৃত্তির ক্রিয়াচঞ্চল রূপ দেখান হইয়াছে এবং যেভাবে চরিত্রের অভ্যন্তর হইতে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে নাটকখানি শেকসপীয়রের ট্র্যাজেডির সহিত সমজাতীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি চরিত্রের মূল হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহাতে একটি অনিবার্য, অপ্রতিরোধনীয় শক্তির অদৃশ্য লীলা থাকিবেই, তাহা না হইলে ট্র্যাজেডি আমাদের অন্তরে এরূপ সীমাহীন হাহাকার উদ্রেক করিত না। এমন কি শেকসপীয়রের নাটকেও আকস্মিক ঘটনাযোগ, আত্যন্তিক দুর্ভাগ্য প্রভৃতি স্থান লাভ করিয়াছে।২ নুরজাহান নাটকেও ট্র্যাজেডির জন্য দায়িত্ব নুরজাহানেরই সর্বাপেক্ষা বেশি, কিন্তু তবুও ইহাতে কি অনিবার্য শক্তির অলঙ্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ-লীলা বারবার অনুভূত হয় নাই? সে পরোক্ষভাবে শেরখাঁ ও জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর জন্য দায়ী। অথচ ইঁহাদের কাহারও মৃত্যু তো তাহার ঈপ্সিত ছিল না, কারণ ইঁহাদের একজনের নিকট হইতে সে পাইয়াছিল সংসার আর একজনের নিকট হইতে সাম্রাজ্য। নাটকের ট্র্যাজেডির জন্য তাহারই দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক সন্দেহ নাই; কিন্তু জাহাঙ্গীর, আসফ, লয়লা প্রভৃতি সকলেরই

১। ...the most important is that they should be good'

—Poetics.

২। 'Shakespeare, however, never relies entirely on the 'tragic flaw' to bring his heroes to ruin. The irony of coincidence, sheer bad luck, always has a hand in the action' —Discovering Drama by Elizabeth Drew, P. 179

কিছু কিছু দায়িত্ব যে আছে তাহাও তো অস্বীকার করা যায় না। ট্র্যাজেডির জগৎ এই সর্বগ্রাসী ভুল ও দুঃখের জগৎ। এখানে সকলেই তাহাদের ভাব ও আচরণের দ্বারা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বাভাবিক ব্যবস্থাকে উল্টাইয়া দেয়—এবং সকলেই এক অলঙ্ঘ্য দুঃখ-পরিণতির দিকে অনিবার্যবেগে অগ্রসর হয়। ট্র্যাজেডির এই অন্তহীন, নিষ্কৃতিহীন সর্বময়তা 'নুরজাহান' নাটকে ফুটিয়াছে। বাহ্যত নুরজাহানের পরাজয় ও পতন ঘটিল মহবৎ-সাজাহান কর্ণসিংহের কাছে। কিন্তু আসলে তাহার বড় পরাজয় ঘটিল অন্তরের মধ্যে—সে পরাজয় তাহার শয়তানী সত্তার কাছে নারীসত্তার। নুরজাহান যতই একটির পর একটি অন্যায় কাজ করিয়াছে ততই তাহার অন্তরতম নারীসত্তা নিরুপায়ভাবে আর্তনাদ করিতে করিতে ক্ষয়িষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সেই শয়তানী-সত্তাটির বিলোপ ঘটিল আর তখন বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িল তাহার অন্তরসত্তাটি—দেখিলাম, পরাজিত, ক্ষত-বিক্ষত, অপ্রকৃতিস্থ একটি নারী। উপরের দেবতা তাহাকে শাসন করিবার জন্য ঝড়ের গর্জন ও বিদ্যুতের কশাঘাত সুরু করিয়াছেন, নীচের মানুষ তাহাকে দমন করিবার জন্য তাহার শক্তি ও দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাকে সহায়-সম্বলহীনা এক ভিখারিণী করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা অপেক্ষা হৃদয়বিদারক দৃশ্য আমরা আর কোথায় দেখিয়াছি?

শেরখাঁ ও জাহাঙ্গীর এই দুইটি চরিত্র পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি গূঢ় সাদৃশ্য আছে। নারীর প্রেমতৃষ্ণা উভয়ের জীবনের করুণ পরিণতি ঘটাইয়াছে। শেরখাঁ স্বেচ্ছায় ঘাতকের কাছে মৃত্যু বরণ করিলেন আর জাহাঙ্গীর তিল তিল করিয়া নিজের জীবনকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। শেরখাঁ অমিত-শক্তিশালী বীর, কিন্তু তাঁহার উদার হৃদয়ের সবখানি জুড়িয়া এক সীমাহীন ভালোবাসা ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু সেই ভালোবাসা নুরজাহানের শুষ্ক-কুণ্ঠিত হৃদয়ে আহত হইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। শেরখাঁর অভিমান-ক্ষুব্ধ অন্তর একটু নালিশ করিল না, একটি কথা বলিল না, মৃত্যুর মধ্য দিয়া এক ব্যথামৌন দীর্ঘশ্বাস চিরকালের জন্য নুরজাহানের চিত্তলে সঞ্চিত করিয়া রাখিল।

জাহাঙ্গীরের চরিত্র আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় মনে হইলেও, আসলে তাঁহার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব-লীলা দেখা গিয়াছে। তাঁহার একটি অভিমান ছিল যে, তিনি ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু এই ন্যায়পরায়ণতা বার বার তাঁহার দুর্দমনীয় রূপতৃষ্ণার কাছে পরাজিত হইয়াছে। তিনি জানেন, অন্যের বিবাহিতা পত্নীর প্রতি লোভ করা অন্যায়; তিনি জানেন শেরখাঁকে বিনা কারণে হত্যা করা অপরাধ। কিন্তু তবুও তিনি কঠোরভাবে নিজেকে নিবৃত্ত করিতে পারেন না। নুরজাহানের ক্ষমতা-প্রাপ্তির পর তাঁহার একটির পর একটি নৃশংস কাজে জাহাঙ্গীরের ন্যায়বোধ তীব্রভাবে আহত হইয়াছে, অথচ প্রতিরোধ করিবার আগ্রহ ও শক্তি তাঁহার নাই। সেজন্য নিজের জাগ্রত বিবেকবুদ্ধিকে জোর করিয়া নিস্তেজ করিবার জন্য তিনি আরও বেশি মদ খাইয়াছেন, আরও অধিক সম্ভোগ-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, 'সুরা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীত আমায় ঘিরে রাখুক। আর তার উপর তুমি তোমার রূপ, কণ্ঠস্বর, আলিঙ্গন

দাও প্রিয়ে। চক্ষু থেকে পৃথিবী নিভে যাক।' এই সব কথার মধ্যে পরিতৃপ্ত সৌন্দর্য কামনা নাই, ইহাদের মধ্যে এক মরণাকাঙ্ক্ষী লোকের অন্তিম বেদনা ধ্বনিত হইয়াছে।১

নুরজাহানের কন্যা লয়লা নাটকের মধ্যে নুরজাহানের এক প্রতিদ্বন্দ্বিনী শক্তিরূপে বিরাজ করিয়াছে। লয়লার সহিত গ্রীক নাটকের ইলেকট্রা চরিত্রের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। ইলেকট্রার ন্যায় লয়লাও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে সঙ্কল্পবদ্ধ এবং মাতৃঅপরাধের প্রতিকারে প্রবৃত্ত। লয়লার চিত্তও নুরজাহানের ন্যায় কুলিশ-কঠোর, সর্বনাশী শক্তির সহিত সেও প্রথমে হাত মিলাইয়াছিল। কিন্তু খসরুর মৃত্যুর পর আহত, অনুতপ্ত চিত্তে সে এই শক্তির নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। তখন হইতে সে আর প্রতিহিংসাময়ী কন্যা নহে, স্নেহ-মমতা-করুণায় গড়া নারী। তাহার এই নারী সত্তার সহিত নুরজাহানের শয়তানী সত্তার তীব্র লড়াই চলিয়াছে। কিন্তু যখন নুরজাহানের শয়তানী সত্তা বিলুপ্ত হইয়া গেল, তখন আর নুরজাহানের সহিত তাহার কোন বিরোধ রহিল না। তখন কন্যার অপার স্নেহ ও মমতা লইয়া সে অভাগী মায়ের দুঃখক্ষত অশ্রুজলে মুছাইয়া দিতে চাহিল। ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা উল্কাপিণ্ডের মত খসিয়া পড়িল, কিন্তু করুণা ও মমতার স্নিগ্ধজ্যোতি অকম্পিত শিখায় জ্বলিতে লাগিল।

মেবার পতন (১৯০৮)॥ 'নূরজাহানে'র পর 'মেবারপতন' লিখিত হয়। 'মেবার পতন' উদ্দেশ্যমূলক নাটক। এক উদার, সাম্যমূলক মহানীতি প্রচার করিবার জন্যই তিনি নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই ভূমিকায় বলিয়াছেন—'এই নাটকে আমি এক মহানীতি লইয়া বসিয়াছি; সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটী চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্ব প্রেমের মূর্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী।' নাটকীয় ঘটনা এবং পাত্রপাত্রীর কথোপকথনে লেখকের বক্তব্য উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইয়া উঠায় নাটকের ক্রন্দনময় সুর এক সান্ত্বনাময় শান্তিতে নির্বাণলাভ করিয়াছে। সেইজন্য নাটকের অন্তিম প্রভাব নৈরাশ্যবাদের স্থলে আশাবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক দুর্লঙ্ঘ্য, দুজ্ঞেয় নিয়তি সর্বনাশী বাহু বিস্তার করিয়া যেন সব চরিত্রগুলিকে জাপটাইয়া ধরিয়াছে। ইহাকে মানিয়া লওয়া ছাড়া যেন আর উপায় নাই—গোবিন্দসিংহ, অমরসিংহ ইহার বিরুদ্ধে যুঝিয়াছে, কিন্তু ইহাকে রোধ করিতে পারে নাই। গোবিন্দসিংহ মহিমময় রাজপুতকুলের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ। মহারাণা প্রতাপসিংহের প্রিয়তম পার্শ্বচর তিনি। সেই বীরর্ষভ স্বর্গীয়রাণার স্বদেশ-প্রাণতা এবং কুলগৌরব তিনি বহন করিতেছেন। সেইজন্য তিনি কন্যাকে ত্যাগ করিয়াছেন

১। অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্যের আলোচনা উল্লেখযোগ্য—'এই অনিচ্ছা অলসের বা দুর্বলের অনিচ্ছা নহে, এই অনিচ্ছার উৎস আত্মগত অবসাদ—আত্মপীড়ন কামনা। এই সময় হইতেই জাহাঙ্গীরের মধ্যে এক বৈরাগ্যের করুণ সুর বাজিতে থাকে—মনে হয় তিনি যেন নিজের প্রতি নিজে প্রতিশোধ লইতেছেন।'

পুত্রকে হারাইয়াছেন, কিন্তু জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত স্বাধীনতারক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই অটল, অটুট ত্যাগ এবং সংকল্পের তুলনা নাই। অমরসিংহের মধ্যে একটা অনুভূতি-প্রবণ, বিশ্লেষণশীল, সূক্ষ্মদর্শী ভাব দেখা যায়, তিনি যেন ভাগ্যের উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গের মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন, যেন ভবিষ্যৎ পরিণতি স্পষ্ট দেখিয়াও তাহা এড়াইবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি তাঁহার নাই।১

॥ সাজাহান (১৯০৯) ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'সাজাহান' শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে সমালোচকেরা প্রায় একমত। কালের বিচারে অদ্যাপি এই নাটকখানা জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিয়াছে। নাটকের মধ্যে বহুতর চরিত্র এবং বিভিন্ন উপকাহিনী থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার সুনিপুণ শিল্পকৌশলে সব ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে অবিচ্ছিন্নভাবে পরস্পরের সহিত গাঁথিয়া দিয়াছেন। নাটকখানির অভিনয় দেখিবার কালে ঘটনাপুঞ্জ অতি দ্রুত তালে তালে পা ফেলিয়া দৃষ্টির বিভ্রম আনিয়া দেয়। জটিল ভাবতরঙ্গের নিমেষে নিমেষে উত্থান পতন অন্তর রুদ্ধ করিয়া দেয়—মনে হয় পলক ফেলিবার যেন অবকাশ নাই, নিশ্বাস ছাড়িবার যেন অবসর নাই। ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া, সেই কাহিনী এক অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন নাটকীয় রসের মধ্যে জমাইয়া তুলা সহজ কৃতিত্বের কথা নহে, নাট্যকার সেই কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন। সাজাহানের নামে নামকরণ হইলেও, সাজাহান এই নাটকের সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রভাবশালী চরিত্র নহেন।২ সাজাহান পুরুষসিংহ বটে, কিন্তু সেই সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ—তাঁহার ক্রুদ্ধ গর্জন নীরন্ধ্র কারাপ্রাচীরে নিষ্ফলভাবে মাথা ঠুকিয়াছে, বাহিরে কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিং লীয়ারের ন্যায় সন্তানের কৃতঘ্নতায় তিনি নিঃসঙ্গভাবে তাঁহার আক্রোশ ও অভিশাপ রুদ্র প্রকৃতির মধ্যে মিলাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু জগৎ তাঁহার অতীত ঐশ্বর্য ও প্রাক্তন ক্ষমতার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্ভ্রম জানায় নাই। তাঁহার চরিত্র আদ্যন্ত একই রূপ – স্নেহাতুর, অপ্রকৃতিস্থ, অসহায়—তিনি চলমান ঘটনার নিরুপায় দ্রষ্টা, শক্তিমান স্রষ্টা নহেন। প্রকৃতপক্ষে যিনি কাহিনীর মধ্যস্থলে বিরাজ করিয়া সমস্ত চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত এবং নিয়মিত করিতেছেন, তিনি ঔরংজীব। ঔরংজীবের কুটিল, নিষ্ঠুর চক্রান্ত 'বোয়া কনষ্ট্রিকটারের Boa

১। টড অমরসিংহের চরিত্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন—'He was worthy of Pertap and his race,..... he had a reserve bordering upon gloominess, doubtless occasioned by his reverses for it was not natural to him; he was beloved by his chiefs for the qualities they most esteem generosity and valour, and by his subjects for his justice and kindness, of which we can judge from his edicts, many of which yet live on the column or the rock.'

*History of Rajasthan*—Annals of Mewar, P. 340.

২। 'সাজাহানের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর ভূমিকা। ট্র্যাজেডির দিক দিয়াও সাজাহান নামকরণের সার্থকতা আবিষ্কার করা যায় না। বোধ হয় না।'

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড)—ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৩৯০।

Constrictor ) ন্যায় অন্যান্য চরিত্রগুলিকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহারা যেন নিরুদ্ধ হাহাকারে জীবন সাঙ্গ করিয়াছে। সাজাহান, দারা, সুজা, মোরাদ, সোলেমান, মহম্মদ—এতগুলি চরিত্রের করুণ ট্র্যাজেডি কেবল একটিমাত্র লোকের জন্য ঘটিয়াছে। অথচ নাট্যকার তাঁহাকে একেবারে নির্দ্বন্দ্ব হৃদয়হীন পিশাচ করিয়াও অঙ্কন করেন নাই। তিনি নিষ্ঠুর, উৎপীড়ক এবং কূটনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন বটে, কিন্তু তিনি একেবারে স্নেহহীন, যুক্তিহীনও নহেন। মাঝে মাঝে তাঁহার কৃষ্ণমেঘাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশ চিরিয়া কোনো সুকোমল বৃত্তি চকিত দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ঔরংজীবের সূক্ষ্ম শাণিত বুদ্ধি বার বার জয়লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার সর্বশেষ জয় হইয়াছে হৃদয়বৃত্তির করুণ আবেদনে, এই বিষয়টী লক্ষ্য করিবার যোগ্য। দারার কাহিনী নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃখাবহ, দুঃখ-দুর্ভোগের সঙ্গে তাঁহার অতি ক্লেশকর সংগ্রাম, এবং সর্বশেষে তাঁহার নিদারুণ শোচনীয় পরিণতি হৃদয় শুষ্ক করিয়া দেয়। সোলেমান এবং মহম্মদকে পিতৃভক্ত, কর্তব্যপরায়ণ, উদার-হৃদয় চরিত্ররূপে দেখানো হইয়াছে। দিলদার শেক্‌স্পীয়ারের Foolএর ন্যায় বাহ্যত মূর্খ এবং নির্বোধ দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালী হৃদয়বান চরিত্র। জাহানারার চরিত্রে স্নেহ ও ত্যাগ, বুদ্ধি ও হৃদয়, তীক্ষ্ণতা এবং কোমলতার সমাবেশ করা হইয়াছে। কর্ডেলিয়ার মতই সে পিতার প্রতি স্নেহশীলা এবং মমতাময়ী আবার বুদ্ধি ও কৌশলের খেলায় ঔরংজীবের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তাহার এই শক্তিময়ী প্রভাবময়ী চরিত্রের পাশে পিয়ারার উচ্ছল প্রাণময় হাল্কা চরিত্র চমৎকার বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে। পিয়ারার চপল, পরিহাস-প্রিয় ভাসমান বাক্য-মেঘের তলায় যে দুঃখ ও ক্লেশের পুঞ্জ পুঞ্জ জল সঞ্চিত হইয়া আছে তাহাতেই চরিত্রটি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

॥ চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১) ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের চূড়ান্ত সাফল্য আমরা 'সাজাহানে' লক্ষ্য করিয়াছি। সমুদয় শ্রেষ্ঠ মোগল বাদশাহদের কাহিনী শেষ করিয়া নাট্যকার বিশ্রান্ত দৃষ্টিতে হিন্দু রাজত্বের দিকে তাকাইলেন।১ চন্দ্রগুপ্তের কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া গ্রন্থকারকে হিন্দু পুরাণ ও কিংবদন্তী এবং গ্রীক ইতিহাসের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। 'বিষ্ণুপুরাণ' এবং 'মহাবংশ', 'দিব্যাবদন', 'মহাপরিনিব্বাণসুত্ত' প্রভৃতি গ্রন্থে ও জাষ্টিন এবং প্লুটার্কের ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। নাট্যকার নাটকের বীজ মোটামুটি এই সব গ্রন্থের বৃত্তান্ত হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইচ্ছাপূর্বক কোনো স্থলেই তিনি ঐতিহাসিক

১। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী-লেখক নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—"মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনেতা, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয় একদিন কথায় কথায় দ্বিজেন্দ্রলালকে বলেন, 'রায় সাহেব, এতদিন পিঁয়াজ রসুন খাইয়ে গায়ে গন্ধ ক'রে দিয়েছেন, এইবার একটু ঘি আলোচাল খাইয়ে দিন না।' দ্বিজেন্দ্র উত্তর দেন, আচ্ছা, এইবার তাই হবে।' দ্বিজেন্দ্রের অন্তরঙ্গ শ্রীযুক্ত অধর মজুমদার মহাশয় বলেন—'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক সেই প্রতিশ্রুতির ফল।" পৃঃ ১৮৬।

বিবরণের গুরুতর ব্যতিক্রম করেন নাই। পুরাণ এবং কিংবদন্তী অনুসরণ করিয়া লেখক চন্দ্রগুপ্তকে নীচ শূদ্রবংশোদ্ভূত বলিয়াছেন, অবশ্য আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, অন্ত্যজ ছিলেন না।১ (জাষ্টিনের মতে কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত নীচ বংশজ ছিলেন।২) দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের প্রথম দৃশ্যে আলেকজাণ্ডারের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে। চন্দ্রগুপ্ত নির্বাসিত থাকিবার কালে আলেকজাণ্ডারের সহিত দেখা করিয়া নন্দকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা।৩ সেলুকাস এবং এন্টিগোনাসের মধ্যে বিরোধ বাধিয়াছিল তাহাও ঐতিহাসিকদের বৃত্তান্তে রহিয়াছে।৪ অবশ্য এন্টিগোনাস যে সেলুকাসের পুত্র ইহা নাট্যকারের স্বরচিত। এখানে স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়া তিনি সুনিপুণ নাট্যকলার পরিচয় দিয়াছেন। হেলেন এবং চন্দ্রগুপ্তের বিবাহে নাটকের সাঙ্গ হয়, এবং এখানেও নাট্যকার ইতিহাসের অনুবর্তন করিয়াছেন।৫ চাণক্যের কূট চক্রান্তে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন—ইহাই নাটকের প্রধান ঘটনা, এবং এই বিষয়েও ইতিহাস গ্রন্থকারের সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে।৬ লেখক চাণক্যের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, জটিল কূটনীতি এবং অসামান্য ক্ষমতার বর্ণনা সম্ভবতঃ 'মুদ্রা-রাক্ষসে'র প্রভাবে করিয়াছেন। সেইজন্য সংস্কৃত নাটকখানির ন্যায় তাঁহার নাটকেও চাণক্য মুখ্যতম চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র ছায়া ব্যতীত আর সব চরিত্রই ঐতিহাসিক; সুতরাং নাট্যকার ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন ইহা বলা যায়। তবে চরিত্রগুলি বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া বিকশিত করাই নাট্যকারের দায়িত্ব এবং কৃতিত্ব, এখানে ইতিহাস তাঁহাকে সাহায্য করে নাই।

1. 'It is therefore practically certain that Chandragupta belonged to a Kshatriya community, viz. the Moriya (Maurya) clan'.
*Political History of Ancient India*—by H. C. Roy Choudhury, P. 217.

2. *The Invasion of India* byMc. Crindle, P. 327.

3. V. A. Smith এর *Early History of India*, P. 123 দ্রষ্টব্য।

4. In the course of the internecine struggle between the generals of Alexander two had emerged as competitors for supreme power in Asia—Antigonos and Seleukos, who afterwards became known as Nikator, or the conqueror.'
*Early History of India* by V. A. Smith, P. 124.

5. '......And the high contracting powers ratified the peace by 'a matrimonial alliance' which phrase probably means that Seleukos gave a daughter to his Indian rival.'
*Ibid*, P. 125.

6. 'The adviser of the youthful and experienced Chandragupta in the revolution was a Brahmin named Vishnugupta, better known by his patronymic Chanakya or his surname Kautilya, by whose aid he succeeded in seizing the vacant throne.'
*Ibid*, P. 124.

'চন্দ্রগুপ্ত' বিশেষ জনপ্রিয় এবং অভিনয়োপযোগী নাটক, কিন্তু ইহার নাট্যকলা এবং ঘটনা-সংস্থাপন নির্দোষ ও ত্রুটিহীন নহে। ঘটনা ও চরিত্রের অসঙ্গতি এবং অসংলগ্নতা অনেক স্থলেই লক্ষ্য করা যায়। নাটকের নামকরণ যথার্থ হয় নাই। চাণক্যের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সমস্ত কাহিনীকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার পাশে চন্দ্রগুপ্তকে নিতান্ত ম্লান ও অপরিস্ফুট মনে হইয়াছে। শক্তির পরীক্ষায় যে সে অতি ছোট তাহাও গ্রন্থমধ্যে একবার প্রমাণিত হইয়াছে। একমাত্র প্রথম দৃশ্য ব্যতীত আর সর্বত্র সে চন্দ্রের ন্যায় ধার-করা দীপ্তিতে শোভা পাইয়াছে। নাটকের মধ্যে দুইটী কাহিনী রহিয়াছে—চন্দ্রগুপ্ত-চাণক্য-মুরাঘটিত প্রধান কাহিনী, এবং সেলুকাস-এন্টিগোনাস-হেলেন-ঘটিত গ্রীক উপকাহিনী। নাট্যকলা অনুযায়ী উপকাহিনী সর্বথা মূল কাহিনীর অধীন হইবে, ১ এবং ইহা ঘটনা-সাদৃশ্যে অথবা বৈসাদৃশ্যে মূল কাহিনীর গতিকে দ্রুত ধাবমান করিয়া তুলিবে। কিন্তু 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের দুইটী কাহিনী একেবারে স্বতন্ত্র, ইহাতে উপকাহিনীটি মূল কাহিনীর উপর নির্ভরশীল হয় নাই। শেষে হেলেনের বিবাহদ্বারা দুইটী কাহিনীকে যুক্ত করা হইল বটে, কিন্তু দুইটী নদীধারা যেন সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত হইয়া অবশেষে একটী কৃত্রিম খালের দ্বারা মিলিত হইল। হেলেন এবং চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধটীকে ভালোভাবে পরিষ্কার ও পরিস্ফুট করা হয় নাই। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখি হেলেন চন্দ্রগুপ্তের কথা চিন্তা করিতেছে, তারপর পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেও সেলুকাস, হেলেন এবং চন্দ্রগুপ্তের কথোপকথনের সময় মনে হয় হেলেন চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু অবশেষে দেখা যায় যে হেলেন চন্দ্রগুপ্তকে ভালোবাসে নাই, দুইটী রাজ্যের মিলন সাধন করিরার জন্যই সে চন্দ্রগুপ্তকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার আত্মদান যেন হৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতি নহে, এ যেন একটি রাজনৈতিক চাল। চন্দ্রগুপ্ত এবং হেলেনের মধ্যে কোনো সময়ে হৃদয়ের আদান প্রদান এবং বোঝাপড়াও হয় নাই, হেলেনের সম্মুখে অকস্মাৎ একবার চন্দ্রগুপ্তের প্রেমের বিস্ফোরণ অসংলগ্ন এবং পূর্বাপর-সম্বন্ধ-রহিত। ছায়ার প্রেম উপেক্ষিত হইল আর এক গভীরতর প্রেমের আকর্ষণে নয়, নেহাত প্রয়োজনের খাতিরে। ছায়ার প্রেমের মর্যাদা অকারণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নাটকের সংযোগস্থলের ঐক্য (Unity of Place) নাই। গ্রীস, আফগানিস্থান এবং ভারতবর্ষে ঘটনাস্রোত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে নন্দের নিদারুণ নিষ্ঠুর হত্যার যে ভয়াবহ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা রঙ্গমঞ্চে দেখানো অসঙ্গত, দর্শকের পক্ষে এই দৃশ্য অত্যন্ত গ্লানিকর এবং ক্লেশজনক।

১। '........The relation of the underplot to the mainplot may be described as dependence; the term fairly covers constructive support, just as in architecture buttresses at once lean against and support the main mass.'

*Shakespeare as a Dramatic Artist* by Moulton, P. 366.

প্রাচ্য নাট্যকলা অনুযায়ী এইরূপ হত্যা-দৃশ্য নিষিদ্ধ।১ প্রতীচ্য নাটকে রঙ্গমঞ্চে হত্যা থাকিলেও হত্যার এইরূপ বিস্তারিত লোমহর্ষণ দৃশ্য কখনো প্রশংসনীয় এবং সমর্থনীয় হয় নাই।

চরিত্রাঙ্কনের কথা আলোচনা করিতে প্রথমেই মনে পড়ে চাণক্যকে। চাণক্য গ্রন্থকারের অদ্ভুত সৃষ্টি। এই কৃষ্ণকায় শীর্ণ ব্রাহ্মণের মধ্যে যেন উত্তপ্ত লাভা টগবগ করিয়া ফুটিয়াছে, যেন সামান্য ফাঁক পাইলেই জ্বলন্ত অগ্নিস্রাব চতুষ্পার্শ্বস্থ সব কিছু ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে। চাণক্য ব্রাহ্মণের লুপ্ত তেজ এবং ক্ষমতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার কুশাগ্র বুদ্ধি, অনধিগম্য কূটনীতি এবং বজ্রকঠোর ব্যক্তিত্ব স্বীয় সংকল্প সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু চাণক্যের ট্র্যাজেডি এইখানে যে, এইরূপ একটী অসম-শক্তিশালী অমিত প্রভাবশালী চরিত্র অবশেষে যেন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল—ইহা হৃদয়ের নিকট বুদ্ধির পরাজয়, স্নেহের নিকট শক্তির পরাজয়। যে মূর্তিমান প্রতিহিংসা বীভৎস সর্বনাশী শক্তিকে ক্ষণে ক্ষণে আলিঙ্গন করিয়াছে, তাহা যেন স্নেহ কোমলতার শান্তি বারিতে অবগাহনের পর নব জীবন লাভ করিয়া বসিল। চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষা উপনায়ক এন্টিগোনাসের চরিত্র আমাদের দৃষ্টি এবং ঔৎসুক্য অনেক বেশি আকর্ষণ করে। এন্টিগোনাস বীর, দর্পী, উদার এবং মহৎ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাহার চরিত্র নিতান্ত ট্র্যাজিক এবং বিষাদময়। হেলেনের অচঞ্চল, পাষাণ হৃদয়ে তাহার উচ্ছ্বসিত প্রেমতরঙ্গ আছাড় খাইয়া নিষ্ফল আর্তনাদ করিয়াছে, এবং পিতৃপরিচয়ের দুজ্ঞেয় রহস্য তাহাকে কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় দিশাহারা ভাবে ছুটাইয়াছে। গ্রীক বীর ইডিপাস পিতাকে না জানিয়া হত্যা করিয়াছিল, এবং সেও না চিনিয়া পিতার শত্রুতা করিয়াছে, এমন কি তাঁহাকে বন্দী পর্যন্ত করিয়াছে। ইহার মধ্যে যে irony আছে তাহা সফোক্লিসের ironyর সমতুল্য। সেলুকাসের মধ্যে সন্তানবৎসল পিতৃত্ব এবং মুরার মধ্যে স্নেহাতুর মাতৃত্বের গৌরব ও মাধুর্য ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

॥ সিংহল বিজয় (১৯১৫) ॥ 'চন্দ্রগুপ্তে'র পরে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার দীপ্তি মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পরে তিনি যে নাটকগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহার কোনোখানাই খুব উচ্চশ্রেণীর নহে। বাঙালী বীর২ বিজয়সিংহের লঙ্কাজয় কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া

১। 'What is seen should essentially serve to produce the sentiment aimed at, and it must avoid offending the feelings of the audience. Hence it is improper to portray on the stage such events as a national calamity, the downfall of a king, the siege of a town, a battle, killing or death, all of them painful.'

*Sanskrit Drama* by A. B. Keith. P. 300.

১। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বলেন যে বিজয়সিংহ গুজরাটের লোক ছিলেন, বাঙালী ছিলেন না।

'সিংহলবিজয়' লিখিত হইয়াছে। তবে ঐতিহাসিক ঘটনা অপেক্ষা হৃদয়গত ভাবদ্বন্দ্বই নাটকের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর মধ্যে ঐক্য এবং সঙ্গতির নিতান্ত অভাব। আবেগের আতিশয্য মাত্রা ছাড়াইয়া অনেক সময়েই তরল হইয়া পড়িয়াছে। হত্যা ও নিষ্ঠুরতার আধিক্যও বিশেষ পীড়াদায়ক। বিজয়সিংহ পিতা ও বিমাতার বিরাগে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইয়া শ্যামদেশ জয় করিয়া বসিল, এবং পুনরায় বঙ্গদেশে চলিয়া আসিল, অবশেষে আবার নির্বাসিত হইল। ইহাতে ভাব ও অবস্থার পুনরুক্তি হইয়াছে। কুবেণীর সহিত সমুদ্রবক্ষে বিজয়সিংহের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যও অত্যন্ত অবাস্তব ও অস্বাভাবিক হইয়াছে। বস্তুত একমাত্র কুবেণীর চরিত্র ব্যতীত আর কিছুই উল্লেখযোগ্য নহে।

'সুরুচিসঙ্গত অপেরা' রচনার উদ্দেশ্য লইয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল 'সোরাব-রুস্তম' (১৯০৮) নামক নাট্যরঙ্গখানি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল কয়েকখানা নাচ-গান থাকিলেই অপেরা হয় না। অপেরার বিষয়বস্তু খুব তরল ও লঘু হওয়া দরকার। কিন্তু 'সোরাব-রুস্তমে'র কাহিনী অতিশয় করুণ ও ট্র্যাজিক। এই কাহিনী লইয়া অপেরা লেখা চলে না। লেখক নিজেও ইহা বুঝিয়াছিলেন, সেইজন্য খাঁটি অপেরা ইহাকে বলিতে চান নাই।১ যে পিতার সন্ধানে সোরাব ব্যাকুল হইয়া বাহির হইয়াছে, সেই পিতার দ্বারাই সে নিহত হইল—এই বিষয়ের মধ্যে নিয়তির যে নিষ্ঠুর চক্রান্ত পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাদ্বারা এক চমৎকার বিষাদ-ঘন ট্র্যাজেডি রচনা করা যাইত।

## (ঙ) সামাজিক নাটক

দ্বিজেন্দ্রলাল মাত্র দুইখানা সামাজিক নাটক লিখিয়াছেন। সামাজিক নাটক রচনার সময় তাঁহার প্রতিভা অস্তোন্মুখ ম্লানিমা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইজন্য ইহাতে তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় নাই। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে চরিত্র ও ভাবের বৈচিত্র্য খুব কমই আছে। গতানুগতিকতার স্রোতহীন স্বল্প বারিরাশির মধ্যে অতি ক্ষুদ্র আবর্তের সৃষ্টি করিয়াই বাঙালী পুরুষ ও নারীর জীবন শান্তিলাভ করে। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে এই বাঙালী জীবন লইয়া যথাসম্ভব ঘাঁটাঘাঁটি হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্র প্রভৃতিকে অনুসরণ করিয়া নিরুদ্ধস্রোত নদীর মধ্যে একটু এদিক ওদিক গতায়াত করিয়াছেন, নদীর মুখ কাটিয়া জলধারাকে চঞ্চল, তরঙ্গময় ও গতিশীল করিতে পারেন নাই।

১। 'সোরাব-রুস্তম দস্তুরমত অপেরা নয়,.........এক কথায় অপেরায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে।' ভূমিকা—'সোরাব-রুস্তম'।

॥ পরপারে (১৯১২) ॥ তাঁহার প্রথম সামাজিক নাটক 'পরপারে'। ইহার কাহিনী পরিণতিহীন, এবং চরিত্রগুলি অসম্পূর্ণ। গিরিশচন্দ্রের নাটকে যেমন ধর্মমূলক এবং আধ্যাত্মিক পরিণতি লক্ষ্য করা যায় এই নাটকেও সে রকম পরিণতি দেখা গিয়াছে। মনে হয় নাটকের শেষ কথা এই ক্রিয়াচঞ্চল বাস্তব জীবনে বলা হইল না। ইহা যেন জীবনের পরপারেই ধ্বনিয়া উঠিবে। সেইজন্য যে কাহিনী মিলনান্ত পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ অকারণ কতকগুলি মৃত্যু ঘটাইয়া তাহার গতি লণ্ডভণ্ড করিয়া দেওয়া হইল। মহিম এবং সরযূ দুইজনই খালাস হইল, অথচ কাহারো মিলন হইল না। বিশ্বেশ্বর এবং সরযূ পটপট করিয়া মরিয়া গেলেন, এবং মহিমও ভক্ত সাধক হইয়া পড়িল। নাট্যকার কথায় কাঁদাইতে না পারিয়া, গায়ের জোরে চড় মারিয়া কাঁদাইলেন। সন্দেহবাদী এবং যুক্তিসর্বস্ব দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ জীবনে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল এই নাটকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।১ কিন্তু ইহাও সত্য যে, ভক্তিবিশ্বাসের ফলে তাঁহার নাটক কোনো প্রশংসনীয় কৃতিত্ব লাভ করে নাই। নাটকখানির আর একটা ত্রুটী এই যে ইহাতে পিস্তল ছোড়াছুড়ি এবং ছোরা চালাচালি এত বেশি আছে যে ডিটেকটিভ উপন্যাসের ন্যায় ইহা melo-dramatic হইয়া পড়িয়াছে। নাটকের নায়ক হয়তো মহিম, কিন্তু চরিত্রটী নিতান্ত ক্ষুদ্র, নীচ এবং অবিকশিত। মন্দ কাজ করিবার মত হৃদয়ের শক্তি এবং দৃঢ়তাও তাহার নাই। বিবাহের পর সে স্ত্রীর প্রতি এতই আসক্ত হইয়া পড়িল যে স্নেহময়ী মাকে পর্যন্ত উপেক্ষা এবং অপমান করিতে তাহার বাধিল না, আবার মুহূর্তের মধ্যে সে স্বাধ্বী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া বেশ্যা শান্তার প্রেমে উন্মাদ হইয়া উঠিল। এই একটার পরে একটা অপরাধ করিয়াও তাহার কোনো দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, তাপ উত্তাপ নাই। নিজের অপরাধ সরযূর উপর নিতান্ত কাপুরুষের মত চাপাইয়া সে তাহার চরিত্রের চরম জঘন্যতা প্রকাশ করিয়াছে। বিশ্বেশ্বরের চরিত্র নাট্যকার তাঁহার দাদামহাশয় প্রসাদদাস গোস্বামীকে আদর্শ করিয়া চিত্রিত করিয়াছিলেন। প্রথমদিকে এই চরিত্রের স্নেহপরায়ণ, পরোপকারী এবং রঙ্গরসপ্রিয় ভাব বেশ ভালোভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, কিন্তু শেষে ইহার মনস্তাপ ও আত্মহত্যার দৃশ্য হৃদয় স্পর্শ করে না। কালীচরণের উপর নিমচাঁদের প্রভাব সুস্পষ্ট। কালীচরণ কালিমা-পঙ্কে নিমগ্ন থাকিয়াও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক। তাঁহার উদাসীন, বিবাগী চিত্তের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ন্যায়-অন্যায় বোধ এবং সদাশয়তা বিরাজ করিতেছে। পতিতা চরিত্রও যে সংযম ও মহত্ত্বের আধার হইতে পারে শান্তার মধ্যে তাহা লেখক দেখাইয়াছেন। শান্তা চরিত্রের মধ্যে আমরা যেন শরৎচন্দ্রের কোনো সুপরিচিত নায়িকাকে দেখিতে পাই, তাহার দৃপ্ত তেজস্বিতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মধ্যে যেন নোরা অথবা ইসাডোরা ডানকান উঁকি মারিতেছে।

---

১। 'এই নাটকখানি রচনাকালে কবির হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ হইয়াছিল, তাঁহার জীবন-ইতিহাসে তাহার আভাস পাওয়া যায়।'

'দ্বিজেন্দ্রলাল'—নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ১৯৭।

॥ বঙ্গনারী ( ১৯১৬ ) ॥ 'বঙ্গনারী'র উপর গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের প্রভাব অধিকতর পরিস্ফুট। যে সামাজিক সমস্যা এই নাটকখানির ভিত্তি তাহা 'বলিদানে'আলোচিত হইয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্র গিরিশচন্দ্রের নাটকের দুঃখশোকপ্রাপ্ত অসংলগ্ন-প্রলাপী পরিবার-কর্তার হুবহু অনুরূপ চরিত্র। উপেন্দ্রও 'প্রফুল্ল' নাটকের রমেশের ন্যায় অমানুষী দৌর্বৃত্ত্যের অধিকারী। 'বঙ্গনারী' সামাজিক নাটক হইলেও ইহাতে স্থূল ও রোমাঞ্চকর ঘটনাদ্বারা সুলভ আবেগ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। সদানন্দের মুখ দিয়া গ্রন্থকার নিজের কথা ব্যক্ত করিলেও কেদারের চরিত্র বেশি সরস ও প্রাণবান। লঘুচিত্ত, পাগলাটে কেদারের হৃদয় সততা ও মহত্ত্ব দিয়া গড়া, তাহার অভিনব গালাগালির শব্দগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য। সুশীলা যুক্তিবাদিনী আধুনিক নারী-শিরোমণি, তাহার প্রখর বাক্যঘর্ষণে সমাজ বিদ্রোহ মুহুর্মুহুঃ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

## ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

### (ক) গীতিনাট্য

ক্ষীরোদপ্রসাদ রূপকথার ন্যায় কাহিনী লইয়া কয়েকখানা নাটক রচনা করিয়াছিলেন। 'কিন্নরী', 'বাসন্তী' প্রভৃতি অল্প কয়েকখানা নাটক ব্যতীত এই ধরণের অধিকাংশ নাটকে আরব-পারস্য-তুরস্কের উপাখ্যান নিবদ্ধ হইয়াছে। আরব্য উপন্যাসে এবং পারস্য উপন্যাসে যে রকম অদ্ভুত, অসম্ভব এবং রোমাঞ্চকর গল্প আছে এই সব নাটকের কাহিনীও সেইরূপ। নাটকের মধ্যে ঘটনার যে রকম বাস্তবতা এবং সম্ভাব্যতা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, এই সব নাটকে তাহা নাই। চরিত্র-সংঘর্ষের দ্বারা এবং ভাব ও ক্রিয়ার দ্বন্দ্ব সাহায্যে যে নাটকীয় রস বিকাশ করা হয়, এই নাটকগুলিতে তাহার কোনো পরিচয় নাই। সুতরাং ইহাদের অভিনয় দেখিয়া মনের মধ্যে কোনো প্রকার আবেগচাঞ্চল্য অথবা নাটকীয় রসানুভূতি হয় না, চরিত্র সৃষ্টি বলিতে ইহাদের মধ্যে কিছুই নাই। ইহাদের অন্তঃস্থিত আগ্রহবর্ধক গল্পরসই ইহাদের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। এই সব নাটক দেখিতে দেখিতে একপ্রকার কল্পময়, স্বপ্নাচ্ছন্ন, রোমান্টিক রসে মন আবিষ্ট, ভরপুর হইয়া উঠে, শিশুর কৌতূহল লইয়া গল্পের পরিণতি জানিবার জন্য মন ব্যগ্র হইয়া থাকে। এ-সব নাটকে ঘটনার কোনো বিপরীত গতি নাই, কাহিনী অবিরাম ঘটিয়া গিয়াছে। নাটক না বলিয়া ইহাদিগকে গল্পের নাটকীয় রূপ বলা অধিকতর সঙ্গত। আমাদের রঙ্গালয়ের দর্শকবৃন্দ নাটক অপেক্ষা নাচগান বেশি ভালোবাসেন, এবং এই সব নাটকে নাচগানের প্রাচুর্য থাকাতে রঙ্গমঞ্চে ইহাদের সমাদরের অভাব হয় নাই। 'আলিবাবা' এবং 'কিন্নরী'র সাফল্যই ইহার প্রমাণ। এই নাটকগুলির মধ্যে রোমান্স এবং কৌতুকরস ইহাদের সরস চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। এই শ্রেণীর নাটক লিখিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ খ্যাতি অর্জন করিলেও তাঁহার পূর্বেই ইহার প্রবর্তন হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র 'আবুহোসেন' প্রভৃতি নাটক লিখিয়া ইহার সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন।

'আলিবাবা'র ( ১৮৯৭ ) মত জনপ্রিয় এবং সর্ব-সমাদৃত গীতিনাট্য খুব কমই আছে। নাটকখানির মধ্যে এক অতি রহস্যময় কাহিনী রঙ্গরসের উচ্ছল স্রোতে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। রোমান্স, কৌতুক এবং adventureএর বিচিত্র সমাবেশে ইহা অতিশয় উপাদেয় এবং চিত্তরোচক হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের প্রধান চরিত্র মর্জিনা। ইহার রঙ্গব্যঙ্গ, নৃত্যগীতই নাটকের প্রাণরস জোগাইয়াছে।

'বেদৌরা' এবং 'আলাদিন' উদ্ভট এবং অসম্ভব ঘটনাশ্রিত রূপকথার কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'বেদৌরা'তে ( ১৯০৩ ) খালেদানরাজ্যের পুত্র কমরলজমান এবং চীনরাজকন্যা বেদৌরা কিভাবে অপ্সর-অপ্সরার তৎপরতায় মিলিত হইল তাহার উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে। পরোপকারী হাস্যময় চরিত্র মার্জমান বিশেষ সরস হইয়াছে। 'আলাদিন' নাটকে আরব্য উপন্যাসের প্রসিদ্ধ গল্পটীকে রূপায়িত করা হইয়াছে।

'বরুণা' ( ১৯০৮ ) নাটকের সহিত অমৃতলালের 'নবযৌবন' নাটকের সাদৃশ্য আছে। অভিরাম বসন্তকুমারের অনুরূপ। বরুণার সহিত পুণ্ডরীকের সম্বন্ধ লইয়া সরস ঘটনার সমাবেশ করা হয় নাই, শেষ পর্যন্ত বরুণা-পুণ্ডরীকের মিলনের ও বরুণার প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটনে যেন কোনো কৌতূহলের নিবৃত্তি হইল না, কোনো কৌতুকের সমাধান হইল না। উদারচিত্ত সত্যনিষ্ঠ রাজা শিববর্মা এবং কৌতুকময়, স্নেহপূর্ণ অভিরামের চরিত্র খুব আমোদজনক হইয়াছে।

'ভূতের বেগার' ( ১৯০৮ ) অমৃতলালের প্রহসনের ন্যায় শিক্ষাত্মক রঙ্গনাট্য। বিজাতীয় ভাবাপন্ন চাকুরিয়া বাবুদিগকে চাকুরীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া দেশে ঘরে ফিরিয়া যাওয়ার উপদেশই ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।

'বেদৌরার' ন্যায় 'বাসন্তী' নাটকেও (১৯০৮) অপ্সর-অপ্সরার সহায়তায় রঘুবর ও জয়ার মিলন ঘটিয়াছে। নাটকের ঘটনা সামাজিক পটভূমিকায় স্থাপিত হইয়াছে। বাসন্তীকে কেবল প্রস্তাবনায় দেখা গিয়াছে, নাটকে তাহার কোনোই অংশ নাই।

'কিন্নরী'র ( ১৯১৮ ) বিষয়বস্তুর উপর উর্বশী-পুরূরবার কাহিনীর প্রভাব রহিয়াছে—ইহা অনুমান হয়। কাহিনীর সংযোগস্থল এক রোমান্টিক, কল্পময়, আবেশভরা জগতে। পড়িতে পড়িতে মন মধুর, রহস্যময় সুরে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে।

উপরিউক্ত নাটকগুলি ছাড়াও ক্ষীরোদপ্রসাদ আরব-পারস্য-তুরস্ক প্রভৃতি দেশের কাহিনী লইয়া আরও কয়েকখানা নাটক লিখিয়াছিলেন, যথা 'জুলিয়া' ( ১৩০৬ ), 'সপ্তম-প্রতিমা' ( ১৩০৯ ), 'দৌলতে দুনিয়া' ( ১৩১৫ ), পলিন' (১৩১৭), 'মিডিয়া', 'রূপের ডালি' ( ১৩২০ ) ও 'বাদসাজাদী' ( ১৩ ২ )।

'জুলিয়া' ( ১৯০০ ) বোগদাদের স্বনামখ্যাত কালিফ ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ হারুণ-অল-রসিদের অনুপম মহত্ত্ববিষয়ক একটী আখ্যানের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রবল-প্রতাপান্বিত বাদশাহের পক্ষে নিজের স্ত্রীকে অন্যের হাতে তুলিয়া দেওয়া সহজ উদারতার

পরিচায়ক নহে, কালিফ প্রেমের মহাশক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই অসাধারণ উদারতার দ্বারা নিজের চরিত্রকে ভূষিত করিয়াছেন।

'পলিনে'র (১৯১১) মধ্যে ঘটনার অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতা অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়াছে। নীলপাহাড় হইতে হারেমের দিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া যে সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া সিস্তান রাজ্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, তিনিই আবার সিস্তানরাজকে সমাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহার কন্যাকে দেখাইয়া দিলেন। এইরূপ অসঙ্গত দৃশ্য অনেক আছে। মাঝে মাঝে আবার হাস্যকর বীররসের অবতারণাও রহিয়াছে।

'মিডিয়া' (১৯১২) নাটকখানির কথঞ্চিৎ অভিনবত্ব আছে। সুলতান মনস্থরের চরিত্রের মধ্যে বিশিষ্টতা ফুটিয়াছে। মনস্থর দুর্দান্ত অত্যাচারী, অথচ প্রেমের সন্ধানে বিভোর ও ভ্রাম্যমান। ঘটনার অসংলগ্নতা এই নাটকেও পুরোপুরি মাত্রায় রহিয়াছে। মিডিয়া মনস্থরের প্রতি আকৃষ্ট, অথচ মনস্থরকে কিছুতেই ধরা না দিয়া ছুটাছুটি করিতেছে—ইহার মধ্যে হাস্যকর অসঙ্গতি বিদ্যমান। জড়শক্তির উপর চৈতন্যশক্তির প্রভুত্ব—ইহাই নাটকের মধ্যে পরিস্ফুট নীতি।

## (খ) পৌরাণিক নাটক

ক্ষীরোদপ্রসাদ কয়েকখানা পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছিলেন, যথা—বভ্রুবাহন (১৩০৬), সাবিত্রী (১৩০৯), উলুপী (১৩২৩), ভীষ্ম (১৩২০), মন্দাকিনী (১৩২৮) ও নরনারায়ণ (১৩৩৩)।

॥ সাবিত্রী (১৯০২) ॥ ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাষা সাধারণত সরল ও অনাড়ম্বর, কিন্তু 'সাবিত্রী' নাটকের ভাষা দুরূহ সংস্কৃত শব্দে পরিপূর্ণ। ভাষার মধ্যে প্রকৃতি বর্ণনা এবং কবিত্ব-সৃষ্টি করিবার প্রয়াস সুস্পষ্ট। সংলাপ অত্যন্ত দীর্ঘ, এবং শব্দের গম্ভীর আড়ম্বরে নাটকের গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নাটকের মধ্যে কোথাও ঘটনার সংঘর্ষমূলক চমৎকারিত্ব দেখা যায় নাই। তুম্বুরু চরিত্র হাস্য-কৌতুক উদ্রেক করিয়াছে।

॥ ভীষ্ম (১৯১৩)॥ দ্বিজেন্দ্রলাল যখন 'ভীষ্ম' নাটক লিখিতেছিলেন তখন ক্ষীরোদপ্রসাদও তাঁহার 'ভীষ্ম' প্রকাশ করেন। সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়তার দিক দিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদেরই জিত হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকখানা ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তখনকার দর্শকবৃন্দের রুচির মধ্যে রসগ্রাহিতার পরিচয় আমরা পাই না। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের মধ্যে তীব্র হৃদয়াবেগ ও চাঞ্চল্যকর ভাবদ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায় না। কাহিনীর অতিরিক্ত দীর্ঘতা একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর, এবং শেষ দুই অঙ্কে নানা কেন্দ্র-বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমাবেশ রহিয়াছে। নাটকের কথোপকথন স্থানে স্থানে গদ্যে এবং কোথাও বা অমিত্রাক্ষর ছন্দে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু জায়গায় জায়গায় ভাষা নিতান্ত তরল ও হাল্কা

হওয়ায় রসগাম্ভীর্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভীষ্মের প্রতি অম্বার দুর্দম অনুরাগ প্রদর্শন করা হয় নাই। সুতরাং ভীষ্মের প্রত্যাখ্যান তাহাকে কিভাবে এতোখানি প্রতিহিংসাময়ী করিয়া তুলিল তাহা নিরর্থক এবং উদ্দেশ্যহীন।

গিরিশচন্দ্র যেমন অপৌরাণিক চরিত্র লইয়া ভক্তিমূলক নাটক লিখিয়াছিলেন, 'রঞ্জাবতী' এবং 'রামানুজ' সেই ধরণের নাটক। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পরে এই রকম নাটক লিখিয়া কেহ তেমন সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকেও কোনো উৎকর্ষ লক্ষিত হয় না। চরিত্র এবং ঘটনার অসঙ্গতি তাঁহার নাটককে প্রভাবহীন ও বৈশিষ্ট্যহীন করিয়াছে।

॥ রঞ্জাবতী ( ১৯০৪ ) ॥ 'রঞ্জাবতী' এবং 'রামানুজে'র মধ্যে ক্ষীণ ঐতিহাসিক সূত্র থাকিলেও ভক্তিরস উদ্দীপনই নাটক দুইখানির অন্তিম লক্ষ্য। ধর্মমঙ্গল কাহিনী হইতে কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়া 'রঞ্জাবতী' রচিত হইয়াছে। কিন্তু নাটকের মধ্যে কল্পনা উদ্দামভাবে প্রশ্রয়লাভ করিয়াছে। কর্ণসেন এবং কালু-ডোম নাটকে যথাক্রমে নয়ন সেন এবং দলু সর্দার হইয়াছে। রঞ্জাবতীর পুত্র ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেনের উল্লেখ নাটকে নাই। ইহাতে রঞ্জাবতীর পুত্রের নাম হইয়াছে সূর্যসেন, নাটকের মধ্যে নিয়ন্ত্রী দেবতা মদনমোহন, ধর্মঠাকুর নহেন। প্রথম দিকে গ্রন্থখানার গল্প-রস উপভোগ্য, কিন্তু শেষভাগে মাঝে মাঝে দেবতার লীলা দেখাইতে যাইয়া নাটকীয় সংহতি এবং আবেগ নষ্ট করা হইয়াছে। ধর্মানন্দের আধ্যাত্মিক বাক্যগুলি নিতান্ত নিরর্থক ও প্রভাবহীন। মাঝে মাঝে চরিত্রগুলিকে অবিশ্বাস্য উপায়ে অসম্ভব স্থানে সমাবেশ করা হইয়াছে। দলু, লক্ষ্মী প্রভৃতি ডোম-ডোমনীগণের চরিত্রই বীরত্বে, মহত্বে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়াছে।

॥ রামানুজ (১৯১৬) ॥ 'রামানুজ' নাটকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রবর্তক ধর্মনেতার ধর্মজীবন বর্ণিত হইয়াছে। ইহার আদ্যন্ত ধর্মলীলায় পরিপূর্ণ এবং ইহাতে মানব ও দেবতার ভেদাভেদ অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গিরিশচন্দ্র মহাপুরুষদের জীবনে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিতেন সেই রকম দ্বন্দ্বও নাটকের মধ্যে নাই। কুরেশের চরিত্র-মাহাত্ম্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

॥ নরনারায়ণ ( ১৯২৬ ) ॥ পৌরাণিক নাটকের বিষয়বস্তু পুরাণের সুপ্রচলিত কাহিনী হইতে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং ঘটনা ও চরিত্র পরিকল্পনায় পুরাণ-বহির্ভূত কোন অভিনব মৌলিকতা দেখাইবার ক্ষমতা নাট্যকারের নাই। কিন্তু নাটক পুরাণ নহে, সেজন্য একটি সুস্পষ্ট ভাবাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কোন বড় ঘটনা বাদ দিয়া আবার কোন ছোট ঘটনার উপর রঙ ফলাইয়া একটি অবিচ্ছিন্ন নাট্য পরিবেশ গড়িয়া তোলা এবং চরিত্রগুলির রসোত্তীর্ণ নাট্যপরিণতি দেখানই নাট্যকারের কাজ। এই সুনির্দিষ্ট ভাবাদর্শ এবং ঘটনা ও চরিত্রের নাট্যরূপ না থাকিলে পৌরাণিক নাটক পুরাণের পুনরাবৃত্তি হয় মাত্র, নাটক হয় না।

'নরনারায়ণ' নাটকের প্রস্তাবনায় আমরা দেখিলাম নাটকের ভাবাদর্শের আভাস—

দৈব কিংবা পুরুষকার
নিদান বিধান কোন্ রাজার,
কর্ম সাক্ষী বিজয়-লক্ষ্মী
কোন্ মহানে করে বরণ?

বুঝিলাম, দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বই নাটকের মধ্যে উপস্থাপিত করা হইবে। নাটকের আরম্ভ হইয়াছে কর্ণের ব্রহ্মশাপ-প্রাপ্তি হইতে এবং ইহার সমাপ্তি কর্ণের প্রাণোৎসর্গে। সুতরাং কর্ণই যে নাটকের নায়ক এবং এই চরিত্র অবলম্বন করিয়াই দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্ব তাহাও বুঝা গেল। অথচ কর্ণের নামে নাটকের নামকরণ হয় নাই। ইহার কারণ কি? পৌরাণিক জগৎ ও আমাদের বস্তু-জগৎ এক নহে। পৌরাণিক জগতে মানুষের ক্রিয়াকর্ম, ভাব ও আকাঙ্ক্ষার মূলে এক দৈবশক্তির অলঙ্ঘ্য বিধান বিরাজ করিতেছে। সেই দৈবশক্তি সতত প্রকাশিত না হইতে পারে কিন্তু এই বস্তুজগতের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে বারবার তাহার প্রতি আমাদের আর্ত ও আকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতে থাকে। নাটকের গোড়ার দিকে ভীষ্মের মুখে নর-নারায়ণের ব্যাখ্যা আমরা শুনিলাম—

এক আত্মা দ্বিধাভূত ভিন্নরূপে।
দুষ্কৃতের ধ্বংস তরে, ধর্মের রক্ষণে—
যুগে যুগে হন তাঁরা অবতার।

এই নরনারায়ণের গূঢ় মহিমা নাটকের ঘটনাবলীর উপরে কিরণ বিস্তার করিতেছে। এই মহিমার বস্তুরূপ হয়তো পরিস্ফুট হয় নাই, কিন্তু ইহাই নাটকের মূল নীতিরূপে ধর্মবিশ্বাসী মনের কাছে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

কিন্তু কথা হইল, নরনারায়ণের মহিমার প্রতি বিশ্বাসী হইয়াও তাঁহাদের প্রধান বিরোধী শক্তি কর্ণকেই বা অশ্রদ্ধা করি কি ভাবে? তাঁহাকে তো কোনক্রমেই দুষ্কৃতকারী বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার পরাজয় ও পতনের মধ্যদিয়া নরনারায়ণের কোন্ কল্যাণ মহিমা পরিস্ফুট হইল? তিনি কুন্তীর কানীন পুত্র, কিন্তু মাতার অপরাধের জন্য তাঁহার দায়িত্ব কোথায়? তিনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়া ধর্মপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মনুষ্যত্বের কোন অবমাননা তো তিনি কখনও করেন নাই। তিনি বীর, উদার, দানশীল, সত্যসন্ধ—পুরুষকারের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। অথচ তাঁহার এ পরাজয় ও দুঃখভোগ কেন? মহাভারতে যাহাই থাকুক না কেন, কর্ণের অপাপবিদ্ধ জীবনের করুণতম পরিণতি দেখিয়া আমাদের সমস্ত মনুষ্যত্ব-বোধ বিদ্রোহ করে। বাসুদেব হউন, নারায়ণ হউন, নর-নারায়ণ হউন, তাঁহার বিধানের বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ প্রশ্ন জাগ্রত হইয়া উঠে? যদি কর্ণের মত পুরুষোত্তমের এই পরিণতি, তবে সাধারণ মানুষ আর কি আশায়, কি ভরসায় জগতের সু-আদর্শগুলিকে আঁকড়াইয়া থাকিবে? মানুষের মনের এই অনিবার্য সমস্যার কিভাবে সমাধান হইবে

জানিনা।১ তবে দেখিতে পাই, জগতের বহু বহু ক্ষেত্রে অন্যায়কারীর অন্যায়ের জন্য এইভাবে ন্যায়ব্রতীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কুন্তী ও দুর্যোধনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল কর্ণকে। কিন্তু শুধু যদি নিরুপায়, নির্বীর্য দুঃখভোগই কর্ণের চরিত্রের মধ্যে দেখান হইত তাহা হইলে কর্ণের পতন আমাদের মনে কোন গভীর ট্র্যাজিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। কর্ণ প্রথমে দৈবের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন যে, তিনি অজেয়। সেজন্য এক সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের বর্মে তিনি নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাস যখন তাঁহার ভাঙ্গিয়াছে, যখন তাঁহার অনিবার্য পরিণতি তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তখনও তিনি দৈবের কাছে বশ্যতা স্বীকার করিলেন না, আমরণ সংগ্রাম করিয়া গেলেন।

নাটকের সূচনাতেই নিয়তির চক্রান্ত সুরু হইতে দেখি। কর্ণের সযত্ন অস্ত্রশিক্ষা ও কঠোর সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার জন্যই যেন ব্রহ্মশাপ। কর্ণের দ্বিতীয় অভিশাপ-প্রাপ্তি গুরু পরশুরামের নিকট হইতে। কর্ণ ভাবিলেন অভিশাপ নিষ্ফল, কারণ তিনি সূতপুত্র। অলক্ষ্য নিয়তি ক্রূর হাস্য হাসিলেন। কর্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তিনি গভীরভাবে বিষ্ণুভক্ত—কিন্তু তাহার তীব্র বিদ্বেষ নরনারায়ণ—ধনঞ্জয় ও বাসুদেব কৃষ্ণের বিরুদ্ধে। কৃষ্ণ যে নারায়ণ এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে সংগ্রাম করিয়াছেন। কৃষ্ণকে বাঁধিবার জন্য তিনিই দুর্যোধনকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় তাঁহার অন্তরাত্মা ইহা সমর্থন করিতে পারে নাই, এই বাসুদেবেরই প্রতি স্নেহে মমতায় বিগলিত হইয়া নিদ্রামধ্যে এই বন্ধনের বিরুদ্ধেই পীড়িত প্রতিবাদ জানাইয়াছে। কিন্তু কর্ণের আসল আত্মদ্বন্দ্ব সুরু হইল তখন হইতে যখন তিনি কৃষ্ণের কাছেই আত্মপরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আজন্ম পোষিত সঙ্কল্প ও অভিমান একটি নিষ্ঠুর আঘাতে যেন চৌচির হইয়া গেল। জগতের অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা কুড়াইয়াও সূতপুত্র বলিয়া তাঁহার মধ্যে একটি আহত অভিমান ছিল, আজ কৃষ্ণের কথায় যখন তিনি জানিলেন সেই অভিমান বৃথা তখন তিনি নিজেকে বড় বেশি অসহায় বোধ করিলেন। যে অর্জুনকে বধ করিবার জন্য তিনি চিরকাল কঠোর সঙ্কল্প পোষণ করিয়া আসিয়াছেন সেই অর্জুনকে ভ্রাতা জানিয়া এক মুহূর্তেই সদ্যোজাত ভ্রাতৃস্নেহ সেই সঙ্কল্পের সহিত সংঘাতে লিপ্ত হইল—

মর্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়
মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা—বাসুদেব!
মর্ম ভাঙ্গা প্রীতিপুষ্প অঞ্জলিতে ধরি,'
শুনাতে আসিলে তুমি
মনঃক্ষোভ কথা!

---

১। Tragedy of whatever type to remain tragedy, must refuse to make all things plain, must prostrate itself before the unknown, nor presume with the sentimentalists lightly to interpret the hieroglyphics of destiny —Tragedy by Dixon, P. 38

এই কথাগুলিতে মহাবীর কর্ণের মর্মবেদনা হৃদয়ের ক্ষতমুখে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পর কর্ণ তাঁহার সত্য ত্যাগ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বিদ্বেষও অনেকটা শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন, তিনি আর অবধ্য নহেন, ব্রাহ্মণ ও গুরুর অভিশাপ ভয়-কঠিন মূর্তিতে তাঁহার শিরের উপর ঝুলিতেছে। কবচ ও কুণ্ডলহীন হইয়া তিনি সহজেই অস্ত্রভেদ্য হইয়া পড়িয়াছেন। একমাত্র অবলম্বন একাঘ্ন বাণ, কিন্তু যতবার অর্জুনের বিরুদ্ধে তিনি সেই ভয়ঙ্কর বাণ প্রয়োগ করিবার কথা ভাবেন, ততবারই সেই নবীন-নীরদ-শ্যাম কৃষ্ণ আসিয়া সেই বাণের কথা তাঁহাকে ভুলাইয়া দেন। আর বাণ প্রয়োগ করিবেন তিনি কাহার বিরুদ্ধে, নিজেরই ভ্রাতার বিরুদ্ধে তো; সেই চিন্তায় যে তাঁহার অন্তরাত্মা উল্লাসের পরিবর্তে বেদনাই বোধ করিয়া বসে। সেজন্য এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ে তাঁহার আগ্রহ কমিয়া গিয়াছে, সত্যসন্ধ মহাপুরুষ যেন নিরাসক্ত চিত্তে বীরের কর্তব্য-কর্ম করিয়া গিয়াজেন। কর্ণের একাঘ্নী অস্ত্র ঘটোৎকচের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হইল; অর্জুনের প্রতি প্রযুক্ত সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হইল। দৈবের শেষ জয় সিদ্ধ হইল। কবচ-কুণ্ডলহীন, ভগ্নরথ মহাবীর অন্তিম মুহূর্তে দেবতার চরণে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু দেবতার জয়ে উল্লাস বোধ না করিয়া মানুষের পরাজয়ে আমাদের চিত্ত সীমাহীন বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিল।

নাটকের মধ্যে কর্ণের অংশটুকু বাদ দিলে অনেক ঘটনাকেই অকারণ এবং অনেক চরিত্রকেই অস্পষ্ট মনে হইবে। নাট্যকার নাটকের পরিমিত কেন্দ্রমুখী ক্রিয়াশীল ঘটনার কথা বিস্মৃত হইয়া অনেক স্থলেই মহাভারতের কাহিনী অনুসরণ করিয়া বহু অনাটকীয় দৃশ্য ও চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন। ইহাতে নাটকের দীর্ঘতা যেমন অপরিমিত হইয়াছে, তেমনি ইহার গতিবেগ শিথিল ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় সব চরিত্রই যথাযথ মহাভারতের চরিত্র হইয়াছে, তবে দুইটি নারী চরিত্রের ভাবমূর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি হইল দ্রৌপদীর প্রতিহিংসামূর্তি। দ্রৌপদীর কঠোর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও তীব্র বিদ্বেষ জ্বালা দেখিয়া বেদব্যাসের সেই অসিতাপাঙ্গী, কেশাকর্ষণ-কুপিতা দ্রুপদনন্দিনীর তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যগুলি মনে পড়ে—

> ধিক পার্থস্য ধনুষ্মত্তাং ভীমসেনস্য ধিগ্ বলম্।
> যত্র দুর্যোধনঃ কৃষ্ণ মুহূর্তমপি জীবতি॥
> যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যা যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি।
> ধার্তরাষ্ট্রেষু বৈ কোপঃ সর্বঃ কৃষ্ণ বিধীয়তাম্॥

আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র কর্ণপত্নী পদ্মাবতী তাঁহার দেবোপম স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় পূর্ণ অন্তরকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, অথচ স্বামীর কৃষ্ণদ্বেষের সহিত তাঁহার যোগ নাই। বাসুদেব কৃষ্ণকে তিনি আরাধ্য দেবতারূপে পূজা করিয়াছেন, কর্ণ যাহা পুরুষকারের অভিমানে বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই, পদ্মাবতী যেন এক অকুণ্ঠ ভক্তির দৃষ্টিতে সেই রহস্য নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন। স্বামীর অমঙ্গলের সম্ভাবনা ভাবিয়াও পাণ্ডব বধূরূপে তিনি

পাণ্ডবের জয় কামনা করিয়াছেন, পতিপ্রাণা বধূর কুলের মর্যাদা-গর্বে এক ত্যাগব্রতচারিণী মহীয়সী নারীরূপে তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন। সত্যই দ্রৌপদীর কথার পুনরাবৃত্তি করিতে ইচ্ছা হয়—

ওগো নরশ্রেষ্ঠের ঘরণী
প্রণিপাত করি আমি তোমার উদ্দেশে।

## (গ) ঐতিহাসিক নাটক

ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ণতা আমরা দ্বিজেন্দ্রলালে দেখাইয়াছি। ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক নাট্যকার, দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক রচিত হইয়াছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক দোষত্রুটি যাহাই থাকুক না কেন, একটা বিষয়ে তাঁহার ন্যায্য সম্মান তাঁহাকে দিতেই হইবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে জাতীয়মন্ত্রপূত অনুপ্রাণনাময় নাটকাবলীর প্রণয়ন হইয়াছিল তাহার সূচনা ক্ষীরোপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকেই হইয়াছিল। 'প্রতাপাদিত্য' নাটক হিসাবে খুব উৎকৃষ্ট নয়, ইহা অপেক্ষা সব দিক দিয়া শ্রেষ্ঠতর নাটক পরে অনেক লেখা হইয়াছিল, তবে জাতীয়ভাবের প্রথম প্রবর্তকের গৌরব ইহার অবশ্যপ্রাপ্য, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ উঠিতে পারে না। 'পদ্মিনী', 'চাঁদবিবি', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'বঙ্গে রাঠোর' প্রভৃতি নাটকেও স্বদেশী ভাবোদ্দীপনই নাটকের উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। সুতরাং স্বাধীনতাব্রতী, মুক্তিসাধক নাট্যকার-প্রবর দ্বিজেন্দ্রলালের পাশেই ক্ষীরোদপ্রসাদের স্থান আমরা নির্দেশ করিতে পারি। কিন্তু নাট্যকলার দিক দিয়া বিচার করিলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক অপেক্ষা ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক নিকৃষ্ট ইহা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হইব। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে যে রকম বীররসের উন্মাদনা আছে, ভাষা ও ভাবের সর্বত্র যেমন একটা গম্ভীর, সংহত এবং ওজস্বী রূপ আছে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে সে সব নাই। তাঁহার নাটকের ভাষা অনেক স্থানে অনুচিতভাবে তরল এবং হাল্কা, এবং গভীর ও গম্ভীর ভাব কোনো কোনো জায়গায় কৌতুক রসের চাপল্যে অস্ফুট এবং অবিকশিত। ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রধান দোষ—ঘটনা সংস্থানের অসঙ্গতি এবং চরিত্রসমাবেশের অসম্ভাব্যতা। নাট্যকার তাঁহার ইচ্ছা এবং কল্পনা অনুযায়ী এমন জায়গায় এমন সব পাত্রপাত্রীকে একত্রিত করেন যে তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করা চলে না। দ্বিজেন্দ্রলালকে অনুসরণ করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদও তাঁহার নাটকীয় চরিত্রগুলিকে দ্বন্দ্বময় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এই চেষ্টা সর্বাপেক্ষা ফলবতী হইয়াছে 'আলমগীর' নাটকে।

গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় ক্ষীরোদপ্রসাদ ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে যাইয়া ইতিহাসকে খুব বিশ্বস্তভাবে অনুবর্তন করেন নাই। অনেক স্থলেই তিনি নিজের প্রয়োজন মত কল্পনাশ্রয়ী হইয়া অভিনব ঘটনা এবং চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক দুই একটি চরিত্র লইয়া সম্পূর্ণ কল্পিত কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া তিনি কয়েকখানা নাটক রচনা করিয়াছিলেন, যথা—'রঘুবীর', 'খাঁজাহান', 'আহেরিকা', এব 'বঙ্গে রাঠোর'। পৃথকভাবে ঐ নাটকগুলির আলোচনা করা হইবে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ যে ঐতিহাসিক নাটকগুলি লিখিয়াখিলেন সেইগুলির নাম প্রতাপাদিত্য, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, পদ্মিনী ( ১৩১৩ ), অশোক (১৩১৪), চাঁদবিবি ( ১৩১৪ ) বাঙ্গলার মসনদ (১৩১৭), আলমগীর (১৩৩৮), বিদুরথ (১৩২৯)।

॥ অশোক (১৯০৮)॥ 'অশোক'কে ঐতিহাসিক নাটক জোর করিয়া বলিতে হয়, কারণ নাটকের মধ্যে ইতিহাসের অনুসরণ খুব কমই আছে। নাটকের নাম 'অশোক', অথচ অশোককে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার চরিত্রের কোনো বৈশিষ্ট্যও ফুটিয়া উঠে নাই। বীতশোক, ধুন্ধুমার এবং চিত্রা এই তিনটী চরিত্রেরই পুনঃ পুনঃ আনাগোনা দেখা গিয়াছে। চরিত্র-সমাবেশের অসংলগ্নতা এবং সংলাপের দুর্বলতার জন্য নাটকের কোনো প্রভাব মনের মধ্যে থাকে না।

॥ পদ্মিনী (১৯০৬)॥ 'পদ্মিনী' নাটকের নামও যথার্থ হয় নাই। দুই একবার পদ্মিনীকে দেখা গেলেও তাঁহার চরিত্রের অভিব্যক্তি নাটকের মধ্যে নাই। তিনি ঘটনার জটিলতা এবং ট্র্যাজেডির কারণও নহেন। যদি কেহ দুর্লঙ্ঘ্য ঘটনাপুঞ্জের জন্য সর্বাপেক্ষা দায়ী হইয়া থাকে তবে সে নসীবন। এই খেয়ালী নারীর ব্যক্তিগত খেয়ালের সহিত একটা জাতি যেন তাহার ভাগ্য বাঁধিয়া দিয়াছে। অথচ নসীবন তাহার স্বামী আলাউদ্দিনের প্রতি এরূপ বিজাতীয় প্রতিহিংসার বশীভূত হইল কেন তাহার সঙ্গতাকারণ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয় নাই। নাটকের চরিত্র সমাবেশের মধ্যে গুরুতর ক্রটি লক্ষিত হয়, যে কোনো চরিত্রকে যে কোনো স্থলে অবিশ্বাসজনক ভাবে স্থাপন করা হইয়াছে, সঙ্গতি এবং সম্ভাব্যতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। নাটকে ট্র্যাজেডির অমোঘ, অব্যর্থ·গতি কোন পাত্রপাত্রীর চরিত্রের ভিতর হইতে হয় নাই, বাহিরের ঘটনার আঘাতেই ট্র্যাজেডি ঘটিয়াছে। গোরার চরিত্রই সর্বাধিক সরস ও জীবন্ত।

॥ প্রতাপাদিত্য (১৯০৩)॥ 'প্রতাপাদিত্য' একদিন স্বাদেশিক নাট্যজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও ইহার মধ্যে স্বদেশপ্রাণতা উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রকাশ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। জায়গায় জায়গায় সংলাপের মধ্যে স্বদেশানুরাগ ব্যক্ত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশের জন্য একাগ্র সাধনা, অনন্ত আশা, মহৎ আত্মত্যাগ নাটকের মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই। ইহাতে দুঃখ তাপের আঘাতে স্বাধীনতার মূল্য বুঝিয়া লইতে হয় নাই, সেইজন্য ইহার idea মনের মধ্যে প্রভাব মুদ্রিত করিতে পারে নাই। প্রতাপাদিত্যের পতন কোনো ট্র্যাজেডি হয় নাই, মনে হয় অকস্মাৎ যেন তাহার পরাজয় এবং পতন ঘটিয়া গেল, অনিবার্য ঘটনারাশির মধ্য দিয়া ট্র্যাজেডি যেভাবে গড়িয়া উঠে ইহা তেমন হয় নাই। প্রতাপাদিত্য বাংলার লুপ্ত স্বাধীনতা উদ্ধার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র আমাদের মন আকর্ষণ করিতে পারে না। তিনি সাহসী বীর বটে, কিন্তু মানবত্বের দুর্লভ গুণে মণ্ডিত নহেন। তাঁহার স্বকৃত অপরাধের জন্যই

তাঁহার স্বোপার্জিত রাজ্যের ধ্বংস নিকটবর্তী হইয়াছিল। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'ও আছে যে প্রতাপাদিত্যের অন্যায় এবং অপরাধের জন্য দেবী তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পতন ঘনাইয়া আসিয়াছিল। স্নেহময়, ক্ষমাশীল খুল্লতাতের প্রতি তাঁহার অকারণ সন্দেহ এবং বিদ্বেষ তাঁহার চরিত্রকে হীন করিয়াছে, এবং অবশেষে যখন তিনি তাঁহারই অভ্যর্থনায় উদ্যত খুল্লতাতকে হত্যা করিয়া বসিলেন তখন তাঁহার এই কাজ ক্ষমার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে ভুলক্রমে এই শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া অন্যায়কারীকে সহানুভূতি দেখানো যাইত কিন্তু এই হত্যা প্রতাপাদিত্যের বহুকালপোষিত বিদ্বেষের স্বাভাবিক পরিণতি মনে হয় বলিয়া তাঁহার প্রতি কোনো সহানুভূতি জাগ্রত হয় না। প্রতাপাদিত্যের এই গুরুতর অন্যায়ের জন্য তাঁহার পরিণতি আমাদের চিত্তকে তেমন বিষাদময় করিয়া তুলে না। প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের মধ্যে রাজোচিত গাম্ভীর্য এবং গুরুত্ব নাই। ভূমিকাটীকে পরিহাস-রসিক ভাঁড়ের মত করিয়া অঙ্কন করা অসংগত হইয়াছে। ভবানন্দ দেশদ্রোহী, নীচাশয় চরিত্র, মানসিংহকে সেই আহ্বান করিয়া আনিয়া বাংলার সর্বনাশ সাধন করে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নদা দেবী তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বঙ্গমাতার কাছে তাহার বিভীষণ-বৃত্তি যে কেবল তিরস্কৃত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

॥ আলমগীর (১৯২১) ॥ 'আলমগীর' ক্ষীরোদপ্রসাদের কীর্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যে নাটকখানি বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অম্লানভাবে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ঔরংজীবের দ্বন্দ্বময় চরিত্র ক্ষীরোদপ্রসাদের পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার প্রসিদ্ধ নাটকদ্বয় 'দুর্গাদাস' এবং 'সাজাহানে'র মধ্যে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। রাজসিংহ-রূপ-কুমারী কাহিনী লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'রাজসিংহ' প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদকে তাঁহার পূর্ববর্তী পুস্তকগুলি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল। নাটকখানি অত্যন্ত দীর্ঘ, নাট্যকার নিজে অভিনয়ের জন্য নাটকের অনেক স্থলে নির্দেশ বর্জনের দিলেও ইহার দীর্ঘতা বিশেষ কম ক্লান্তিদায়ক হয় নাই। নাটকের মধ্যে আলমগীর-উদিপুরী ও রাজসিংহ-ভীমসিংহ-জয়সিংহের কাহিনী পরস্পরের সহিত মিলিতভাবে অগ্রসর হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য নাটকের ন্যায় ইহাতেও ঘটনা-সংস্থাপনের সম্ভাব্যতা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। মহারাণী বীরাবাইএর মেবার ত্যাগ করিয়া রূপনগরে উপস্থিতি, ভীমসিংহ-জয়সিংহের মহাশত্রু ঔরংজীবের সম্মুখে গমন, উদিপুরীর শিবিরে রূপকুমারীর প্রবেশ—এই ঘটনাগুলি এত কষ্টকল্পিত যে কিছুতেই বিশ্বাস করা চলে না। আলমগীর এবং উদিপুরীর মধ্যে ক্ষমতার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের আলমগীর এক অপূর্ব চরিত্র। আলমগীর প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী, আবার নিতান্ত দুর্বল। তাঁহার অজেয় ব্যক্তিত্বের স্পর্ধিত চূড়া যেন নিমেষের মধ্যে পরাজয়ের অতল জলে ডুবিয়া যাইতেছে। তিনি আপন ক্রিয়া এবং দুষ্ক্রিয়ার নিষ্করুণ সমালোচক, তাঁহার দৃষ্টি সঞ্চরণশীল এবং কল্পনাময়; সেজন্য স্থানে স্থানে তাঁহার বাক্য অপ্রকৃতিস্থের অসংবদ্ধ আলাপের ন্যায়

মনে হয়, নাটকের অধিকাংশ চরিত্রের মধ্যে ভাবের অতি দ্রুত লয়-বিলয় হইয়াছে, সেইজন্য জায়গায় জায়গায় চরিত্রের উদ্দেশ্য ( motive ) ব্যাহত হইয়া গিয়াছে।

॥ চাঁদবিবি (১৯০৭) ॥ 'চাঁদবিবি' ঐতিহাসিক নাটক বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক কোনো বিরাট ঘটনা অবলম্বন করিয়া কাহিনী রসঘন হইয়া উঠে নাই। ঐতিহাসিক নাটকে সাধারণত যে দেশাত্মবোধ ও ভাবোদ্দীপনা থাকে ইহাতে তাহারও অভাব। ইহার তুচ্ছ ঘটনারাশি পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া বিশেষ কোনো নাটকীয় উদ্দেশ্য সৃজন করিয়া তুলিতে পারে নাই। চাঁদবিবি নামেরও যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পঞ্চম অঙ্কের পূর্বে চাঁদবিবির প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতা লক্ষিত হয় না। এখলাস খাঁ, নেহাঙ খাঁ, মিয়ান মঞ্জু প্রভৃতি চরিত্র অতিরিক্ত স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। চাঁদবিবির মৃত্যুও আকস্মিক ও নিরাবেদন।

॥ রঘুবীর (১৯০৩) ॥ 'রঘুবীর' গদ্য ও পদ্যে রচিত। গদ্য সংলাপ স্বচ্ছ ও সরস, কিন্তু পদ্য উক্তিসমূহ দীর্ঘ এবং নিরাবেগ। ভীল রঘুবীরের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাত্মক চরিত্রগুলির ন্যায় ধর্মদ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি হইয়াছে। প্রায়শ এইরূপ দ্বন্দ্ব দর্শকের পক্ষে বিরক্তিকর। ঘটনা সংস্থাপন অনেক স্থলেই দুর্বল ও অবিশ্বাস্য। জাফর ও রঘুবীর দুই দুইবার মুখোমুখী হওয়া সত্ত্বেও কোনো চরম ব্যাপার ঘটিল না, নিতান্ত সহজেই যেন দুইজন দেখা সাক্ষাৎ করিয়া চলিয়া গেল।

## (ঘ) কাল্পনিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক

॥ খাঁজাহান (১৯১২) ॥ 'খাঁজাহানের' মধ্যে কয়েকটী ঐতিহাসিক চরিত্র আছে, কিন্তু কাহিনী সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত। ঘটনা সমাবেশের অস্বাভাবিকতা নাটকীয় কৌতূহল ও আগ্রহ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। নিতান্ত অসম্ভব এবং অপ্রত্যাশিত স্থানে চরিত্রগুলিকে উপস্থিত করা হইয়াছে। এক একটা ঘটনা ঘটিয়াছে, অথচ তাহার যেন কোনো কারণ নাই এবং সঙ্গতিও নাই। নারায়ণ রাও একবার মোগলের দিকে, আবার খাঁজাহানের দিকে, কিন্তু তাহার এই পক্ষ পরিবর্তনের পিছনে যথেষ্ট কারণ নাই। সোফিয়াও পিতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া ঘর ছাড়িল, অথচ মনে হয় ইহার কোন দরকার ছিল না। তাহার যেন সর্বত্রই অবারিত গতি, নিমেষের মধ্যেই সে যেন সকল ব্যাপারের মধ্যে যাইয়া একটা সমাধানের অংশ গ্রহণ করিতেছে। তাহার এই গতিবিধি সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। নাটকের মধ্যে আবার ঘটনা সংঘর্ষ এবং দ্রুত ভাব পরিবর্তনের মধ্য দিয়া নাটকীয় রস জমাইবার অতি দুর্বল এবং হাস্যজনক চেষ্টা হইয়াছে। আজিমৎ অতি সামান্য কারণে প্রহরীকে হত্যা করিয়া বসিল এবং তাহাতেই একটা বিরাট হৈ-হৈ ব্যাপার সুরু হইয়া গেল। শেষ দৃশ্যে নারায়ণ এবং খাঁজাহানের মৃত্যু এবং সোফিয়ার সহমরণের আয়োজন

দেখাইয়া করুণরস সৃজন করিবার একটা নিষ্ফল প্রয়াস করা হইয়াছে। নাটকের কোনো স্থলই মর্মস্পর্শী হয় নাই।

॥ আহেরিয়া (১৯০৫) ॥ 'আহেরিয়া' অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট নাটক। বারাহা-লাঙ্গাইয়ের সহিত ভট্টিদের বিরোধের উপর ভিত্তি করিয়া নাটকখানি রচিত। পরিশেষে সকলের মিলনের মধ্যে নাটকের সাঙ্গ হইয়াছে। মূলরাজের চরিত্রই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মূলরাজের মধ্যে ভাবদ্বন্দ্ব বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি তনুরায়কে হত্যা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নাটকের মধ্যে তাঁহাকে মহাশক্তিশালী, উদার এবং অটুট সংকল্পনিষ্ঠ দেখিতে পাই। নির্বংশ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংকল্প ত্যাগ করেন নাই। অবশেষে তাঁহার চিরশত্রু, পুত্রহন্তা দেবরায়কে সিংহাসনে বসাইয়া তিনি মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। কেতু এবং রেবা একেবারে দ্বন্দ্বহীন, নিশ্চিন্ত চরিত্র, অবস্থা বিপাকে তাহাদের পিতৃশত্রুদের পত্নী হইয়া তাহারা বেমালুম স্বামীর পক্ষে ঝুঁকিয়াছে, স্নেহময় পিতার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত তইতে তাহাদের বাধে নাই। অন্যান্য চরিত্রগুলিও অপরিস্ফুট এবং অনুল্লেখ্য।

॥ বঙ্গে রাঠোর (১৯১৭)॥ক্ষীয়মাণ পাঠান রাজত্বের শেষ সময়কার অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া 'বঙ্গে রাঠোর' রচিত হইয়াছে। রঙ্গলাল-কালু-ভোলাই-এর মধ্য দিয়া বাঙালীর শক্তিবীর্য দেখানো হইয়াছে। নাটকের মধ্যে জাতিধর্মের বিভেদের প্রতি নজর দেওয়া হয় নাই। কলি বেগম অবাধে হিন্দুপরিবারে গৃহীত হইল, জৈনুদ্দিন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া পড়িল, এবং রতিলাল ধর্মত্যাগ করা সত্ত্বেও কাহারো কাছে স্নেহ ও সম্মান হারাইল না। ভুবনেশ্বরীর চরিত্র বেশ স্নেহময়ী ও মহীয়সীরূপে ফুটিয়াছে। রঙ্গলাল এবং ভোলাই-এর চরিত্রও সরস হইয়াছে।

# রবীন্দ্রনাথ

## (ক) ভূমিকা

শেকসপীয়ার বলিয়াছেন—নামে কি যায় আসে, গোলাপ যেই নামেই অভিহিত হউক না কেন সমান গন্ধ বিতরণ করে। কিন্তু নাম যে কতখানি অর্থবান হইতে পারে তাহা রবীন্দ্রনাথের কথা চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে। প্রকৃতই সহস্রাংশুর ন্যায় তিনি তাঁহার কিরণমালায় মানুষের কত চিন্তাক্ষেত্র, কত কল্পলোক, কত লীলাভূমি শোভিত, সজ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার প্রতিভার পরশমণির পরশে সাহিত্যের সব বিভাগ সোনা হইয়া গিয়াছে। কবিতা ও গল্পের রাজ্যে তিনি যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনি অতুলনীয়। তাঁহার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার নাট্যসাহিত্য নাট্যরীতির সুনিয়ন্ত্রিত বিধানের মধ্যে নির্দেশিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু বন্ধন-অসহিষ্ণু, মুক্তি-প্রয়াসী রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার রীতি ও নিয়ম অতিক্রম করিয়া নাট্য রচনা সুরু করিলেন। তাঁহার নাটকের সহিত পূর্ববর্তী নাট্যধাবার কোনো যোগ নাই। তাঁহার নাটকীয় চেতনার উৎস হইয়াছে তাঁহারই অনুভূতি-অভিজ্ঞতা-রসসিক্ত মানসভূমি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের মধ্যে তাঁহার অনুভূত সত্যদর্শন ক্রমিক ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়া এক অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহার যে মানস-অভিজ্ঞতা ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে তাহারই সৌন্দর্যময় প্রকাশ তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন সময়ে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধের মধ্যে তাঁহার যে মানসের পরিচয় পাই, তাহার অভিব্যক্তি তৎকালীন নাটকের ভিতরেও রহিয়াছে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের নাটক বস্তুতন্ত্রতা সত্ত্বেও তাঁহার সাহিত্যের অন্যান্য ধারার সহিত মিলিতভাবে তাঁহার কোনো মানস সত্যকেই প্রকাশ করিয়াছে ইহা ভুলিলে চলিবে না।

রবীন্দ্র-প্রতিভা প্রথমত এবং প্রধানত কাব্যধর্মী। কাব্যের ক্ষেত্রে ইহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এবং এই ক্ষেত্রের মৃত্তিকা ও রস গ্রহণ করিয়া ইহা পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে এই প্রতিভা-তরু বহু বিচিত্র চিন্তা এবং মননের বায়ু হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার মূলদেশের সহিত কাব্যভূমির সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠতম হইয়া রহিয়াছে তাহা স্মরণ রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যেও তাঁহার সর্বব্যাপী কাব্যময়তা বিরাজ করিতেছে, এবং ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 'খেয়া'-যুগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি যে নাটকগুলি লিখিয়াছিলেন, সেইগুলির মধ্যে গীতিকাব্যের প্রভাব অধিকতর পরিস্ফুট। তবে অপরিণত বয়সের প্রাথমিক কয়েকখানা নাটক ব্যতীত এই কাব্যভাব তাঁহার নাটকের-নাটকত্বের হানি করে নাই। 'বিসর্জন,' 'মালিনী' প্রভৃতি কাব্যছন্দে লিখিত হইলেও নাটক হিসাবে ইহাদের তুলনা নাই। 'খেয়া'র পূর্ব পর্যন্ত কবির মন বিশ্বের রূপরস সম্ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল, সেইজন্য এই সময়কার নাটকেও উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য তরঙ্গের

অবারণ লীলা, বিশ্বজগৎ এবং মানব-জীবনের অকুণ্ঠিত জয়গান লক্ষ্য করা যায়। তখনকার সদাপ্রফুল্লিত চিত্ত হাস্যরসের তরল স্রোতে অতি সহজেই ভাসিয়া বেড়াইতে চাহিত, সেইজন্য তাঁহার প্রহসনগুলিরও জন্ম হয় এই সময়ে। 'খেয়া'র পরে গীতাঞ্জলি যুগ হইতে তাঁহার মন রূপ হইতে অরূপ রাজ্যে, বিশ্ব হইতে বিশ্বাতীতের পানে অগ্রসর হইল। তখন হইতে রূপক তত্ত্বময় নাটকগুলির সূচনা হইল। 'গীতাঞ্জলি,' 'গীতালি', 'গীতিমাল্যে' যেমন বাহ্যজগতের আকুতি ও চাঞ্চল্য অন্তর্জগতের মৌন সাধনায় নিমগ্ন হইল, তেমনি পূর্বেকার নাটকগুলির ক্রিয়াময় ঘটনারাশি রূপক নাটকের অন্তর্গূঢ় ভাবময়তার মধ্যে নির্বাণ লাভ করিল। ইহাই রবীন্দ্রনাথের নাট্যধারার ইতিহাস। এই নাট্যধারার প্রতিটী বীচি-বিক্ষেপ, প্রতিটী গতি-পরিবর্তনের বিশেষত্ব আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রধান গুণ ইহার অনবদ্য, অতুলনীয় ভাষা। ভাষা-রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট তাঁহার ভাষাকে যেভাবে ইচ্ছা গঠিত এবং চালিত করিয়াছেন। এই ভাষার কৃতিত্বেই তাঁহার নাটক বিরল ঘটনাময় হইলেও যথেষ্ট আবেগবান ও গতিমান হইয়াছে। দুই একখানা নাটক, যেমন—'তপতী', 'রক্তকরবী'তে তাঁহার ভাষা একটু অলঙ্কার-বহুল হইয়া সাধারণের পক্ষে মাঝে মাঝে দুরূহ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ নাটকের ভাষা নাটকীয় চরিত্রের ভাব ও দ্বন্দ্ব সুগভীর রেখায় অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সংলাপের মধ্যে আর একটী জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাঁহার সংলাপ খুব সংক্ষিপ্ত এবং পরিমিত। বাংলার অধিকাংশ নাট্যকারদের নাটকে সংলাপের অপরিমিত দীর্ঘতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ফলে পাত্রপাত্রীর কথাবার্তা অনেক স্থলে একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। ছোটো সংলাপের সমাবেশ থাকিলে আমাদের দৃষ্টি ইতস্তত বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে ঘুরিতে থাকে, ফলে আমাদিগকে বিশেষ সজাগ এবং অভিনিবিষ্ট থাকিতে হয়, এবং পাত্রপাত্রীদের সংলাপে সংঘর্ষ লাগিয়া মুহুর্মুহুঃ আবেগকণা বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের নাটকের কথোপকথন এত ক্রিয়াচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ নাটকে প্রচলিত নাট্যরীতি ভঙ্গ করিয়াছেন ইহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অঙ্ক ও দৃশ্যের বাঁধাবাঁধি তিনি একেবারে বর্জন করিয়াছেন। 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী'তে কোনো অঙ্ক অথবা দৃশ্য নাই। পাত্রপাত্রীগুলিকে একটানা সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন। আবার কোনো কোনো নাটকে অঙ্ক বাদ দিয়া কয়েকটী বড়ো বড়ো দৃশ্যের মধ্যে ঘটনা সংস্থাপিত করিয়াছেন। 'ফাল্গুনী'তে পাত্রপাত্রীদের নাম উল্লেখ না করিয়া সংলাপ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ নাটক অভিনয়ে চিত্রপট ও রূপসজ্জা বর্জনীয় মনে করিতেন। 'ফাল্গুনী'র সূচনায় কবি মহারাজকে বলিতেছেন—'চিত্রপটে প্রয়োজন নেই—আমার দরকার চিত্তপট—সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।' অবশ্য দর্শকের মন কতখানি উন্নত ও কল্পনাশীল হইলে সে নাটকীয় রস-উদ্বোধক উপকরণগুলি অনাবশ্যক বোধ করিবে তাহা বিবেচনা করা দরকার, এবং রঙ্গমঞ্চ ও ইহার আনুষঙ্গিক

কৃত্রিম কলা-কৌশল না থাকিলে নাটক বাস্তবের (Reality) বিভ্রম (illusion) জাগাইয়া তুলিতে পারে কিনা সেই সন্দেহও মনের মধ্যে থাকিয়া যায়। ভবিষ্যতের নাট্যজগৎ রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নাট্যকলা গ্রহণ করে কিনা তাহাই দেখিবার বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত নাটকে বাহ্য ক্রিয়া এবং সংঘর্ষ খুব বেশি লক্ষ্য করা গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে অন্তর্জগৎ উদ্‌ঘাটিত এবং বিশ্লেষিত হইলেও বাহ্য কল্পনার অত্যধিক প্রাধান্য বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের পূর্বতন নাট্যকারবৃন্দ তাঁহাদের নাটকে দৌড়ঝাঁপ, মারামারি, কাটাকাটি ইত্যাদি সস্তা ধরণের রোমাঞ্চকর দৃশ্যের সমাবেশ করিয়া action সৃষ্টি করিতে গিয়াছেন, আমাদের দর্শকবৃন্দের রুচিও এই রকম নাটক পছন্দ করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিতেছে তাহা আমরা চোখের সম্মুখে দেখিতেছি। মুগুরের ঘা না খাইলে যে রসবোধ জাগ্রত হয় না, তাহা সূক্ষ্ম স্পর্শের সমাদর করিবে কিরূপে? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দর্শকের রুচি গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার নাটকের মধ্য হইতে স্থূল এবং রোমাঞ্চময় ঘটনা একেবারে বাদ দিলেন। কিন্তু সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের নাটক যে ক্রিয়াবিরল, নিরাবেগ হইয়া পড়িল তাহা নহে। উত্তাপ তিনিও সৃষ্টি করিলেন, তবে তাহা কাঠখড়ের ন্যায় চোখ রাঙ্গাইয়া থাকে না, সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক তারের মধ্যে ইহা অদৃশ্য অথচ প্রচণ্ড জ্বালাময় অগ্নি-প্রবাহের ন্যায় বিরাজ করিতে থাকে। অন্তর্লীন-পাবক শমীবৃক্ষ যেমন ভিতরে দগ্ধ হইয়াও বাহিরে অক্ষত, অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে, তাঁহার নাটকের আবেগময় ক্রিয়াও অন্তস্তল দিয়া সুতীব্রভাবে গমনশীল হইয়াও বাহিরে অপ্রকাশিত থাকে। সুতরাং মনপ্রাণ রুদ্ধ করিয়া শুধুমাত্র চোখ দুটীকে জাগাইয়া রাখিলে তাঁহার নাটকের রস উপলব্ধ হইবে না। তাঁহার নাটক যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্তর এবং বাহিরের সব ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রস্তুত এবং প্রখর রাখিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথে আসিয়া বাংলা নাটক তাহার পরিপূর্ণ আভিজাত্য এবং গৌরব লাভ করিল। নাটকের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম কলাকৌশল এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সুস্পষ্ট পরিচয় দিলেন তাহা তাঁহার পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই, এবং পরেও অনুসৃত হয় নাই। তাঁহার নাটক এখনো ব্যাপক সর্বজন-সমাদর লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ দর্শকদের মন এখনও যোগ্য ও প্রস্তুত হয় নাই। ভাবী কালের অনাগত সমাজে ইহার প্রকৃত মূল্য অনুভূত হইবে। তখন লোকে সমস্বরে স্বীকার করিবে রবীন্দ্রনাথ বাংলার শুধু শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারও বটে।

## (খ) কাব্যনাট্য

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-জীবনের সূচনা হইতে ‘চিত্রা’-‘চৈতালি’ যুগ পর্যন্ত যে সব নাটক লিখিয়াছিলেন তাহা পদ্য-ছন্দে রচিত। সাধারণত এইগুলি নাট্যকাব্যরূপে খ্যাত। গীতি-কবিতার উচ্ছ্বাস এবং লালিত্য ইহাদের মধ্যে আছে সন্দেহ নাই,

কিন্তু ইহাদের মধ্যে নাটকীয় গতি ও আবেগ এবং ঘটনার চমৎকারিত্বও আছে; তাহা না হইলে ইহাদিগকে কখনো নাটক বলা সংগত হইত না। ইহাদের মধ্যে প্রাথমিক পর্বের নাটকগুলিকে প্রকৃতপক্ষে নাটক বলা যায় কিনা সন্দেহ। এই সময়ে 'ভগ্নহৃদয়' নামক একখানি গ্রন্থ কবি লিখিয়াছিলেন, নাটকাকারে লিখিত হইলেও কবি ইহাকে কাব্য বলিয়াছেন। 'ভগ্নহৃদয়'কে যদি কাব্য বলিতে হয় তবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি গ্রন্থকে কাব্য না বলিয়া উপায় নাই। কিন্তু তবুও একটু উদারভাবে বিচার করিয়া রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভাসরূপে ইহাদিগের আলোচনা চলিতে পারে। দ্বিতীয় পর্বের নাট্যকাব্যগুলি নাটক হিসাবে সম্পূর্ণ নিখুঁত এবং সার্থক। 'বিসর্জন' এবং 'মালিনী'র মধ্যে ঘটনার এরূপ দ্রুত ধাবমান গতি, ভাবের এমন সূক্ষ্ম, সীমাহীন দ্বন্দ্ব, এবং চরিত্রের এত সুগভীর আবেগ রহিয়াছে যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যে ইহাদের তুলনা খুব কমই আছে। 'মালিনী'র পর তিনি কতকগুলি দীর্ঘ কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাদিগকে নাটক বলা মোটেই সমীচীন হইবে না। আমরা 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি কবিতার কথা বলিতেছি। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায়-অভিশাপ' প্রভৃতি কবিতা-গুলিকে নাটক বলিতে সম্মত হন নাই, অথচ এই কবিতাগুলিকে নাটক হিসাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই কবিতাগুলি নাট্যাকারে লেখা, এবং ইহাদের মধ্যে চরিত্রগুলির হৃদয়দ্বন্দ্বও হয়তো আছে। কিন্তু নাটকের মধ্যে যে ঘটনার জটিলতা, কাহিনীর যে ধারাবাহিক গতি এবং পরিণতি, বিচিত্র এবং বিভিন্ন চরিত্রের যে রকম সমাবেশ প্রয়োজন এই কবিতাগুলিতে সে সব নাই। সুতরাং ইহাদিগকে কাব্য হিসাবে আলোচনা করাই বিধেয়।

রবীন্দ্রনাথের নাট্য রচনার উন্মেষ হয় 'বাল্মীকির প্রতিভা'তে। ইহাতে সঙ্গীতের সুরের মধ্য দিয়া নাটকীয় ঘটনা ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে। অতীন্দ্রিয় ভাবলোকবিহারী সঙ্গীতকে রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুময় জগতে সঞ্চালন করিয়াছেন।১ নাটকখানির মধ্যে দেশী বিদেশী নানা বিচিত্র রাগ রাগিণীর লীলা দ্বারা এক অপূর্ব সঙ্গীতের মায়াপুরী সৃষ্ট হইয়াছে। এই সংগীতের তরঙ্গময় উচ্ছ্বাসে নাটকের ঘটনা ক্ষিপ্রগতি নৃত্যের ছন্দে নিমেষের মধ্যে চক্ষুকর্ণের মোহময় বিভ্রম জাগাইয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। সে-কারণে নাটকের ক্রিয়া বিক্রিয়াগুলি যথেষ্ট দ্বন্দ্বময় হয় নাই। বাল্মীকির রত্নাকর দিকটী পরিস্ফুট হয় নাই, দয়া ও মমতায় গলিয়া যাইবার জন্য যেন তাঁহার হৃদয় প্রস্তুত হইয়াই ছিল, বালিকার এক কথাতেই তাহার দস্যুজীবন শেষ হইয়া গেল। দস্যুগণের নির্মমতা এবং বাল্মীকির সহিত তাহাদের বিরোধিতা তরল হাস্যরসের মধ্যে পরিণত হইয়া নিতান্ত কৃত্রিম এবং মূল্যহীন মনে হইয়াছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র আসল এবং একমাত্র দ্বন্দ্ব বাল্মীকির

১। 'উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা করি একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই।'

'জীবনস্মৃতি'।

মনে—এই দ্বন্দ্ব সূক্ষ্ম, ভাবময় এবং অন্তর্নিহিত। এইখান হইতে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র প্রভাব তাঁহার নাটকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।১ বাল্মীকি লক্ষীর অনুগ্রহ গ্রহণ না করিয়া সরস্বতীর কৃপা মস্তকে ধারণ করিয়া লইলেন ইহাতেও 'সারদামঙ্গলে'র ভাব হুবহু অনুসৃত।

'বাল্মীকির প্রতিভা'র ন্যায় 'রুদ্রচণ্ডে' সঙ্গীতের প্রাধান্য নাই, সংঘাতমূলক ঘটনাই ইহার প্রাণ। কবির পদ্যছন্দ এখনো জড়তামুক্ত হয় নাই বটে, কিন্তু এই ছন্দ ক্রিয়াশীল ঘটনা ব্যক্ত করিতে অনেকাংশে সমর্থ হইয়াছে।

নাটকের মধ্যে ক্রুদ্ধ জ্বালাময় প্রতিহিংসা এবং মধুর মমতাময় প্রেম—এই দুই বিপরীত ভাবের লীলা লক্ষ্য করা গিয়াছে। অবিচারিত, নির্বাসিত রুদ্রচণ্ড তাহার চিত্তকে বারিবিন্দুহীন শুষ্ক তপ্ত মরুভূমির মত করিয়া তুলিয়াছে, এই মরু দ্বারা সে নিজে দগ্ধ হইয়াছে, এবং অন্যকে দগ্ধ করিবার অবিচল চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মনে হয় প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার অটল সংকল্পই বুঝি তাহার চরিত্রকে এরূপ কঠোর করিয়া তুলিয়াছে, ইহা যেন তাহার যথার্থ পরিচয় নহে। সেইজন্য পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতিহিংসা অর্থহীন হইয়া যাওয়ায় সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিজের রুদ্ধ স্নেহ শতধারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কন্যার কাছে তাহার আসল মর্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া দিল—

'আয় মা অমিয়া মোর কাছে আয় বাছা।
এতদিন পিতা তোর ছিল না এ দেহে
আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া।'

রুদ্রচণ্ডের কঠোর প্রতিশোধস্পৃহা তাহার চরিত্রকে ক্ষুদ্র করিতে পারে নাই, তাই মহম্মদ ঘোরীর গোপন সাহায্য প্রার্থনা সে ঘৃণায় অগ্রাহ্য করিয়া ঘোরীর আগমন বার্তাই নগরে প্রচার করিতে চলিল, পৃথ্বীরাজ তাহার শত্রু বটে, কিন্তু পৃথ্বীরাজ যেন একমাত্র তাহারই শত্র, সেই শত্রুর প্রতি বীরোচিত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার সংকল্প লইয়াই সে বাঁচিয়া আছে। যখন সেই সঙ্কল্প সাধন করার সম্ভাবনা তিরোহিত হইল, তখন নিতান্ত ভগ্নহৃদয়েই সে আত্মনাশ করিযা বসিল। এই অনমনীয়-চিত্ত, উন্নতশির, বিশালপ্রাণ বীরের পরিণতি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। অমিয়া অরণ্যের আগ্নেয়গিরির পাশে শীতল প্রস্রবণের ধারার ন্যায়, অগ্নিতাপপীড়িত চিত্তকে শান্ত ও তৃপ্ত করিবার জন্য যেন বিরাজ করিয়াছে। সে কারুণ্য ও মমতার মৃত্তিকায় গড়া নিখুঁত নিষ্কলঙ্ক প্রতিমা, রোষ অভিমানের বিন্দুমাত্র মসীচিহ্ন সেই প্রতিমাকে কলঙ্কিত করে নাই।

১। রবীন্দ্রনাথ 'বিহারীলাল' নামক প্রবন্ধে উক্ত কবির 'সারদামঙ্গল' কাব্য হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া 'বাল্মীকির প্রতিভা'তে নিবন্ধ করিয়াছিলেন তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন—বাল্যকালে বাল্মীকির প্রতিভা নামক একটী গীতিনাট্য রচনা করিয়া 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বংকিমচন্দ্র এবং অন্যান্য রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটকটি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের সারদামংগলের আরম্ভ ভাগ হইতে গৃহীত।'

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটক হইলেও নাটকত্ব অপেক্ষা একটা বিশেষ তত্ত্বই ইহার মধ্যে প্রধান। এই তত্ত্বটী বার বার রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন। কবি নিজেই বলিয়াছেন—'আমার তো মনে হয় আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিকন সাধনের পালা'।১ এই সীমা অসীমের মিলনতত্ত্বই নাটিকাখানির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। সন্ন্যাসী অসীমের প্রয়াসী হইয়া বুঝিতে পারে নাই যে সীমার মধ্যেই অসীম সুর বাজাইতেছে, অসীম তো সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, সে যে সীমার নিবিড় সঙ্গ চাহিতেছে। এই সত্য সে শেষে বুঝিল, সে দেখিল—'ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।'২ নাটকের মধ্যে বার বার কতকগুলি সাধারণ নরনারীকে তুচ্ছ বিষয় লইয়া মাতামাতি করিতে দেখা গিয়াছে। তাহারা অবান্তর এবং নাট্যসম্পর্কবিচ্ছিন্ন মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহারও একটা সত্যকে প্রকাশ করিতেছে। তাহারা খণ্ডসীমার মধ্যে আচ্ছন্ন থাকিয়া অসীমের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। 'প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনি সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।'৩ তত্ত্ব বাদ দিলে নাটক হিসাবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র তেমন কোন মূল্য নাই। সন্ন্যাসীর দীর্ঘ অন্তর্মুখী উক্তিগুলি নাটকের দিক দিয়া অসঙ্গত এবং মূল্যহীন, নাটকের ঘটনা-সংস্থান দুর্বল এবং অসংলগ্ন ও দৃশ্যগুলি আদিঅন্তহীন এবং নিরর্থক।৪ 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র গানগুলি খুব চমৎকার, রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গানগুলির মধ্যে সরস মাধুর্য তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া ফিরিয়াছে।

'মায়ার খেলা'য় 'বাল্মীকি প্রতিভার' ন্যায় সুরের মধ্য দিয়া নাটকীয় ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। ইহাকে নাটক বলা বোধ হয় সঙ্গত নয়, কারণ ইহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। ইহার সঙ্গীতের উচ্ছ্বসিত ঝঙ্কারে আমাদের মন আবিষ্ট হইয়া থাকে, ঘটনার গতির প্রতি আমাদের আর তেমন ঔৎসুক্য থাকে না। নাটকখানি শেষ হইলে মনে হয় আমরা বুঝি এক স্বপ্নময় রূপকথার রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিলাম, সেখানকার সঙ্গীতের রেশ গুন্ গুন্ করিয়া আমাদের কানে ঝঙ্কার তুলিতেছে, এবং আলো-আঁধারময় নয়নাভিরাম দৃশ্য সৌন্দর্য্য যেন আমাদেয় চোখ ধাঁধিয়া রাখিয়াছে। 'মায়ার খেলা'র আখ্যানবস্তুর সহিত

১। 'জীবনস্মৃতি'

২। জীবনস্মৃতি

৩। ঐ

৪। 'The play in the original, is extremely loose in construction ; the scenes are ragged, with no clear beginnings or endings.'

*Rabindranath : Poet & Dramatist*

by Edward Thompson, P. 5!.

কবিনিন্দিত পূর্ববর্তী নাটিকা 'নলিনী'র সাদৃশ্য আছে। ১ 'মায়ার খেলা' মানসী যুগে লিখিত হয়, মানসী কাব্যের মধ্যে যে নিষ্ফলতার কারুণ্য এবং প্রকাশের বেদনাময় সুরটী প্রতিধ্বনিত, তাহা এই নাটকেও ফুটিয়াছে, দুরাশায় বুক বাঁধিয়া কল্পিত প্রেমের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইলে কেবল ব্যর্থ হইতে হয়, প্রেম যে ধরা দিবার জন্য সাগ্রহ বাহু প্রসার করিয়া আমাদের পাশেই বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা জানিলে প্রেমকে পাওয়া যাইবে। নাটকটীর দ্বিতীয় কথা—দুঃখ ও বিচ্ছেদের হোমাগ্নিতে দগ্ধ করিতে পারিলেই প্রেমের খাঁটি পরিশুদ্ধ রূপের সহিত পরিচয় হয়। আত্মসুখের জন্য প্রেম আশা করিলে সুখ নষ্ট হয়, প্রেমও মিলে না। মায়াকুমারীগণের কথায়—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মিলে না,
শুধু সুখ চ'লে যায়,
এমনি মায়ার ছলনা !

॥ রাজা ও রাণী (১২৯৬) ॥ 'রাজা ও রাণী' রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যের দ্বিতীয় স্তর সূচনা করিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরবর্তী জীবনে পূর্বতন অনেক রচনাকেই প্রশংসা করিতে পারেন নাই। আলোচ্য নাটকখানি তথাকথিত দোষক্রটিও পরিণত বয়সে তাঁহাকে যথেষ্ট পীড়া দিয়াছিল এবং পরিশেষে ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া 'তপতী' নাম দিয়া একখানি নূতন নাটক রচনা করিয়া তিনি ইহার সম্বন্ধে তাঁহার দায়িত্ব শোধ করিলেন। ২ চল্লিশ বৎসর পরে যে লোকের মানস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। আর রবীন্দ্রনাথের ন্যায় নিত্যনব-অনুভূতিশীল কবির পক্ষে তো কথাই নাই। সুতরাং সত্তর বৎসরের বুদ্ধি-বিদগ্ধ মন লইয়া তিনি যদি ত্রিশ বৎসরের হৃদয় সমৃদ্ধ রচনার সহিত একমত না হইতে পারেন তবে অবশ্য তাঁহাকে কোন দোষ দেওয়া যায় না কিন্তু সেজন্য পূর্বতন রচনার মধ্যে অসন্দিগ্ধ ভাবে দোষ অনুসন্ধান করা নিরাপদ ও সমীচীন নহে। ৩ কারণ কবির সুস্পষ্ট মন্তব্য সত্ত্বেও ইহা প্রমাণ করা দুরূহ নহে যে 'রাজা ও রাণী' একখানি প্রথম শ্রেণীর নাটক এবং বাংলা সাহিত্যে যে দুই একখানি ট্র্যাজেডি আছে ইহা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। আমরা সে প্রমাণই করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমত যে যে কারণে নাটকখানি রবীন্দ্রনাথের কাছে নিন্দনীয় হইয়াছিল সেগুলি আমরা বিচার করিব। কবির আপত্তির প্রথম কারণ হইল ইহার লিরিকের আতিশয্য। যে

১। আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটিকার সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।'

বিজ্ঞাপন—'মায়ার খেলা'

২। 'অনেকদিন ধরে রাজা ও রাণীর ক্রটী আমাকে পীড়া দিয়েছে।.........তখনই স্থির করেছিলেম এ নাটক আগাগোড়া নতুন ক'রে না লিখলে এর সদ্‌গতি হতে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্য মতো দায়িত্ব শোধ করেছি।'—'তপতী'র ভূমিকা

৩। 'রাজা ও রাণী' ও 'তপতী'র প্রকাশকাল যথাক্রমে—১২৯৬ ও ১৩৩৩ সাল।

যুগে তিনি 'রাজা ও রাণী' লিখিয়াছিলেন তখন বিশ্বপ্রকৃতি বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ তাঁহার হৃদয়কে কানায় কানায় ভাবাবেগে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছিল। তখন যাহা কিছু এই হৃদয় উৎস হইতে নির্গত হইতেছিল তাহাই লিরিকের শতসুরে রণিত হইয়াছিল। লিরিকের আতিশয্য নাটকের মধ্যে দোষাবহ এবং 'রাজা ও রাণী'ও যে সেই দোষ হইতে মুক্ত নয় তাহা সত্য। কিন্তু একথাও মনে রাখা উচিত যে নাটকের মধ্যে লিরিকের লক্ষণ থাকিলেই যে তাহা অপাংক্তেয় হইয়া যায় এমন কোন কথা নহে। জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেকসপীয়ারের নাটক হইতে নজীর লইয়া প্রমাণ করা যায় যে লিরিকের উদ্দাম প্রবাহ অনেক স্থলে শ্রেষ্ঠ নাট্য রস-সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। নাটক বিশেষত প্রেমমূলক কাব্যনাটকের মধ্যে লিরিকের টান একান্ত অস্বাভাবিক নহে। শেক্‌সপীয়ারের রোমিও জুলিয়েট নাটকের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রকৃত নাটকের মধ্যে লিরিকের মন্ময়তা নাটকের তন্ময়তার সহিত এক অপূর্ব একাত্মতা লাভ করে। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দৃশ্যমান বস্তু-জগতের ঘটনার আবর্তে ঘূর্ণ্যমান থাকিয়া মাঝে মাঝে দূরস্থিত ভাবজগতে তাঁহার কল্পনা-বিলসিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ভালোবাসেন। ১ 'রাজা ও রাণী'-র মধ্যে কবির কল্পনা-বিলাস অনেক জায়গায় সীমা অতিক্রম করিয়াছে বটে কিন্তু তবুও মনে হয় কবিতার প্রতি পদক্ষেপে, গানের প্রতি স্বরমূর্ছনায় এক সকরুণ ব্যর্থ প্রেম ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। লিরিকের রম্য জগতের মধ্যে স্থাপিত হওয়াতে কুমার ও ইলার প্রেম এক রোমান্টিক বিষাদ-সুন্দর রসে পরিস্নাত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম যেন এক বেদনা-ভরা কম্পমানা রাগিণীর ন্যায় ধীরে ধীরে বাতাসে মিলাইয়া গেল। কুমার ও ইলার প্রসঙ্গে 'রাজা ও রাণী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অন্যতর আপত্তি সম্বন্ধে এখন আলোচনা করিব। কবি বলিয়াছেন, 'কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত।' কবির এই উক্তি আংশিক সত্য মাত্র, পুরাপুরি সত্য কখনই নয়। এ-কথা অবশ্য অস্বীকার করা চলে না যে 'রাজা ও রাণী' নাটকের শেষ দিকে কুমার ও ইলার কাহিনী অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করাতে বিক্রম ও সুমিত্রার মূল কাহিনী খণ্ডিত ও বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তবুও এ-কথা বলা নিতান্ত অন্যায় যে তাহাদের কাহিনী নাটকের মধ্যে 'শোচনীয় রূপে অসঙ্গত' মূল-কাহিনীর অন্তর্গত উপকাহিনীর উদ্দেশ্যই হইল ঘটনা-সাদৃশ্য (Parallelism) অথবা বৈসাদৃশ্য (Contrast) দ্বারা মূলকাহিনীকে রসঘন ও আবেগচঞ্চল করিয়া তোলা। কুমার

1 'The dramatic is distinguished from the lyrical in that the latter depend almost wholly on the expression of the poet's personality, whereas the former must ever fuse into a single unity the objective and the subjective'

*World Drama by A Nicoll, P 924*

ও ইলার বৃত্তান্তও এই নাটকে ভাব ও আদর্শের বৈসাদৃশ্য দ্বারা বিক্রম ও সুমিত্রার কাহিনীকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। বিক্রম ও সুমিত্রার প্রেমের মধ্যে রহিয়াছে অন্তর্বিরোধ আর কুমার ও ইলার প্রেমে রহিয়াছে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আনুগত্য। অবশ্য দুই প্রেমেরই পরিণতি ঘটিয়াছে বিষাদে ও ব্যর্থতায়,—প্রথম ক্ষেত্রে চরিত্রগত ভ্রান্তি ও মোহের ফলে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাহ্য শক্তির প্রতিকূলতার ফলে— একটিতে Othelloর পরিণতি আর একটিতে Romeo Juliet-এর পরিণতি। অন্যভাবে বলা যায় বিক্রম-সুমিত্রা এবং কুমার-ইলার পরিণাম হইয়াছে যথাক্রমে ট্র্যাজিক ও প্যাথেটিক। দুইটি কাহিনীর চরিত্র আলোচনা করিলেও সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লক্ষিত হইবে। বিক্রমের আসক্তি লালসায় অন্ধ এবং কর্তব্যের প্রতি পরাঙ্মুখ কিন্তু কুমারের অনুরাগ ত্যাগসিদ্ধ এবং কর্তব্য-সচেতন। সুমিত্রা বৃহত্তর কল্যাণের আদর্শে উদ্বোধিত হইয়া তাহার অন্তর-কামনা নিরুদ্ধ এমন কি রাজার প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিয়াছেন অথচ ইলা তাহার উদ্বেলিত বাসনার উচ্ছ্বসিত ধারায় কুমারের অন্তর ধৌত করিয়া দিয়াছে। দুই কাহিনীর মধ্যে ভাব ও চরিত্রগত বৈপরীত্য দ্বারা যে নাটকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে তাহা ছাড়াও কুমার-ইলার কাহিনী অন্য প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছে। ইলার প্রবল ও অচঞ্চল প্রেম স্বর্গচ্যুত হতভাগ্য রাজার হৃদয়ে ঊষর প্রতিহিংসা-জ্বালা নির্বাপিত করিয়া ক্ষমাসুন্দর স্নেহের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে।[১] রাজার মুখেই তাঁহার অন্তরের পরিবর্তন প্রকাশিত হইয়াছে—

আমি কোন সুখে ফিরি
দেশ-দেশান্তরে, স্কন্ধে বহে জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ।
কোথা আছে কোন স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফুটিত শুভ্র-প্রেম শিশির-শীতল।
ধুয়ে দাও, প্রেমময়ী, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর রক্ত-কলুষিত।

'রাজা ও রাণী' সম্বন্ধে বিরূপ হইয়া রবীন্দ্রনাথ 'তপতী' নাটক লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'তপতী'র মধ্যে উচ্চতর নাট্যকলা-কৌশলের পরিচয় আছে কিনা সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে। 'রাজা ও রাণী'র মধ্যে ইলা ও কুমারের কাহিনী যদি কবির মতে 'উপসর্গ' হইয়া থাকে, তবে 'তপতী'র মধ্যে 'নরেশ ও বিপাশা'র কাহিনী কি প্রবলতর উপসর্গ হয় নাই? 'লিরিকের প্লাবন' বলিয়া কবি 'রাজা ও রাণী'কে অভিযুক্ত

১। বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্যের মত উল্লেখযোগ্য—'ইলার প্রবল প্রেম প্রেম-স্বর্গচ্যুত রাজাকে আবার স্নিগ্ধ-স্পর্শে হিংসামুক্ত করিয়া তুলিয়াছে; রাজার দুর্দান্ত হিংস্রতাকে প্রশমিত করিয়া দিয়াছে।' নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার (২য় খণ্ড), পৃঃ—১৮৯।

করিয়াছেন, কিন্তু নরেশ ও বিপাশার ঘর-ছাড়া পথচারী-জীবনের কথায় ও গানে তো এই লিরিকের ছন্দই ধ্বনিত হইয়াছে। কুমারসেন, চন্দ্রসেন, শঙ্কর প্রভৃতি চরিত্র 'রাজা ও রাণী'তে যেরূপ সজীব ও সংঘাতশীল ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়াছিল 'তপতী'তে তাহাদের চরিত্রের সেরূপ কোন বৈশিষ্ট্য নাই। তাহারা এই নাটকে অস্ফুট, অপূর্ণ ও অকারণ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ববর্তী নাটকে নাটকীয় পরিবেশের যে জটিল বিস্তৃতি এবং আবেগ ও প্রবৃত্তির যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব দেখানো হইয়াছে পরবর্তী নাটকে সেগুলির নিতান্তই অভাব। 'রাজা ও রাণী'তে যদি হৃদয়ের আতিশয্য বিসদৃশ হইয়া থাকে, তবে 'তপতী'তে মননের প্রাখর্যও বিগর্হিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। আগের নাটকে বিক্রমদেবের চরিত্রের মধ্যে যে তীব্র প্রবৃত্তির সংঘাত ও সুচঞ্চল ক্রিয়াশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, পরের নাটকে তাহার অভাব খুবই চোখে পড়ে। কেবল সুমিত্রার চরিত্রায়ণে 'তপতী'র উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। 'রাজা ও রাণী'র মধ্যে সুমিত্রার চরিত্র শেষদিকে নিষ্ক্রিয় ও বর্ণহীন, কিন্তু 'তপতী'তে তাহার চরিত্র ক্রম-বিকাশের মধ্য দিয়া এক ত্যাগসিদ্ধ অগ্নিতপ্ত মহিমা লাভ করিয়াছে।

'রাজা ও রাণী'র মধ্যে বিক্রমদেবের চরিত্র দুর্বার অন্তঃপ্রবৃত্তির দুষ্প্রতিরোধ্য তাড়নায় যে নিদারুণ ট্র্যাজিক দুঃখের গৌরব লাভ করিল বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা কমই আছে। বিক্রমদেব প্রবল হৃদয়বান মানুষ। তাঁহার হৃদয়ে অনন্ত ক্ষুধা, সেই ক্ষুধাতৃপ্তির জন্য তাঁহার প্রেমদীর্ণ হৃদয় অনুনয়ে সুমিত্রার কাছে লুটাইয়া পড়িল। মহাসিন্ধু তাঁহার ঘরে, তবুও তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক, সেই শুষ্কতা তাহার শিরা-উপশিরায় শত প্রদাহের সৃষ্টি করিল। সুমিত্রা এই প্রদাহের নিবারণ করিতে পারিতেন, স্নিগ্ধ-শীতল প্রতিদানের দ্বারা তিনি সেই ঊষর, অনুর্বর চিত্তভূমিতে কল্যাণ ও কর্তব্যের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া রাজাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যে আগুন রাজার ভিতরে জ্বলিতেছিল, তাহা প্রতিহিংসার লেলিহান সহস্রশিখারূপে ছড়াইয়া পড়িল চতুর্দিকে। কিন্তু ইহার শেষ কোথায়, শান্তিও বা কোথায়? হিংসায় শান্তি নাই, যুদ্ধে শান্তি নাই,—সেই নিষ্ঠুর পলাতকা নারী এখনও দূরে, তাঁহার নিকট হইতে বহুদূরে —হিংসার অন্তরাল হইতে বিক্রমের প্রেমিক-আত্মা কাঁদিয়া উঠিল। রেবতীর ক্রূর ও হিংস্র মুখে তিনি নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, অন্যায় ও হিংসার পথে চলিতে চলিতে তিনি থামিলেন। তারপর ইলার ত্যাগনিষ্ঠ, অবিচল প্রেমের পুণ্যজ্যোতি-স্পর্শে তাঁহার চিত্ত হইতে লোভ ও হিংসার কুৎসিত আবরণ খসিয়া পড়িল, স্নিগ্ধ ক্ষমা ও করুণায় সিক্ত হইয়া তাঁহার আত্মা এক নবজন্ম লাভ করিল। বিক্রমদেবের আসল পরিবর্তন এইখানে। সেজন্য শেষদৃশ্যে যে আত্যন্তিক দুঃখের অবতারণা করা হইল তাহা কাহিনীর অনিবার্য পরিণাম নহে। বিক্রমের মন কুমারকে ক্ষমা করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। বিক্রমের পরিবর্তন কুমারের জানা ছিল না বলিয়াই সে আত্মহত্যা করিয়াছিল এবং তাহার কর্তিত মস্তক আনিয়া শোকে অভিমানে সুমিত্রা প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পূর্বেই যে প্রতিহিংসাময় বিক্রম মনুষ্যত্বের নবদীক্ষা লাভ

করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জানা ছিল না। ভ্রান্ত ধারণা ও নিয়তি-নির্দিষ্ট অপ্রতিরোধ্য ঘটনা পরম্পরায় নাটকের দুঃখ-পরিণতি ঘটিল।

রবীন্দ্রনাথ ভোগকে ত্যাগের দ্বারা শুদ্ধ এবং সংযত করিবার কথা বহু স্থানে বলিয়াছেন, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' উপনিষদের এই বাণী কবি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। যে প্রেম কামনার সুড়ঙ্গপথে চলে, ত্যাগ ও নিষ্ঠার রাজপথে বিচরণ করে না; সংসারের অশেষ প্রকার কর্তব্য নিয়ত 'অয়ং অহং ভো' বলিয়া আহ্বান জানাইতেছে, যেই প্রেম তাহা শুনিতে পায় না; সেই প্রেম শুভ, মঙ্গলদায়ক নহে, অশান্তি ও অতৃপ্তি তাহার একমাত্র পরিণাম ইহা ভারতীয়-সাধনা-নিমগ্নচিত্ত রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কথা। 'রাজা ও রাণী'তে নাট্যকার গতানুগতিক নাট্যধারা একেবারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, সেইজন্য অনেক স্থূল ও রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা ইহাতে আছে। কুমারের কর্তিত শির প্রদর্শন, সুমিত্রার পতন ও মৃত্যু এবং ইলার আকস্মিক আগমন ও মূর্চ্ছা— এইগুলি রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ক্রিয়াময় নাটকের যথার্থ পরিচায়ক নহে।

॥ বিসর্জন (১২৯৮) ॥ 'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহের অন্যতম। হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিহীন ধর্মাচার কখনো প্রকৃত ধর্মের অংগ হইতে পারে না ইহাই নাটকের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের মানব-সত্তা সৃষ্টির শান্তি ও কল্যাণের মধুর দিকটাই বরাবর উদ্বোধন করিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধদেবের অহিংসাতত্ত্ব তাঁহার জীবন-দর্শনকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করিয়াছে এবং চিরকাল ক্ষুব্ধকণ্ঠে তিনি ইহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। ধর্মের নামে আমাদের দেশে সহিংস ব্যাপার ঘটিয়া আসিতেছে, কবি তাহা কোনো দিন সমর্থন করিতে পারেন নাই। কবির ধর্ম বিশেষ করিয়া তাঁহার গভীর মানবতা-বোধ হইতে উদ্ভূত, সর্বব্যাপী প্রেম এবং কল্যাণের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র মধ্যে হিংসার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ধ্বনিত, তাহারই পূর্ণতর এবং বিশিষ্টতর রূপ 'বিসর্জন' নাটকে পরিস্ফুট। নাট্যকার তাঁহার তত্ত্ব বিকাশ করিয়া তুলিলেন যেমন একদিকে দুঃখাবহ ট্র্যাজেডির করুণ রসের মধ্য দিয়া, তেমনি আবার ইতর লোকের নির্বোধ বিশ্বাসকে পরিহাসের স্নিগ্ধ আঘাতের দ্বারা।

'বিসর্জন' নাটকের নাটকীয় গুণ এবং মঞ্চ-সাফল্যের কারণ ইহার অসাধারণ আবেগময় বিরুদ্ধ শক্তির সবল সংঘর্ষ। নাটকের মধ্যে যেন মুহুর্মুহুঃ দ্রুত-ধাবমান মেঘের পরস্পর-ঘর্ষণে অগ্নিগর্ভ বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'এই নাটকে বরাবর এই দুটী ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম এবং প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেধেছিল।'[১] দুই প্রধান শক্তির সংগ্রামে গুণবতী রঘুপতির সহায়ক হইয়াছিলেন, এবং অপর্ণা রাজার সহযোগিতা করিয়াছিল। রঘুপতি ক্রুদ্ধ

১। রঘুপতিকে বড় করিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজ মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, প্রতিপক্ষের মুখে দুর্বল যুক্তি ও ব্যবহারে ভীরুতা প্রকাশ করিয়া তিনি তাঁহার নায়কের প্রতি অবিচার করেন নাই।'

'রবীন্দ্র-জীবনী'—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২১৩ পৃঃ।

সাগর তরঙ্গের ন্যায় চতুর্দিকে শব্দময় ফেনময় আবর্ত.বচনা করিয়া উপর্যুপরি আঘাতের দ্বারা সম্মুখস্থ প্রতিবন্ধক অপসারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য অচল, অটল পর্বতের ন্যায় তাঁহার সমস্ত আঘাত অগ্রাহ্য করিয়া স্থির আসনে অবিকম্পিত হইয়া রহিলেন। রঘুপতি চিত্তহীন, সহায়হীন পুরোহিত ব্রাহ্মণ মাত্র, অথচ তাঁহাকে প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজার বিরোধিতা করিতে হইয়াছে ; সেইজন্য তাঁহার মানসিক শক্তি, বাক্যবল এবং জিগীষাবৃত্তির এরূপ অসামান্য প্রভাব দেখাইতে হইয়াছে যাহাতে তাঁহাকে সর্বক্ষমতাবান রাজার যোগ্য প্রতিপক্ষ বলিয়া মনে হয়। কবি গোবিন্দমাণিক্যকে জয়যুক্ত করিলেও তাঁহার বিপরীত শক্তিকেও হীন এবং খর্ব না করাতে নাটকের চিত্তচাঞ্চল্যকারী আবেগময় ভাব যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। রঘুপতি শাস্ত্রাচার এবং সংস্কারনিষ্ঠার মূর্তিমান প্রতীক, তাঁহাকে ভ্রান্ত বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার শক্তিকে লঘু করিয়া লাভ নাই। নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সত্য প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন রঘুপতি তাহা মানিয়া লওয়াতে সেই সত্যের জয় ঘোষিত হইল বটে, কিন্তু সেই জয়ে গৌরব কোথায় ? যে বজ্র বিরাট ধ্বংস সাধন করিতে পারিত তাহাকেই যেন কৌশলে তারের সাহায্যে মাটিতে চালান দেওয়া হইল। ভাগ্যের ক্রূর চক্রান্তে তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারই হৃদ্‌পিণ্ডরূপ জয়সিংহকে উৎপাটন করিয়া দিল ; তাঁহার রুদ্রতেজ, অমিত বলবীর্য মাটিতে মিশিয়া গেল। সেই অবস্থায় একটা নূতন তত্ত্ব আশ্রয় করিলেও তাঁহার চরিত্রের ট্র্যাজিক সুর কেবল আমাদের কানে বাজিতে থাকে, তাঁহার নূতন জীবনকে আমরা সাগ্রহচিত্তে স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। রঘুপতি আমাদের উৎসুক, কম্পমান চিত্তকে এরূপভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন যে তাঁহার প্রতিপক্ষ গোবিন্দমাণিক্য সত্যাশ্রয়ী হইয়াও আমাদের চিত্তজয়ী হইতে পারেন না। তাঁহার শক্তি ও বীর্যবত্তার প্রভাবের বিষয় আমরা জ্ঞাত হই বটে, কিন্তু সেই প্রভাবের বিকাশ আমরা . নাটকের মধ্যে লক্ষ্য করি-না। তাঁহার ভাব এত অন্তর্মুখী, আবেগ এত সমাহিত এবং কথা এত শান্ত যে তাঁহাকে একেবারে নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্ক্রিয় মনে হয়।১ এই স্থির, নিস্তরঙ্গ বারিধিসদৃশ হৃদয়ে মাত্র একবার তরঙ্গবিক্ষোভ লক্ষ্য করিয়াছি, যখন তিনি তাঁহার ভ্রাতার নির্বাসন আজ্ঞা প্রদান করেন। রঘুপতি এবং গোবিন্দমাণিক্য—এই দুই বিপক্ষ শক্তির আকর্ষণে তীব্র দোলায়মান অবস্থার মধ্যে জয়সিংহ বিরাজ করিয়াছে। একদিকে ধর্ম এবং গুরুর প্রতি অটুট শ্রদ্ধা এবং অপরদিকে নবজাগ্রত সত্যবোধ—এই দুই বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব তাহার জীবনকে নিতান্ত করুণ ও বিড়ম্বিত করিয়া তুলিয়াছে। পরিশেষে আত্মবিসর্জনের দ্বারা সে সব দ্বন্দ্বের নিরসন করিল। জয়সিংহের বিসর্জনে রঘুপতির আসল পরাজয় এবং পরিবর্তন, সুতরাং এই

১। 'গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র মহৎ, কিন্তু বিকাশের দিক হইতে তাহা সুন্দর নহে. তাহার মধ্যে কোনো দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, সংশয় নাই। প্রতিমুহূর্তের অনুভবের নূতনত্বের মধ্যে যে রসের লীলা, মনের মধ্যে সংশয়ের যে দোলা, গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে তাহা নাই।'

'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' (১ম সং) ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়—৩১৯ পৃঃ।

বিসর্জনই নাটকের তত্ত্বকে সার্থক করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'যে শক্তি এই নাটকে জয়ী হয়েছে অপর্ণা তাকেই প্রকাশ করছে। বাইরে থেকে তাকে দুর্বল বলে মনে হয়, কার্যত তারই জয় হল।১ কিন্তু জয়ী শক্তিকে প্রকাশ করিলেও তাহার চরিত্র আবেগ চাঞ্চল্যের দ্বারা, ভাবের দ্বন্দ্ব দ্বারা জীবন্ত হইয়া উঠে নাই।২ 'বিসর্জনে'র মধ্যে শুধু বলিদানের বিরুদ্ধে নয়, প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধেও যেন একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ রহিয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য কেবল যে বলিদান বন্ধ করিয়াছেন তাহা নয়, প্রতিমার প্রতি যেন ভক্তিও তাঁহার নাই। রঘুপতি নিজের অপরাধ প্রতিমার উপরে চাপাইয়া তাহাকে বিসর্জন দিয়া যেন সর্বদোষমুক্ত হইল, শান্তিলাভ করিল, দেবীর প্রতি তাঁহার আজন্মবিশ্বাস এবং ভক্তি মিথ্যা বলিয়া বুঝিল।

'বিসর্জন' নাটকের মধ্যে কয়েক জায়গায় অসংগতি এবং অপূর্ণতা চোখে লাগে। প্রভুভক্ত চাঁদপাল কিভাবে বিদ্রোহী হইয়া পড়িল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। গুণবতীর ধ্রুবহত্যার ষড়যন্ত্র আকস্মিক, অস্ফুট এবং পূর্বাপর যোগরহিত।৩ যে নারী এইরূপ নৃশংস কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহার মনের যথাযোগ্য বিশ্লেষণ হইয়াছে কিনা, এবং তাহার শান্ত নিরুদ্বেগ পরিণতি সংগত কিনা এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগ্রত হয়।

৭। মালিনী ১৩০২॥ 'বিসর্জনে'র সহিত পরবর্তী নাটক 'মালিনী'র অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। 'বিসর্জন' অপেক্ষা 'মালিনী' অনেক স্বল্পায়তন, পাত্রপাত্রীর বহুলত্বও ইহাতে একেবারে নাই। স্বল্প পরিসরের মধ্যে দৃঢ়সংহত ঘটনা বক্ষোদ্গত নিশ্বাস বায়ুর ন্যায় বক্ষকে চঞ্চল স্ফীত করিয়া মুহূর্ত মধ্যে আবার শূন্য, ফাঁক করিয়া দিয়া বহির্গত হইয়াছে। সুমধুর তানলয়বিশিষ্ট সঙ্গীতের ন্যায় ইহা ক্ষণকালের মধ্যে শেষ হইয়া গেল বটে, কিন্তু ইহার ক্রন্দনময় সুর কেবলি যেন আমাদের কানে অনুরণন জাগাইতে থাকে। 'বিসর্জনে' ইতর লোকের কথাবার্তার সময় আমাদের মানসিক আবেগ চাঞ্চল্য স্থির করিয়া লইতে পারি, নাটকের শেষও হইয়াছে পরিপূর্ণ শান্ত রসের মধ্যে। কিন্তু 'মালিনী'তে পার্শ্ববর্তী কোনো দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার অবসর নাই, পরিপূর্ণ বিক্ষুব্ধ হৃদয়জ্বালার মধ্যেই নাটকখানির যবনিকা পাত হইয়াছে। 'মালিনী'র ট্র্যাজেডি অধিকতর দুঃখময় এবং প্রভাবময় তাহাতে সন্দেহ নাই। ৪

১। পরিশিষ্ট—'বিসর্জন' (শান্তিনিকেতনে 'বিসর্জন' অধ্যাপনা কালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কথিত)।

২। 'অপর্ণা একটি আইডিয়ার রসমূর্তি, কোনও জীবনের বিকাশ নয়, রক্তমাংসের একটি মানব কন্যার রূপ তাহার মধ্যে কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই।'

'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' (১ম সং)—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, ৩২০ পৃঃ।

৩। But it comes far too late, more than half-way through, is made little of and handled very half heartedly.'

*Rabindranath* by Thompson, p. 98-99.

৪। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় 'বিসর্জন' এবং 'মালিনী'র তুলনামূলক আলোচনা করিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা প্রণিধান-যোগ্য 'দু'টি নাটকই ট্র্যাজেডি, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মালিনীর ট্র্যাজেডি এত ঘনীভূত, এবং এত প্রবল, এবং এত স্বল্পকাল বিস্তৃত যে বিসর্জনের ট্র্যাজেডি সেই তুলনায় অনেকটা তরল এবং নিষ্প্রভ।'

—রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, পৃঃ ৩৩৮।

আর একদিক দিয়াও 'মালিনী' 'বিসর্জন' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সুসঙ্গত বিকাশ 'মালিনীতে' অধিকতর পরিস্ফুট। 'বিসর্জন' নাটকে চরিত্রগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছে, এবং ঘটনার বহুলত্বপূর্ণ চমৎকারিত্বও তাহাতে অধিক, সেইজন্য নাটকখানি হয়তো বেশি জনপ্রিয় হইয়াছে। কিন্তু নিখুঁত চরিত্র-বিশ্লেষণে 'মালিনী'র তুলনা নাই। রঘুপতির চরিত্র অদ্বিতীয় হইলেও, তাহার পরিণতি সামঞ্জস্যহীন। কিন্তু ক্ষেমংকর রঘুপতির আদর্শে অংকিত হইলেও কবি যেন পূর্বতন চরিত্রের দোষত্রুটি শোধরাইয়া লইয়া তাহাকে সৃষ্টি করিলেন। সে সংস্কারগত ধর্মরক্ষার জন্য কঠোর সংকল্প-ধারী, সর্বপ্রকার চেষ্টায় অবিচলিতচিত্তে যত্নবান, কিন্তু সে স্নেহ-প্রেমহীন নহে, সুপ্রিয়ের প্রতি তাহার স্নেহ এবং নির্ভরতা বরাবর দেখানো হইয়াছে। নারীর আকর্ষণ এবং মোহিনী-শক্তি সম্বন্ধেও সে অজ্ঞান নয়—

আমিও কি ভাবি নাই মুহূর্তের ঘোরে
এসেছে অনাদি ধর্ম নারীমূর্তি ধ'রে
কঠিন পুরুষমন কেড়ে নিয়ে যেতে
স্বর্গপানে? ক্ষণতরে মুগ্ধ হৃদয়েতে
জন্মেনি কি স্বপ্নাবেশ?

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সংকল্প সিদ্ধির জন্য সে হৃদয় জয় করিয়াছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনমনীয় আত্মমর্যাদায় সে অপরাজিত হইয়া রহিল, রঘুপতির মত বিপক্ষের সহিত আপোষ করিয়া লইল না। সুপ্রিয়ের সহিত জয়সিংহের মিল আছে, কিন্তু জয়সিংহের কঠোর অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাঁহার নিষ্ঠা এবং চরিত্রবল সুপ্রিয়ের মধ্যে নাই। সুপ্রিয়ের মধ্যে বিরুদ্ধ ধর্মের দ্বন্দ্ব অপেক্ষা মালিনীর প্রতি আকর্ষণ-জনিত দুর্বলতাই অধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং জয়সিংহের মহত্ত্ব তাহাতে নাই। বন্ধুর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সে তাহার ভীরু এবং স্বার্থপর চিত্তকেই প্রকাশ করিয়াছে। নবধর্মের প্রতি আসক্তির কথা বলিয়া ইহা সমর্থন করা চলে না।১

ক্ষেমংকরকে শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ এবং অপরিবর্তিত রাখিয়া লেখক সুনিপুণ চরিত্র সৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। শৃঙ্খলিত ক্ষেমংকরের অগ্নিবর্ষী বচন এবং সুপ্রিয়-হত্যার দৃশ্য নাটকত্ব এবং চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়া অনবদ্য একথা সকল সমালোচক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই হৃদয়বিদারক শেষ দৃশ্যে নাট্যকারের প্রতিপাদিত তত্ত্ব যে বিশেষ চাপা পড়িয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুত মালিনীর তত্ত্ব কোনো স্থলেই তেমন প্রভাবশালী হইয়া দেখা দেয় নাই। সুপ্রিয়ের চরিত্রের দ্বারা

* 'তাহার মন শান্ত, কিন্তু সে দুর্বল, এমন কি ভীরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।'
'রবীন্দ্র জীবনী' (১ম খণ্ড) পৃঃ ৩০৯।

এই তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, কারণ ব্যক্তিগত আকর্ষণই তাহার মনে প্রধান হইয়াছে। নবধর্মপ্রচারিকা মালিনীও যে তাহার ধর্মের মাহাত্ম্য কোনো স্থলে আচরিত ক্রিয়ার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছে তাহাও নয়। যে দৃশ্যে সে সর্বসাধারণকে আকস্মিকভাবে স্বমতে আনয়ন করিয়াছে তাহা অবিশ্বাস্য এবং অবাস্তব মনে হয়।১ মালিনী অতি সহজেই সকলকে বশীভূত করিয়া পুনরায় গৃহকোণে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু ইহাতে যেন আমাদের মন অধিকৃত হইল না, ইহা যেন সেই একেশ্বর সংগ্রামরত, সর্বপরিত্যক্ত ক্ষেমংকরের পিছনে লুটাইতে থাকে। তত্ত্বের পরিস্ফুরণের দিক দিয়া 'বিসর্জন' শ্রেষ্ঠ, এবং ভাব ও চরিত্র বিকাশনের দিক দিয়া 'মালিনী' শ্রেষ্ঠ।

## (গ) প্রহসন

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে অনেকে প্রহসন লিখিয়াছেন, যথাস্থানে আমরা তাঁহাদের আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার প্রহসন পূর্ববর্তী লেখকদের প্রহসন হইতে স্বতন্ত্র। তিনি অল্পসংখ্যক প্রহসন লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রহসন রচয়িতারূপে তাঁহার পাশে দাঁড়াইতে পারেন, এমন লেখক বাংলা সাহিত্যে দুই একজনের বেশি নাই। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা জানেন কবির চিত্ত সতত কি রকম সরস পরিহাসে পূর্ণ থাকিত। তাঁহার সঙ্গী, সেবাকারী এমন কি ভৃত্য পর্যন্ত যথেষ্ট রসজ্ঞ না হইলে তিনি তাঁহাদের পছন্দ করিতেন না।২ তাঁহার এই হাস্যকৌতুকময় চিত্তের পরিচয় বহুতর কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল, প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ-সম্পন্ন কবি হাস্যরস সৃজন করিতে যাইয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলেন নাই। সেইজন্য তাঁহার হাস্যরসের মধ্যে একটা সুসংযত পরিমিতি-বোধ, একটা সযত্ন-চেষ্টালব্ধ সুপরিপাটি শব্দ-বিন্যাস, এবং অন্তঃশায়ী সুগূঢ় রসের ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়। যাহাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় মাত্র হাস্যরস উপভোগের উপায় তাহারা রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস গ্রহণ করিতে পারিবে না। বৈদগ্ধ্যসেবিত মনকে উদ্যত রাখিতে পারিলে তবেই এই রস উপলব্ধ হইবে। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনের প্রধান গুণ—ইহার সুতীক্ষ্ণ সুস্নিগ্ধ ব্যঞ্জনাময় সংলাপ। ইহা অপরূপ আলোক-অন্ধকারময়, শত ঝংকার-মুখরিত অভিনয়-আসরের ন্যায় আমাদিগকে আবিষ্ট, বিভ্রান্ত করিয়া রাখে, ক্ষণে ক্ষণে অচিন্তনীয়, অভাবনীয় শব্দের অভিনয় আমাদিগকে মুগ্ধ, চমৎকৃত করিয়া তোলে, কিন্তু এই অভিনয়ে বেরসিক অর্বাচীনের প্রবেশাধিকার নাই।

1. Indeed, one scene—that where by her simple appearance she wins over the Brahmins who are clamouring for her punishment—is almost ridiculous ; it could not have happened, could not be credible, unless with someone a hundred fold more alive and dominating than this shadow girl.'

*Rabindranath* by Thompson, P. 139.

২। শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী লিখিত 'নির্বাণ', এবং শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী রচিত 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য।

॥ বৈকুণ্ঠের খাতা (১৩০৩) ॥ 'বৈকুণ্ঠের খাতা' স্বল্পায়তন প্রহসন, মাত্র তিন দৃশ্যে ইহা সমাপ্ত। বৈকুণ্ঠের খাতা যাহা তাঁহার নিজের কাছে এত প্রিয়, তাহাই আবার অপরের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছে। কোনো ব্যক্তির কথা এবং আচরণ যদি অন্য সকলের অপেক্ষা বিভিন্ন হয় তবেই তাহা হাস্যরসাত্মক হইয়া পড়ে।১ বৈকুণ্ঠের খাতার মধ্যে হয়তো মূল্যবান অনেক সম্পদ আছে, কিন্তু অন্য লোকের তাহাতে আগ্রহ নাই, অথচ বৈকুণ্ঠ সকলকে তাহা শুনাইবেনই। কৌতুকরস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যদি একই রকম অথবা বিপরীত ধরণের দুইটী চরিত্রকে একত্রে সমাবেশ করা হয়। মলিয়েরের প্রহসনে জোড়া চরিত্রের কথার সঙ্গতি অথবা অসঙ্গতি দেখাইয়া অনেক স্থলে সরস কৌতুকের সৃষ্টি করা হইয়াছে। বৈকুণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে যখন অবিনাশকেও নিজের লেখা শুনাইবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিতে দেখি, তখন আমাদের হাস্য দ্বিগুণ বর্ধিত হয়। লেখক ইহাই দেখাইয়াছেন যে, বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়িলে সকলেই পাগলাটে এবং বাতিকগ্রস্ত হইতে পারে, সুতরাং অন্য কেহ সরল এবং নির্বোধ ইহা মনে করিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া লাভ নাই, অতি সহজেই স্থিরমস্তিষ্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধি ও বিচারশক্তি লুপ্ত হইতে পারে। কেদার এবং তিনকড়ির জোড়া চরিত্রও কৌতুকরসকে প্রবল করিবার জন্য একসঙ্গে স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাদের জীবনের ধরণ এবং উদ্দেশ্য এক রকম হইলেও ইহাদের চরিত্রগত পার্থক্য বিদ্যমান। কেদার সুবিধাবাদী, আত্মসুখান্বেষী এবং প্রবঞ্চক। সে বাহিরে সাধু সাজিয়া কার্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টায় থাকে ; কিন্তু তিনকড়ি আত্মসুখপ্রয়াসী, পরনির্ভরশীল হইলেও নিতান্ত স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ, ধরা পড়িবার ভয় তাহার নাই। তিনকড়ির এক কথাতেই কেদার এবং তাহার চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—'বরাবর দেখে আসছি কেদার দা, শেষকালটা তুমি ধরা পড়ই, আমি সর্বাগ্রেই সেটা সেরে রাখি—আমার আর ভাবনা থাকে না।' উদার, আত্মভোলা বৈকুণ্ঠ আমাদের হাস্যরস উদ্রেক করিলেও হাস্যরসের তরঙ্গাঘাতে যেন আমাদের চিত্ত-তটে স্নেহ এবং সহানুভূতির পলিমাটি জমা হইতে থাকে। সেই বৈকুণ্ঠকে শেষের দিকে সকলের অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত হইয়া থাকিতে দেখিয়া আমাদের অন্তর করুণরসে পরিপূরিত হইয়া উঠে। বৈকুণ্ঠ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে বইখানা পরিপূর্ণ বিষাদান্তক হইয়া পড়িত, কিন্তু লেখক সামলাইয়া লইয়া আবার সুখকর পুনর্মিলনের মধ্যে স্নিগ্ধ পরিতৃপ্তি জাগাইয়া তুলিলেন, পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় রহিল।

॥ চিরকুমার সভা (১৩৩২) ॥ 'চিরকুমার সভা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রহসন। রৌদ্রালোকিত বৃষ্টিধারার ন্যায় বুদ্ধিদীপ্ত রুচির হাস্যরসের চিত্তাভিরাম লীলা সমস্ত গ্রন্থখানাকে অশেষ প্রীতি-

1. William Congreve তাঁহার Humour in Comedy প্রবন্ধে হাস্যরসের (Humour) সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—'A singular and unavoidable manner of doing or saying anything, peculiar and natural to one man only, by which his speech and actions are distinguished from those of other men.'

*European Theories of Drama* by Clark P. 214.

প্রদ করিয়া তুলিয়াছে। বিদগ্ধজনপ্রিয় বাক্যাবলীর চমৎকারী প্রয়োগে, উপমা রূপকের ঘটায়, যমক-অনুপ্রাস-শ্লেষের ছটায় নাটকীয় কথাগুলি বিদ্যুৎ আভায় ঝলমল করিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে যেন ইহারা আমাদের নয়ন ধাঁধিয়া, আমাদের অন্তর ঝাঁঝিয়া দিতেছে। 'চিরকুমার সভা'র সর্বপ্রধান গুণ ইহার অর্থময়, ধ্বনিময় সংলাপ। কিন্তু সংলাপের চমৎকারিত্ব সত্বেও ইহারা কাহিনীর দুর্বলতা বিশেষ লক্ষণীয়। ইহাতে কোনো মধুর ষড়যন্ত্রময় ঘটনা আমাদের আগ্রহ এবং ঔৎসুক্যকে সজোর আক্রমণে উন্মুক্ত করিয়া রাখিতে পারে না। পঞ্চম অঙ্কের পূর্বে কোনো সরস ভ্রান্তি এবং কৌতুকাবহ অসঙ্গতি নাটকীয় কৌতূহলের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। প্রহসনের মধ্যে অনেক সময় কৃত্রিম বাধা ও অস্থায়ী দ্বন্দ্বের সঞ্চার করিয়া কৌতুকরসকে জমাট করিয়া তুলিতে হয়। কিন্তু আলোচ্য প্রহসনে কোনো সমস্যার দ্বন্দ্ব এবং তাহার অতি তৃপ্তিজনক সমাধান দেখানো হয় নাই। চিরকুমার সভার কৌমার্যব্রত এবং ইহার বিরুদ্ধে বিবাহের ষড়যন্ত্র এই দুই ভাবের প্রতিকূলতা বেশ স্পষ্টভাবে প্রহসনের মধ্যে দেখানো উচিত ছিল, কিন্তু তাহা মোটেই ভালোভাবে স্ফুটিত হয় নাই। চিরকুমার সভার সভ্যগুলি যেন কৌমার্য ভাঙ্গিবার জন্য পা বাড়াইয়াই আছে। পূর্ণর তো কথাই নাই, সে নিজের ক্ষেত্র সুবিধাজনক করিয়া লইবার জন্যই সভ্য হইয়াছিল। শ্রীশ এবং বিপিনেরও মনে কৌমার্যরক্ষার জন্য কোন দৃঢ় সংকল্প নাই, কোনো বলিষ্ঠ প্রয়াস নাই। ভ্রান্ত এবং বাতিকগ্রস্ত লোকের পরাজয়ে তখনি আমাদের কৌতুকানন্দ উদ্রিক্ত হয়, যখন সেই ভ্রান্তি এবং বাতিকের পিছনে সবল ইচ্ছা এবং সুদৃঢ় নিষ্ঠা থাকে; দুর্বল দ্বিধাগ্রস্ত লোকের পরিবর্তনে অথবা পরাজয়ে আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল থাকে না।[১]

স্বয়ং চন্দ্রবাবু পর্যন্ত—যিনি কৌমার্যনীতির ধারক, কুমার সভার নায়ক, এবং কুমারগণের চালক, তিনিও যেন অতি সহজেই বিবাহপ্রথাকে মানিয়া লইলেন। সুতরাং মনে হয় চিরকুমার সভা কয়েকজন দুর্বল ব্যক্তির সংশয়ী চিত্তের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহা তো বরাবর ভাঙ্গিয়াই ছিল, সুতরাং ইহাকে আরও ফলাও করিয়া ভাঙ্গিয়া লাভ কি? প্রহসনের কৌতুকরস উৎসারিত হইয়াছে প্রধানত অক্ষয় এবং রসিকের দ্বারা। ইহারা সুস্থ, স্বাভাবিক, বুদ্ধিশীল চরিত্র; অন্যান্য চরিত্রের ভ্রান্তি ও অসংগতি লইয়া ইহারা হাস্য পরিহাস উদ্রেক করিয়াছে। বাঙালী সমাজে ঠাকুরদা-নাতনী, এবং শালী-ভগ্নীপতি-সম্পর্ক বিশেষ সুবিধাজনক এবং রসাল; রসিক ও অক্ষয় এই সম্পর্কের সুযোগে অনেক ঠাট্টা-তামাসা করিতে পারিয়াছে। রসিকের সুমধুর সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি, অক্ষয়ের সুস্বর সঙ্গীতলহরী, নৃপ-নীরবালার সুস্নিগ্ধ চাঞ্চল্যবিলাস এমন এক কৌমুদীস্নাত মঞ্জুকুঞ্জ-কাননের সৃষ্টি করিয়াছে, যেখান হইতে অবিরত মধু ও সৌন্দর্য ক্ষরিত হইতেছে।

১। ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেন মহাশয় 'চিরকুমার সভা'র একটু কঠোর সমালোচনা করিয়াই একস্থানে যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য—'যে চিরকুমারের ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য রমণীর দরকার হয় না, শুধু গানের খাতা বা রুমাল হইলেই চলে, তাহাদের পরাজয়ে যে হাস্যরসের সঞ্চার হয় তাহা উচ্চাঙ্গের নহে।'

'রবীন্দ্রনাথ'—পৃঃ ২৩৪।

রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য এবং সন্ন্যাসধর্মকে কোনো দিন শ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই। বহুবার তিনি বলিয়াছেন যে তিনি 'অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ' লাভ করিতে চান। কবির জীবনীকার প্রভাতবাবু বলিয়াছেন যে তিনি সম্ভবত স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে পরিহাস করিয়াই প্রহসনখানা রচনা করিয়াছিলেন।'১ চিরকুমার সভা যখন তিনি লিখিয়াছিলেন তখন তাঁহার মানস-সত্তা 'চিত্রা'-'চৈতালি' পর্ব সাঙ্গ করিয়া 'ক্ষণিকা'তে পরিক্রমণ করিতেছে। ধরণীর বিচিত্র রূপ, রস, সৌন্দর্য তাঁহাকে এখনো প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে। ভোগবিমুখ বৈরাগ্য এখন তাঁহার কাছে মূল্যহীন, হাস্যকর। মনের এই অবস্থায় তিনি প্রহসনখানি রচনা করেন।

॥ শেষরক্ষা (১৩৩৫) ॥ 'শেষরক্ষা' রবীন্দ্রনাথের প্রহসন 'গোড়ায় গলদে'র সংস্কৃত এবং মার্জিত রূপ। 'চিরকুমার সভা'র অপূর্ব বাগবৈদগ্ধ্য এবং সূক্ষ্ম হাস্যরস ইহাতে নাই বটে, কিন্তু ইহার ঘটনার বুননি অধিকতর কৌশলপূর্ণ। ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেন মহাশয় প্রহসনখানার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'এই প্রহসনের মূল উপজীব্য চরিত্র-সৃষ্টি নহে, আর্টের কাজ চরিত্র সৃষ্টি, মানব হৃদয়ের দুজ্ঞে'য় রহস্যের সন্ধান। ঘটনার সন্নিবেশ সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধানের উপায়-মাত্র। ইহাই যদি মুখ্য হইয়া পড়ে, তবে আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।' উপরিউক্ত মন্তব্যের মধ্যে ডাঃ সেন প্রহসনের সংজ্ঞা সম্বন্ধে সুবিচার করেন নাই। প্রহসনের (Farce) হাস্যরস জটিল ঘটনার কুশল সমাবেশের উপর নির্ভর করে।২ চরিত্রসৃষ্টি ইহাতে মুখ্য নাও হইতে পারে। সুতরাং চরিত্রসৃষ্টি 'শেষরক্ষা'য় উল্লেখযোগ্য না হইলেও নিপুণ ঘটনাবলীর সরস সংস্থাপনে ইহা শ্রেষ্ঠ প্রহসনরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত। প্রহসনের মধ্যে তিন জোড়া পাত্রপাত্রী তিন রকম স্বতন্ত্র ঘটনারস সৃষ্টি করিয়াও পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হইয়াছে। চন্দ্র এবং ক্ষান্তর অম্লমধুর দাম্পত্য-প্রেম, বিনোদ-কমলের অর্থসমস্যা-পীড়িত বিচ্ছেদমিলনময় সম্বন্ধ এবং গদাই ও ইন্দুর ভ্রান্তি-মধুর অনুরাগ—এই তিন প্রকার আখ্যান প্রহসনের মধ্যে রহিয়াছে। এক জায়গায় মাত্র ঘটনা সংস্থান জটিল এবং অবিশ্বাস্য হইয়াছে। কমলের হঠাৎ বিপুল অর্থপ্রাপ্তি এবং বিনোদের সহিত কথোপকথনের মধ্যেও যে তাহার ছদ্ম ব্যক্তিত্ব ধরা পড়িল না ইহা অসম্ভব মনে হয়। মনে হয় অর্থসঙ্কটের মধ্যে যে সমস্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল তাহাই যেন নাট্যকার অকস্মাৎ সমাধান করিয়া দিলেন। প্রহসনের পরিশেষে সকলেরই শেষরক্ষা হওয়ায় সর্বজনীন প্রসন্নতা-জাত কৌতুকরস আমাদের মনে স্নিগ্ধ তৃপ্তির সঞ্চার করে।

১। 'আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি সে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নূতন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠনে রত। শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে চিরকুমার থাকিয়া সন্ন্যাসী হইয়া দেশ সেবায় ব্রতী হইবার জন্য একটা প্রেরণা আসিয়াছিল। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যখন এই নাটকখানি লিখিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার মনের মধ্যে তরুণ বাংলার এই নূতন সাধনার রূপ জাগিতেছিল। তাঁহার মতের বিরোধী—এই চিরকৌমার্যকে তিনি প্রহসনের বিদ্রূপবাণে পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

'রবীন্দ্রজীবনী' (১ম খণ্ড)—পৃঃ ৩৪৪।

২। ...'its main characteristics are dependence in it of character and of dialogue upon mere situation.

*The Theory of Drama* by Nicoll.

## (ঘ) সাঙ্কেতিক নাটক

এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে নাটকগুলির আলোচনা হইল সেইগুলি প্রচলিত নাট্যধারার অনুযায়ী। কিন্তু এখন আমরা তাঁহার যে নাটকসমূহ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব সেইগুলি বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক সম্পূর্ণ অভিনব ধারার প্রবর্তন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে সাঙ্কেতিক নাটক বাংলা সাহিত্যে ছিল না, এবং তাঁহার পরেও এই নাটক আর লেখা হয় নাই। এই নাট্যরীতি তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা অনুমান করা অসংগত নহে।১ অবশ্য তাঁহার নাটকের ভাব এবং সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব—এ সব তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। যে বিশেষ মানস-অনুভূতির পরিচয় তাঁহার সাঙ্কেতিক নাটকে রহিয়াছে, তাহার সহিত পাশ্চাত্য সাঙ্কেতিক নাট্যের কোন যোগ নাই।

মানুষের ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের মধ্যে চিন্তা ও চেতনার অনন্ত পারাবার প্রবাহিত। সেই পারাবারের বিচিত্র-গভীর তরঙ্গ-লীলা চিরকাল মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছে। মানুষের মনের সেই বিস্ময়-কৌতূহল প্রকাশ করিবার অবিরাম চেষ্টা তাহার জীবন ধারায় লক্ষ্য করা গিয়াছে। সে ভাষা সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু সেই ভাষা দ্বারা সে মনের অনির্বচনীয় ভাবরহস্যের অপূর্ণ ও আংশিক প্রকাশ করিতে পারে মাত্র। সেই প্রকাশভঙ্গির আরও সুষ্ঠুতর, আরও পূর্ণতর রূপ দিবার জন্য সে ব্যবহার করে সংকেত অথবা প্রতীক। অবশ্য তাহার ভাষাও এই সংকেত ছাড়া আর কিছুই নহে। ভাষা হইল অর্থবান ধ্বনির সমষ্টি, এবং সেই সব ধ্বনিও বিশেষ বিশেষ প্রাণী ও বস্তুর সংকেত মাত্র। মানুষের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ধ্বনির বিচিত্রতা ও সেই কারণে ভাষারও জটিলতা দেখা গিয়াছে। কিন্তু তথাপি এই ভাষা-সংকেত ছাড়া আর বহুপ্রকার সংকেত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা তাহার রহিয়া গেল। মানুষ অপূর্ণ, তাহার ভাষাও অপূর্ণ; সেজন্য সেই ভাষা দ্বারা কোন পূর্ণভাব ও আদর্শ প্রকাশ করা সম্ভব নহে। কিন্তু সেই পূর্ণতার দ্যোতনা আসে সংকেত হইতে।২ নারী-সৌন্দর্যকে বুঝাইবার জন্য যখন একটি গোলাপ ফুলকে সংকেত রূপে ব্যবহার করা হয় তখন নারীসৌন্দর্যের পূর্ণ আদর্শই আমাদের মনে আভাসিত হইয়া উঠে। হিন্দুগণ ভগবানকে সাধনা করিবার জন্য নানা দেবমূর্তির প্রতীক নির্মাণ করিয়া থাকেন। প্রতীক মাটি অথবা পাথরের হইতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া ভক্ত সাধক ভগবানের পূর্ণ মহিমাই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। রাজা

১। This development of his drama brings his prose plays into line with the most modern drama of the world. It has been an independent development, in the main ; but he is well aware of what is happening outside India, and to his mind a hint is more than a full exposition is to most poets.

*Rabindranath* by Thompson.

২। Symbols are the only things free enough from all bonds to speak of perfection.

Ideas of good & evil by W. B. Yeats, 160

দোষত্রুটিপূর্ণ মানব হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার হস্তধৃত রাজদণ্ড পরিপূর্ণ রাজসত্তারই প্রতীক। শুধু কেবল নির্জীব জড় পদার্থ॰ যে প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, সজীব মানুষও কোন কোন ভাব বা আদর্শের প্রতীক হইতে পারে.। রামচন্দ্র বিশেষ ব্যক্তি মাত্র নহেন, তিনি চিরকালীন আদর্শ মানুষের প্রতীক, তেমনি রাবণও মানুষের দুর্দান্ত প্রবৃত্তিরই চিরন্তন প্রতীক হইয়া রহিয়াছে। রূপকথার প্রবাল-পালঙ্কে শয়ান ঘুমন্ত রাজ-কন্যার কথা আমরা পড়িয়াছি. সেই রাজ-কন্যার মানুষীসত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু আমাদের অন্তরের শাশ্বত সৌন্দর্য-সত্তারূপে সে চিরকাল বাঁচিয়া রহিয়াছে। এই সব প্রতীক বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, মানুষের ভাবরহস্য ব্যাখ্যা করিতে সেই সব ব্যক্তি বা বস্তুই প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে যাহাদের সম্বন্ধে মানুষের মনের মধ্যে বহুকালপোষিত ধারণা ও সংস্কার আছে। মুক্তধারা ও রক্তকরবীর স্বভাবধর্ম কি তাহা আমরা জানি বলিয়াই উহাদের সঙ্কেত আমরা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও অনুমান করিতে পারি এবং নিশ্চয় অনুভব করিতেও পারি।

সাহিত্যে চিরকাল সঙ্কেতের ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। আর্থার সাইমন্স বলিয়াছেন, সাঙ্কেতিকতা ছাড়া কোন সাহিত্য হইতে পারে না।১ ইয়েটসও বলিয়াছেন যে, শুধুমাত্র গল্পকথন অথবা নিছক চিত্রাঙ্কন ছাড়া সব শিল্পকলাই সাঙ্কেতিক।২ শিল্পী তাঁহার শিল্প-কলার মধ্যে রঙ ও রেখা, সুর ও ছন্দের যে সুমিল সমাবেশ করেন তাহার ফলে আমাদের মনের মধ্যে এক অনির্বচনীয় ভাবব্যঞ্জনার সঞ্চার হয়। এখানে শিল্পকলার উপাদানগুলি গূঢ় ভাবপ্রকাশের সঙ্কেত ছাড়া আর কিছুই নহে। ইয়েটস এই ভাবসঙ্কেতকেই emotional symbol বলিয়াছেন। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের ধ্বনিবাদীরাও ব্যক্ত ধ্বনির মধ্যে এক গূঢ় অর্থের সঙ্কেত লইয়া বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্যের এই মৌলিক সঙ্কেতধর্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহার অন্তর্নিহিত চরিত্র ও ঘটনাগত সাঙ্কেতিকতা আমরা প্রায় সব বড় সাহিত্যিকের রচনাতেই দেখিতে পাই। যেখানে সাঙ্কেতিকতা সেখানেই একটি রহস্যদ্যোতনা, একটি আশা-আশঙ্কিত ঘটনার সম্ভাবনা আমাদের মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে। আমাদের জানা ও চেনা জগতের অন্তরালে যে একটি অদৃশ্য, অনির্দেশ্য ঘটনা-জাল বিস্তৃত হইতেছে তাহারই অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় এই সাঙ্কেতিকতার মধ্যে। ম্যাকবেথ নাটকের প্রথমেই যে বজ্র-বিদ্যুতের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা হইতেই কি সমগ্র নাটকের ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই? ইবসেনের Hedda Gabler নাটকে Hedda তাহার আকাঙ্ক্ষিত নায়ক Lovborg-কে বার বার vine leaves-এর সহিত যুক্ত করিয়া উল্লেখ করিয়াছে। Vine leaves-এর মধ্যে একটি আরণ্যক উদ্দামতার ভাব নিহিত রহিয়াছে। Heddaর মধ্যে বেপরোয়া, সমাজ-সংস্কারহীন চিত্তের মাঝে তাহার ঈপ্সিত প্রণয়ী সম্বন্ধে

১। Without symbolism there can be no literature
*Symbolist movement in literature* by A. Symons ( Constable & Co., Ltd. 1911) p. 1.

২। All Art that is not mere story-telling or mere portraiture is symbolic.
*Ideas of good and evil*—160

কিরূপ দুর্দম কামনা বিরাজমান তাহারই সঙ্কেত বহন করিতেছে ঐ vine leaves। I can see him already—with vine leaves in his hair—flushed and fearless' এই কথা গুলির গভীর সৌন্দর্য্যের সহিত মিলিয়াছে গূঢ় সঙ্কেত। কৃষ্ণকান্তের উইলে যে দুর্যোগ-মুহূর্তে রোহিণীকে বাঁচাইবার জন্য গোবিন্দলাল রোহিণীর গাত্র স্পর্শ করিল তখনই অন্যত্র ভ্রমর একটি বিড়ালকে মারিতে গেলে লাঠি তাহার কপালেই ফিরিয়া আঘাত করিল। এইখানেও সাঙ্কেতিকতার ব্যবহার হইয়াছে। রোহিণীকে মারিতে ভ্রমর উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু সেই রোহিণীই কি এখন হইতে ভ্রমরের মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিল না?

সাহিত্যের সাঙ্কেতিকতা শুধু কেবল বস্তু ও ঘটনাশ্রয়ী নহে, ইহা বিশেষ বিশেষ চরিত্রকে অবলম্বন করিয়াও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। মেঘদূতের যক্ষ একটি বিশেষ কাব্যের নায়ক মাত্র নহে, সে বিশ্বের চিরন্তন বিরহ-বেদনার প্রতীক। নীলপাখীর জন্য Tyltyl ও Mytyl যে অভিযানে বাহির হইয়াছিল তাহা জগতের গুহাহিত আনন্দ ও সত্যকে জানিবার জন্য মানুষের শাশ্বত চেষ্টার সঙ্কেত বহন করে না কি? মানুষের উচ্চাশার অন্ত নাই, দুঃসাধ্যকে সাধন করিবার তাহার কি প্রাণান্তকর প্রয়াস, কিন্তু প্রতিকূল নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে তাহার আশা ও প্রয়াস ধূলায় লুটাইয়া যায়। মানুষের জীবনের এই নিষ্ফল বেদনার দিকটি ফুটিয়া উঠিয়াছে হাউপ্‌টম্যানের The Sunken Bell নামক নাটকের Heinrich চরিত্রে। Heinrich পর্বত চূড়ায় ঘণ্টা ঝুলাইতে গিয়াছিল কিন্তু সেই ঘণ্টা পড়িয়া গেল কর্দমাক্ত জলাশয়ে। দুঃখে হতাশায় Heinrich বলিল, 'Twas for the valley, not the mountain top!' এই ভাবে জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজির আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে, বড় সাহিত্যিক তাঁহার চরিত্রকে শুধু কেবল ক্রিয়া ও পরিবেশের মধ্যে সংকীর্ণ করিয়া রাখেন না। সেই চরিত্রের মধ্য দিয়া মানুষের চিরন্তন কোন আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার চরিত্র কায়িক সীমা ছাড়াইয়া এক অমূর্ত ভাবের অনন্ত প্রতীক হইয়া উঠে।

এ পর্য্যন্ত আমরা সাহিত্যের সাধারণ সাঙ্কেতিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, এবার আমরা বিশেষ সাঙ্কেতিক সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা সুরু করিব। অবশ্য পূর্বোক্ত 'Blue Bird', 'The Sunken Bell' প্রভৃতি এই সাঙ্কেতিক সাহিত্যেরই শ্রেণীভুক্ত, সাঙ্কেতিকতার সাধারণ লক্ষণ বুঝাইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। সাঙ্কেতিক সাহিত্য বলিতে আমরা সাধারণত যাহা বুঝি তাহার উৎপত্তি ও পূর্ণতম বিকাশ হইয়াছিল ফরাসী দেশে। উনবিংশ সতাব্দীতে জড়বাদী বস্তুবিজ্ঞানের প্রভাবে ফরাসী দেশের সাহিত্যে বেপরোয়া বস্তুবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। বস্তুবাদী সাহিত্যিকগণ নির্বিকার লিপ্সা লইয়া দৃশ্যজগতের সর্বপ্রকার আবরণ উন্মোচন করিয়া দিলেন, বস্তুই বস্তুর পরিণাম ভাবিয়া এই বস্তুসম্ভোগে তাঁহাদের সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কে লিপ্ত করিয়া রাখিলেন। কিন্তু এই বহিঃসর্বস্ব কামনা-পঙ্কিল দৃষ্টিভঙ্গির প্রচণ্ড মত্ততা শিথিল হইয়া আসিল এবং ইহার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া

স্বরূপেই একটা বিরুদ্ধ, নবায়িত আদর্শ ক্রমে ক্রমে জাগ্রত হইয়া হইয়া উঠিল। লেখক বুঝিলেন, পাঠক বুঝিলেন যে, এই বস্তুপুঞ্জই বোধ হয় সব নহে, এই বস্তুপুঞ্জের তীক্ষ্ণ জ্ঞানই বোধ হয় যথেষ্ট নহে। বস্তুপুঞ্জের অন্তরালে যে অমূর্ত অধ্যাত্ম-জগৎ বিরাজিত তাহাই জানিতে ও জানাইতে হইবে। তখন হইতে সাঙ্কেতিক সাহিত্যের সূচনা—ইন্দ্রিয়ের সুরা হইতে অতীন্দ্রিয়ের সুধার সন্ধান। এই সাহিত্য এক আনন্দিত মুক্তির আহ্বান আনিল—এই মুক্তি অন্তরের, এই মুক্তির আত্মার, এই মুক্তি পরমাত্মার। সাহিত্যে তখন হইতে আসিল ঘটনার স্থলে রহস্য আর বর্ণনার স্থলে ব্যঞ্জনা।১ ফরাসী সাঙ্কেতিক সাহিত্যিক-দের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় Gerard De Nervalএর। Gerard De Nervalই প্রথম দেখান যে কবিতা সৌন্দর্যের বর্ণনা নহে ইহার রহস্য-বিস্ময়ের বাহন মাত্র, মানুষের গহন চেতনা ইহার মধ্য দিয়া মূর্ত হইতে চাহে। Gerard De Nerval-এর পর আসেন Villiers De Lisle Adam। Villiers তাঁহার প্রসিদ্ধ নাটক Axelএ বিভিন্ন মানুষী আদর্শের রূপ অঙ্কন করিয়াছেন। Villiersএর বিশ্ব বস্তুবিশ্ব নহে, ইহার অতীত সূক্ষ্মবিশ্ব, এই সূক্ষ্মবিশ্বের সৌন্দর্যই তাঁহার চোখে একমাত্র সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্যের অঞ্জন যাহার চোখে লাগিয়াছে সে এ বস্তুবিশ্বের মায়ায় ভুলিবে কেন? Villiers এর পর প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক Paul Verlaineএর আলোচনা করা প্রয়োজন দুঃখ-সমস্যা-পীড়িত মানবাত্মার আধ্যাত্মিক শান্তি ও সান্ত্বনালাভের আকৃতি ফুটিয়াছে Paul Verlaineএর কবিতায়। তাঁহার 'Sagesseতে মানবাত্মা ও পরমাত্মার গভীর সম্বন্ধটি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এইরূপ আধ্যাত্মিক অনুভূতির সন্ধান পাই আমরা Stephane Mallarmeর সাহিত্যেও। Mallermeর দৃষ্টিতে এই জগৎ এক নূতন চেতনা লাভ করিল, অদৃশ্য জগতের সহিত দৃশ্যজগৎ এক গূঢ় সূত্রে সংবদ্ধ হইয়া উঠিল। বিশ্বের অন্তর্নিহিত অতীন্দ্রিয় রহস্যের সন্ধান আমরা পাই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাট্যকার মেটারলিঙ্কের নাটকে। মেটারলিঙ্ক দেখাইলেন যে, আমাদের এই আলোকিত জীবরাজ্যের সম্মুখে ও পশ্চাতে অপার ও অনধিগম্য অন্ধকার-রাজ্য। মাঝে মাঝে মেটারলিঙ্কের রহস্যময়তা ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার সহিত মিলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তবুও সর্বত্রই একটা সুষম-সুন্দর রূপের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মানুষের বাক্য আর কতটুকু প্রকাশ করিতে পারে? বাক্যের অতীত যে ধ্যানমৌন নীরবতার জগতে এই বিশ্বসৃষ্টির সার সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহার পরিচয় মেটারলিঙ্ক পাইয়াছিলেন এবং সেজন্যই তিনি এতবড় মরমী সত্যদ্রষ্টা।

সাঙ্কেতিক সাহিত্যের বিকাশ ফরাসী দেশে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হইলেও অন্যান্য দেশেও ইহার সাধনা বড় কম হয় নাই। ইংরাজি সাহিত্যে উইলিয়াম ব্লেকই সর্বপ্রথম সাঙ্কেতিকতার অপরিহার্যতা অনুভব করিয়াছিলেন এবং তিনিই সকলের আগে সাঙ্কেতিক

১। It is all an attempt to spiritualise literature, to evade the old bondage of rhetoric, the old bondage of exteriority.

Symbolist Movement in Literature by A. Symons. P. 8

ও রূপকের পার্থক্য অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। আইরিশ নাট্যকারদের নাটকে, এ. ই.-র কবিতায় এই সাঙ্কেতিকতার অতি সুষ্ঠু প্রকাশ হইয়াছিল। অবশ্য ইংরাজি সাহিত্যে সাঙ্কেতিক আন্দোলনের নেতা হইলেন ইয়েটস। ইয়েটসের নাটকে গীতিধর্মিতার অতিশয্য ও বাহ্য ক্রিয়ার স্বল্পতা থাকিলেও তাঁহার নাটক আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ১ ইউরোপের নাট্যকারদের মধ্যে ইবসেন, হাউপ্টম্যান, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ প্রভৃতি নাট্যকারদের নাটকে সাঙ্কেতিকতার লক্ষণ বিদ্যমান। এই সাঙ্কেতিকতা কোথাও আংশিক আবার কোথাও বা সামগ্রিক। পরিশেষে সাধারণভাবে বলা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সাহিত্যে মানুষের অবচেতন মনের দিকে, আত্মার অচিন্তনীয় রহস্যের দিকে একটি প্রবণতা দেখা যায় এবং সীমায়িত বাক্য ও বর্ণনার দ্বারা এ সব বিষয় প্রকাশ করা সম্ভব নহে বলিয়া সাহিত্যিকগণ ইঙ্গিত ও সঙ্কেত অবলম্বন করিলেন, বর্ণনীয় জগতের অন্তরালস্থিত অবর্ণনীয় জগৎকে আভাসিত করিয়া তুলিলেন।

উপরিউক্ত সাঙ্কেতিক সাহিত্যের আলোচনা হইতে সাঙ্কেতিকতার লক্ষণ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হইতে পারে। সাঙ্কেতিকতা আমাদের কাছে এক নূতন জগতের সংবাদ বহন করিয়া আনে—আমাদের এই দৃশ্য, বুদ্ধিবদ্ধ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অতীত যে অদৃশ্য, শব্দবর্ণহীন অতীন্দ্রিয় জগৎ বিরাজমান তাহার সহিত আমাদের পরিচয় স্থাপিত হয়। দৃশ্য মানেই সত্য নহে আর অদৃশ্য হইলেই মিথ্যা হয় না, ইহাই আমরা সাঙ্কেতিক সাহিত্য হইতে শিক্ষা লাভ করি। ২ মানুষের এই স্থূল বস্তুজগৎ তো নিত্যক্ষয়িষ্ণু ও নিয়ত পরিবর্তনশীল, ইহার মধ্যে আমাদের যে চিত্ত নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে তাহা অহরহ আঘাত-বেদনায় জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে কিন্তু যখন অনন্ত আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য আমরা জানিতে পারি তখন আমাদের পরম সত্যের উপলব্ধি হয়, আমাদের আত্মা পায় চিরন্তন মুক্তি। মানুষের বস্তুচেতন সত্তার গভীরে যে অজর, অমর, নিত্য, শাশ্বত আত্মা রহিয়াছে তাহার সন্ধান পাইলেন সঙ্কেতবাদিগণ। ৩ মেটারলিঙ্কের Blue Bird ও Huysmansএর La Cathedral নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে আপাতদৃষ্টিতে যাহা জড়পদার্থ বলিয়া বোধ হয় তাহার অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম, অদৃশ্য আত্মা বিরাজমান। এই সর্বব্যাপী ও নিত্যকালীন আত্মিক চেতনার সাক্ষ্য পরিস্ফুট হইয়াছে সাঙ্কেতিক সাহিত্যে। মানুষ অপূর্ণ, তাহার প্রেমও অপূর্ণ,

১। All of Mr. Yeats' dramas suffer from too great lyrical fervour, and from a lack of action ; yet they are unquestionably among the finest poetic plays of our time, British Drama—*A Nicoll* (George G. Harrap, 3rd, Ed.), 410

২। ......'a literature in which the visible world is no longer a reality, and the unseen world no longer a dream'.

—The Symbolist Movement by *A. Symons*, P, 4,

৩। What is Symbolism if not an establishing of the links which hold the world together, the affirmation of an eternal, minute, intricate, almost invisible life, which runs through the whole universe ?

—Ibid, P, 145.

কিন্তু সে যখন তাহার প্রেম ভগবানের চরণে নিবেদন করিতে পারে তখন সে পায় পূর্ণতার আস্বাদ, তাহার প্রেমও হয় পরিপূর্ণ সার্থক। ১ মানুষ ও ভগবানের এই প্রেম-সম্বন্ধই তো স্থাপিত হইয়াছে Paul Verlaine এবং রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক সাহিত্যে।

সাঙ্কেতিক সাহিত্যের এই যে অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তার স্বরূপ আমরা আলোচনা করিলাম ইহার প্রকাশভঙ্গি কিরূপ সে প্রশ্ন আমাদের মনে আসিতে পারে। সাঙ্কেতিকতার মধ্যে বর্ণনীয় বিষয়ের ভাষা নাই, কেবল আভাস আছে। সাধারণ বাক্যরীতি ও বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা গূঢ়াতিগূঢ় ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নহে। সেজন্য সাঙ্কেতিক সাহিত্যের বাক্যে ও বর্ণনায় একটা জটিল কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যজাল বিস্তৃত হইয়া আছে। ২ যাহা অদৃশ্য, অমেয় ও অতীন্দ্রিয় তাহা কি ভাবে স্পষ্ট রঙ ও রেখার মধ্য দিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে? তাহা বর্ণনা করা যায় না, তাহা কেবল সঞ্চার করা যায়। যাহা নামহীন তাহাকে নাম দিলেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহার রূপ দেওয়া যায় শুধু কেবল ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া। সাইমন্‌সের কথা উল্লেখ করা যায়—'to name is to destroy, to suggest is to create' সাঙ্কেতিকতার এই উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সঙ্কেতবাদী সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের শিল্পকে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা হইতে বহু দূরে লইয়া যাইতে চাহেন। তাঁহারা আদিম ও চিরন্তন মানবপ্রবৃত্তির লীলা অনেক সময়েই দেখান বটে, কিন্তু সেই সব প্রবৃত্তিলীলার সক্রিয় বাস্তবরূপ অপেক্ষা নিষ্ক্রিয় ভাবরূপই অধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠে। নাট্যশিল্পই আমাদের বিশেষ আলোচ্য বস্তু, সেই শিল্প সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক। নাটকের পক্ষে তীব্র গতিবেগ ও সক্রিয় বস্তুসংঘাত অপরিহার্য। সঙ্কেতবাদী নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই নাটকের এই চিরাচরিত নীতি লঙ্ঘন করিয়া ইহাকে এক অবাস্তব কল্পলোকে লইয়া গিয়াছেন। নাটকের এই সব নীতির সর্বাপেক্ষা বড় নায়ক বোধ হয় প্রসিদ্ধ আইরিশ নাট্যকার ইয়েটস। ইয়েটসের নাটকীয় পরিবেশ যেমন এক স্বপ্নালু, মায়াময় রহস্যমেঘে আচ্ছন্ন, তাঁহার নাটকীয় চরিত্রগুলিও তেমনি নিস্পন্দ, নিশ্চেতন, নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব দ্বারা রূপায়িত হইয়াছে। ইয়েটস সাধারণ রঙ্গমঞ্চ এবং রঙ্গমঞ্চের উপযোগী স্থূল নাট্যক্রিয়া মোটেই পছন্দ করিতেন না। কিন্তু ইয়েটসের এই সব কায়াহীন, রূপহীন নাটকগুলিকে প্রকৃতপক্ষে নাটক বলা চলে কিনা সে সন্দেহ অনেকেই ব্যক্ত

১। To love God is to love the absolute, so far as the mind of man can conceive the absolute, and thus, in a sense, to love God is to possess the absolute, for the love has already possessed that which it apprehends.

Ibid—P. 96.

২। ......for although you can expound an opinion, or describe a thing when your words are not quite well chosen, you can not give a body to something that moves beyond the senses unless your words are as subtle, as complex, as full of mysterious life, as the body of a flower or of a woman.

Ideas of Good and Evil, P, 177.

করিয়াছেন।১ এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, নাটকে ভাব ও তত্ত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার বহিঃপ্রকৃতি যদি একটি বস্তুরূপ গ্রহণ না করে তবে বাস্তব দর্শকের কাছে কিছুতেই তাহার মূল্য থাকিতে পারে না। এদিক দিয়া বিচার করিলে হাউপ্টম্যান ও রবীন্দ্রনাথের নাটকের নাট্যমূল্য সহজেই চোখে পড়িবে।২ সঙ্কেতবাদী নাট্যকারগণ তাঁহাদের নাটকে সুদূর অতীন্দ্রিয় জগতের আভাস আনিবার জন্য আর একটি বিষয়ের শরণ লইয়াছেন এবং তাহা হইলে কবিত্ব। হাউপ্টমান এবং আইরিশ নাট্যকারগণ যে নাটকের ভাষারূপে গদ্যের স্থলে পদ্যকে গ্রহণ করিলেন তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। গদ্যের মধ্যে একটা নিত্তনৈমিত্তিক বাস্তবতা ও ব্যবহারিক স্থূলতা আছে কিন্তু পদ্যের সুর ও ছন্দের মধ্যে আছে একটা সুদূর অজানার অস্পষ্ট চেতনা। জগতের চিরঞ্জয়ী নিত্যতার সন্ধান পাওয়া যায় একমাত্র কবিতায়, সেজন্যই নিত্যতাসন্ধানী নাট্যকারগণ কবিতাকেই বাছিয়া লইলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক পদ্যে লিখিত না হইলেও ইহার গদ্যও যে পদ্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে তাহার প্রয়োজন এখন সহজেই অনুমান করা যাইবে।

সাঙ্কেতিকতার আলোচনায় আর একটি বিষয় সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার। উদ্দেশ্যকে প্রচ্ছন্ন ও উপায়কে স্পষ্ট করিয়া, অর্থাৎ বর্ণিত ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়া কোন গূঢ় ভাবতত্ত্বের আভাস দেওয়া যায় দুই প্রকারে—সাঙ্কেতিক অথবা রূপক রচনার মাধ্যমে। এই সাঙ্কেতিক ও রূপকের পার্থক্য কি? সাধারণত কথা দুইটি একটু শিথিলভাবে ব্যবহৃত হয়, সেজন্য প্রায়ই আমরা সাঙ্কেতিককে রূপক ও রূপককে সাঙ্কেতিক বলিয়া ভুল করিয়া থাকি। কিন্তু দুইটি বিষয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমেই ইয়েটসের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি উল্লেখ করা যাক—'A symbol is indeed the possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame while allegory is one of many possible representations of an embodied thing, or familiar principle and belongs to fancy and not to imagination : the one is a revelation, the other an amusement'৩ ইয়েটস অতি সুন্দরভাবে পার্থক্যটি বুঝাইয়া দিয়াছেন। অরূপকে রূপের মধ্যে ধরিবার চেষ্টা সাঙ্কেতিক রচনায় কিন্তু রূপকে রূপান্তরে দেখাইবার ইচ্ছা রূপক রচনায়। প্রথমটিতে আধ্যাত্মিক

১। এ প্রসঙ্গে Elizabeth Drew-র মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—'But to the average lover of the theatre, the plays of Yeats seem too remote and esoteric to be called dramatic at all. Apart from their lack of character or anything more than the most rudimentary action, they are full of direct symbolism which makes them meaningless to the uninitiated.'

Discovering Drama, P. 219.

২। 'রবীন্দ্রনাথ এবং হাউপ্টম্যানের নাটকের সাধারণ আখ্যানভাগের দিকটাও অসুন্দর বা একঘেয়ে নয়। গভীর অর্থের দিকটাই প্রধান কিন্তু কাব্যার্থের দিকটাও মনকে টানে এবং হেলায় অগ্রাহ্য করিবার মত নয়।'

রবীন্দ্রনাথ—অশোক সেন, পৃঃ ১০৬।

৩। Ideas of Good & Evil—P. 123.

অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ কিন্তু দ্বিতীয়টিতে নৈতিক উদ্দেশ্যের সৌন্দর্য্যময় ছদ্মবেশ। অধ্যাত্মজগতের স্বরূপ তো বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব নহে—যতঃ বাচঃ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। কিন্তু মানুষের নৈতিক জগতের ছদ্মবেশ উন্মোচন করা সহজ। সেজন্য সাঙ্কেতিক রীতিতে অপ্রকাশ্য শেষ পর্যন্ত অপ্রকাশ্যই থাকিয়া যায় কিন্তু রূপক রীতিতে অপ্রকাশিত ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয় মাত্র। ১

ওমর খৈয়ামের কাব্য, টেনিসনের Princess অথবা রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' যখন পড়ি তখন বুঝিতে পারি যে ব্যক্ত রূপ-রস সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া বিশেষ বিশেষ দার্শনিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করাই কবিদের উদ্দেশ্য। সেইসব তত্ত্ব যবনিকার অন্তরালে রহিয়াছে বটে কিন্তু তাহাদিগকে চিনিবার মূল সূত্রগুলির সন্ধান পাইলে আর তাহাদের পরিচয় অস্পষ্ট থাকিবে না। একটি প্রশ্ন করা যাইতে পারে—উদ্দিষ্ট তত্ত্ব ও সত্যকে যবনিকার অন্তরালে রাখিবার প্রয়োজন কি, সোজাসুজিই তো তাহাদিগকে সম্মুখে আনা যাইত! না, তাহা হইলে তত্ত্ব ও সত্যের বিবৃতি হইত, কিন্তু সাহিত্য হইত না। সাহিত্যের মধ্যে সুন্দরের ছলনা একটু থাকা দরকার। এই ছলনাটুকুর জন্যই সাহিত্যের সহিত দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের পার্থক্য। Faery Queen, Divine Comedy ও Pilgrim's Progress তত্ত্বগর্ভ রূপক রচনা হইলেও সাহিত্য একথা সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন। সাঙ্কেতিক রচনায় কিন্তু বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের মধ্যে সুস্পষ্ট মিল আবিষ্কার করা সম্ভব নহে। এখানে মানুষের মনোজগতের কোন তত্ত্ব নহে, সেই মনোজগতের অতীত সীমাহীন অনির্বচনীয় জগৎকেই আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিবার একটা লোকায়ত্ত চেষ্টা হয় মাত্র। এখানে ব্যাখ্যা নহে, বিস্ময়; শিল্পচেতনা নহে, অধ্যাত্মসাধনাই মুখ্য কথা।

এবার আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটকের আলোচনা সুরু করিব। রবীন্দ্রনাথের নাটক আমরা রূপক বা সাঙ্কেতিক কোন্ পর্য্যায়ে ফেলিব? শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশী এই নাটকগুলিকে তত্ত্বনাট্য বলিয়াছেন। ইহাতে সরাসরি সমস্যাটির সম্মুখীন হইতে হয় না বটে, কিন্তু মুস্কিল বাধে তখন যখন একটা বিশেষ নাটকীয় অভিধা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, রবীন্দ্রনাথের নাটক আলোচনা কালে রূপক ও সাঙ্কেতিক এই কথা দুইটি একটু শিথিল ও অসতর্কভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাথমিক সমালোচকেরা রূপক কথাটিই বেশি ব্যবহার করিয়াছেন। পরবর্তীকালে কেহ কেহ সাঙ্কেতিক কথাটি

১। গোটে রূপক ও সাঙ্কেতিকের পার্থক্য বুঝাইতে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধার করিলে এ সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্ট হইবে—'Allegory transforms the phenomenon into a concept, the concept into an image; but in such a way that in the image the concept may even be preserved circumscribed and complete at hand and expressible.

Symbolism transforms the phenomenon into an idea, the idea into an image, in such a way that in the image the idea still remains unattainable and for ever effective and, though it be expressed in all languages, yet remains inexpressible.

প্রয়োগ করিলেও রূপকের সহিত ইহাকে অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তই সম্ভবত সর্বপ্রথম রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের পার্থক্য আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে সাঙ্কেতিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।১ রূপক ও সাঙ্কেতিক এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে বিজ্ঞ সমালোচকদের মধ্যেই যে কতখানি মতভেদ রহিয়াছে একটি দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে। ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্ত 'ডাকঘর' ও 'রাজা' এই নাটক দুইখানিকে শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাটক বলিয়াছেন অথচ শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশীর মতে ঐ দুইখানি রূপক নাটক। আবার অন্যপক্ষে বিশী মহাশয় 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' ও 'অচলায়তন'কে অবিমিশ্র সাঙ্কেতিক নাটক বলিয়াছেন কিন্তু ডাঃ সেনগুপ্তের মতে ঐগুলি সাঙ্কেতিক ও রূপক নাটকের মিশ্রিত রূপ। বড় বড় পণ্ডিতদের মধ্যেই এতখানি মতবিরোধ দেখা গেলে সাধারণ পাঠক রূপক-সাঙ্কেতিকের মীমাংসা করিবে কি প্রকারে? সাঙ্কেতিক নাটক সম্বন্ধে এপর্যন্ত যে আলোচনা করিয়াছি তাহার সূত্র ধরিয়া বিচার করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের নাটককে সাঙ্কেতিক না বলিয়া উপায় নাই। অবশ্য কবি তাঁহার কোন কোন নাটকে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, সে সব স্থলে তাঁহার বর্ণিত ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়া এক একটা সুস্পষ্ট ভাবতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব এবং সেকারণেই সেই সব নাটক রূপক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 'রক্তকরবী,' 'মুক্তধারা,' 'অচলায়তন,' 'রথের রশি,' এই নাটকগুলির মধ্যে রূপকার্থ আবিষ্কার করা কঠিন নহে, কিন্তু তবুও এগুলিকে পুরাপুরি রূপক বলা চলে না; কারণ, প্রথমত নাটকগুলিতে বহু সাঙ্কেতিক বস্তু বা প্রতীক ব্যবহার করা হইয়াছে, দ্বিতীয়ত অরূপ, অসীম রহস্যের দ্যোতনা ইহাদের প্রায় প্রত্যেকখানির মধ্যেই পাওয়া যায়। রঞ্জনের দুর্জ্ঞেয় অস্পষ্টতায়, নন্দিনীর অলৌকিক ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনায়, অভিজিতের দুঃসাধ্য অভিযানে, পঞ্চকের প্রাণের ঘূর্ণিছন্দে, বিশুপাগোলের দুঃখসাধনায়, ধনঞ্জয় বৈরাগী ও দাদাঠাকুরের অতীন্দ্রিয় আনন্দবাদে কি বিশ্ববিধাতার চিরন্তন রহস্যলীলার সঙ্কেতই ফুটিয়া উঠে নাই? 'রাজা' ও 'ডাকঘরে'র তো কথাই নাই, কারণ ঐ দুইখানি বিশুদ্ধ সাঙ্কেতিক নাটক, উহাদের বাদ দিলেও 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি নাটককেও তো সাঙ্কেতিক না বলিয়া উপায় নাই। অরূপের রূপের লীলাই ঐ সব নাটকে প্রকাশিত; তাহাতে আলো, রঙ ও সুরের পরশ থাকিলেও তাহা যে শব্দ-বর্ণ গন্ধ-স্পর্শহীন জগৎ হইতেই উদ্ভূত। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে আর কবে কোন্ কবি পারিয়াছেন? ইউরোপের সাহিত্যিকগণ যে আত্মার সন্ধান, যে অতীন্দ্রিয় লীলার পরিচয় পাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা ভারতের ধূলায় ও বাতাসে, আকাশ ও অন্তরীক্ষে চিরকাল জাগ্রত সত্য হইয়া রহিয়াছে। 'নান্য

১। রবীন্দ্রনাথের নাটক সাঙ্কেতিক। তাহার মধ্যে রূপকের স্পর্শ আছে, কিন্তু অরূপ, অসীমের সন্ধানই তাহার প্রধান লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথ—সুবোধ সেনগুপ্ত, পৃঃ ২২০, (২য় সং)।

পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' বলিয়া বহু সহস্র বৎসর পূর্বে তাঁহারা পারমার্থিক মুক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদী ইউরোপের পক্ষে পরমার্থতত্ত্ব মানুষের মুক্তির নূতন সত্যরূপে গৃহীত হইতে পারে কিন্তু এই সত্য ভারতের কাছে কিছু নূতন নহে। অধ্যাত্মবাদী ভারতের চেতনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নব সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করিয়াছিল এবং 'খেয়া' পর্বে কবির অধ্যাত্মচেতনার পূর্ণতম প্রকাশ হইয়াছিল। সেজন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই তৎকালীন নাটকের মধ্যেও এই চেতনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই নাটকের সর্বত্রই অরূপকে রূপ দিবার আকাঙ্ক্ষা, অসীমকে পাইবার আকূতি, অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরিবার আয়োজন; সেই নাটককে সাঙ্কেতিক নাম না দিয়া আর কি নাম দিব?

রবীন্দ্রনাথ কবি,—চিরসুন্দরের মরমিয়া পূজারী; তাঁহার নিজের কথায়, 'আমি শুধু বাঁশরিতে ভরিয়াছে প্রাণের নিশ্বাস'; কিন্তু তবুও একথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা চলে যে, তিনি জীবনের সুন্দর রূপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার তত্ত্বরূপও দেখিয়াছেন। সৃষ্টির গভীর লীলারহস্য, মানুষী সম্বন্ধের আবর্ত-জটিল তরঙ্গ-বিক্ষোভ তাঁহার চেতনাকে নিরন্তর বিচলিত করিয়াছে। 'খেয়া' পর্বের পূর্ব পর্যন্ত জীবন ও জগতের রসাবেগ এত প্রবল হইয়া রহিয়াছে যে সব চিন্তা ও তত্ত্ব তাহার মুখে ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু 'খেয়া'-পর্বে আসিয়া সেই উচ্ছ্রিত উদ্বেল ধারা শান্ত হইল এবং সেই অচপল, রহস্য-গহন ধারার মাঝে এক একটি তত্ত্বরূপ শতদলের মত শোভা পাইতে লাগিল। শতদল বলিলাম এজন্য যে, কবির হাতে নিছক একটি তত্ত্বও অপূর্ব সুন্দর মূর্তি লাভ করিয়া আমাদের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এদিক দিয়া বিচার করিলে 'খেয়া'-পর্বের কবিতাগুলি অপেক্ষা নাটকগুলির মূল্য বেশি। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে তত্ত্বই প্রধান, কিন্তু সাঙ্কেতিক নাটকগুলির মধ্যে তত্ত্ব ও সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ মিলন। সৌন্দর্যের কথা পরে আলোচনা করা যাইবে, তবে তত্ত্বের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই মনে হয়, ইহা কবির অন্তরে অনুভূত এক নবায়িত সত্যরূপ, কবির সত্তা-নিরপেক্ষ কোন নৈর্ব্যক্তিক বস্তুময়তা ইহাতে নাই। বিশ্বের চিন্তা ও প্রবণতা, সমাজব্যবস্থার বন্ধন ও অবিচার, রাষ্ট্রিক স্বার্থের কদর্য-কুৎসিত রূপ কবির মানস-অনুভূতিতে যে বেদনার্ত প্রতিবাদ জাগ্রত করিয়াছে তাহারই রূপ প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার তত্ত্বনাটকে। এই নাটকের তত্ত্ব সর্বজনীন চিন্তার সহিত অনেক স্থলে যুক্ত হইলেও ইহা কবিরই মানস-অনুভূতির একটি বিশেষ রূপ, সেজন্য কোন সার্বিক ism বা মতবাদের মধ্যে ইহাকে ফেলা চলে না। শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশী তত্ত্বনাটকগুলির বিষয় তিনটি মূল সমস্যায় বিভক্ত করিয়াছেন, যথা (১) মানুষের সহিত ভগবানের সম্পর্ক, (২) মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক, (৩) মানুষের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক।[১] রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষত রবীন্দ্রনাথের নাটকে এই তিনটি সম্পর্কই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই

১। রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ (২য় খণ্ড), পৃঃ ৬।

সম্পর্কগুলিকে আলাদা আলাদা বিভাগ করা কি সম্ভব? কবির মানস-চেতনায় সম্পর্কগুলি ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সাহিত্যেও মানুষ, প্রকৃতি ও ভগবান এক অখণ্ড রসরূপ লাভ করিয়াছে। 'রাজা'র মধ্যে মানুষ ও ভগবানের সম্পর্ক প্রধান হইলেও বসন্ত প্রকৃতি কি এই নাটকের একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে? 'অচলায়তন' ও 'মুক্তধারা'য় মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক প্রধান হইলেও ঐ নাটক দুইখানিতে দাদাঠাকুর ও ধনঞ্জয় বৈরাগী তা ভগবানেরই দূত। তেমনি 'রক্তকরবী'তেও মানুষী সংঘাতের মধ্যে পৌষালি প্রকৃতিও এক অবিচ্ছিন্ন সরসতা সঞ্চার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-জীবন বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন চেতনা মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে, যেমন আদি পর্বে প্রকৃতি, মধ্য পর্বে ভগবান ও অন্ত্যপর্বে মানুষ। কিন্তু এরূপ বিভাগ সত্ত্বেও একথা কখনই বলা চলে না যে, ইহাদের মধ্যে একটি যখন প্রধান হইয়া উঠিয়াছে তখন অপরগুলি একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে কাহাকেও বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না, বিশেষত মানুষ ও প্রকৃতিকে তো কখনই না। ইহা যেমন তাঁহার সমগ্র সাহিত্যজীবন সম্পর্কে সত্য, তেমনি সত্য তাঁহার সাঙ্কেতিক নাটকগুলি সম্পর্কে।

রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকের তত্ত্ববস্তু ও নাট্য-সংঘাতের মূলে রহিয়াছে এক মৌলিক দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্ব প্রাণধর্মের সহিত জড়ধর্মের। এই দ্বন্দ্বটি প্রায় সব নাটকেই বর্তমান এবং আমার মনে হয় কবির সাঙ্কেতিক নাটকের মূলবস্তু ইহাই। এই বিষয়টি লইয়া একটু বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাই। যে প্রাণধর্মের কথা বলিলাম, তাহার প্রকাশ হইয়াছে প্রায় প্রত্যেকখানি নাটকের নায়ক চরিত্রের মধ্যে, যেমন অমল, পঞ্চক, অভিজিৎ, নন্দিনী ইত্যাদি। ইহারা কবিহৃদয়েরই শাশ্বত মানস-মূর্তি, মুক্তির বাণী-বাহক—যে মুক্তির স্বপ্নে কবির জীবন আজন্ম বিভোর হইয়াছিল। মুক্তির মধ্যেই জীবন, মুক্তির মধ্যেই আনন্দ, তখন 'বাধা নাই, কোন বাধা নাই'। এই অবাধ মুক্তির প্রকাশ যখন, তখনই মানুষের অবারিত প্রাণের প্রতিষ্ঠা। তখন মানুষে মানুষে বাধা নাই, মানুষ ও প্রকৃতির কোন ব্যবধান নাই এমন কি মানুষ ও ভগবানেরও কোন দূরত্ব নাই। তখন মানুষ বিশ্বমানুষ হইয়া উঠে, বিশ্বমানুষ বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মিলিত হয় এবং বিশ্বপ্রকৃতি বিশ্বদেবতার লীলাস্থল হইয়া যায়।

কিন্তু এই প্রাণের প্রতিষ্ঠা নির্বাধ নহে, নিষ্প্রাণ জড়শক্তির নিষ্ঠুর সংগ্রাম চলিয়াছে ইহার সহিত। এই জড়শক্তি বিভিন্ন আকার ও প্রকারে দেখা দিতে পারে কিন্তু ইহার ধর্ম এক, উদ্দেশ্যও এক। ইহার নৃশংস লৌহবাহু, মুক্ত প্রাণের আনন্দিত বিকাশকে সতত পিষিয়া ফেলিতে উদ্যত। এই জড়শক্তি 'অচলায়তনে' অন্ধ সংস্কার, 'ডাকঘরে' গৃহবদ্ধ শাসন, 'রাজা'য় সকাম দেহতন্ত্র, 'রক্তকরবী'তে আকর্ষণজীবী ধনতন্ত্র এবং 'মুক্তধারা'য় সাম্রাজ্যবাদী লৌহযন্ত্রের রূপ ধারণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মুক্তপ্রাণের এই সব বাধার বিরুদ্ধে চিরকাল তাঁহার সুতীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং সাঙ্কেতিক নাটকগুলির মধ্যে এই প্রতিবাদ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কবি নিজস্ব মত ও আদর্শ এই সব নাটকে কোথাও প্রচ্ছন্ন রাখেন নাই, নিঃসন্দিগ্ধ দৃঢ়তার সহিত সেগুলিকে সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

সেজন্য তাঁহার উক্তি কোথাও কোথাও একটু আধটু কটু ও তিক্ত রসাশ্রিত হইয়া উঠিয়াছে। 'তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে—পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে, সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে।'—এই হাসি সাঙ্কেতিক নাটকগুলির বহু স্থানেই উপচিত হইয়াছে। একটু সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে কবির ব্যঙ্গ মূল বিরোধী শক্তির প্রতি উদ্দিষ্ট নহে; কারণ প্রাণের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করিয়াছে তাহারও একটা নীতি আছে এবং তাহার শক্তি নিন্দনীয় হইলেও অশ্রদ্ধেয় নহে। সেজন্য কবি তরল হাসির আঘাতে তাহাদিগকে লঘু করিতে চাহেন নাই—কাঞ্চীরাজ, মহাপঞ্চক, বিভূতি ও জালেঘেরা রাজা—কাহাকেও হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। কিন্তু কবির হাসির আঘাত ক্ষমা করে নাই স্তাবক, স্বার্থপর, নীচাশয় চরিত্রগুলিকে। উপাধ্যায়, উপাচার্য, মোড়ল, অধ্যাপক, গুরুমহাশয় প্রভৃতি চরিত্রের প্রতিই তিনি ব্যঙ্গের বাণগুলি নিক্ষেপ করিয়াছেন যাহাদের নীতির বালাই নাই, নিষ্ঠার পরোয়া নাই, মান অপমানেও কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু এই নাটকগুলিতে শুধু কবির ব্যঙ্গ নহে, বেদনাও প্রকাশ পাইয়াছে। কবি শেলি একদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'I grow weary to see the strong and selfish still tyrannise in this world'; সেই দুঃখ রবীন্দ্রনাথের চিত্তেও বাসা বাঁধিয়াছে। এই দুঃখ অবরুদ্ধ প্রাণের দুঃখ, অপমানিত মনুষ্যত্বের দুঃখ। সমাজব্যবস্থার আসল গলদ কোথায়, রাষ্ট্রশাসনের যথার্থরূপ কি ভাবে প্রবর্তন করা যায়, ধনতন্ত্রী অত্যাচারের মূল কোথায় নিহিত রহিয়াছে এসব বিষয়ে কবি সূক্ষ্ম বিচার করিতে পারেন নাই। তবে তিনি দেখিয়াছেন যে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে এমন সব নীতি ও নিয়ম রহিয়াছে যাহাদের ফলে মানুষের স্বাধীন বিকাশ পদে পদে খণ্ডিত হয়। উপনন্দ, পঞ্চক, সুভদ্র, অমল, অভিজিৎ, বিশু, ধনঞ্জয় বৈরাগী—ইহারা মানুষের প্রতিনিধি, যে মানুষের জীবন-কাব্য দুঃখের অশ্রুলেখায় রচিত হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকে এই দুঃখভোগী মানুষের সংগ্রামের কথাই লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃখ তো দুঃখ নয়, দুঃখের কাঁটা যে তাঁহার হৃদয়ের স্নিগ্ধ পরশে আনন্দের কমল হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য কবি যদিও দুঃখভোগী মানুষের দুঃখ দেখাইয়াছেন, তথাপি সেই দুঃখের অশ্রুকালিমা আনন্দের আলোক-বন্যায় ধুইয়া গিয়াছে। দুঃখ তো মানুষের পরম গৌরব, তাহার চিরকালের অভীপ্সিত সম্পদ। ইহার মধ্য দিয়াই তো দুর্লভ মনুষ্যত্বের কঠোর পরীক্ষা হইয়া যায়। এই দুঃখের চরম আঘাত যদি আসে, যদি মৃত্যুই দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? 'খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা' অপেক্ষা তাহা যে অনেক মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর। অমল, অভিজিৎ, রঞ্জন—ইহারা মৃত্যুর মধ্যদিয়া মনুষ্যত্বের যে পরমতম গৌরব লাভ করিল তাহা কোন্ জীবিত মানুষের পক্ষে সুলভ? রবীন্দ্রনাথের নাটকে এজন্য দুঃখই দুঃখের পরিণাম নহে, মৃত্যুই জীবনের সর্বশেষ নহে। দুঃখ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া কবির অদম্য আনন্দ ও আশাবাদ সর্বত্র ধ্বনিত হইয়াছে। জড় ও জীবনের সংগ্রামে জড়ের আংশিক ও প্রাথমিক জয় হইতে পারে কিন্তু অন্তিম ও

সামগ্রিক জয় জীবনের ইহা রবীন্দ্রনাথের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত। সেজন্য অচলায়তনের প্রাচীর ধূলিসাৎ হইয়াছে, যক্ষপুরীর জাল ছিঁড়িয়াছে ও মুক্তধারার বাঁধ ভাসিয়া গিয়াছে। সেজন্য পঞ্চকের প্রাণমাতানো গান মেঘ-মেদুর আকাশকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, পথচারী অভিজিৎ তাহার পথের সন্ধান পাইয়াছে আর নন্দিনীর আনন্দ-লীলায় মৃত পাষাণপুরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবনের ছন্দ ধ্বনিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকের এই অন্তর্নিহিত আনন্দরসের মূলে রহিয়াছে প্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের একাত্ম যোগ। তাঁহার নাটক যে শুধু মাত্র তত্ত্বসর্বস্ব হইয়া যায় নাই, রূপে রসে ইহা যে এক অনিন্দ্য সৌন্দর্যবস্তু হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ, ইহাতে মানবপ্রকৃতির প্রাণ ও প্রেরণা আসিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতির উদার উন্মুক্তি ও অপার জীবন-রহস্য হইতে। রবীন্দ্রনাথ যে কবি, সুন্দরের পরশে যে তাঁহার অঙ্গ পুণ্য ও অন্তর ধন্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তো আমরা কখনও ভুলিতে পারি না। এই সুন্দরের স্বর্ণকমল ফুটিয়া উঠে বিশ্বপ্রকৃতির আলো-গন্ধ-সুর ও ছন্দে ভরা আসনে। কবি রহস্য-মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই স্বর্ণকমলের সন্ধান করিয়াছেন, সাঙ্কেতিক নাটকেও ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। মানুষের গৃহবদ্ধ জীবন সংকীর্ণ ও খণ্ডিত, এ জীবন ভূমার পরশ ও ও প্রভাব তখনই লাভ করে যখন ইহা বিশ্বপ্রকৃতির অবারিত আনন্দ-মুক্তির মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে সেজন্য ঘরের মানুষ বাহিরের জন্য পাগোল—'আকাশ ভেঙ্গে বাহিরকে' তাহারা লুট করিতে চায়। নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছাড়িয়া অনিশ্চিত পথকেই তাহারা অবলম্বন করে। উদয়াদিত্য, অভিজিৎ, বাউল, ধনঞ্জয় বৈরাগী, ঠাকুর্দা সকলে তো এই পথের খেলাতেই পাগোল। ঘরের মধ্যে নিরাপদ আরাম রহিয়াছে বটে, কিন্তু যাহারা প্রকৃত সত্যসন্ধানী মানুষ তাহাদের জন্য 'ঘরে ঘরে শূন্য হলো আরামের শয্যাতল,' বিঘ্ন-বিপদ-জড়িত চল-চঞ্চল পথের ইসারা তাহাদিগকে আকর্ষণ করে; রবীন্দ্রনাথের নাটকের চরিত্রগুলি সেই আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মিলনে যখন বাধা দেখা দেয় তখন হয় অশান্তি, তখনই আসে কবিহৃদয়ের প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে প্রত্যেকটি নাটকে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে যে বিশ্বপ্রকৃতি স্থান লাভ করিয়াছে তাহা নিশ্চল জড় প্রকৃতি নহে, তাহা সচল, জীবিত প্রকৃতি। সেজন্যই তো তাহার এত বৈচিত্র্য, রূপ ও রঙের এত পরিবর্তন। এই বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে ঋতুরঙ্গের নিত্য লীলা-পরিক্রমা। রবীন্দ্রনাথের এক একটি নাটকে এক একটি ঋতুর লীলাময় রূপ আমরা দেখিয়াছি।১ বর্ষার সজল-মেদুর রূপ ফুটিয়াছে 'অচলায়তনে,' শরতের স্নিগ্ধ-শুভ্র লীলা প্রাণ লাভ করিয়াছে 'শারদোৎসবে'; শীতের সোনালি ধানের মায়া জাগিয়া উঠিয়াছে 'রক্তকরবী'তে ও বসন্তের আনন্দ-লীলার আসন পাতা রহিয়াছে 'ফাল্গুনী' ও 'রাজা' নাটকে। ঋতুর এই বিচিত্রতার মধ্যেও কিন্তু একস্থলে অনন্ত

১। শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশী তাঁহার 'রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহে' (১ম খণ্ড) ঋতুলীলা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

ঐক্য দেখা গিয়াছে, এবং তাহাও হইল আনন্দরসের অভিব্যক্তিকে। প্রকৃতির যে রূপই কবি দেখান না তাহা সর্বত্রই আনন্দরূপ হইয়া উঠিয়াছে। শীত ও বর্ষা পর্যন্ত কবির চিত্তে শুধু কেবল আনন্দই বহন করিয়া আনিয়াছে। এই আনন্দময়ী প্রকৃতি তাঁহার নাটকীয় চরিত্র-গুলিকে প্রভাবিত ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে,—পঞ্চকের চোখে তাই শ্যামল মেঘের উতলা আহ্বান, সুদর্শনার অন্তরে শিরিষ কুসুমের মত্ততা আর নন্দিনীর গানে পৌষালি ফসলের প্রাচুর্য।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের এই প্রকৃতিপ্রাণতার সহিত আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন—তাহা হইল গীতিধর্মিতা। এই গীতিধর্মিতা তাঁহার সাহিত্যের, সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্যের সর্ববিভাগ যথা—গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির মধ্যে ইহা ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। অবশ্য ইহাতে তাঁহার সাহিত্যের উপকার ও অপকার দুইই ঘটিয়াছে। মানুষের সাধারণ অর্থময় ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির দ্বারা সীমাতীত ও গুহাহিতকে প্রকাশ করা চলে না। কিন্তু সঙ্গীতের সুর ও ছন্দ তাহার আভাস দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটির মর্মবস্তু এই মতের পরিপোষকরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটি সঙ্গীতের মধ্য দিয়া যে বিপুল ভাবরাজ্যকে উদ্‌ঘাটিত করা যায় এক ঝুড়ি কথা দিয়া তাহার প্রান্ত দেশেও পৌছান সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকখানি নাটকে এমন এক একটি সঙ্গীত আছে যাহার মধ্যদিয়া নাটকের সমগ্র ভাবটি ব্যঞ্জিত হইয়া উঠে। পঞ্চকের মুখে যখন শুনি— ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে তারে আজ থামায় কে রে,' তখন আমরা অনুভব করি আকাশের ঘন মেঘে মুক্তির ডাক আর নব বৃষ্টিধারায় তাপদগ্ধ তৃষিত মানুষের সঞ্জীবনী সুধা। 'ফাল্গুনী'র যুবকরা যখন মাতিয়া উঠে—'ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে,' তখন সেই ফাগুনের পরশ সকলের অন্তর রোমাঞ্চিত করিয়া তোলে। 'মুক্ত-ধারা'র ভৈরবপন্থীরা কিছুকাল পরে পরেই রুদ্র গম্ভীর স্বরে যে গান গাহিয়া চলিয়াছে— 'জয় ভৈরব, জয়-শঙ্কয়, জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর' তাহার অন্তর্নিহিত ভয়াবহ সম্ভাবনায় বিভূতির অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রটি যে শিহরিত হইয়া উঠে তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক দুর্বোধ তত্ত্বময়তা সত্ত্বেও যে এত সরস ও সৌন্দর্যময় হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে এই সঙ্গীতগুলির প্রভাব কম নহে। স্রোতস্বিনীর সরসধারা যেমন অদৃশ্য মৃত্তিকা-পথে সঞ্চারিত হইয়া দূরবর্তী অনুর্বর ভূমিকেও সুজলা সুফলা করিয়া তোলে এই গানগুলিও তেমন নীরস তত্ত্বভূমির অন্তরে রসধারা সিঞ্চন করিয়া ইহাকে সুদৃশ্য করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু গানগুলির দ্বারা নাটকের যেমন উৎকর্ষ হইয়াছে তেমনি আবার স্থানে স্থানে অপকর্ষও ঘটিয়াছে। কবি যেখানে সঙ্গীতপ্রবণতার ফলে সঙ্গীতের অকারণ আতিশয্য আনিয়া ফেলিয়াছেন সেখানেই এই অপকর্ষ দেখা গিয়াছে। অনেকস্থলে শুধুমাত্র কয়েকখানি গান যোজনা করিবার জন্যই যেন কবি কোন কোন চরিত্রকে অনাবশ্যক কারণে গতিশীল ঘটনার মাঝে আনিয়া ফেলিয়াছেন। 'ফাল্গুনী'র বাউল, 'রাজা'র ঠাকুরদা, 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয় বৈরাগী—প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইহারা রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ববাহক হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের নাচ গান অনেকস্থলে নাটকের গতিপথে অপ্রাসঙ্গিক বাধা হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটকে জীবনের মর্যাদা ও আকর্ষণ যে সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া উঠিয়াছে তাহা এতক্ষণের আলোচনার মধ্য দিয়া সকলেরই বোধগম্য হইবে। (কিন্তু যাহারা জীবনের জয়গান করিয়াছে তাহারা জীবিত হইতে পারিয়াছে কি? অবশ্য একথা প্রথমেই স্বীকার করিয়া লওয়া ভাল যে, সাঙ্কেতিক নাটকে ইন্দ্রিয়-চালিত জীবনের বর্ণাঢ্য বস্তুরূপ আমরা আশা করিতে পারি না। জীবন সেখানে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশিত, রহস্যকুহেলিছায়ায় আবৃত। কিন্তু তবুও একথা সত্য যে, অভিনেয় নাটকের মধ্যে জীবনের একটা বহিরাশ্রিত মানবীয় রূপ থাকা দরকার। শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশী বলিয়াছেন, 'রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যে একটিও পুরাপুরি বিশ্বাসযোগ্য, হৃদয়গ্রাহী, সজীব চরিত্র চোখে পড়ে না।') কিন্তু একথা কি সর্বাংশে সত্য? রঘুপতি, ক্ষেমঙ্কর, বিক্রমদেব, শঙ্কর, রেবতী, নয়নরায়ের মত সজীব ও সচল চরিত্র সাঙ্কেতিক নাটকে না থাকিতে পারে; কিন্তু মহাপঞ্চক, কাঞ্চীরাজ, বিভূতি, লক্ষেশ্বর, রণজিৎ, অভিজিৎ, সুদর্শনা, নন্দিনী ইহারাও তো একেবারে নির্জীব, নিশ্চল চরিত্র নহে, তত্ত্ববান হইয়াও তো ইহারা প্রাণবান হইতে পারিয়াছে। সাঙ্কেতিক নাটকে তত্ত্বের কণ্টকগুল্মে মানুষের হৃদয়ের আনন্দবেদনার কত শতদল ফুটিয়া রহিয়াছে। অম্বার আর্তনাদ, সুভদ্রের বেদনা, কিশোরের আত্মদান, বিভার প্রায়শ্চিত্ত—এ সব গৌণ ঘটনার মধ্য দিয়াও কবি তাঁহার নাটককে মানবরসাত্মক করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকে তত্ত্ব নিছক তত্ত্ব নয়, জীবন অহেতুক জীবন নয়; এখানে তত্ত্ব জীবনকে অবলম্বন করে ও জীবন তত্ত্বকে আশ্রয় করে।

✓সাঙ্কেতিক নাটকে নাটকীয় রসের আবেদন প্রত্যক্ষ এবং তাৎক্ষণিক নয় বটে, কিন্তু তবুও এই আবেদন জাগাইয়া তুলিতে হইবে। দর্শক বাহ্যক্রিয়ার অভাব কল্পনাকে অতিমাত্রায় উন্মুখ এবং প্রখর রাখিয়া পূরণ করিয়া লয়। সেই কল্পনারূঢ় দৃষ্টির সাহায্যে ভাবজগতের ক্রিয়া এবং দ্বন্দ্ব সে দর্শন করিয়া রসাপ্লুত হইয়া উঠিতে পারে। নাটকে সূক্ষ্ম ভাব বাহ্য ঘটনার স্থান গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু সেই ভাব যথেষ্ট সত্য ও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, মানুষের মনে ইহার সর্বজনীন সহজ আবেদন থাকা দরকার, তাহা না হইলে নাটকের কোনো মূল্য নাই। ১

রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকের আলোচনাকালে ideaর সঙ্গে সঙ্গে নাটকত্ব আমরা বিচার কবির। নাটকীয় গুণগুলি ভালো করিয়া দেখাইতে না পারিলে ideaর চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও তাঁহার নাটকগুলিকে আমরা উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলিয়াছেন যে এই নাটকগুলি তাঁহার কাছে খুবই স্পষ্ট এবং বাস্তব। অবশ্য তাঁহার

১। A. E. Morgan তাঁহার Tendencies of Modern English Drama গ্রন্থে নাট্যকার Yeats এর আলোচনা প্রসঙ্গে সাঙ্কেতিক নাটক সম্বন্ধে অতি সুন্দরভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন—'Real art is a lamp that time can only nourish. Symbolism may be its flame, a subtle light illuminating true and beautiful ideas but unless the ideas are true and beautiful, unless they are essentially real, it is but a will o' the wisp leading only to bottomless quags.' P.247

দৃষ্টি এত সূক্ষ্ম. এত গভীর তলাশ্রয়ী যে তাঁহার কাছে ভাবজগৎ বাহ্যজগতের মতই জীবন্ত এবং ক্রিয়াময়; কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে তাঁহার সাঙ্কেতিক নাটক কিভাবে প্রতিভাত হয় তাহাই আমাদের আলোচ্য। তাঁহার সাঙ্কেতিক নাটকগুলির মধ্যে তাঁহার কোনো বিশিষ্ট মতবাদ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাঁহার কবিতা প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার মধ্যে যে মত ও ধারণার সহিত আমরা পরিচিত হই, তাহারই প্রতিধ্বনি দেখি নাটকে, সুতরাং রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠকের কাছে তাঁহার নাটকের ভাব হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত নহে। তাঁহার নাটক সম্বন্ধে আর একটী কথা উল্লেখযোগ্য এই যে, নাটকের অন্তর্নিহিত রূপক অন্তরেই রহিয়া গিয়াছে। অন্তঃপুরে যাহার স্থান, স্পর্ধা করিয়া কাছারী-ঘরে আসিয়া সে বাহিরের লোকজনকে বিব্রত করে নাই। কবি নিজেও রূপক অর্থ লইয়া অনর্থক মাথা ঘামানো পছন্দ করিতেন না, বক্তব্য অংশের মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবার কথা বলিতেন। 'রক্তকরবী'র প্রস্তাবনায় তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় তিনি বলিয়াছেন –'আমার নিবেদন যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়, হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে বের ক'রে তার কার্যপ্রণালী তদারক করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।' তাঁহার নাটকের সাঙ্কেতিক অর্থ না বুঝিলেও নাটকের দৃশ্যগত রস গ্রহণ করিতে তেমন ব্যাঘাত হয় না। 'রাজা' 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাটকের মধ্যে গভীর তত্ত্ব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাদের মধ্যস্থ পাত্রপাত্রীগুলির চরিত্র-দ্বন্দ্বের মধ্যে যে জমাট নাটকীয় রস আছে তাহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাহা সুদূর, অস্পষ্ট, অতীন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে দৃশ্য-জগতের রূপ ও রস সঞ্চার করিয়া আমাদের প্রত্যক্ষের গোচরীভূত করিয়া তোলাই রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকের উদ্দেশ্য। ইহাতে নাটকত্ব অক্ষুণ্ণ এবং অব্যাহত রহিয়াছে। নাটকের কাজ আমাদের মনের মধ্যে একটা আবেগময় আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা জাগাইয়া রাখা, এবং রবীন্দ্রনাথের সব সাঙ্কেতিক নাটকে এমন একটা চরিত্রের সম্ভাবনা গড়িয়া তোলা হইয়াছে যাহার জন্য আমাদের মনপ্রাণ উদগ্র আগ্রহে উদগ্রীব হইয়া থাকে। প্রায়ই কোনো অদৃশ্য রাজা এই ধরণের চরিত্র হইয়াছে। অপরাপর চরিত্রগুলিও নেহাত বাস্তব-সম্পর্কহীন ভাবের সমষ্টিমাত্র নহে, তাহাদের মধ্যে সরস স্বাভাবিকতা এবং সাধারণ মানবত্ব পুরাপুরি বিদ্যমান। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকগুলিকে যথার্থ নাটক বলিতে আমাদের বাধা নাই।

॥ শারদোৎসব (১৩১৫) ॥ শারদোৎসব ঋতু-প্রশস্তি পর্যায়ের নাটিকারূপে ১ বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শারদোৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হইবার জন্য রচিত হয়। কিন্তু শরৎঋতুর বাহ্য আনন্দোৎসব বর্ণনাই এই নাটিকার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, ইহার মধ্যে গুহাহিত তত্ত্বের সমাবেশও রহিয়াছে, বিশেষত উপনন্দের ঋণশোধের মধ্যে রহস্যঘন সাঙ্কেতিকতার স্পর্শ আছে। সেজন্য সাঙ্কেতিক নাটকের শ্রেণীতে ইহাকে অন্তর্ভুক্ত করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারের আলোকপাতে ঋতু-প্রশস্তি নাটিকা অথবা সাঙ্কেতিক নাটিকা

---

১। বিশ্বভারতী কর্তৃক ঋতুউৎসব পর্যায়ের পাঁচটি নাটিকার নাম—'শেষবর্ষণ', 'শারদোৎসব,' 'বসন্ত,' 'সুন্দর,' 'ফাল্গুনী,'

কোনরূপেই ইহার উৎকর্ষ লক্ষিত হইবে না। প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণে কবি সাড়া দিতে চাহিয়াছেন তাহা সত্য,১ কিন্তু প্রকৃতির সহিত একময়তা আমরা এই নাটিকায় যথার্থরূপে দেখিতে পাইয়াছি কি? শরৎপ্রকৃতির আবেগিত বর্ণনা মাঝে মাঝে আমরা সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছি কিন্তু ইহা কোথাও অবিচ্ছেদ্য প্রভাবরূপে কোন চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মধ্যে মিশিয়া যায় নাই। উপনন্দের সহিত প্রকৃতির যোগ তো একেবারেই নাই। অভিজিৎ কিংবা পঞ্চক হৃদয়ের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রকৃতির যে দুর্দম আনন্দ-নৃত্য অনুভব করিয়াছে উপনন্দ তাহার কণামাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই নাটিকার ঠাকুর্দা চরিত্রের সহিতও প্রকৃতির কোন গভীর আনন্দ-সম্পর্ক নাই। রাজসন্ন্যাসীর একাধিপত্যে ঠাকুর্দা এখানে নিতান্তই উপেক্ষিত মর্যাদা লাভ করিয়াছেন এবং তিনিও তাঁহার ছেলের দল ছুটির আনন্দ যতখানি ব্যক্ত করিয়াছেন প্রকৃতির আনন্দ ততখানি ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। এই নাটিকায় সাঙ্কেতিক রহস্যের কোন সুষ্ঠু রূপাঙ্কন আমরা দেখিতে পাই না। উপনন্দের ঋণশোধের ব্যাপারটির উপর কবি স্বয়ং অনেকখানি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কারণ কবি যেখানেই এই নাটিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেখানে এই বিষয়টিই বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।২ এই নাটিকার বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে যে নাটিকাখানি রচনা করিয়াছিলেন তাহার নামও তিনি 'ঋণশোধ' রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঋণশোধের বিষয়টি নাটিকার মধ্যে কতখানি অংশ লাভ করিয়াছে? নিতান্তই সামান্য সন্দেহ নাই। নাটিকার মূলধারার মধ্যে উপনন্দের বৃত্তান্তটি প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে মাত্র। আর একটি বিষয় বিচার্য। উপনন্দ ঋণশোধ করিবার জন্য যে কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছে তাহাতে কর্তব্যবোধ যতখানি আছে, আনন্দ-বোধও কি ততখানি আছে? সম্ভবত নাই।৩ যদি থাকিত তাহা হইলে লক্ষেশ্বরের অপমানে সে নিজেকে ঋণমুক্ত ভাবিতে পারিত কি? রবীন্দ্রনাথ নিজের ব্যাখ্যায় ও নাটকীয় চরিত্রের কথায় উপনন্দের ঋণশোধের একটি গভীরতর ও ব্যাপকতর তাৎপর্যের আভাস দিয়াছেন। সন্ন্যাসীর কথায় 'আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—জগৎ আনন্দের

---

১। কবির নিজের উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—'মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটছে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো অনেক বড় হয়ে ওঠে।'

২। 'কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ—সমস্ত খেলাধূলা ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যে নিভৃতে ব'সে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তাঁর সত্যকার সাথী মিলেছে, কেন না ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে—সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম।'

—'আমার ধর্ম'

৩। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় এ সম্বন্ধে সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন—'কিন্তু উপনন্দ নিজে তাহার ঋণশোধের কর্মের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিল কি? অন্তত তাহার ভাষণ ও কর্মের মধ্যে সে পরিচয় সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় নাই, বরং কর্তব্য তাহার কাছে কতকটা বেদনার ভার, যদিও সে ভার সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে।

—রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা (২য় খণ্ড)—১২৭

'ঋণ শোধ করবে। বড় সহজে করবে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ ক'রে করবে! সেই জন্যেই ধানের ক্ষেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভ'রে উঠেচে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ।' এইভাবে উপনন্দের ব্যক্তিগত সত্যবোধ একটি সর্বময় জগৎসত্যে রূপায়িত হইয়াছে। কিন্তু নাটিকার এই মর্মবাণী ইহার ঘটনা ও চরিত্রায়ণে মোটেই পরিস্ফুট হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে নাটিকাটির মূল চরিত্র হইল রাজসন্ন্যাসী এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার রহস্যরস জমিয়া উঠিয়াছে। বিজয়াদিত্যের ছদ্মবেশ এবং তাঁহার ছদ্মবেশ মোচনই একমাত্র কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। অবশ্য তাঁহার মধ্য দিয়া কবি বোধ হয় রাজচরিত্রের একটি আদর্শ রূপ ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। 'রাজা হ'তে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই'—এই সত্য কবি সন্ন্যাসী চরিত্রটির মধ্য দিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তবু একথা তো অস্বীকার করা চলে না যে সন্ন্যাসীরূপ রাজার ছদ্মরূপ। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজাই হইয়া উঠিলেন। সেজন্য সন্ন্যাসীরূপে তিনি মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতির যে আনন্দ দ্যোতনা অনুভব করিয়াছেন তাহা তাঁহার রাজসত্তার উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে সে সন্দেহ আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়।১ এই রাজসন্ন্যাসী চরিত্রটির সহিত সর্বাপেক্ষা গভীর সংযোগ ও সংঘাত ঘটিয়াছে লক্ষেশ্বর চরিত্রের। লক্ষেশ্বর আদর্শ নভোচারী মানুষ নহে, সে স্বার্থমগ্ন পৃথিবীর বাস্তব মানুষ। সে নিন্দনীয় হইলেও যথার্থ। সে কুবেরের পূজারী, লক্ষ্মীর পদ্মটির সন্ধান সে পায় নাই। মাটির তলায় অন্ধকারের গর্ভে রহিয়াছে গজমোতি আর মাটির উপরে সারা বিশ্ব জুড়িয়া লক্ষ্মীর পদ্মের পাঁপড়িগুলি পাতা। লক্ষেশ্বর মাটির তলায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া মাটির উপরের পদ্মের সন্ধান পায় নাই। না পাক, কিন্তু যে নিদারুণ অস্বস্তি ও বেদনা তাহাকে অহরহ বিচলিত করিয়াছে তাহাতে তাহার চরিত্রে নি:সন্দেহে একটি সজীব কারুণ্যের স্পর্শ আসিয়া গিয়াছে।

॥ প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬) ॥ 'প্রায়শ্চিত্ত' ঐতিহাসিক নাটকরূপে অভিহিত হইয়াছে। ইহার কারণ সম্ভবত এই যে, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীহাট' হইতে ইহার বিষয়-বস্তু গৃহীত হইয়াছে। নাটকের মূল ঘটনা ও চরিত্রগুলির মধ্যে ইতিহাসের ছায়াপাত আছে, সেজন্য ঐতিহাসিক নাটকরূপে পরিচিত হইবার যুক্তি হয়তো ইহার আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের উদাত্ত-গম্ভীর পরিবেশ ও রসসৃষ্টি কিছুই ইহাতে নাই। ঐতিহাসিক ঘটনার বহির্বিপ্লব ও শক্তিসংঘাত অপেক্ষা পারিবারিক অন্তর্বিপ্লব ও সূক্ষ্ম মানসসংঘাত ইহার মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। দৃশ্যগুলির আত্যন্তিক সংক্ষিপ্ততা ও সংলাপের নিত্য ব্যবহার্য

১। ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্তের মত গ্রহণযোগ্য—'বরং ইহাই মনে হয় যে, সন্ন্যাসীর বেশের মত ইহাও তাঁহার একটা বিশেষ ভঙ্গীমাত্র, মজা দেখিবার জন্য যে কোন সময়েই তিনি বাহির হইতে পারেন, শরতের ঐশ্বর্য উপলক্ষ্য মাত্র।'

—রবীন্দ্রনাথ (২য় সং)—২৩৩

সাধারণত্ব১ অতীত জগতের রহস্যঘন কুহেলি ছিন্ন করিয়া ইহার মধ্যে আধুনিক বাস্তব-জগতের ভাবরস সঞ্চার করিয়াছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচিত হইয়াছিল এমন এক সময় যখন কবির চিত্ত স্থূল ইন্দ্রিয়জগৎ হইতে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্য সন্ধানে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। সমসাময়িক সাঙ্কেতিক নাটকগুলির মধ্যে কবিচিত্তের এই ভাবানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই নাটকও যে তৎকালীন কবিমানসের সাক্ষ্য কিছুটা বহন করিতেছে তাহার দৃষ্টান্ত ধনঞ্জয় বৈরাগী। তাঁহার কথায় ও গানে ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-ভরা জগতের অতীত এক সুখশান্তিময় বিশ্বদেবতার রাজ্যের প্রতি সংকেত ধ্বনিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সাঙ্কেতিক নাটকে পথের যে সর্বময় আকর্ষণ দেখান হয় এই নাটকেও তাহার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। উদয়াদিত্য, বিভা, ধনঞ্জয় সকলেই শেষ পর্যন্ত পথে নামিয়া পড়িল। হিংসা-পীড়িত রাত্রির অন্ধকার পথ দিয়া নব মুক্তিপথে তাহাদের যাত্রা, জীবনে চরম রিক্ত হইয়াছে বলিয়াই তো পরম দুর্লভের সাধনা তাহাদের সার্থক। কিন্তু এই সব কিঞ্চিৎকর সাঙ্কেতিকতা সত্ত্বেও নাটকখানিকে খাঁটি সাঙ্কেতিক নাটকের শ্রেণীতে কখনই ফেলা যায় না। কবির অন্যান্য সাঙ্কেতিক নাটকের মধ্যে প্রকৃতির সহিত যেরূপ অবিচ্ছিন্ন যোগ, যেরূপ কবিত্বময় বাণীর ঝঙ্কার, যেরূপ গূঢ় ভাবরহস্যের পরিমণ্ডল লক্ষ্য করা যায়—এই নাটকে সেরূপ কিছুই নাই। প্রকৃতপক্ষে এই নাটকখানি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, ইহা খাঁটি ঐতিহাসিক নাটক অথবা সাঙ্কেতিক নাটক কোনটাই হয় নাই। ঐ দুইপ্রকার নাটকের মাঝে একটি অসমঞ্জস সন্ধি করিতে চাহিয়াছে মাত্র। ইহার ঐতিহাসিকতার মূলে রহিয়াছে ইহার বিষয়বস্তু এবং কবির মানস-উৎস হইতে আসিয়াছে ইহার সাঙ্কেতিকতার প্রেরণা। পরবর্তীকালে এই নাটকের অনুপ্রেরণা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাটক 'মুক্তধারা'। 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'মুক্তধারা'র কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। চরিত্রের দিক দিয়াও এই মিল সুস্পষ্ট—ধনঞ্জয় তো উভয় নাটকে একই চরিত্র হইয়া রহিয়াছে। তাহা ছাড়া প্রতাপাদিত্য, বসন্তরায়, উদয়াদিত্য যথাক্রমে রণজিৎ, বিশ্বজিৎ ও অভিজিৎ চরিত্রে পরিণত হইয়াছে।

এই নাটকের নাম 'প্রায়শ্চিত্ত' হইল কেন? স্পষ্টতই বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথ সহজ সাধারণ অর্থে নামটি ব্যবহার করেন নাই। প্রায়শ্চিত্ত সত্য সত্যই যাহাদের করা উচিত ছিল সেই প্রতাপাদিত্য অথবা রামচন্দ্রের কোন প্রায়শ্চিত্ত আমরা দেখি নাই। যাহারা পুণ্যাত্মা ও সত্যসন্ধ তাহারাই আঘাত-বেদনা বরণ করিয়া লইয়া নির্বোধ ও নিষ্ঠুর মানুষের জন্য বুঝি প্রায়শ্চিত্ত করিল—উদয়াদিত্য তাহার পিতার এবং বিভা তাহার স্বামীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের দায়িত্ব নিজেদের জীবনে বরণ করিয়া লইল। অথবা ইহাও হইতে পারে যে

১। টমসন সাহেবের উক্তি উল্লেখযোগ্য—There are many scenes, usually extremely brief—statuesque dialogue by which the action seems never to get forword.
Rabindranath—P. 208

প্রতাপাদিত্য উদয়াদিত্যের ন্যায় পুত্রকে এবং রামচন্দ্র বিভার ন্যায় স্ত্রীকে হারাইল, ইহাই তো তাহাদের জীবনের করুণতম প্রায়শ্চিত্ত।

মানুষের নিষ্ঠুর পশুশক্তির সহিত অহিংস আত্মিক শক্তির দ্বন্দ্ব হইতেই আলোচ্য নাটকের প্রাণবস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রতাপাদিত্য হৃদয়হীন পশু, স্নেহ-মমতা, কর্তব্য-কৃতজ্ঞতা সব মানুষী বৃত্তিগুলিই তাহার হিংস্রজিঘাংসার আঘাতে শতচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য, বিভা, সরমা বসন্তরায় প্রভৃতি তাহার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জানাইয়াছে তাহা নীরব ও নিরস্ত্র। হয়তো তাহাদের পার্থিব ক্ষয় ক্ষতি হইল, কিন্তু তবুও কি তাহারা একটি অপার্থিব মৃত্যুঞ্জয়ী গৌরব লাভ করিল না? বন্ধুবর্জিত স্বজন-পরিত্যক্ত প্রতাপের জীবনে ম্যাকবেথের ন্যায় কি ভয়াবহ একাকিত্ব নামিয়া আসিল! এ পরাজয়ের কাছে তো মোগলদের কাছে পরাজয় তাহার পক্ষে তুচ্ছ! পশুশক্তি যখন রাজার মধ্যে রূপ গ্রহণ করে তখন দেখা দেয় অরাজকতা। এই অরাজকতার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম দেখা গিয়াছে এবং এই সংগ্রামের নায়ক ধনঞ্জয় বৈরাগী। স্বৈরতন্ত্রী রাজশক্তির সহিত উপদ্রুত প্রজাশক্তির যে সংঘাত নাটকের মধ্যে দেখান হইয়াছে তাহাতে বর্তমান যুগবিপ্লবের ইঙ্গিত কি স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই?

॥ রাজা (১৩১৭) ॥ 'গীতাঞ্জলি',-'গীতিমাল্য'-'গীতালি' পর্বে যখন রবীন্দ্রনাথের মন অরূপ-সাধনায় নিমগ্ন তখন তিনি অরূপতত্ত্ববিষয়ক নাটক 'রাজা' ('অরূপ রতন') রচনা করেন। রাণী সুদর্শনা বাহ্য রূপ ও সৌন্দর্যের মধ্যে সুন্দরাতীত অরূপকে খুঁজিয়াছিল, ইহা তাহার মোহ। কারণ 'যে প্রভু কোনো বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাহাকে উপলব্ধি করা যায়' তাঁহাকে রূপের খাঁচায় দেখিবার চেষ্টা করা ভুল, এই ভুল এবং মোহের ফলে সে তাহার চতুর্দিকে তীব্র জ্বালাময় অগ্নিদাহের সৃষ্টি করিল। এই দাহে তাহার মিথ্যা অভিমান এবং ভ্রান্ত মোহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল, এবং ভিতরের সত্যোপলব্ধি উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিল, সে তখন বুঝিল যে সৌন্দর্যের প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ রূপটি—'ননীর মত কোমল, শিরিষফুলের মত সুকুমার প্রজাপতির মত সুন্দর' নয়, তাহা 'ঝড়ের মেঘের মত কালো'—'কূলশূন্য সমুদ্রের মত কালো, তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।' এই রূপাতীত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা যায় আপনার চিত্তকে দুঃখতাপে পরিশুদ্ধ করিবার পর। সুদর্শনা বিপদ ও দুর্যোগের মধ্যেই অন্ধকার ঘরের রাজার সন্ধান পাইল, এই ভাবটী 'খেয়া'র 'আগমন' কবিতার মধ্যে কবি ব্যক্ত করিয়াছিলেন—

ওরে দুয়ার খুলে দে রে
বাজা শঙ্খ বাজা,
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,

ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখ রাতের রাজা।

রাজার মধ্যে দুইটী তত্ত্ব– প্রথমত, অরূপের মধ্যেই রূপের সার নিহিত, এবং দ্বিতীয়ত, দুর্গম দুঃখাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই সত্যশিবকে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশী বলিয়াছেন যে, সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা, সুদর্শনা ও কাঞ্চীরাজ রাজাকে যথাক্রমে দাসী, বন্ধু, মধুর ও শত্রুভাবে ভজনা করিয়াছে। এই মত বিশেষ যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য। সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদার সহিত রাজার সম্পর্ক সিদ্ধ হইয়াছে, সেজন্য তাঁহাদের মুখে রাজার রূপ ও মহিমার বর্ণনা। কিন্তু দুইজনের মধ্যে প্রভেদ এইখানে যে, সুরঙ্গমা দেখিয়াছে রাজার ভিতরের দিক আর ঠাকুরদা দেখিয়াছেন রাজার বাহিরের রূপ। উভয়ের দেখাই অসম্পূর্ণ, সেজন্য রাজা সুরঙ্গমাকে বাহিরে আনিয়াছেন আর ঠাকুরদাকে ভিতরে আহ্বান জানাইয়াছেন। সুদর্শনা ও কাঞ্চীরাজের সহিত রাজার পূর্ব-পরিচয় নাই, দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিচিত্র-জটিল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই রাজার সহিত এই পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে এবং নাটকের আখ্যান-বস্তুও ইহাই। সেজন্য সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদা রাজা ও স্বয়ং নাট্যকারের মুখপাত্র হইলেও নাটকের মধ্যে নিঃসংশয়িত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে কিন্তু সুদর্শনা ও কাঞ্চীরাজ চরিত্র।

বিভিন্ন সাধন পদ্ধতির কথা আলোচনা করিতে গেলে আর একটি কথা আসিয়া পড়ে। সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা ও সুদর্শনার সহিত রাজার যে সম্পর্ক তাহা রাগাশ্রিত। দাসী, সখা ও কান্তারূপে ভজনার মধ্যে ভক্ত ও ভগবানের কোন দূরবর্তিতা নাই, সেখানে ক্ষুদ্র ও বৃহতের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য প্রেমের নিত্যকালীন বন্ধন। বৈষ্ণব ধর্মদর্শনে এই প্রেমলীলা মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে[১] এবং রবীন্দ্রনাথও খুব সম্ভবত ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি'র অনেকগুলি কবিতা ও গানে বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তি-সাধনার প্রভাব আবিষ্কার করা সহজ। 'বালিকা বধূ', 'গোধূলি-লগ্ন' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে ভক্ত ও ভগবানের প্রেমলীলার কথা বর্ণিত হইয়াছে। খৃষ্টান মিষ্টিক ও সুফীমতবাদের চিন্তায় হয়তো এরূপ লীলার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু বৈষ্ণবদের মত এমন একাত্ম তন্ময়তার সহিত এই লীলা আর কেহও পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই। 'রাজা' নাটকে ভক্ত ও ভগবানের যে লীলা-সম্পর্ক দেখান হইয়াছে তাহা স্পষ্টতই বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে ও রবীন্দ্রনাথের মতবাদে পার্থক্যও আছে। বৈষ্ণবের

চরিতামৃতের ব্যাখ্যা স্মরণযোগ্য—
দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥

ভগবান সরূপ— কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভগবান অরূপ, দেহের খাঁচার মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবের ভগবান মাধুর্যময় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভগবান মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের সমন্বয়। বৈষ্ণবের ভগবান ভক্তকে বাহিরে আহ্বান করেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভগবান ভক্তকে বাহিরে আহ্বান করেন এবং ভিতরেও আকর্ষণ করেন—বৈষ্ণবসাধনায় স্বকীয়া হইতে পরকীয়ায় মুক্তি কিন্তু রবীন্দ্রসাধনায় পরকীয়া হইতে স্বকীয়ায় স্থিতি।

'রাজা' নাটকে দুইটি পরিবেশ চোখে পড়ে, একটি হইল অন্ধকার ঘর অপরটি বসন্ত প্রকৃতি। এই দুই পরিবেশে কতই না পার্থক্য! একদিকে অন্ধকার ঘরের ভয়ঙ্করতা অন্যদিকে আলোক-মধুর প্রকৃতির রমণীয়তা। রাজার অধিষ্ঠান অন্ধকার ঘরে, তাহা হইলে বাহিরের এই উৎসবমুখর প্রকৃতির সহিত তাঁহার কি কোন যোগ নাই? নিশ্চয়ই আছে। বাহিরের মাঝে তিনি বিচিত্র এবং অন্তরের মাঝে তিনি একক; তিনি অরূপ হইলেও রূপের লীলায় প্রকাশিত 'অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর'। তিনি রুদ্র হইলেও প্রসন্ন মুখ দ্বারা আমাদের রক্ষা করেন—'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'। রাজার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাগবত-অনুভূতির এই পরিপূর্ণ সমন্বয় দেখা গিয়াছে। যিনি ভগবানের এই পরিপূর্ণ রূপ অনুভব করিতে পারেন না তাঁহার সাধনা খণ্ডিত কিংবা ব্যর্থ। সেজন্য ঠাকুরদা ও সুরঙ্গমার সাধনাও যে খণ্ডিত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুদর্শনা অরূপকে বাদ দিয়া শুধু কেবল রূপকে পাইতে চাহিয়াছিল, সেখানেই তাহার ভুল। সুদর্শনার দ্বিতীয় ভুল এই যে, রাজাকে সে নিয়ত-সক্রিয় প্রবল পুরুষ রূপে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল।১ এই দুই ভুলের সুযোগ লইয়া সুদর্শনার ভাগ্যাকাশে দুই দুষ্টগ্রহের উদ্ভব—সুবর্ণ ও কাঞ্চীরাজ। সুদর্শনাকে সুবর্ণ চায় গান্ধর্ব মতে আর কাঞ্চীরাজ চায় রাক্ষস মতে। কিন্তু ভক্তের চরমতম দুর্দিনে ভগবানের অপ্রত্যাশিত করুণা নামিয়া আসে, সুদর্শনার বেলাতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যাঁহাকে পাইবার জন্য তাহার এত কামনা, যাঁহাকে না পাইয়া তাঁহার এত বেদনা তিনি আপনা হইতে আসিয়াই তাহাকে সর্বনাশ হইতে রক্ষা করিলেন। তখন সেই ভয়াল-সুন্দর, কান্ত-কঠোর প্রিয়তমের পদতলে সুদর্শনা সব অভিমান ও অপরাধ সমর্পণ করিয়া দিল, এতদিন পরে তাহার সাধনা সিদ্ধিলাভ করিল।

এই পর্যন্ত তো গেল তত্ত্বের কথা। এই তত্ত্ব 'রাজা'র মধ্যে প্রধান এবং স্পষ্ট তাহা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু ইহার নাটকীয় গুণও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, এবং এই গুণ না থাকিলে নাটক হিসাবে ইহার কোন মূল্য থাকিত না। নাটকের চরিত্রগুলি একটা সূক্ষ্ম আইডিয়ার দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিলেও সেই দ্বন্দ্ব ক্ষণে ক্ষণে বাস্তব দ্বন্দ্ব বলিয়া মনে হইয়াছে। সুদর্শনার মানস-দ্বন্দ্বের তত্ত্বময় ব্যাখ্যা আমরা করিয়াছি, কিন্তু সেই দ্বন্দ্বের বাহ্যরূপটি

---

১। সুদর্শনার দুঃখ এইখানে যে রাজা তাহাকে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখেন না, রাজার ঔদাসীন্যে তাহার নিদারুণ অস্বস্তি। রাজাকে সে এক জায়গায় বলিতেছে—তুমি আমাকে জোর করে ধরে রাখতে পারতে কিন্তু রাখলে না! আমাকে বাঁধলে না —আমি চল্লুম। তোমার প্রহরীদের হুকুম দাও আমাকে ঠেকাক।'

এত তীব্র গতিবেগ-চঞ্চল যে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া নাটকীয় রস তত্ত্বমার্গ ত্যাগ করিয়া মানব-হৃদয় অভিমুখে অতি দ্রুত প্রবাহিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এরূপ একটি দুর্বার দ্বন্দ্বময় নারীচরিত্র রবীন্দ্রনাথের সমগ্র নাট্যসাহিত্যে খুব কমই আছে। ক্লিওপাট্রা অথবা মিডিয়ার ন্যায় তাহার দুরন্ত ভোগলিপ্সা সর্বপ্রকার সংযম ও সংস্কারকে বিদ্রূপ করিয়া এক অলঙ্ঘ্য সর্বনাশের পথে তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। রাজার নিষ্ক্রিয়, নিষ্কাম আশ্রয় হইতে এই সর্বনাশের ঘূর্ণিনৃত্য তাহার কাছে অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষিত। সেজন্য রাজাকে সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজাকে ত্যাগ করিলেও রাজার কামনা সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। স্বয়ংবর সভায় যাইবার পূর্বে তাহার অসহায় অন্তর বিদীর্ণ করিয়া অন্তরতম বাণী নির্গত হইয়াছে—'রাজা, আমার রাজা! তুমি আমাকে ত্যাগ করেচ উচিত বিচারই করেচ। কিন্তু আমার অন্তরের কথা কি তুমি জানবে না? (বুকের বসনের ভিতর হইতে ছুরি বাহির করিয়া) দেহে আমার কলুষ লেগেছে—এ দেহ আজ আমি সভার সমক্ষে ধূলোয় লুটিয়ে যাব—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগে নি বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না?' বিশ্বরাজার রাণী যে সে আজ পিতৃগৃহে কলঙ্কিতা দাসী, সে এক কামনা-লোলুপ সংগ্রামের কলুষিত পাত্রী—তাহার এই অপমান ও বেদনা কঠিনতম চিত্তকেও বিগলিত করে।

আলোচ্য নাটকে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হইল কাঞ্চীরাজ। সুদর্শনার বিভ্রম ও পতনের মূলে কাঞ্চীরাজ-সুবর্ণ তাহার উদ্দেশ্যলাভের একটি অস্থায়ী উপায়মাত্র। সে মদমত্ত রাবণ, সীতাকে হরণ করিবার উদগ্র লালসায় সে অন্ধ। সে জানে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা', সেজন্য স্বয়ম্বর সভায় সে পৌরুষের অভিমানে আভরণকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য নাটকের ন্যায় এই নাটকেও বিরোধী শক্তিকে হেয় করেন নাই, কাঞ্চী-রাজের চরিত্র সে কারণে অতি জীবন্ত মর্যাদা লাভ করিয়াছে। অন্যান্য রাজারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল, কিন্তু সে একাই রণক্ষেত্রে রাজার বিরোধিতা করিতে গেল। কিন্তু তাহার শেষ পরিণতি সুসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধে তাহার পরাজয় হইয়াছে ইহাই তো যথেষ্ট, ইহার পর দীনবেশে তাহাকে রাস্তায় ঘুরাইয়া এবং সুদর্শনাকে মাতৃসম্বোধন করাইয়া এই চরিত্রের এমন কি উৎকর্ষ দেখান গেল? বরং ইহাতে যেন চরিত্রটি একটি অতি সুলভ, নীতি-প্রদর্শিত পরিণতিই লাভ করিয়া বসিল।

যে অদৃশ্য রাজার কথা নাটকের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি শুধুই কেবল আধ্যাত্মিক লোকবিহারী সাধনালভ্য ভগবান নহেন, তিনি দীন পতিতের ভগবান, 'লক্ষ মাটির ঢেলা' তাঁহার চরণে আশ্রয় পাইয়াছে, পার্থিব মানুষের সহিত তাঁহার যোগ নিবিড়। 'রাজা' নাটকের তত্ত্বময়তা আমাদের কাছে নিশ্চয়ই পীড়াদায়ক হইত যদি না ইহার গীতিকাব্যময় অংশ আমাদের মনকে আদ্যন্ত মধুর রসে পরিপ্লাবিত করিয়া রাখিত। টমসন সাহেব ঠাকুরদার প্রতি বিরক্ত হইলেও একথা সত্য যে ঠাকুরদা যদি তাঁহার সরস কথা এবং আনন্দময় গানগুলি লইয়া বিরাজমান না থাকিতেন, তবে নাটকখানি

নিশ্চয়ই নীরস এবং একঘেয়ে মনে হইত।১ অজিত চক্রবর্তী যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য—'রাজা-নাট্যে বসন্ত উৎসবের অবতারণা এবং ঠাকুরদার দলের অবতারণা এ নাটকের সেই লিরিক ভাগ এবং বোধ হয় সর্বোৎকৃষ্ট ভাগ।'

॥ অচলায়তন ( ১৩১৮ ) ॥ রবীন্দ্রনাথ চিরদিন অর্থহীন সংস্কার এবং যুক্তিহীন আচার ও প্রথার তীব্র নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন। বহু দিনার্জিত অন্ধ এবং বিকৃত সংস্কার ও অনুশাসন-গুলি সমাজকে কিভাবে নাগপাশের সহস্র বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহাই নাট্যকার 'অচলায়তন' নাটকে দেখাইলেন। মহাপঞ্চক এবং তাঁহার অনুবর্তিগণ সমাজের তথাকথিত নীচ এবং অস্পৃশ্য গণসাধারণের সীমা হইতে নিজেদের সতর্কভাবে পৃথকীভূত করিয়া একান্ত পীড়াদায়ক মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা অভিশপ্ত গণ্ডির মধ্যে অচলায়তন সৃষ্টি করিয়াছিল। আচার্যের ন্যায় ক্ষমাবান এবং পঞ্চকের ন্যায় প্রাণবান পুরুষের ইহার মধ্যে স্থান হয় নাই। পরিশেষে সত্যবোধের আঘাতে অচলায়তনের প্রাচীর খসিয়া পড়িল, এবং ইহার অধিবাসিগণের সহিত বাহিরের উন্মুক্ত আকাশতলবিহারী সর্বসাধারণের সচল যোগ ঘটিয়া গেল।

অন্যান্য নাটকের ন্যায় এই নাটকেও প্রাণশক্তির সহিত জড়শক্তির সংগ্রাম দেখা গিয়াছে। জড়ের শক্তি যতই প্রবল হউক না কেন প্রাণের কাছে তাহার শেষ পর্যন্ত পরাজয় হইবেই। এই নাটকও পঞ্চকের জয় ও মহাপঞ্চকের পরাজয়ে সমাপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ অদম্য আশাবাদী, তিনি অন্য কোনরূপ পরিণতি দেখাইতে পারেন না। তবে জড়ের এই শক্তি উপেক্ষণীয় নহে, মানুষ ইহাকে আয়ত্ত করিয়া মনুষ্যত্বের কাজে লাগাইতে পারে। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্যের মত তখন সে নীরব আজ্ঞাবাহী হইয়া অসাধ্য সাধন রবে। গুরু ইহা জানিতেন বলিয়াই মহাপঞ্চককে পরাজিত করিয়াই আবার তাঁহার কাজে নিযুক্ত করিলেন। অচলায়তনে দুই বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব থাকিলেও সেই দ্বন্দ্ব কোথাও তেমন তীব্র উত্তেজনা জাগ্রত করিতে পারে নাই, ইহার দীপ্তি ও দাহ কোনটাই নাই। মহাপঞ্চকের মধ্যে যেমন সুদৃঢ় শক্তির পরিচয় আছে পঞ্চকের মধ্যে তাহার কোন সক্রিয় প্রকাশ নাই। তাহাকে মনে হয় যেন শুধু বাঁশির একটি সুর, নির্ঝরের একটি কাকলী। জয়ের গৌরব তাহার নাই, কারণ গুরু যদি না আসিতেন তবে সে কোনদিন মহাপঞ্চকের বন্ধন ছাড়াইতে পারিত কিনা সন্দেহ। দুর্যোধনের পরাজয় হইয়াছিল, কিন্তু অর্জুনের দিকে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাহা মনে রাখিতে হইব। মহাপঞ্চকেরও পরাজয় হইল বটে কিন্তু এ দৈবশক্তির কাছে পরাজয়। এই শক্তির বিরুদ্ধে সে সর্বস্ব পণ করিয়া লড়িয়াছে। সকলে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু একা সে নিজের বিশ্বাসকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নির্ভীকচিত্তে তাহার শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছে। তাহার পরাজয় হইলেও সেই পরাজয়ে অগৌরব নাই, তাহাতে ট্র্যাজিক মর্যাদা আসিয়া গিয়াছে। নিঃসন্দেহে মহাপঞ্চক নাটকের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র।

১। টমসনের উক্তি—As it is, Thakurda with much assistance, able though superfluous spoils everything.'

'অচলায়তনে' সর্বশক্তির উৎস যে গুরু, তিনি কে? 'খেয়া'র কবিতাগুলিতে এবং অন্যান্য রূপক নাটকে যে রাজার কথা বলা হইয়াছে 'অচলায়তনে' তাঁহার স্থানে গুরু আসিয়াছেন। এই গুরুও অন্ধকার গৃহের দরজা জানলা ভাঙ্গিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে এই নাটকে গুরুর রূপ এক নহে, ত্রিবিধ। অচলায়তনে তিনি গুরু, শোণপাংশুদের কাছে তিনি দাদাঠাকুর এবং দর্ভকদের কাছে তিনি গোঁসাই। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান না হইলেও ভগবানের মহিমা তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গীতায় বলা হইয়াছে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে

তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

জ্ঞানবাদী মহাপঞ্চক, কর্মবাদী শোণপাংশু ও ভক্তিবাদী দর্ভকের কাছে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত।১ নাটকের গোড়া হইতেই এই গুরুর আগমন সম্বন্ধে একটি উৎকণ্ঠিত কৌতূহল জাগ্রত করিয়া রাখা হইয়াছে, সকলের কথায় ও ইঙ্গিতে তাঁহার আগমন সব সময় সম্ভাবিত হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে বাধার প্রাচীর সেখানেই গুরুর আবির্ভাব সেই প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য।২ মহাপঞ্চক অচলায়তন গড়িয়া না তুলিলে গুরুর যোদ্ধৃবেশে আগমনের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু এই যোদ্ধবেশই তাঁহার সমগ্র পরিচয় নহে। মহাপঞ্চকের কাছে তাঁহার শক্তিপরীক্ষা দিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সহজভাবে ধরা দিয়াছিলেন শঙ্খবাদক ও মালীর কাছে। অচলায়তনের আশ্রমিকদের মধ্যে একমাত্র শঙ্খবাদক ও মালী তাঁহাকে চিনিতে পারিল ইহার কারণ কি? অচলায়তনের আর সকলেই যখন শুষ্ক আচারের বালুপথে জীবনের ধারাকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল তখন সম্ভবত শঙ্খবাদক ও মালীই জীবনের সুর ও সৌন্দর্য সাধনা করিয়া চলিয়াছিল তাহাদের শঙ্খ ও ফুলের ভিতর দিয়া। সেজন্য বোধ হয় একমাত্র তাহারাই চিনিতে পারিল গুরুকে, মুক্ত জীবনকেই প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যাঁহার আবির্ভাব। গুরু যে মূর্তিতে অচলায়তন ধ্বংস করিলেন তাহা তাঁহার ছদ্মমূর্তি মাত্র। যিনি স্নেহ করেন তিনি শাসন করিতেও পারেন। গুরুর স্নেহ সংকীর্ণতা গ্রাহ্য করে না, মহাপঞ্চককেও তিনি স্নেহ করেন বলিয়া আঘাত করিয়া তিনি তাঁহাকে সংশোধন করিয়া লইলেন, ত্যাগ করিলেন না। অচলায়তনের প্রাচীর যখন ভাঙ্গিয়া গেল তখন গুরুর সহিত মহাপঞ্চকের আর কোন ব্যবধানই রহিল না। শত্রু হইয়াও মহাপঞ্চক গুরুর অন্তিম ক্ষমা লাভ করিল, কিন্তু মিত্র হইয়াও শোণপাংশুগণ তাঁহার পরিপূর্ণ প্রশ্রয় পাইল না, ইহার কারণ

১। শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশী জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয় সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা বিশেষ যুক্তিপূর্ণ— 'কবির মতে দাদাঠাকুর, গোঁসাই, গুরু—এই তিন মূর্তিতে মিলিয়া গুরুর সম্পূর্ণ রূপ; ইহাদের মধ্যে যে কোন একটিকে বাদ দিলেই তাঁহাকে খণ্ডিত করা হইল, কবি বলিতে চান জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তির সমন্বয়েই সাধনার সার্থকতা।

২। 'ইতিহাসে সর্বত্রই কৃত্রিমতার জাল যখন জটিলতম দৃঢ়তম হইয়াছে তখনই গুরু আসিয়া তাহা ছেদন করিয়াছেন—আমাদেরও গুরু আসিতেছেন—দ্বার রুদ্ধ, পথ দুর্গম, বেড়া বিস্তর, তবু তিনি আসিতেছেন—তাঁহাকে আমরা স্বীকার করিব না, বাধা দিব, মারিব, তবু তিনি আসিতেছেন ইহা নিশ্চিত।'

—'গ্রন্থপরিচয়'।

কি? ইহার কারণ এই যে, গুরুর পথ নিরপেক্ষ সত্যের পথ, নিঃসন্দিগ্ধ সামঞ্জস্যের পথ, অহং শুধু মহাপঞ্চকের নহে, শোণপাংশুদের মধ্যেও যে বিদ্যমান। সেজন্য তাহারা গুরুর খুব কাছে থাকিয়াও তাঁহাকে পুরাপুরি পায় নাই।১ গুরু মহাপঞ্চককেই শাসন করিলেন—শুধু তাহা নহে, তিনি শোণপাংশুদেরও সংযত করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন। কিন্তু দর্ভকরা কি গুরুকে ঠিকভাবে পাইয়াছিল? একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলিয়াছেন দর্ভকদের প্রতি কবি তেমন গভীর দরদ দেন নাই।২ কিন্তু নাটকখানি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়িয়া আমাদের ঠিক বিপরীত ধারণা হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, গুরু গোঁসাইরূপে দর্ভকদের কাছেই পরিপূর্ণ ভাবে ধরা দিয়াছিলেন। তাহারা মূর্খ, নির্ধন ব্রাত্যজাতি কিন্তু জীবনের মর্মবাণীটি বোধ হয় তাহারা খুঁজিয়া পাইয়াছিল; অচলায়তনের স্ফীতকায় জ্ঞানগরিমার সহিত তাহাদের লেশমাত্র পরিচয় নাই, তাহারা হাল্কাপ্রাণের খুশির ফুৎকারে জীবনের সব ভার বোঝা উড়াইয়া দিয়া নাচেগানে মাতাল হইয়া উঠে। আবার শোণপাংশুদের মত অবিরাম কর্মের পাকে ঘুরিতেও তাহারা চাহে না, সরস ভক্তিবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা পরম নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। কবির মনে যাহাই থাকুক, নাটকের মধ্যে কিন্তু এই ভক্তিপথই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এই দর্ভকরা তাহাদের অন্তরের ভক্তিধারা অবিরল অশ্রুপথে বহাইয়া দিয়াছে আর সেই অশ্রু-আকুতিকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া 'দীন পতিতের ভগবান' প্রসন্নচিত্তে তাহাদের মাঝে নামিয়া আসিয়াছেন। দাদাঠাকুর শুধু একা নহে, সকলকে লইয়া দর্ভকদের ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন এবং ইহাদের প্রতি সকলের সাগ্রহ স্বীকৃতি আদায় করিয়া লইলেন।৩

'অচলায়তনে'র তাত্ত্বিক ও কাব্যিক রূপ বাদ দিলেও ইহার একটি বাস্তব সমাজ-রূপ আছে, সেই সমাজ-রূপের মধ্যদিয়া কবির সমাজ-দৃষ্টি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্র নাথের সমাজ-দৃষ্টি সুচিন্তিত সমন্বয় ও সুব্যবস্থিত সামঞ্জস্যের মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। সেজন্য তাঁহার এক চোখ ভবিষ্যতে প্রসারিত অন্য চোখ অতীতে নিবদ্ধ, তাঁহার এক পদ অগ্রসর হয় আর এক পদ আঁকড়াইয়া থাকে, তাঁহার এক হাত রুদ্রের ত্রিশূল দিয়া ধ্বংস করে, অপর হাত বিষ্ণুর সুদর্শনদ্বারা রক্ষা করে। তিনি অচলায়তন শুধু ভাঙেন নাই, তিনি তাহা গড়িয়াও তুলিয়াছেন। মহাপঞ্চক বাঁধন জড়ায় ও পঞ্চক বাঁধন কাটে, কিন্তু তবুও তাহারা দুই ভাই, ভাইয়ে ভাইয়ে মিলনই তো কবির আকাঙ্ক্ষিত। বিদ্যাবুদ্ধি, মান-

১। দাদাঠাকুর। হুটোপাটি করলেই কি কাছে পাওয়া যায়। কাছে আসবার রাস্তাটা কাছের লোকের চোখেই পড়ে না।

—অচলায়তন, পৃঃ ৫৫।

২। 'আমার মনে হয়, এই নাটকের মধ্যে দর্ভকগণ অর্থাৎ ভক্তিমার্গ কতক পরিমাণে যেন সমস্যা পূরণের জন্যই আনীত হইয়াছে, অন্য দুটির প্রতি কবির যেমন দরদ, ইহার প্রতি দরদ তেমন গভীর নয়।'

রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ—প্রমথ বিশী, পৃঃ ৭৬।

৩। দাদাঠাকুর। সব এখানে রাখ। এসো ভাই পঞ্চক, এসো আচার্য অদীনপুণ্য—নূতন আচার্য আর পুরাতন আচার্য এসো, এদের ভক্তির উপহার ভাগ করে নিয়ে আজকের দিনটাকে সার্থক করি।

মর্যাদার আত্মস্ফীত অহংকারে মত্ত হইয়া যখন আমরা এক সংকীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে নিজেদের বদ্ধ করিয়া রাখি তখন আলো ও রসের অভাবে আমাদের জীবন জীর্ণ হইয়া আসে। কিন্তু অগণিত প্রাণের চাপে যেদিন সেই মোহলালিত বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া পড়ে সেদিন হয় নব আয়তনের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু তখন আর অচল আয়তন নহে, সচল আয়তন। সেই আয়তনে সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে মানুষের প্রাণের ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা। কবি সেই প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ দেখাইয়াছেন কিন্তু তাহা রহিয়াছে দূরে, কবির স্বপ্নভরা ভবিষ্যতের মর্মস্থলে।

॥ ডাকঘর (১৩১৮) ॥ রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকগুলির মধ্যে 'ডাকঘর' সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। একটী সৌন্দর্যপিয়াসী, সুদূরবিলাসী চিত্তের আর্তি ও বেদনা নাটকখানির মধ্যে বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে। অমল যেন রুদ্ধগৃহবাসী বালক রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিরূপ। সৌন্দর্যময়, রহস্যময় বাহির শতলক্ষ বাহু প্রসার করিয়া আকুল আহ্বান জানাইতেছে, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া অমল যেন বলিতেছে—

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী,
দিন চ'লে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী।
আমি সুদূরের পিয়াসী।

কবি 'জীবনস্মৃতি'তে বলিয়াছেন যে ছেলেবেলায় জীবন ও জগতের রহস্যরসে মন মাতিয়া থাকে, পরিচিত দৃশ্যবস্তুর মধ্যে অদ্ভুত ও রহস্যময় বিষয়ের সন্ধানে মন ঘুরিতে থাকে।১ অমলের কাছেও সেইরূপ সাধারণ ও সচরাচর-দৃষ্ট ব্যাপারগুলি পরম রহস্যদ্যোতক, এবং অজানা, অচেনা অনন্ত পথের সূচক বলিয়া মনে হয়। সৃষ্টির এইরূপ রহস্য জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা জানা যায় না, বহু পুঁথিপড়া কবিরাজ ইহার কোন সন্ধান পায় নাই, কিন্তু অমল পাইয়াছে। শিশুকালে সংসারের সহিত সম্পর্ক শিথিল এবং ভগবানের সহিত যোগ গভীর থাকে, সেইজন্য শিশু যে সত্যবোধ লাভ করে বয়স্কলোক তাহা পারে না। রাজার চিঠি অমলের কাছেই আসে, মোড়লের মত সংসারিক লোক তাহা না বুঝিয়া পরিহাস করে। স্থূল বিষয়-লিপ্ত মাধব দত্ত রাজার কাছে পার্থিব ধনসম্পদ লাভ করিতে চায়, কিন্তু অমল চায় ডাকহরকরার কাজ লইয়া নব নব রূপ-রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে। যে দেহ-খাঁচার মধ্যে অমল আবদ্ধ ছিল, অবশেষে মৃত্যুর মধ্যে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহার সৌন্দর্যপিপাসু

১। 'ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা যাইবে তাহার ঠিকানা নাই এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কী আছে বলো দেখি। কোনটা থাকা যে অসম্ভব তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।'
'জীবন-স্মৃতি', পৃঃ ২০-২১।

চিত্ত অখণ্ড, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের সন্ধান পাইল, মৃত্যুর পারে সব রহস্যের তলে এতদিনে সে পৌঁছিতে পারিল।

অমলের আকুতি ও ব্যাকুলতা একটা গভীর তত্ত্বব্যঞ্জক হইলেও শিশু-চরিত্রের কৌতূহলী রহস্যপ্রিয়তা তাহার ভূমিকাকে বিশেষ সরস করিয়া তুলিয়াছে। সে একদিকে মাধব মোড়ল, কবিরাজ প্রভৃতি দ্বারা এবং অন্যদিকে ঠাকুরদা ও সুধার দ্বারা আকর্ষিত হইয়াছে। এই সব চরিত্রের দ্বন্দ্বে নাটিকাখানি রূপকতত্ত্ব সত্ত্বেও যথেষ্ট নাট্যরসাত্মক হইয়াছে।১ শেষের দিকে রাজদূত, রাজ কবিরাজ, সুধা প্রভৃতির আগমনে আমাদের মন কৌতূহলে কম্পমান হইয়া থাকে।

॥ ফাল্গুনী (১৩২২) ॥ 'ফাল্গুনী' 'পূরবী'-'বলাকা' যুগের নাটক। বাংলার কবি নোবেল প্রাইজ পাইয়া বিশ্বকবি হইয়া উঠিয়াছেন। 'গীতাঞ্জলি' পর্বের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাময় পথ অতিক্রম করিয়া তিনি পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ ও গতিবাদের পথে পরিক্রমণ করিতেছেন। স্থবিরের শাসননাশী বিদ্রোহী যৌবনের জয়গানে তাঁহার অন্তর বাহির মুখরিত। এই সময়ে তিনি 'ফাল্গুনী' নাটক রচনা করেন। এই নাটকে বসন্তের উচ্ছ্বসিত আনন্দ উৎসবের মধ্যদিয়া চির নবীনকে বন্দনা করা হইয়াছে। এই নবীন বার বার মৃত্যুর মধ্যে অবগাহন করিয়া পুনর্জীবন লাভ করে। 'যে সব পাতা ঝরে গিয়েছে—তারাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত তাহলে জরাই অমর হতো—তা'হলে পুরাতন পুথির কাগজে সমস্ত অরণ্য হল্‌দে হ'য়ে যেত। সেই শুকনো পাতার সরসর শব্দে আকাশ শিউরে উঠত, কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চির নবীনতা প্রকাশ করে —এই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না, তারা জরাকে বরণ ক'রে জীবন্মৃত হ'য়ে থাকে—প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।'

'ফাল্গুনী'র ভূমিকা রূপে একটী নাট্যদৃশ্য সন্নিবেশ করা হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এইরূপ দীর্ঘ প্রস্তাবনার মূল্য ও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।২ ইহার মধ্যে যে শ্লেষ ও ব্যঙ্গ আছে তাহাও অকারণ ও অর্থহীন। 'ফাল্গুনী'র মধ্যে বিচিত্র সৌন্দর্যময় বসন্তপ্রকৃতি এরূপ সুমধুর কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া প্রকাশ

১। 'কিন্তু অমলের সঙ্গে সঙ্গে মাধব দত্ত, ঠাকুরদা, মোড়ল, সুধা প্রভৃতি যে মানুষগুলিকে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যে নানা বৈচিত্র্য আছে। কেহ বা অনুকূল, কেহ বা প্রতিকূল। সুতরাং ঐ মূল ভাবটুকুকে সূত্রের মত করিয়া এই সকল বৈচিত্র্যকে তাহার সহিত সম্মিলিত করিয়া একটি স্ফটিকব্যূহ রচনা করিতে হইয়াছে। এই বিচিত্রতার সমাবেশেই তো নাট্যরস।'

'কাব্য পরিক্রমা'—অজিত চক্রবর্তী, পৃঃ ৫০।

2. But if the main plot must be judged adversely, far more decided must be the opinion pronounced against the long prologue. This is of the very quintessence of thinness, a gossamer which no fairies have woven but the spiders of a very dusty room.' *Rabindranath* by Thompson, P. 251.

পাইয়াছে যে ইহার নাটকীয় অংশ ভালো পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। নাটকখানি আমাদের সম্মুখে যেন এক পরম রমণীয় নন্দনকানন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। সেই কাননে অসংখ্য তরুলতা নবীন শ্যামলিমায় উজ্জ্বল করিয়া উঠিয়াছে, রাশি রাশি পুষ্প স্তবকে স্তবকে ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে স্তরে স্তরে মধু সঞ্চিত হইয়া আছে, আকাশে পরাগ উড়িতেছে, মধুকরের পরিতৃপ্ত গুঞ্জনে সবদিক ভরপুর—এইখানে একদল বাঁধন-ছেঁড়া প্রকৃতি-পাগোল ছেলে-বুড়োর দল আসিয়া নৃত্যগীতে মাতিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কে আসিল, কে গেল, কাহার সহিত কাহার ঠোকাঠুকি লাগিল তাহা ভ্রূক্ষেপ করিয়া দেখিবার সময় নাই। সুতরাং ইহাদের দ্বারা নাটক জমিতে পারে না, এবং জমেও নাই। ইহার ভাবরাশি ভাসমান শৈবালদামের ন্যায় তরল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, কোনো জটিল আবর্তের মধ্যে ঘূর্ণিত হয় নাই। বসন্তের সমীরণের ন্যায় সমস্ত চরিত্রের গতি একদিকেই ছুটিয়াছে। দাদার ন্যায় অবসিতপ্রায় দুর্বল শীর্তের হাওয়া তাহার কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

॥ মুক্তধারা (১৩২৯) ॥ 'মুক্তধারা'য় রবীন্দ্রনাথ যান্ত্রিকতা এবং হিংসাত্মক জাতীয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় রবীন্দ্রনাথও বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বাহন যান্ত্রিকতাকে কোনোদিন সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন যে, মানুষ এই যান্ত্রিকতার পূজক হইয়া পরস্পরের মধ্যস্থ আত্মিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে, পাশ্চাত্যের দিকে তাকাইলে ইহা ভালোভাবেই বুঝা যাইবে।১ এই যান্ত্রিকতার আশ্রয় লইয়া পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ক্রমাগত শক্তি এবং সম্পদ লাভ করিয়া উগ্র জাতীয়তাবাদী হইয়া উঠিতেছে। কবি তাঁহার 'Nationalism' গ্রন্থে এই বিকৃত জাতীয়তাবাদের চাকচিক্যময় খোলসটী অনাবৃত করিয়া ইহার কদর্য রূপটী উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন।২ উত্তরকূটের লোকদের মধ্যে এই জাতীয়তাই বাসা বাঁধিয়াছে। যান্ত্রিক উপায়ে শিবতরাইএর লোকদিগকে বঞ্চিত এবং নিঃস্ব করিয়া ইহারা অপরিমিত লিপ্সাকে অবারিত প্রশ্রয় দিয়াছে।

১। 'যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো ক'রে তোলায় পশ্চিম সমাজে মানব-সম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে। কেননা স্ক্রু দিয়ে আঁটা আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান ক'রে তুললে, অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃ প্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায়, সেই সৃষ্টি-শক্তি-সম্পন্ন বন্ধন শিথিল হোতে থাকে।'

'শিক্ষার মিলন।'

২। জাতীয়তাবাদী পাশ্চাত্য দেশসমূহকে উদ্দেশ করিয়া তিনি 'Nationalism' গ্রন্থে বলিয়াছেন—'It is the continual aud stupendous dead pressure of this inhuman upon the living human under whlch the modern world is groaning. Not merely the subject races, but you who live under the delusion that you are free, are every day sacrificing your freedom and humanity to this fetich of nationalism, living in the dense poisonous atmosphere of world-wide suspicion and greed and panic.'

*Nationalism*, P. 26.

'মুক্তধারা'র মধ্যে মানব-সমাজের তিনটি স্তর-বিভাগের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, এরূপ স্তর-বিভাগ সম্বন্ধে কবির কোন সজ্ঞান মানস-চেতনা ছিল কিনা জানি না, কিন্তু নাটকের তত্ত্ব-রহস্য উদঘাটন করিতে যাইয়া ইহার আলোচনা অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রণজিৎ, বিভূতি ও অভিজিৎ এই তিনটি চরিত্র সম্ভবত তিনটি স্তরের প্রতীক। রণজিৎ রাজ-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিনিধি। কিন্তু যন্ত্র ও শিল্পতন্ত্রের আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন রাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় বিভূতির সর্বময় ও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব—সমাজ ও রাষ্ট্র তাহার করে শাসিত, রাজা তো তাহার হাতের নিরুপায় সাক্ষী মাত্র। রণজিতের যুগ গিয়াছে, বিভূতির যুগ চলিতেছে, কিন্তু এই মদমত্ত নিষ্প্রাণ যন্ত্রশক্তির পদতলেই কি চিরতরে মানুষ তাহার মনুষ্যত্ব বিলাইয়া দিবে? না, তাহা কখনও হইতে পারে না। এই প্রাণঘাতী দুঃশাসন শক্তিরও পরাজয় ও পরিবর্তন ঘটিবে। তখন যুগ যুগান্তের নিপীড়িত মানবাত্মা মুক্তির মন্ত্রে জাগরিত হইয়া উঠিবে, সুখ ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা হইবে ধরণীতে। অভিজিৎ তো সেই অনাগত সমাজের অগ্রদূত। অভিজিৎ প্রাণ দান করিয়াছে, কত শত অভিজিৎকে এইভাবে প্রাণদান করিতে হইবে, কিন্তু তাহাদের মৃত্যুর মধ্যদিয়া উদয়ের পথে জ্যোতির্ময় আশার বাণী ফুটিয়া উঠিয়াছে। দিকে দিকে মুক্তধারার উতরোল কলরব শোনা যাইতেছে, পথে-প্রান্তরে আজ অম্বা ও বটুর দল ক্ষিপ্ত হইয়াছে। বিভূতির পতনের আর বিলম্ব কত?

যন্ত্র যে মানুষকে কতখানি দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে তাহার প্রমাণ উত্তরকূটের লোকেরা। তাহারা দেবতার পদে যন্ত্রকে বসাইয়াছে, কিন্তু এ যে দেবতা নহে, অপদেবতা সে শুভবুদ্ধি এখন আর তাহাদের নাই। 'মানুষের দেবতারে ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে'—তাহাকেই আজ তাহারা ত্রাতা ও ভাগ্যবিধাতা রূপে বরণ করিয়াছে। এই অপদেবতা তাহাদিগকে দিয়াছে কলুষিত সাম্রাজ্যবাদ—জীবনকে বাঁধিবার উপায় আর মানুষকে মারিবার অস্ত্র। এই সাম্রাজ্যবাদই তো আজ যন্ত্রবাদী পাশ্চাত্য জাতিগুলির উগ্র জাতীয়তাবাদের আড়ালে থাকিয়া বিশ্বের চতুর্দিকে তাহার অশুভ বাহু বিস্তার করিতেছে। শিবতরাইয়ের লোকেরা পরাধীন শোষণক্লিষ্ট মানুষের প্রতিনিধি। তাহাদের সহিত ভারতবাসীদের তুলনা করিলে অসঙ্গত হইবে না। ভারতের অধিবাসীরাও কি শিবতরাইয়ের লোকদের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অনুকম্পার উপর নির্ভর করে নাই? তাহাদের জীবনধারাও কি যন্ত্রবাদী, শিল্পসমৃদ্ধ পাশ্চাত্য শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই? উত্তরকূটের বিরুদ্ধে শিবতরাইয়ের যে সংগ্রাম তাহার সহিতও ভারতের অহিংস সংগ্রামের সুস্পষ্ট মিল রহিয়াছে। শিবতরাইয়ের নেতা ধনঞ্জয় বৈরাগীও যে মহাত্মা গান্ধীর অবিকল অনুকৃতি তাহাও কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। অবশ্য ধনঞ্জয় বৈরাগীকে নাটকে যে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে তাহাদ্বারা অহিংস সত্যাগ্রহের বিশদ ব্যাখ্যা হইলেও নাটকের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই। নাটকের মূল সংগ্রাম বিভূতি ও অভিজিতের মধ্যে, তাহার মাঝখানে ধনঞ্জয় বৈরাগী আসিয়া পড়াতে

মূল গতিবেগ যেমন বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তেমনি অভিজিতের চরিত্রও অনেকখানি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অভিজিতের সংগ্রামও শিবতরাইয়ের লোকদের লইয়া, সুতরাং ধনঞ্জয়ের সংগ্রাম-উদ্দেশ্যের মধ্যে বৈচিত্র্য কোথায়? ধনঞ্জয়ের গানগুলিও যেমন অগুণ্য তেমনি অনাবশ্যক। অনেক সময় মনে হয় কবি তাঁহার গানকে নাটকীয় ক্রিয়ার অনুগামী না করিয়া নাটকীয় ক্রিয়াকেই গানের অনুগামী করিয়া ফেলিয়াছেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী আদর্শ মহামানুষ, কিন্তু তবুও ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, তাঁহার অংশ নাটকের মধ্যে দুর্বল এবং বোধ হয় ইহাই নাটকের মধ্যে একমাত্র দুর্বল অংশ।

যন্ত্র ও জীবনের সংঘাতই 'মুক্তধারা' নাটকের মুখ্য প্রাণবস্তু। এই দুই শক্তির রূপায়ণ হইয়াছে বিভূতি ও অভিজিৎ চরিত্রে। বিভূতির শক্তির প্রকাশ তাহার অহংকৃত স্পর্ধায় আর অভিজিতের শক্তির প্রকাশ তাহার হিতার্থী আত্মত্যাগে, বিভূতির উল্লাস জীবনের বন্ধনে আর অভিজিতের গৌরব জীবনের মুক্তিতে। বিভূতি বাঁচিয়াও পরাজয়ের মৃত্যু লাভ করিল কিন্তু অভিজিৎ মরিয়াও চিরকালের জন্য বাঁচিয়া রহিল। অভিজিৎ মুক্তধারার সন্তান, এই মুক্তধারার কাছে সে পাইয়াছিল জীবনের আবেগ ও আদর্শ—'Both law and impulse' ১। সেজন্য সে মুক্তিপথের চিরযাত্রী, সে নিজেই বলিয়াছে, 'আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁছেছে।' নন্দিসঙ্কটের পথ কাটা হইতে অভিজিতের সংগ্রাম সুরু হইল এবং এই সংগ্রামের পরিপূর্ণ সিদ্ধি সে লাভ করিল মুক্তধারার রুদ্ধ পথকে মুক্ত করিয়া দিয়া। ইহাতে কি তাহার মৃত্যু হইল? ইহা তো মৃত্যু নয়, ইহা যে মায়ের কোলে সন্তানের প্রত্যাবর্তন। সন্তানের এত বড় মুক্তি-সাধনার পর মা তাহাকে আর দূরে রাখিতে পারিল না, নিজের স্নেহ-শীতল বুকের মধ্যে টানিয়া লইল।

এই নাটকে আর একটি শক্তি আছে, তাহা হইল দেবশক্তি। যন্ত্র মানুষকে করিয়াছে অবহেলা আর দেবতাকে করিয়াছে অপমান। আজ তাহার স্পর্ধিত আস্ফালন মন্দিরের চূড়াকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। মোহভ্রান্ত মানুষ আজ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দেবতাকে উপলক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছে। সে ভাবিতে ভুলিয়াছে যে, দেবতা সৃষ্টি করেন আর যন্ত্র করে সংহার; দেবতা জল দেন আর যন্ত্র সেই জল বাঁধে। দেবতা প্রথমে নীরব থাকিয়া যন্ত্রের স্বৈরলীলা সহিয়া যান, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার জাগিবার পালা। তখন ভৈরবের জটাজূট কাঁপিয়া উঠে, তাঁহার ঘূর্ণিত লোচন হইতে প্রলয়বহ্নি নির্গত হয় এবং তাঁহার হস্তধৃত ত্রিশূল শূন্যে আস্ফালিত হইতে থাকে। ভৈরবপন্থীদের স্তবের মধ্যে যে ব্যথাতুর অসহায় মানুষের আবাহন ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই আবাহন কি বৃথায় যাইবে? কখনই নহে। সেই আবাহনে শঙ্কর রুদ্র হইয়া সাড়া দিবেন। তখন মুক্তধারার জল-

---

১। অভিজিৎ। মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অন্তরের কথা আছে ঐ মুক্তধারার মধ্যে'।

কল্লোলে প্রলয়-পয়োধি জলের মত্ততা ফুটিয়া উঠিবে আর যন্ত্রের অহংকৃত চূড়াটি খসিয়া সেই জলের তলায় আশ্রয় লইবে।

যন্ত্রের নির্মিতি যতই জোরালো ও মজবুত হউক না কেন তাহার মধ্যে ছিদ্র কিন্তু রহিয়া গিয়াছে। বিভূতি এই ছিদ্রের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল। যে ভয়ঙ্কর তাহারও ভয় আছে, কারণ এই ছিদ্র যত সামান্যই হউক ইহার ভিতর দিয়া যে তাহার রুষ্ট অদৃষ্টের অভিশাপ পথ করিয়া লইবে। অম্বার বুকফাটা কান্না ও বটুর নিষ্ফল আক্রোশ এই ছিদ্রপথে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিভূতির অনুবর্তীদের সন্দেহ ও বিদ্রোহ এই পথে প্রশ্র পাইয়াছে। বিভূতির আঘাত আসিল তাহার নিজের লোকেদের কাছ হইতে ইহা অপেক্ষা যন্ত্ররাজের শোচনীয় পরাজয় আর কি হইতে পারে?

'মুক্তধারার' মধ্যে তত্ত্ব থাকিলেও তাহা নিশ্চল তত্ত্ব হইয়া পড়ে নাই। সচল ক্রিয়াবেগের মধ্য দিয়া তাহা প্রাণবন্ত রূপ লাভ করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তত্ত্ব ও নাট্যের যেরূপ পরিপূর্ণ মিলন এই নাটকে ঘটিয়াছে তাহা 'রাজা' ছাড়া অন্য কোন সাঙ্কেতিক নাটকে দেখা যায় নাই।১ 'মুক্তধারা'র মধ্যে কোন অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ নাই। অথচ কবি সুকৌশলে বিভিন্ন চরিত্রকে পর পর আনিয়া একটি অবিরাম ঘটনার ক্রমিক বিন্যাস দেখাইয়াছেন। নাটকের সব দৃশ্যই পথে ঘটিয়াছে এবং পথের মধ্যে রহিয়াছে চলার ইঙ্গিত, গতির নেশা। সেখানে পথচারীর মিলন ও সংঘাত নিত্যই ঘটিতেছে।২ এই মিলন-সংঘাতের দ্বন্দ্ব-জটিল ক্রিয়াবেগে নাট্য-ধারার মধ্যে উঠিয়াছে আবর্ত ও কল্লোল। একদিকে বিভূতি ও উত্তরকূটের লোকেরা আর অন্যদিকে অভিজিৎ, ধনঞ্জয় ও শিবতরাইয়ের প্রজারা। এই সংঘাত ভাবের আকাশে বাষ্প হইয়া যায় নাই, বাস্তব মাটিতে কায়িক রূপ লাভ করিয়াছে। মানুষের যে দুঃখ নাটকের মধ্যে ফুটিয়াছে তাহারও একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, মানব রসাশ্রিত রূপ আছে। মানুষের যে কান্না ইহাতে স্থান পাইয়াছে তাহাতে যথার্থ কান্নাই আছে, কান্নার বিলাস নাই। অভিজিতের মৃত্যু নাটকের মধ্যে সত্য সত্যই ঘটানো হইয়াছে, এখানেও কোন ফাঁকতাল নাই। রণজিতের মানসবেদনাও খুব বাস্তব ও জীবন্ত। একদিকে বিভূতির প্রতি নিরুপায় পক্ষপাতিত্ব অন্যদিকে অভিজিতের প্রতি একটি গভীরতর গোপন আকর্ষণ—এই দ্বিমুখী প্রবণতার দ্বন্দ্বে তাঁহার চরিত্র সজীব কারুণ্য লাভ করিয়াছে।

'মুক্তধারার' রসদ্যোতনার অনবদ্য কুশলতার পিছনে রহিয়াছে পরিবেশ-সৃষ্টিতে কবির অসাধারণ কৃতিত্ব। তিনি বিভিন্ন প্রতীক ও ধ্বনির দ্বারা দর্শকের মনের মধ্যে অবিরাম এক রহস্যরসের দোলা দিয়া গিয়াছেন। প্রথমেই দেখা যায় অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথা ও ভৈরব মন্দির চূড়ার ত্রিশূল। এই দুইটি প্রতীক নাটকের অজানিত তত্ত্বকে এক মুহূর্তেই আমাদের মনের রহস্য-দ্বারে সম্ভাবিত করিয়া তোলে। তারপর মুক্তধারার জলকল্লোল,

১। টমসন সাহেব এই নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'It is the greatest of his symbolical plays.

২। কবি এই নাটকের নাম প্রথমে 'পথ' রাখিয়াছিলেন তাহা স্মরণীয়।

অশ্বায় বুকফাটা আহ্বান—স্থমন, স্থমন এবং সর্বোপরি ভৈরবপন্থীদের উদাত্ত-গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ—ইহাদের মধ্য দিয়া যে আশা-আশঙ্কা-উদ্বেল রহস্য-পরিবেশ গড়িয়া উঠে তাহা আমাদের চিত্তের উপর এক অবিচ্ছিন্ন প্রভাব-জাল বিস্তার করিয়া রাখে।

॥ রক্তকরবী (১৩৩১) ॥ 'রক্তকরবী' নাটকখানি রূপক নয় ইহাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, অথচ তিনি নিজেই রামায়ণের কাহিনীর সহিত ইহাকে তুলনা করিয়া ইহার রূপক তত্ত্বটী বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নাটকের প্রস্তাবনায় কবি বলিয়াছেন—'কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় ক'রে দিচ্ছে। 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীও এক অতিকায় অজগরের ন্যায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত ক্ষুদ্র মানবাত্মাগুলিকে গ্রাসে গ্রাসে তাহার গহ্বরের মধ্যে চালান করিয়া দিতেছে, তাহাদের বাহিরে আসিবার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। পতঙ্গ যেমন বহ্নির রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে নিজেদের সর্বনাশ সাধন করিয়া বসে, পল্লীর স্বাধীন কৃষীও তেমনি আপাত লোভনীয় ধনকণার আকর্ষণে নিজেদের রক্তলোভী যন্ত্র-দানবের কাছে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে।১

আধুনিক জড়বাদী বিশ্বসভ্যতার দুই অঙ্গ—যন্ত্র ও ধনতন্ত্র, এই দুই অঙ্গ পরস্পরের পরিপূরক এবং ইহাদের মিলিত রূপ, অর্থাৎ যান্ত্রিক ধনতন্ত্র হইতে যে বস্তু-শক্তির উদ্ভব তাহা জড়বাদী বিশ্বের উপর সর্বগ্রাসী ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছে। এই বস্তু-শক্তি মাটিকে পাষাণ আর মানুষকে পুতুল করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার দানবীয় বাহু যখন প্রসারিত হয় রাজনৈতিক জগতের দিকে, তখন স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত লাগে, এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের সংগ্রাম সুরু হয় আর ধরাতলে নামিয়া আসে রক্তস্রাবী সর্বনাশের বীভৎস মারীলীলা। বিগত দুইটি যুদ্ধে আমরা তো এই লীলাই দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ এই মদমত্ত বস্তুশক্তির বিরুদ্ধে চিরকাল তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। এ প্রতিবাদ মানুষের—মানুষের প্রেম ও প্রাণের। 'মুক্তধারা'র মধ্যে যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর 'রক্ত-করবী'র মধ্যে প্রতিবাদ রহিয়াছে পুঞ্জীভূত ধনের বিরুদ্ধে। এই ধনের আকর্ষণে মানুষ ধানের কথা ভুলিয়াছে, লক্ষ্মীর আসন ফেলিয়া কুবেরের আগারের দিকে ছুটিতেছে। এই আকর্ষণ অশুভ হইলেও সত্য, কারণ ইতিহাসের অনিবার্য কারণ-পরম্পরা হইতে ইহার উদ্ভব। পশুচারণ-যুগ হইতে কৃষিযুগ এবং কৃষিযুগ হইতে শিল্পযুগ—এগুলি সভ্যতার ক্রমিক ঐতিহাসিক স্তর। শিল্পবিপ্লবের পর হইতে সমগ্র বিশ্ব-জগতে যন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ হইতেছে, মৃত্তিকাপ্রাণ মানুষ ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিক সত্তার দ্বারা অধিগত হইতেছে, ব্যক্তি-মানুষ শ্রেণী-মানুষে পরিণত হইতেছে। বর্তমানে যাঁহারা মানুষের মুক্তি চান তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মানুষের অর্থনৈতিক সত্তাকে পুরাপুরি আঁকড়াইয়া ধরিয়া অর্থের উৎপাদন ও

১। 'কৃষী যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটী গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটীর ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন?' 'প্রস্তাবনা'—রক্তকরবী।

বণ্টনের মধ্যেই আমূল পরিবর্তন আনিতে চাহেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি অর্থনৈতিক চেতনা হইতে মানুষের প্রাণকে মুক্ত করিতে চান, সোনারখনি হইতে দূরে, ধূমশ্বসিত কারখানার বাহিরে যেখানে মাটির 'পরে সোনার আসন পাতা, কারখানার ধূম যেখানকার আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘে পরিণত সেখানে মানুষকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন। এই পথ কাহারও কাহারও নিকট পশ্চাৎপ্রসারী ও প্রতিক্রিয়াশীল মনে হইতে পারে, কিন্তু তবুও কবির পথ যে ইহাই তাহা অস্বীকার করা চলে না। তবে এ সম্বন্ধে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ অর্থবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অর্থকে কেবল অনর্থ বলিয়াও ভাবেন নাই। মানুষের প্রয়োজনে অর্থ, অর্থের প্রয়োজনে মানুষ নহে, ইহাই কবির মত। সোনার থলি যতক্ষণ মানুষের হাতে থাকে ততক্ষণ মানুষের কল্যাণ কিন্তু সেই থলি যখন বোঝা হইয়া মানুষের ঘাড়ে চাপে তখন হইতে সুরু হয় মানুষের দুর্গতি। এই দুর্গতি যক্ষপুরীর, এই দুর্গতি যক্ষপুরীর রাজার। যখন যক্ষপুরীর বন্দীশালা ভাঙ্গিয়া পড়িল আর রাজা বাহির হইয়া আসিলেন মুক্তিপথে তখনই এই দুর্গতির অবসান। তখন যক্ষপুরীর সোনা ছড়াইয়া পড়িল পৌষালি ধানের ক্ষেতে আর শিশির-ভেজা রোদের আঁচলে। তখন রাজার দানব-সত্তার মৃত্যু আর নির্জিত মানব-সত্তার পুনর্জন্ম। ধনতন্ত্রী অভিশাপ হইতে মানুষ বাঁচিল বটে কিন্তু বাঁচার জন্য আবার মরিতে হইল মানুষকে। যুগে যুগে এভাবে মানুষকে বাঁচাইতে মানুষ মরিয়াছে। যন্ত্রের হাত হইতে মানুষকে বাঁচাইতে অভিজিৎ মরিল আর স্বর্ণের হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে রঞ্জন ও নন্দিনী প্রাণ দিল।

'মুক্তধারা'র যন্ত্ররাজের সহিত 'রক্তকরবী'র যক্ষরাজের এইখানে পার্থক্য যে, যন্ত্ররাজ নির্দ্বন্দ্ব, নির্মানুষ জড়শক্তি মাত্র কিন্তু যক্ষরাজের মধ্যে জড় ও জীবনের দ্বৈতলীলা। সেজন্য যন্ত্ররাজের সংগ্রাম মানুষের সহিত কিন্তু যক্ষরাজের সংগ্রাম নিজের সহিত।[১] যক্ষপুরীর রাজা জালের আবরণের অন্তরালে অবস্থিত। এই জাল বহির্জগৎ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, প্রাণের লীলাভূমি হইতে নির্বাসিত করিয়া তাহাকে বন্দীশালায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আলো ও জীবন হইতে বঞ্চিত হইয়া সেই অন্ধকার বন্দীশালায় তাহার মানুষী সত্তার বিলোপ হইয়াছে এবং তাহার স্থলে এক অমানুষী দৈত্য যখের ধন আগলাইয়া বসিয়া আছে। এমন সময় জালের আবরণ ভেদ করিয়া এক ঝলক জীবনের আলোক সেই বন্দীশালায় প্রবেশ করিল। সেই আলোকের সঞ্জীবনী স্পর্শে মৃত মানুষটি আবার বাঁচিয়া উঠিল এবং তখন আরম্ভ হইল মানুষ ও দৈত্যের এক দারুণ লড়াই। অবশেষে মানুষটিরই জয় হইল, তবে সেজন্য আর একটি মানুষকে মরিতে হইল, সে হইল রঞ্জন। মানুষ ভাঙ্গিয়া ফেলিল দৈত্যের ধ্বজা। 'যার অজেয় শল্যের একদিক পৃথিবীকে অন্যদিক স্বর্গকে বিদ্ধ করেছে।' রুদ্ধ কারাগৃহের জাল ছিঁড়িয়া মানুষ বাহিরে আসিল কিন্তু তখন

১। 'আমার এই রূপায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি একদেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।' —'রক্তকরবীর' প্রস্তাবনা।

সে দেখিল, রাজা গিয়াছে কিন্তু তাহার রাজত্ব এখনও যায় নাই, সৈন্য ও সর্দার এখনও মোতায়েন। মানুষরূপী রাজার শেষ সংগ্রাম সুরু হইল তাহারই শক্তির বিরুদ্ধে। যন্ত্রী যদি যন্ত্রকে অপরিমিত প্রশ্রয় দেয় তাহা হইলে এমন এক সময় আসে যখন যন্ত্রই যন্ত্রীকে চালিত করে। এই ট্র্যাজেডি দেখা গিয়াছে যক্ষপুরীর রাজার মধ্যে। রাজার নিজের কথাতেই তাহা ব্যক্ত— ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না।' অধ্যাপক সাধন ভট্টাচার্য বলিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত প্রজাশক্তির সহিত রাজশক্তিকে মিলাইয়া দিয়া—সর্দারদিগকেই প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করাইয়াছেন এবং এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির মৌলিক বিরোধ নাই—আসল বিরোধ সর্দার সরকারের সঙ্গে।' এই মত যুক্তিসহ, তবে এ প্রসঙ্গে ইহাই বলা যায় যে, রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির বিরোধ নাই তখনই যখন উভয়ের মধ্যে মানুষী-সত্তার বিকাশ। রাজা মানুষ হইয়াই প্রজার সহিত মিলিত হইতে পারিলেন, যতক্ষণ রাজা ছিলেন ততক্ষণ পারেন নাই। আর সর্দারের সহিত রাজার অন্তিম বিরোধ হইলেও মূলত সর্দার রাজারই শক্তি। রাজা মানুষ বলিয়াই শেষ পর্যন্ত তাহার মনুষ্যত্বের মুক্তি, কিন্তু সর্দার তো যন্ত্রমাত্র। যন্ত্রের মুক্তি নাই, সে অন্তর্হিত দুর্বার শক্তির তাড়নায় অন্ধবেগে ছুটিয়া চলে, সে তখন তাহার চালককেও আর গ্রাহ্য করে না। এইজন্য নিজের শক্তিকে পর্যুদস্ত করিতে যাইয়া রাজাকেও বোধ হয় মরিতে হইল।

এই রাজাকে যে মানুষ করিল, অবরুদ্ধ যক্ষপুরীর মধ্যে যে আলোকের ঝরণা-ধারা বহিয়া আনিল, যাহার কথায় ও গানে নিষ্প্রাণ মানুষের মধ্যে প্রাণের পরশ জাগিয়া উঠিল সে কে? কোথা হইতে সে আসিল, কেন আসিল তাহা ঠিক কবি বলেন নাই। কিন্তু তাহার আগমনে নিয়মে-বাঁধা যক্ষপুরীর সব ওলট-পালট হইয়া গেল। মৃতের অন্তরে জীবনের কান্না মর্মরিয়া উঠিল। নন্দিনীর অপর কোন পরিচয় নাই, সে কেবল নারী, চিরন্তন নারী—'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' সে পুরুষের চিত্তে প্রেম, আনন্দ ও সৌন্দর্যের বাণী পৌছাইয়া দিল—'এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল, প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধন-জালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কি করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙ্গে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তা বর্ণিত আছে।' নন্দিনীর আভরণ রক্তকরবী। এই রক্তকরবী কিসের প্রতীক? পুষ্প প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক এবং রক্তবর্ণ ক্ষত ও বেদনার প্রতীক।১ রক্তকরবী বলিতে সাধারণভাবে প্রেম, সৌন্দর্য, আনন্দ সব-কিছু বুঝাইতে পারে কিন্তু আলোচ্য নাটকে রক্তকরবীর মধ্য দিয়া কবি বেদনারক্তিম প্রেমের কথাই বিশেষভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। যেখানে প্রেমের কোন ইঙ্গিত রহিয়াছে সেখানেই রক্তকরবীর

---

১। শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশীকে লিখিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের পত্র দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ—প্রমথ বিশী—পৃঃ ১৮৩

অবতারণা। প্রথমত কিশোর নন্দিনীকে ভালোবাসিত বলিয়াই তাহাকে সে রক্তকরবী ফুল দিয়াছিল, তারপর নন্দিনীর প্রতি রাজার আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ঐ রক্তকরবীর লোভের মধ্য দিয়া; অধ্যাপক এমন কি সর্দারের আসক্তিও ঐ রক্তকরবীর উপর। কিন্তু নন্দিনী এই রক্তকরবীর মঞ্জরী দিয়াছিল শুধু রঞ্জনকে। কিন্তু রঞ্জন তো একা সম্পূর্ণ নহে, বিশুকে লইয়াই সে সম্পূর্ণ, সেজন্য রঞ্জনের মৃত্যুর পর এই মঞ্জরী যখন ধূলায় লুটাইতেছিল তখন বিশু তাহা তুলিয়া লইল, নন্দিনীর প্রেমও সার্থকতা লাভ করিল।

রঞ্জন কে সে আলোচনা করা যাক। নন্দিনীর নামের মধ্যে যেমন তাহার স্বরূপ প্রকাশিত, রঞ্জনেরও তাহাই—মানুষের চিত্ত নন্দিনীর দ্বারা নন্দিত হয় আর রঞ্জনের দ্বারা হয় রঞ্জিত কিন্তু অর্থ একই। তবে নারীর নন্দিনীরূপের প্রকাশ প্রেম ও সৌন্দর্যের মধ্যে আর পুরুষের রঞ্জন রূপের প্রকাশ যৌবন ও শক্তির মধ্যে। শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশী বলিয়াছেন যে, 'রঞ্জন হইতেছে মানুষের বিশুদ্ধরূপ।' কিন্তু এই ব্যাখ্যা বোধ হয় আরও সূক্ষ্মতর ও পূর্ণতর হওয়া প্রয়োজন। রঞ্জন মানুষের পুরুষ রূপ আর নন্দিনী তাহার নারীরূপ। এই পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক আকর্ষণ যেমন নিত্য ও সনাতন ১ তেমনি উভয়ের মিলনেই মানুষের পরিপূর্ণ সত্য ও সার্থকতা। রাজা ও রঞ্জনের কোন মৌলিক প্রভেদ নাই (রাজা ও রঞ্জনের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও এক—রাজা—রঞ্জ+অন ও রঞ্জন—রঞ্জ—ণিচ+অন), কিন্তু রাজার উপর যে দৈত্যটি ভর করিয়া আছে তাহার সহিত রঞ্জনের বিরোধ। দৈত্যটি মানুষকে মারিল বটে তবে নিজেও সে মরিয়া গেল। কিন্তু মানুষ. মৃত্যুকে জয় করিয়া হইল মৃত্যুঞ্জয়।

কিন্তু একা রঞ্জনও বোধ হয় সম্পূর্ণ নহে, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। রঞ্জন ও বিশু জীবনের দুই দিক—একদিকে আলো ও আনন্দ অন্যদিকে দুঃখ ও রহস্য।২ বিশু নিজে বলিয়াছে—'আমি রঞ্জনের ও-পিঠ যে-পিঠে আলো পড়ে না—আমি অমাবস্যা।' রঞ্জন ও বিশুকে লইয়াই পুরুষের পূর্ণাঙ্গ রূপকে বরণ করিয়াই নন্দিনীর প্রেম সার্থক।

'মুক্তধারা'র ন্যায় 'রক্তকরবী'ও অঙ্ক ও দৃশ্য-বিরহিত নাটক। কিন্তু 'মুক্তধারা'র মধ্যে নাট্যকার যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র পর পর আনিয়া ক্রিয়া ও রসের বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছেন 'রক্তকরবী'তে সেরূপ কোন বৈচিত্র্য দেখা যায় না। 'মুক্তধারা'য় উন্মুক্ত পথের উপরে চরিত্রগুলিকে যথেষ্ট গতিশীল করিয়া তোলা হইয়াছে কিন্তু 'রক্তকরবী'তে সে সুযোগেরও অভাব।

১। নন্দিনী রঞ্জনের চূড়ায় নীলকণ্ঠ পাখীর পালক পরাইয়া দিয়াছিল। নীল রঙ অসীম ও অনন্তের দ্যোতনা বহিয়া আনে। কবির সঙ্কেত এই যে, রঞ্জন মরিতে পারে না, মরিতে পারে না রঞ্জন ও নন্দিনীর প্রেম। কবি কি এখানে মেটারলিঙ্কের 'নীল পাখীর কথা ভাবিয়াছেন?' Tyltyl যে নীল পাখীর সন্ধানে বাহির হইয়াছিল রঞ্জনও কি তাহাই—'The great secret of things and happiness চাহিয়াছিল?' নন্দিনী কি তাহার মৃত্যুর পর সেই আশাই পূর্ণ করিল?

২। 'বিশুর ভিতর দিয়া জীবনের অন্ধকারের দিক অর্থাৎ দুঃখের রহস্যের দিকটাই প্রতিভাত—যেমন রঞ্জনের ভিতর দিয়া জীবনের আনন্দের এবং আলোর দিক রূপায়িত?'

—রবীন্দ্রনাথ (২য় পর্ব)—অশোক সেন—পৃঃ ২০১

একটি বদ্ধ পুরীর জালাবরণের বহির্ভাগে এই নাটকের ঘটনা ঘটিয়াছে। এই নির্দিষ্ট ও সংকীর্ণ স্থানে সমগ্র ঘটনার অবতারণার জন্য স্বভাবতই নাটকের গতি মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়ত এই নাটকে নাট্যকার চরিত্রগুলির কথার সৌন্দর্যের দিকে যত দৃষ্টি দিয়াছেন গতির দিকে তত দৃষ্টি দেন নাই। সেই কথায় তারকার জ্যোতি আছে বটে কিন্তু প্রদীপের দাহ নাই। রূপক-শ্লেষ-বিরোধ প্রভৃতি অলঙ্কার সৌন্দর্যে, চিত্র ও সঙ্গীতের সরসতায় নাটকখানি একটি অনবদ্য কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে।

এই কাব্যরসের অত্যধিক আতিশয্যের আর একটি কারণ এই যে, নাটকের সমস্ত লক্ষ্য নন্দিনীর দিকে। নন্দিনী তো একটি রক্তমাংসের জীব নহে, সে যেন আকাশ হইতে খসিয়া-পড়া একটি আলোর ফোয়ারা, কোন অপার্থিব সঙ্গীতের একটি মূর্তিমতী ছন্দ। তাহার রূপে অন্ধকার পুরী আলোয় ঝলমল করিয়া উঠে, তাহার কথায় চারিদিকে খুশির বাতাস বহিতে থাকে, তাহার গানে মরা যক্ষপুরীর ইঁট-কাঠ-পাথরে নৃত্যের দোলা লাগিয়া যায়। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ যদিও ধনতান্ত্রিক অত্যাচারের বীভৎস-বিশ্রী রূপ দেখাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু নাটকের কোথাও সেই রূপ নাই। যক্ষপুরীর তলায় সোনা এবং ইহার উপরেও নন্দিনীর পরশমণি সব সোনা করিয়া দিয়াছে। বস্তুত অনুপ-উপমন্যু-শকলু-কঙ্কুর দৃশ্য ব্যতীত 'রক্তকরবী'র কোথাও যক্ষপুরীর প্রকৃত চেহারা নাই। চরিত্রগুলি কেহই যথার্থরূপে যক্ষপুরীর প্রতিনিধি নহে, সকলেই যেন নন্দিনী-বাইগ্রস্ত। রাজাকে আমরা গোড়া হইতেই তাহার রাজত্ব ত্যাগ করিয়া নন্দিনীর অনুগ্রহ পাইতে লালায়িত দেখিতে পাই। অধ্যাপক-মোড়লের তো কথাই নাই, এমন কি সর্দার পর্যন্ত রসিকতার দ্বারা নন্দিনীর মনোরঞ্জন করিতে ব্যগ্র। এইরূপ একমুখী প্রবণতার ফলে নাটকের মধ্যে বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত কোথাও তেমন বাস্তব রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। মহাপঞ্চক বিভূতি ও কাঞ্চীরাজের ন্যায় সবল মতনিষ্ঠ চরিত্র 'রক্তকরবী'তে নাই, সেজন্য নাট্যাংশে ইহা খুবই দুর্বল। 'রক্তকরবী'র নাট্যবেগ দেখা গিয়াছে শুধু কেবল দুইটি বিষয়ে—রাজার চরিত্র-দ্বন্দ্বে ও রঞ্জনের আগমন প্রত্যাশায়। রাজাকে আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাহার আবেগকম্পিত কথায় আমরা একটি দুর্দান্ত চরিত্রের দুষ্প্রতিরোধ্য হৃদয়-সংঘাত অনুভব করিতে পারি। বাস্তবিক বর্তমান ধনতন্ত্রী মানুষ বিশ্বের সব ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য হাতের মুঠায় পাইয়াও আসলে কত একক, কত অসহায়! তাহার অন্তরাত্মা আজ বস্তুর পুঞ্জ হইতে মুক্তি চায়, নিয়মের নিগড় হইতে মুক্তি চায়! রাজার আত্মধিক্কারে ও নবজাত মোহ-কামনায় ইহাই কি পরিস্ফুট হয় নাই? রাজাকে আমরা রঙ্গমঞ্চে দেখিতে পাই না বলিয়াই তাহার প্রতি আমাদের কৌতূহল আরও তীব্র ও আমাদের সমবেদনা আরও গভীর হইয়া উঠে। রাজার মত রঞ্জনও আমাদের চোখের সম্মুখে কখনও দৃশ্য হয় নাই, অথচ নন্দিনীর প্রতিটি কথাতেই রঞ্জনের সহিত মিলিত হওয়ার ইঙ্গিত। এজন্য রঞ্জন সম্বন্ধে দর্শকের মনের মধ্যে একটি সদাজাগ্রত দিদৃক্ষা বিরাজ করিতে থাকে। একটি চরিত্রকে কখনও রঙ্গমঞ্চে আনিয়া এবং তাহার মুখের একটি কথাও না শুনাইয়া তাহার সম্বন্ধে

সকলের মনে একটি অবারিত আবেগ-কৌতূহল সৃষ্টি করা যথেষ্ট নাট্যকৌশলের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু চরিত্রটিকে শেষ পর্যন্তও নাট্যকার উদ্ঘাটন করিলেন না, ইহার চতুর্দিকে একটি চিরন্তন রহস্যজাল রচনা করিয়া রাখিলেন।

॥ তাসের দেশ (১৩৪০) ॥ রূপকথার রাজপুত্র গিয়াছিলেন পাশাবতীর পুরে এবং আলোচ্য নাটকের রাজপুত্র চলিয়াছেন তাসবতীর দেশে। আবার রূপকথার সঙ্গে এই নাটকের সাদৃশ্য দেখাইয়া বলা যায় যে, রূপকথার অপর এক রাজকুমার অচিন দেশের ঘুমন্ত রাজ-কন্যাকে সোনার কাঠির পরশে জাগাইয়াছিলেন এবং আলোচ্য নাটকের রাজপুত্রও তাসের দেশের নির্জীব নিয়মবদ্ধ মানুষের মধ্যে যে নবীনা প্রাণ হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহাকে বাঁচাইতেই আসিয়াছে। রূপকথার রাজপুত্র মাত্রই অসাধ্য সাধনে ব্রতী, রাজপুরীর আরাম ও আদর উপেক্ষা করিয়াই দুর্গম, বিঘ্নসঙ্কুল পথের অভিযাত্রী। 'তাসের দেশে'র রাজপুত্রও তো লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া অলক্ষ্মীকে পাইবার জন্য ব্যাকুল; কারণ সে জানে 'ভীরু করেছে ঐ লক্ষ্মী। সাহস আছে লক্ষ্মীছাড়ার। যার বিপদ নেই তার ভরসা নেই।'

কবি তাসের দেশের রূপক কেন গ্রহণ করিলেন? লাল কাল উর্দিপরা তাসগুলি নিয়মের আবর্তে ঘুরিতেছে কিন্তু প্রাণের ছন্দে চলিতেছে না। তাহাদের চাল আছে কিন্তু চলন নাই। তাহারা চ্যাপ্টা, ভিতরে হাওয়া নাই বলিয়া তাহারা আগাইতে পারে না। তাহারা অতিমাত্রায় গম্ভীর এবং ব্রহ্মার হাই হইতে উৎপত্তি বলিয়া মাটির সহিত সম্পর্ক ইহাদের খুবই কম। রূপক অত্যন্ত স্পষ্ট। গৃহবদ্ধ ও গম্ভীর লোকেদের প্রতি কবির মনোভাব কি তাহা আমরা বার বার জানিয়াছি। এই নাটকেও সেই মনোভাব রূপকের ছদ্মবেশে ও বিদ্রূপের ভূষণে প্রকাশিত হইয়াছে। নামগুলি তাসের হইলেও লোকগুলি যে আমাদের দেশেরই তাহা বুঝাও কষ্টকর নহে।১ বস্তুত নাটকের পাত্র-পাত্রীদের তাসের নাম দেখিয়া তাহাদিগকে যে অদ্ভুত জগতের জীব মনে হয়। তাহাদের স্বভাব ও আচরণের মধ্যে সেই অদ্ভুতত্ব খুজিয়া পাওয়া যায় নাই। বিশেষত গানগুলির দ্বারা নাটকের জগৎ আমাদেরই পরিচিত রূপ-রস-সৌন্দর্যের জগৎ হইয়া উঠিয়াছে।

অন্যান্য নাটকের ন্যায় এই নাটকেও আশার আলোকিত পথে প্রাণের জয়শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ তাসের দেশের আকাশে একদিন নীল মেঘ জমিয়া উঠিল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ময়ুরের নাচ ও ভ্রমরের গুঞ্জনে নিয়মের রাজত্বে অনিয়ম দেখা দিল—সেই অনিয়মের প্রবল বন্যায় কুষ্টির বেড়া, সম্পাদকীয় স্তম্ভ আর আইনের জবরদস্তি সব ভাসিয়া গেল। তাসের দেশের রাণী তো আগেই পথিক রাজপুত্রের বশীভূত হইয়াছিলেন, শেষকালে রাজাও হইলেন। রাজপুত্রের জয় পূর্ণ হইল, জীবনের জয় সিদ্ধ হইল।

---

১। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য—'এই তাসের দেশ যে আমাদেরই সনাতনপন্থী দেশ তাহা না বলিয়া দিলেও কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইবে না।'

—রবিরশ্মি (২য় খণ্ড)—৩০৬।

## (ঙ) বিবিধ

'শোধবোধ' 'কর্মফল' গল্পের নাট্যরূপ। ইহাতে নকল সাহেবীয়ানাকে তীব্র ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, এবং খাঁটি প্রেম যে কেতাদুরস্ত আচার এবং চোস্ত চালচলনের সাপেক্ষ নয় তাহাই বলা হইয়াছে। শেষের দিকে মাসীর আশ্রয় প্রাপ্ত সতীশের জীবনে একটী জটিল সমস্যার উদ্ভাবন করা হইয়াছে। তবে মাসীর অন্যায় সত্বেও সতীশের ব্যবহারেও একটা উদ্ধত অকৃতজ্ঞতার ভাব দেখা গিয়াছে। শেষ দৃশ্য অতি মাত্রায় তরল উত্তেজনাকর হইয়া উঠিয়াছে, এবং ইহাতে এক জটিল সমস্যার যেন খুব আকস্মিক ও সুলভ সমাধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

॥ কালের যাত্রা (১৩৩৯) ॥ 'কালের যাত্রা' বইখানার মধ্যে দুইখানা নাটক আছে— 'রথের রশি' এবং 'কবির দীক্ষা'। 'কবির দীক্ষায়' নাটকীয় ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্র-সমাবেশ কিছুই নাই, সুতরাং ইহার আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। 'রথের রশি'র মধ্যে 'ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবানের লীলা দেখানো হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মন্ত্রবল, স্ত্রীলোকদিগের পূজা ও নৈবেদ্য, সৈনিকদের দৃপ্ত বাহুবল, এবং শ্রেষ্ঠী ধনপতির ধন-ঐশ্বর্যের ক্ষমতা যে রথ টলাইতে পারিল না তাহা শূদ্রদের স্পর্শমাত্রই সচল হইয়া উঠিল। মহাকালনাথ সবার পিছে, সবার নীচে সবহারাদের মাঝে আজ নামিয়া আসিয়া শূদ্রশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা আর কেহ বুঝিতে পারে নাই, কেবল বুঝিয়াছেন কবি, যিনি নিরন্তর বিশ্বের তাল ও ছন্দ রক্ষা করিয়া চলেন। 'রথের রশি'র ভাষা গদ্য হইলেও কবিতার ন্যায় মধুর ও ছন্দোময়।

॥ বাঁশরী (১৩৪০) ॥ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের শেষপর্যায়ের লক্ষণগুলি 'বাঁশরী'তে সুপরিস্ফুট। অর্থাৎ এই নাটকে কবির আত্মলীন মানসন্তর হইতে পরিবেশ স্থানান্তরিত হইল বস্তুতান্ত্রিক সমাজ-স্তরে, হৃদয়ের সরসতা অপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল মননের প্রখরতা, অনুভূতির ধারা শুকাইয়া আসিল বিতর্কের মরুপথে। নাটকের কথার প্রয়োজন চরিত্রসৃষ্টির জন্য, কীন্তু এই নাটকে কথার কারুকার্যের দিকে কবি যত দৃষ্টি দিয়াছেন, চরিত্রের সজীবতার দিকে তত দৃষ্টি দেন নাই। সেজন্য বাক্যের বোমায় চরিত্রের সম্ভাবনা উড়িয়া গিয়াছে। বাঁশরী সোমশঙ্করকে ভালোবাসে এবং সোমশঙ্করের হৃদয়েও বাঁশরী নিঃসপত্ন অধিকার। কিন্তু কি অনিবার্য অবস্থার তাড়নায় সোমশঙ্কর সুষমাকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করিল তাহা বোধগম্য নহে। পুরন্দর সুষমার প্রেম হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, সুষমা ও সোমশঙ্করকে মিলিত করিয়া দিলেন। সুষমা ভালোবাসে পুরন্দরকে আর সোমশঙ্কর ভালবাসে বাঁশরীকে, কিন্তু পুরন্দরের প্রয়োজনে তাহাদিগকে আত্মহত্যা করিতে হইল। কিন্তু এই আত্মহত্যার দ্বারা কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইল? পুরন্দর বলেন, প্রেমে মুক্তি, ভালোবাসায় বন্ধন। পুরন্দর ও সুষমার মধ্যে এই প্রেম থাকিতে পারে, সোমশঙ্কর ও বাঁশরীর মধ্যে এই প্রেম থাকিতে পারে, কিন্তু সোমশঙ্কর ও সুষমার সম্বন্ধের মধ্যে এই প্রেম কোথায়? সোমশঙ্করের মুখ দিয়া কবি যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও যুক্তিসহ নহে, 'এতদিনের তপস্যায় এই নারীর চিত্তকে তুমি

যজ্ঞের অগ্নিশিখার মতো ঊর্ধ্বে জ্বালিয়ে তুলেছে, আমারি 'পরে ভার দিলে এই অনির্বাণ অগ্নিকে চিরদিন রক্ষা করতে।' কিন্তু একটি নারীর চিতাগ্নি জ্বালাইয়া রাখিবার ভার সোমশঙ্কর নিল, ইহাতে তাহার প্রেম ও পুরুষত্ব কোনটাই প্রকাশ পাইল না। বাঁশরীর কথা সমর্থন করিয়া বলা যায়, পুরন্দর সোমশঙ্করের 'বুদ্ধিকে দিয়েছে ঘোলা করে, দৃষ্টিতে দিয়েছে চাপা।' কিন্তু এই সন্ন্যাসী-পুরুষটিকে নাটকের মধ্যে এতখানি অসাধারণ করিয়া তোলা হইয়াছে কেন, তাঁহার ব্রতসাধনার উদ্দেশ্যই বা কি? নাটকের মধ্য হইতে ইহার কোন উত্তর পাওয়া যায় না।১

সোমশঙ্কর ও বাঁশরীর প্রেমই নাটকের মূল সমস্যা, কিন্তু নাটকের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে সোমশঙ্কর নহে, ক্ষিতীশ। অথচ ক্ষিতীশের অন্তর আমাদের কাছে একেবারে অপ্রকাশিত হইয়াই রহিল, এমন কি বাঁশরীর অকৃতার্থ জীবনের নিত্যকার প্রয়োজনেও তাহার ডাক পড়িল না।

নাটকের অন্যান্য চরিত্রের নির্জীব শীতলতার মধ্যে বাঁশরী একমাত্র সজীবতার অগ্নিশিখা। সে নিছক 'আইডিয়া'র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে নাই। সকায়, সকাম জীবনের সহিতই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহিয়াছে। তাহার অভিমানের ইস্পাতের তলায় রহিয়াছে মর্মবেদনার মৃত্তিকা। তাহার শাণিত বৈদগ্ধ্য ও আক্ষেপহীন বিদ্রূপ ছদ্মবেশ মাত্র। সেই ছদ্মবেশে ঢাকা রহিয়াছে একটি প্রেম ও বেদনায় গড়া নারীমূর্তি। সেই নারীমূর্তি আত্মপ্রকাশ করিল সোমশঙ্করের সহিত শেষ সাক্ষাতকারের সময়। বিবাহ তাহার হইল না বটে, কিন্তু বিবাহের চেয়ে অনেক বড় যে প্রেম, সেই প্রেমের অমর স্বাক্ষর সে অন্তরের মধ্যে লাভ করিয়া ধন্য হইল।

॥ চণ্ডালিকা (১৩৪০) ॥ 'চণ্ডালিকা' নাটকখানির কাহিনী রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধসাহিত্যের অন্তর্গত 'শার্দুল কর্ণাবদান' হইতে গৃহীত। নাটিকাখানির মধ্যে নাটকীয় ভাব অপেক্ষা কাব্যময় ভাব অনেক বেশি পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাতে একই ঘটনা সংস্থাপনের মধ্যে প্রকৃতি ও তাহার মাতার কথোপকথন নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রকৃতির কথার মধ্য দিয়া তাহার প্রাণের আকুতি—আশা ও বেদনা এক অতি সকরুণ গীতোচ্ছ্বাসের ন্যায় মর্মরিয়া উঠিয়াছে। চণ্ডালিকার অত্যুগ্র আশা ও স্বপ্ন যখন সুগভীর অনুতাপ ও আত্মগ্লানির মধ্যে লুটাইয়া পড়িল তখন মনে হইল শত ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত বীণার তারগুলি যেন অকস্মাৎ ছিঁড়িয়া গেল, যেন শত শত দীপ্তিমান আলোক বর্তিকা এক দমকা বাতাসে নিভিয়া গেল।

১। 'পুরন্দর চরিত্রের চমক এত বেশি, এত বেশি রহস্যময় যে এই ধরণের বস্তু-ঘনিষ্ঠ সামাজিক নাটকে এতটা চমক এতটা রহস্য বস্তু-প্রত্যয়কে শিথিল করিয়া দেয়।' রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—নীহার রায়—১৬৮

# চতুর্থ অঙ্ক

## রবীন্দ্রোত্তর নাট্য-সাহিত্য

### (ক) ভূমিকা

বাংলা নাটকের চূড়ান্ত উন্নতি আমরা রবীন্দ্রনাথে লক্ষ্য করিয়াছি, বাংলা সাহিত্যের সর্বময় সমৃদ্ধি তাঁহার দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে শুধু মাত্র একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে একেবারে পরিব্যাপ্ত, সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বৃহৎ বনস্পতির ন্যায় তিনি এই সাহিত্যক্ষেত্রের সর্বত্র আচ্ছাদন করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরবে বিরাজ করিয়াছেন; তাঁহার সময়ে যে সমস্ত পাদপ এই ক্ষেত্রে জন্মলাভ করিয়াছে তাহারা এই বনস্পতির বীজ হইতে জাত, তাহারই ছায়াতে লালিত এবং শিকড়রসে পরিপুষ্ট। রবীন্দ্রনাথের এই সর্বগ্রাসী প্রভাবের ফলে তাঁহার সমসাময়িক কালে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর সাহিত্যিকের আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। কেবল উপন্যাস-ক্ষেত্রে কবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণতম বিকাশ দেখা যায় নাই, এবং সেইজন্যই উপন্যাস-জগতে অন্যতর যুগন্ধর প্রতিভা শরৎচন্দ্র এবং তাঁহার অনুবর্তিগণের অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছে, এবং তাঁহাদের দ্বারা উপন্যাস-সাহিত্য অশেষভাবে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাব্যজগতে তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিয়া কোনো সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই, এবং অদূর ভবিষ্যতেও পারিবেন কিনা সন্দেহ। নাট্যক্ষেত্রেও তাঁহার পরে খুব শক্তিশালী লেখকের উদ্ভব হয় নাই। যে নাট্যধারা এতদিন পূর্ণতোয়া নদীর ন্যায় চঞ্চল গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল, রবীন্দ্রনাথের পরেই তাহা শ্লথগতি, নিরুদ্ধ-স্রোত, বিশীর্ণ জলরেখায় পরিণত হইয়াছে। অবশ্য একথা বলিতেছি না যে রবীন্দ্রনাথের পরে ভালো নাট্যকার মোটেই জন্মান নাই। আধুনিক কালেও ২।৩ জন প্রকৃত প্রতিভাবান নাট্যকার আছেন বটে, কিন্তু তবুও একথা সত্য যে, বাংলা নাটকের পূর্ব গৌরব ও সমৃদ্ধি আর নাই। কি কারণে এরূপ হইল, ইহার জন্য বর্তমান নাট্যশালা ও দর্শকদের মানসিক চাহিদা কতখানি দায়ী, এবং বাংলা নাটকের পুনরভ্যুত্থান সম্ভব কিনা—এসব বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব। আমরা শুধু বিষণ্ণ নেত্রে লক্ষ্য করিতেছি যে বর্তমান কালে এমন কোনো নাট্যকার নাই যিনি সমগ্র নাট্য-জগৎকে অন্তত কিছুকালের জন্যও তন্মুখী এবং তদাশ্রয়ী করিতে পারিয়াছেন। আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে কেহও তাঁহার বিশিষ্ট ভাব, মত ও রীতির দ্বারা নাট্যজগতে কোনো যুগান্তকারী বিপ্লব আনয়ন করিতে পারেন নাই। দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারদের নাটকে অনেক দোষত্রুটি আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা যেমন সমসাময়িক কালে নাটকীয় আন্দোলন এবং মত্ততা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন, যেমন একখানির পর একখানি নাটকের দ্বারা রঙ্গজগৎকে নিত্য

নূতন রসে চঞ্চল, পরিতৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন আধুনিক কালে তেমনটি দেখা যায় না। যে মুষ্টিমেয় নাট্যকারবৃন্দ বর্তমানে নাটক লিখিতেছেন তাঁহাদের নাটকসমূহ সংখ্যায় অনধিক এবং রঙ্গমঞ্চে তাঁহাদের ২।১ খানা নাটক বিশেষ জনপ্রিয় হইলেও নাটকের মধ্য দিয়া নাট্যকার দর্শকবৃন্দের সহিত অন্তরঙ্গ যোগাযোগ লাভ করিতে পারেন নাই। আধুনিক এমন অনেক নাটক আছে, যাহাদের উপর প্রীতি ও প্রশংসা বর্ষিত হইলেও তাহাদের স্রষ্টার সহিত দর্শকদের মানস-পরিচয় নাই, এমন কি স্রষ্টার নাম পর্যন্তও তাঁহারা অবগত নহেন।

আধুনিক নাটকের দোষ ও দৈন্য থাকিলেও একটা বিষয়ে ইহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে, এবং তাহা হইতেছে যে, এই নাট্যসাহিত্য বর্তমান বিশ্বনাট্যধারার সহিত সম্পৃক্ত ও সাদৃশ্যযুক্ত। ইউরোপে যুগ-প্রবর্তক নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের পর হইতে নাটকের কলা ও রীতির আমূল পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। বাংলা সাহিত্যেও দ্বিজেন্দ্রলাল এবং বিশেষত রবীন্দ্রনাথের সময় হইতে প্রাচীন কঠোর বিধিবদ্ধ নাট্যকলা বর্জিত হইয়া ইবসেনীয় রীতি বহুলাংশে গৃহীত হইয়াছে। রবীন্দ্র-পরবর্তী নাট্য-সাহিত্যে ইউরোপীয় এবং রবীন্দ্র-রীতিই প্রায় সর্বত্র অনুসৃত হইয়াছে। যে সব বিশিষ্ট ভঙ্গী ও পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রথম দেখা গিয়াছে, বর্তমান নাট্যকারগণ সেইগুলি নিষ্ঠার সহিত তাঁহাদের নাটকে ব্যবহার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে সংলাপের চমৎকারিত্বের কারণ ইহার সংক্ষিপ্ততা, ইহা আমরা দেখাইয়াছি। তাঁহার পরবর্তী নাটকেও সংলাপ খুব সংক্ষিপ্ত, ঐ সব নাটকে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মুখে দ্রুত সংলাপের আদান প্রদান হইয়াছে বলিয়া দর্শকের মন সমস্ত চরিত্রের উপর সন্নিবিষ্ট থাকে, এবং চরিত্রগুলিও যুগপৎ ক্রিয়ামগ্ন থাকিতে পারে, একজনের সুদীর্ঘ বক্তৃতার সময় অপর আর একজনের হাই তুলিতে অথবা নখ খুঁটিতে হয় না। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের নাটকে অংক ও দৃশ্যবিভাগ সম্বন্ধে যে চরম স্বাধীনতা লক্ষ্য করা যায় আধুনিক নাটকেও তাহা পরিস্ফুট। এমন অনেক নাটকই লেখা হইতেছে যেগুলির মধ্যে পাঁচ অংক তো নাই-ই, এমন কি অংক ও দৃশ্যের সুস্পষ্ট বিভাগও নাই। এমন অনেক নাটক আছে যাহাতে কোনো দৃশ্যই নাই, যেমন শচীন্দ্রনাথের 'স্বামী-স্ত্রী' নাটকখানি, ইহাতে কেবল চারটি অংক আছে, কোনো দৃশ্য নাই। আবার অন্যপক্ষে অয়স্কান্ত বক্সীর 'ডক্টর মিস কুমুদে'র মত নাটকও আছে, যাহাতে কোনো অংকই নাই, শুধু কয়েকটী দৃশ্য রহিয়াছে। এখনকার নাট্যকারগণ কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করিয়া তাঁহাদের নাটকসমূহ রচনা করিয়া থাকেন। অংক ও দৃশ্য সংখ্যা যথাসম্ভব কমাইয়া, একই অংক অথবা দৃশ্যের মধ্যে বিভিন্ন ভাবাত্মক পাত্র-পাত্রীকে সুকৌশলে প্রবেশ করাইয়া আধুনিক নাটকে ক্রিয়ার অবিরাম গতি অব্যাহত করা হইয়া থাকে।

বর্তমান নাট্য সাহিত্যের আর একটী লক্ষণ ইহার অন্তর্দ্বন্দ্বময়তা। অবশ্য এখনও যে কোনো কোনো নাটকে সস্তা এবং স্থূল দৃশ্যের অবতারণা নাই তাহা নহে, কিন্তু তবুও

আধুনিক নাট্যকারদের লক্ষ্য এবং প্রয়াস হইতেছে সূক্ষ্ম আবেগময় অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটাইয়া তোলা। অবশ্য এই অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করা শক্ত কাজ, এবং খুব কম নাট্যকারই তাহাতে যথার্থ সক্ষম হইয়াছেন। নাট্যকারদের আলোচনা প্রসঙ্গে সেই বিষয় আমরা বিচার করিল।

আজকালকার নাটকের আর একটী সর্বত্রসুলভ বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, ইহাতে অতি বিস্তৃতভাবে মঞ্চনির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে। এই মঞ্চনির্দেশ দ্বিজেন্দ্রলাল হইতে বাংলা নাটকে চলিয়া আসিতেছে। এই মঞ্চনির্দেশের মধ্য দিয়া লেখক তাঁহার বক্তব্য অধিকতর পরিস্ফুট করিতে পারেন, এবং ইহার ফলে নাট্যকার ও অভিনেতার মধ্যে সহযোগিতাও বৃদ্ধি পায়। বর্তমান কালের অনেক নাট্যকার রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের অভিনয়-ভঙ্গি ও মানস-প্রবণতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাঁহারা নাটক লিখিবার কালে বিশেষ বিশেষ অভিনেতার উপযোগী বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কোনো বিশেষ ধরণের ভূমিকায় কোনো অভিনেতা অভিনয় করিয়া যদি খুব খ্যাতি অর্জন করেন, তবে পরবর্তীকালে অনেক লেখক তাঁহাদের নাটকে সেই ধরণের ভূমিকা সন্নিবেশ করেন। এইভাবে বর্তমান নাট্যরচনা রঙ্গমঞ্চের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময়েই নাটকরচয়িতাগণ রঙ্গমঞ্চের প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও পরিচালকের নির্দেশে তাঁহাদের নাটকে অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়া থাকেন, সেই পরিবর্তন মঞ্চসাফল্যের দিক দিয়া বিশেষ কার্যকর হইলেও সর্বত্র নাট্যকলার পোষক হয় নাই।

## (খ) পৌরাণিক নাটক

গিরিশচন্দ্রের সময়ে পৌরাণিক নাটকের চূড়ান্ত সমৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল এ বিষয় আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার পরে পৌরাণিক নাটকের পুনরভ্যুত্থান আর সম্ভব হয় নাই। যে ধর্মোদ্দীপনা উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা গিয়াছিল তাহা বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হইয়া আসিল। বিংশ শতাব্দীর ভাববিপ্লবের স্পর্শ আমাদের দেশও লাভ করিল, সর্বশক্তিময় বিজ্ঞানের অদ্ভুত লীলার পরিচয় আমরাও পাইলাম। দেশের লোকের মন ক্রমে ক্রমে অধ্যাত্মবিমুখ, ইহসর্বস্ব হইয়া উঠিল। নানা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জটিলতা আমাদের চিন্তা ও কল্পনাকে অধিকার করিতে লাগিল, ধর্মসম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল কমিয়া আসিল। অলৌকিক ব্যাপারের মধ্য দিয়া যে ধর্মভাব উদ্রেক করাই পৌরাণিক নাটকের প্রধান লক্ষ্য তাহা আর আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, সেইজন্য পৌরাণিক নাটকের প্রচারও শেষ হইয়া আসিল। কলিকাতার যে রঙ্গমঞ্চগুলি এককালে পৌরাণিক নাটকের দ্বারা পরিপোষিত হইত এখন সে সব স্থানে ঐ নাটকের অস্তিত্ব নাই।

বর্তমানে যে দুই একজন লেখক পৌরাণিক নাটক লিখিতেছেন তাঁহাদের নাটকের সহিত পূর্বতন পৌরাণিক নাটকের কোনোই যোগ নাই। বস্তুত তাঁহাদের নাটককে খাঁটি

পৌরাণিক নাটক বলা যায় কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। কারণ পুরাণের কোন বিশেষ ঘটনা কি কাহিনী ব্যতীত পৌরাণিক ভাব, আদর্শ, নীতি কিছুই প্রদর্শন করা বর্তমান নাট্যকারদের উদ্দেশ্য নহে। চিরপালিত ধর্মাদর্শ এবং ভক্তিভাব আধুনিক নাটকে তো নাই-ই, বরং গতানুগতিক পৌরাণিক সংস্কার ও নিষ্ঠার প্রতি একটা বিদ্রোহের ভাব ইহাতে রহিয়াছে। বর্তমান সংস্কারবিরোধী, ধর্মবিদ্রোহী চিত্ত ভগবানকে ছাড়িয়া শয়তানের জয়গানে মুখরিত, 'The devil is not as black as he is painted'—ইহা আধুনিক ভাববিপ্লুত মানুষের অন্তরের প্রতিধ্বনি। পুরাণ এবং ধর্মগ্রন্থে এতদিন যাহারা ঘৃণা ও অবজ্ঞা কুড়াইয়া আসিয়াছে, তাহাদের চরিত্রই নূতন ধরণের সহানুভূতিশালী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়া আলোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনেক কবিতায় অনেক পুরাণান্তর্গত চরিত্রকে মনুষ্যত্ববোধের মানদণ্ড দ্বারা নূতনভাবে বিচার করিয়াছেন, আধুনিক নাটকেও সেই রকম অনেক স্থলে নূতন বিচারশক্তির প্রয়োগ, অভিনব মূল্য ও মর্যাদা নির্ধারণ লক্ষ্য করা যায়।

ভক্তিভাব এবং ধর্মাদর্শের অভাব বশত এবং অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা না থাকাতে অধুনাতন পৌরাণিক নাটকে সুতীব্র ভাবাবেগ ও ঘাত-প্রতিঘাত অনেক জায়গাতেই প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহাতে এই নাটক দর্শনে দর্শক ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে কোনো গতানুগতিক শিক্ষা লাভ করে না বটে, কিন্তু যথার্থ নাটকীয় রস উপভোগে তাহার চিত্ত চরিতার্থ হইয়া উঠে। নাটকত্বের দিক দিয়া আধুনিক পৌরাণিক নাটকের গুণ বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

## (১) মন্মথ রায়

পৌরাণিক নাটক লিখিয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের নাম করিতে হয়। শুধু পৌরাণিক নাটক নহে, সর্বপ্রকার নাটক আলোচনার কালে ইঁহাকে আধুনিক সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলা চলে। নাটকের মধ্যে ইনি এক অনাবিষ্কৃত রহস্য এবং এক অনাস্বাদিত রস বিকাশ করিয়া দেখাইলেন। নাটকে এরূপ সুতীব্র ভাবাবেগ এবং সুপ্রখর ক্রিয়াময়তা সৃষ্টি করিতে খুব কম নাট্যকারই পারিয়াছেন। সূক্ষ্মতম অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিটী পরদা ইনি অতি সুনিপুণ হস্তে স্পর্শ করিয়াছেন, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবিরাম সংঘাতে ইঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মর্মস্থল ছিঁড়িয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। ইঁহার নাটকের উদ্বেলিত ভাবতরঙ্গ ঘূর্ণ্যমান আবর্তের মধ্যে লীলা করিয়া অমোঘ অবস্থার কঠিন শিলায় নিরুপায়ভাবে আর্তনাদ করিয়া মরিয়াছে। ইঁহার নাটক দর্শনকালে চরম উত্তেজনায় মন নাচিতে থাকে, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া পড়ে।

মন্মথবাবুর ভাষা অলংকৃত এবং কবিত্ব-সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রভাব ইঁহার নাটকে পড়িয়াছে একথা বলিলে অন্যায় হয় না। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ইঁহার ভাষাতেও

প্রকৃতির অবগুণ্ঠন অপসৃত হইয়াছে ও তাহার নয়নাভিরাম রূপ ও সৌন্দর্য ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মন্মথবাবুর সুনির্বাচিত অলংকৃত বাক্য এক একটা তীব্রগতিশীল তীক্ষ্ণ তীরের ন্যায় মর্মস্থলে আসিয়া বিঁধিতে থাকে।

আমাদের আলোচ্য নাট্যকার আধুনিক বিদ্রোহী ভাবধারায় পুষ্ট ও অনুপ্রাণিত, চিরাচরিত ধারণায় যাহারা পাপাত্মা এবং ঘৃণ্য তাহাদের চরিত্রের মধ্যে তিনি বিচিত্র ভালোমন্দের সংমিশ্রণ করিয়াছেন। গায়ের জোরে তিনি মন্দকে ভালো বলিয়া চালাইতে চান নাই। অনুকূল ঘটনা সৃষ্টি এবং অকাট্য যুক্তি দ্বারা তিনি আমাদের বহুকালপোষিত সংস্কার ও ধারণাকে বিচলিত করিয়াছেন। তিনি নাটকের অনেক স্থলেই প্রচলিত নীতি ও সমাজ-আদর্শকে ব্যঙ্গ করিয়া নিন্দিত এবং গর্হিত বিষয়কে সাহসের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রবল মানসিক ভাব ও কামনাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার কাজই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সংস্কার ও আদর্শ লইয়া মাথা ঘামানো তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

॥ কারাগার ॥ মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'কারাগার' শ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করিতে পারে। কংসের অত্যাচারে যাদবগণ এবং বসুদেব, দেবকী ও বিদুরথের কৃষ্ণভক্ত স্ত্রীপুত্র-গণের কি রকম দুর্দশা ও ক্লেশভোগ হইয়াছিল তাহার বিবরণ লইয়া নাটকখানি রচিত। কংস দানবের ঔরসে মানবীর গর্ভে জন্মলাভ করে। সেইজন্য দানবীয় ও মানবীয় এই দুই রকম ভাবই তাহার মধ্যে আছে। অত্যাচার ও উৎপীড়ন যথেচ্ছভাবে চালাইলেও তাহার মানবীয় দুর্বলতা দুঃস্বপ্নের মত আগমন করিয়া তাহাকে ভীত, আতঙ্কিত করিয়া তোলে। বিদুরথ আদর্শ প্রভুভক্ত সেবক, প্রভুভক্তির কাছে সে নিজের স্নেহ এবং বাৎসল্যও জোর করিয়া দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। নাটকের আবেগোচ্ছ্বসিত ঘটনা বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হইয়াছে। প্রত্যেকটী চরিত্র সুতীব্র দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ এবং অশেষ প্রাণরসে সঞ্জীবিত।

॥ দেবাসুর ॥ 'দেবাসুর' পঞ্চাঙ্ক বৈদিক নাটক। লেখক বলিয়াছেন—'ঋগ্বেদে দেবাসুর সংগ্রামের যে সুপ্রচুর ইঙ্গিত রহিয়াছে, সেই ইঙ্গিতে এই নাটক পরিকল্পিত হইয়াছে।' শচী এবং সূর্যা এই দুইটী চরিত্র লইয়া নাট্যকাহিনী ঘনীভূত হইয়াছে। সূর্যার জন্য বৃত্রাসুরের ভাই বলাসুর আত্মত্যাগ করিয়াছে। কালো হইয়া আলোর রাজ্যের মেয়ের জন্য তাহার সুব্যাকুল আকুতির মধ্যে করুণ ট্র্যাজেডি বিদ্যমান। বৃত্রাসুরও অশেষ বলদৃপ্ত ও ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও শচীর জন্য তাহার দুর্বলতাকে সে কিছুতেই জয় করিতে পার নাই। নাটকের ভাষা কবিত্বময়, সংঘাতপূর্ণ এবং আবেগগর্ভ।

॥ সাবিত্রী ॥ সাবিত্রীর মত সর্বজনজ্ঞাত এবং বহু আলোচিত পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া নাট্যকার 'সাবিত্রী' নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। কাহিনীর মধ্যে নাটকত্ব খুব কম, সেইজন্য নাটকত্ব ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নাট্যকার অভিনবরূপে চরিত্র সমাবেশ করিয়াছেন। নাটকের প্রধান চরিত্র অশ্বপতি। অশ্বপতির হৃদয়দ্বন্দ্ব, তাঁহার মানসিক সন্তাপ আমাদের মন অভিভূত করিয়া রাখে।

॥ চাঁদসদাগর ॥ 'মনসামঙ্গলে'র সুপ্রচলিত কাহিনী অনুসরণ করিয়া লেখক 'চাঁদ সদাগর' রচনা করেন। মাঝে মাঝে নাট্যরস জমাইবার জন্য তিনি আকস্মিকভাবে চরিত্র সমাবেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোনো স্থলেই প্রচলিত কাহিনীর গুরুতর পরিবর্তন করেন নাই। লেখকের অন্যান্য নাটকে যেমন উচ্ছ্বসিত আবেগের প্রাবল্য বিদ্যুদ্দীপ্তিতে ঝলকাইতে থাকে এই নাটকে তেমন নাই। ইহাতে ক্রম-অগ্রসয়মান গল্প বিপরীত ঘটনার দ্বন্দ্বকে পরিস্ফুট হইতে দেয় নাই। মনসাকে মঙ্গলকাব্যে যে রকম নীচ, অনিষ্টান্বেষীরূপে দেখিতে পাই, এখানে তেমন নহে। অকারণ নীচতা ও উদ্দেশ্যহীন জঘন্যতা তাহার চরিত্রকে হেয় করিতে পারে নাই। বজ্রকঠোর, অমিতবীর্য, অনমনীয় চরিত্র চাঁদ সদাগর আমাদের চিত্তকে আবেগোদ্বেল এবং উদ্বেগাতুর করিয়া রাখে।

॥ একাঙ্কিকা ॥ মন্মথবাবুর 'একাঙ্কিকা' গ্রন্থখানির মধ্যে কয়েকটী একাঙ্ক নাটিকা সংকলিত হইয়াছে। এই স্বল্পায়তন নাটিকাগুলির তুলনা বাংলা সাহিত্যে তো নাই-ই, এমন কি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাট্যাবলীর সহিত ইহারা সমতুল্য একথা সাহসের সহিত বলা চলে। বইখানির মধ্যে কয়েকটা চোখ-ঝলসানো রত্ন ইতস্তত পড়িয়া আছে, ইহাদের দীপ্তিপ্রাখর্য আমাদের বিচার করিবার, তুলনা করিবার ক্ষমতা হরণ করিয়া ফেলে। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে এক একটা নাটিকা পড়িবার পরে উত্তেজিত মনের মধ্যে অসংখ্য সুরের ঝংকার ক্রমাগত উত্থিত হইতে থাকে। গীতিকবিতার ন্যায় ইহাদের অভ্যন্তরস্থ প্রভাব আমাদের মনের মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী অনুরণন সৃষ্টি করিয়া চলে। নাটিকাগুলির প্রত্যেকটিই অত্যুত্তম হইলেও খুব চুলচেরা বিচার করিয়া 'বিদ্যুৎপর্ণা'কে শ্রেষ্ঠ বলা চলে। বিষকন্যার তীব্র জ্বালাময় হলাহল নাটিকাখানির মধ্যে যেন ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। দর্শন করিবার কালে গ্লানিকর বিষের প্রভাবে আমাদের মন-প্রাণ জর্জরিত হইয়া পড়ে। বিদ্যুৎপর্ণা হাস্যে-লাস্যে, কটাক্ষে-বিদ্রূপে চতুর্দিকে তরল বিষ ছড়াইয়াছে। পুরোহিতের গোপন কামনা, এবং গূঢ় ঈর্ষা শোচনীয় মৃত্যু বরণ করিয়া এই বিষময়ী ভয়ঙ্করীর পদে লুটাইয়া পড়িয়াছে। 'বিদ্যুৎপর্ণা'র ন্যায় সুতীব্র কামনাময়, অস্থির উত্তেজনাপূর্ণ নাটিকা 'রাজপুরী'। রাণী চরিত্রটী চঞ্চল ভালবাসায় পূর্ণ, কবির প্রতি তাহার উদ্দাম কামনা নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু তবুও সে অসত্যসাধিকা নহে। নিজে কলঙ্ক-তিলক ললাটে আঁকিয়া সে সত্যের জয় ঘোষণা করিরা গেল। 'পঞ্চভূত' রূপক নাটিকা। 'মাতৃমূর্তি'র মধ্যে শিল্পীর মিনতিভরা সুগভীর অন্তর-কামনাকে লেখক এইভাবে অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন যে তাহার কামনার প্রকৃতি সম্বন্ধে রাণীর মত আমাদেরও ভুল হয়। শিল্পীর অশান্ত আবেগময় প্রেম যে মাতৃ-মূর্তির কল্পনা করিয়াছিল তাহা আমরা প্রথম ধরিতে পারি না। প্রণয়ীর প্রেমের সহিত এই প্রেমের অভিব্যক্তি অভিন্ন। 'উপচার' নাটিকায় সাধ্বী শিরোমণি ভৈরবী স্বামীর কল্যাণের আশায় নারীর ঘৃণ্যতম কলঙ্ক বরণ করিয়া লইল, এই নিষ্ঠা ও ত্যাগ এত অদ্ভুত, এত বিচিত্র যে বিস্ময়ে, বেদনায় আমাদের মন স্তব্ধ হইয়া যায়। মন্মথ রায়ের অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে 'শ্রীবৎস', 'মহুয়া', 'খনা' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক সময়ের পৌরাণিক নাটকসমূহের মধ্যে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যে নাটকখানি দর্শকের মনে অক্ষয়ভাবে মুদ্রিত হইয়া আছে। 'সীতা' নাটকের ঘটনা বহির্মুখী নয়, হৃদয়-দ্বন্দ্বমূলক অন্তর্মুখী ঘটনাপ্রবাহই ইহার প্রাণরসের মূলে রহিয়াছে। রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জন-ইচ্ছা এবং শাস্ত্র-সংস্কারের দ্বারা তাঁহার হৃদয়বত্তাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। দায়িত্ব এবং কর্তব্যের সহিত তাঁহার নিরভিযোগ, মৌন অন্তঃসত্তার সংগ্রাম গূঢ় নাটকীয় রসে মন পূর্ণ করিয়া তোলে। বশিষ্ঠের সহিত কথোপকথনের সময় রামচন্দ্র তাঁহার অবরুদ্ধ হৃদয়ধর্মের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ সহসা মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। লোকাচার এবং শাস্ত্র-সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নাটকের মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে। শম্বুকের তেজোদ্দীপ্ত. অকাট্য যুক্তির মধ্যে একটা ধাবমান গতি সঞ্চারিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কয়েকখানি পৌরাণিক নাটক আছে। সেইগুলি ভক্তি-ভাবযুক্ত ধর্মরসাত্মক। ষ্টার থিয়েটারে সেইগুলির অভিনয় হইয়াছে।

## (গ) ঐতিহাসিক নাটক

ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধি আমরা দ্বিজেন্দ্রলালে দেখিয়াছি। তাঁহার পরে বর্তমান সময়েও কিছু কিছু ঐতিহাসিক নাটক রচিত হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ সব নাটকের অধিকাংশ দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাববিশিষ্ট। ভারতীয় ইতিহাসের স্বদেশীভাবরঞ্জিত কোনো বৃত্তান্ত কি ঘটনা লইয়াই সাধারণত আধুনিক নাটকসমূহ রচিত হইতেছে, এবং কাহিনীর মধ্যে জাতীয়ভাব উদ্দীপিত করিবার উদ্দেশ্যই লেখকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন দিন দিন প্রবল ও শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে, আমাদের জাতীয় চেতনা এবং গৌরব-বোধ প্রতিদিন প্রখর হইতেছে, স্বভাবত সেই কারণে এই শ্রেণীর নাটকসমূহ আমাদের মনে সহজ এবং তাৎক্ষণিক আবেদন করিতে পারে। এই প্রত্যক্ষ আবেদনময়তার জন্য অনেক নাটক কলা ও রীতির দিক দিয়া ত্রুটিপূর্ণ হইলেও রঙ্গালয়ে সমাদর লাভ করিতেছে। অনেক নাটকেই অকারণ ভাবাবেগ এবং অকারণ উচ্ছ্বাস সঞ্চার করিয়া লেখকগণ দর্শকদের স্বদেশী-ভাবানুপ্রাণিত চিত্তকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

### (১) শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া আজকাল শচীন্দ্রনাথ সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। শচীন্দ্রনাথ লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার, রঙ্গালয়ে নাটকের অভিনেয়তা এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাত। আধুনিক রঙ্গালয়ের সূক্ষ্ম টেকনিকে তাঁহার নাটক পরিপূর্ণ। কথার

প্রখরতা এবং আবেগ সংঘাত পরিস্ফুট করিতেও তিনি অনেক স্থলে খুব সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার নাটকের অনেক জায়গাতেই ডি. এল, রায়ের প্রভাব বিদ্যমান, শক্তিশালী চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি এই প্রভাব একেবারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। আধুনিক নাটকের রীতি অনুসারে তাঁহার নাটকেও চরিত্রগুলি বিরুদ্ধ ভাবময় ও জটিল।

॥ সিরাজদ্দৌলা ॥ শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'সিরাজদ্দৌলা'র জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। সিরাজদ্দৌলা বাংলার স্বাধীনতা-সূর্যের শেষ গৌরবোজ্জ্বল অস্তরাগ, সেইজন্য তাঁহার কাহিনী বাঙালীর আগ্রহসিক্ত স্বত:স্ফূর্ত বেদন-ঝঙ্কারের সৃষ্টি করে। শচীন্দ্রনাথের সিরাজদ্দৌলা স্বাধীনতা-রক্ষাব্রতী, ন্যায়নিষ্ঠ এবং উদার। কিন্তু নাটকে তাঁহার শক্তিমান, দৃঢ়চেতা রূপ অপেক্ষা করুণ, দুঃখময়, আবেদনশীল দিকটা অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয়ের মধ্যেও এই নিষ্ফল, নিরুপায় দিকটাই বেশি করিয়া দর্শকের চোখে পড়িত।

॥ গৈরিক পতাকা ॥ মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর গৌরবময় উত্থানের বিষয় লইয়া 'গৈরিক পতাকা' রচিত। নাটকখানি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ন্যায় জাতীয় ভাবোদ্বোধক। একটী জাতির আশা ও স্বপ্নকে কিভাবে ত্যাগ, নিষ্ঠা ও উদার বীরত্বের মধ্য দিয়া সফল করিয়া তোলা যায় তাহার অতি উজ্জ্বল চিত্র নাটকের মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে। শিবাজী চরিত্রের দৃঢ়তা ও কোমলতা, তাঁহার নিষ্ঠা ও ভক্তি নাটকের মধ্যে অতি সুন্দর ভাবে দেখানো হইয়াছে। নাটকখানি বিশেষ ঘটনাবহুল এবং আবেগময়, তবে জায়গায় জায়গায় অতি নাটকীয় ভাব রহিয়াছে,—যেমন, রণরাও হঠাৎ আদিল সাহের দুর্গে প্রবেশ করিয়া বীরাবাইএর কাছে গেল, এবং রণরাও ও বীরাবাই যুদ্ধক্ষেত্রে মুমূর্ষু অবস্থায় মিলিত হইয়া আবার স্বাভাবিক ভাবে বাঁচিয়া উঠিল, এবং পুনরায় প্রেমের আদান প্রদান চলিতে লাগিল। ইহাতে বীরাবাইএর ভৈরব যুদ্ধ নিতান্ত অকারণ এবং অনর্থক হইয়া পড়িয়াছে। নাটকের গানগুলি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-কুমার রায়ের রচনা, উহাদের উপর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব রহিয়াছে। একটু আধটু অসঙ্গতি থাকিলেও ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে গ্রন্থখানি খুবই সার্থক।

॥ রাষ্ট্রবিপ্লব ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান'কে সামান্য অদল বদল করিয়া শচীন্দ্রনাথ 'রাষ্ট্রবিপ্লব' প্রণয়ন করেন। নাট্যকার বলিতে চাহিয়াছেন যে, দারার সর্বধর্মসমন্বয় এবং ঔরঙ্গজীবের ইসলাম ধর্মোন্মাদন—এই দুই আদর্শের সংঘাত তিনি দেখাইয়াছেন। নাটকের মধ্যে প্রধান চরিত্র দারা। ঐরংজীবকে প্রখর বুদ্ধিশালী, ব্যক্তিত্ববান চরিত্ররূপে এখানে দেখি না। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে যে ঘটনার জটিলতা ও দৃশ্যসংস্থাপনের নৈপুণ্য আছে আলোচ্য নাটকে তাহার অভাব। রোশনআরা চরিত্রটী অর্থহীন, কেবল ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও খরকথার পটুতা তাহার আছে। তাহার প্রখরতা ও দীপ্তির কাছে জাহানআরাকে অহেতুক বার বার দুর্বল ও মূক করা হইয়াছে। শেষ দৃশ্য অর্থহীন, এবং একেবারে অনুপযোগী, ইহা কেবল নাট্যকারের মত বহন করিয়াছে মাত্র।

॥ ধাত্রীপান্না ॥ 'ধাত্রীপান্না' দুই অঙ্কে বিভক্ত। নাটকত্বের দিক দিয়া ইহা শচীন্দ্রবাবুর

শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক। নাটকের কাহিনী অতি দ্রুতবেগে তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত ও তীক্ষ্ণ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে। আকস্মিক নাটকীয় ঘটনার মুহুর্মুহুঃ অভিঘাতে দর্শকের মন আবেগ-দোলায় দুলিতে থাকে। বিপরীত ভাবের সঘন সংঘর্ষে নাট্যরস উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। কোনো স্থলেও আবেগোচ্ছ্বাস ও অন্তরচাঞ্চল্য একটু শিথিল হইবার অবকাশ পায় না। বনবীর নির্মম ও নৃশংস, কিন্তু চম্পার কাছে সে দুর্বল, এবং পান্নার মহান আত্মত্যাগ তাহার উষর হৃদয়মরু সিক্ত করিয়াছে। পান্নার প্রতিশোধগ্রহণও অতি চমকপ্রদ ও মনোরম। পান্না এবং শীতলসেনী দুই হিংস্র ব্যাঘ্রীর ন্যায় নখদন্তের আঘাত হানিয়া পরস্পরের সহিত যুঝিয়াছে। বনবীরের সর্বপ্রকার পাষণ্ডতা সত্ত্বেও তাহার মাতৃভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

## (২) মহেন্দ্র গুপ্ত

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত কয়েকখানা ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছেন, সেইগুলি ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। মহেন্দ্র বাবুর নাটকের মধ্যে ঐতিহাসিকতাই প্রধান, ঐতিহাসিকতার তলদেশশায়ী ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বময়তা এবং সূক্ষ্ম ভাবাবেগের ক্রিয়াচাঞ্চল্য তাঁহার নাটকে তেমন অভিব্যক্ত নহে। তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে 'রাণী ভবাণী', 'রাণী দুর্গাবতী,' 'মহারাজা নন্দকুমার', 'টিপু সুলতান', 'পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎসিংহ' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

॥ টিপু সুলতান ॥ 'টিপু সুলতানে'র মধ্যে স্বাধীনচেতা, স্বদেশ-হিতব্রতী, উন্নত-চরিত্র হায়দর আলির যোগ্য পুত্র টিপু সুলতানের কাহিনী উপনিবদ্ধ হইয়াছে। নাটকের মধ্যে ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ এবং জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রয়াসের মহৎ আদর্শের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র একচেটিয়া আধিপত্য লাভ করিয়াছে। বিশ্রান্ত অবসরে গুঞ্জায়মান কোন কোমল বৃত্তির স্ফুরণ ইহাতে নাই। কোনো স্ত্রী-চরিত্রই পরিস্ফুট নহে।

॥ পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎসিংহ ॥ 'পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎসিংহ' চার অঙ্কে সমাপ্ত নাটক। শিখ নায়ক রণজিৎসিংহের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লইয়া নাটকখানি বিরচিত। রণজিৎ-সিংহের কঠোর বিচার ও কর্তব্যপ্রাণতা অতি বাস্তবরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু নাটকের রসের স্ফূর্তি একান্তভাবে তাহার উপর নির্ভর করে নাই। খুব উচ্চ আদর্শ ও স্বদেশপ্রাণতা নাটকের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। রণজিতের মাতা রাজকৌড় এবং পত্নী—খড়্গসিংহের বিমাতা ঝিন্দন বাইএর সীমাহীন মহত্ত্বের দৃশ্য সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক।

## (৩) নিশিকান্ত বসু রায়

॥ বঙ্গেবর্গী ॥ নিশিকান্ত বসু রায় ৩।৪ খানা ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে 'দেবলাদেবী' এবং 'বঙ্গেবর্গী' সমধিক প্রসিদ্ধ। 'বঙ্গেবর্গী' বহু-অভিনীত খ্যাতিসম্পন্ন নাটক। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের প্রভাব ইহার স্থানে স্থানে ধরা যায়। ইহার সংলাপ দীর্ঘ এবং

উচ্ছ্বাসময়, আধুনিক নাটকের সূক্ষ্ম টেকনিক ইহাতে নাই। চাঞ্চল্যকর হত্যা ও বাহ্য স্থূল ঘটনার প্রাবল্য ইহাতে অধিক। সেইজন্য হয়তো ইহার জনপ্রিয়তা এত বেশি হইয়াছে। সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কোনো চরিত্রের রসময় অভিব্যক্তি নাটকে নাই। আলিবর্দি স্নেহপরায়ণ, মিলনপ্রয়াসী এবং ধর্মিষ্ঠ; কিন্তু তাঁহার শক্তি-সক্রিয় প্রভাব অদৃষ্ট। সর্বাপেক্ষা বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ভাস্কর পণ্ডিত। ভাস্কর ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্মবান অথচ দারুদৃঢ় এবং কুলিশকঠোর। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ববর্তী নিরুপায় এবং দুঃখতাপদগ্ধ চিত্তের বিষাদঘনতা অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী।

॥ কেদার রায় ॥ রমেশ গোস্বামীর 'কেদার রায়' নাটকখানিও বহুল প্রচারিত এবং উচ্চ-প্রশংসিত। 'প্রতাপাদিত্যে'র প্রভাব ইহার স্থানে স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। চাঁদরায় এবং কার্ভালো যথাক্রমে বিক্রমাদিত্য এবং রডার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। ঘটনাময় ঐতিহাসিক পরিবেশের মধ্যে নিগৃহীতা রমণীর সামাজিক সমস্যাটী দৃষ্টি ও মন অধিকার করিয়া বসে। কেদার রায়ের মহিমামূলক নাটকের মধ্যে ঈশাখাঁ-সোনা ঘটিত পার্শ্বকাহিনী মূল ভাব-প্রবাহকে খণ্ডিত করিয়াছে। ঈশাখাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও উদারতা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় সংস্থান। নাটকের সর্বপ্রকার দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের পিছনে রহিয়াছে শ্রীমন্ত। শ্রীমন্তের পাগলামির মধ্যে গুরুতর অনিষ্টকারিতা বিদ্যমান, সুতরাং পাগোল বলিয়া সে ক্ষমাশীল উপেক্ষার পাত্র নহে। বীর, প্রভুভক্ত কার্ভালোর ভূমিকা অত্যন্ত প্রাণবান। খ্যাতনামা নট শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়ের অভিনয়-নৈপুণ্য এই ভূমিকাটীকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

॥ পলাশী ॥ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 'পলাশী' নামক একখানা ত্র্যঙ্ক নাটক লিখিয়াছেন। নাটকের মধ্যে বলিষ্ঠ নাট্যকলার পরিচয় আছে। ঘটনার বিন্যাস জমাটভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিথিল গ্রন্থির দুর্বলতা চোখে পড়ে না। প্রধান চরিত্র মোহনলাল —তাহার ব্যক্তিত্ব, স্বদেশপ্রেম এবং বীরত্বই নাটকের প্রধান বর্ণিতব্য সম্পদ। ঘসেটি বেগম এবং সেলিনা বেগ স্বল্প পরিসরের মধ্যে অশেষ প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে। নাটকীয় আবেগ ঘন ঘন উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। সিরাজদ্দৌলার চরিত্র এস্থলে গৌণ।

॥ দিগ্বিজয়ী (১৯২৮) ॥ নাট্যকার 'নিবেদনে' বলিয়াছেন, 'দিগ্বিজয়ী' নাটকখানি ঐতিহাসিক হইলেও ইহার মূল ভাবটি চিরন্তন; সেইজন্য ইহার কোন ঐতিহাসিক নাম (অর্থাৎ নাদির শাহ এই নাম) দিলাম না।' অবশ্য ঐতিহাসিক নাম থাকিলেই যে নাটকের মধ্যে কোনো মূলভাব থাকিতে পারে না, তাহা নহে। ইতিহাসে থাকে শুধু মাত্র ঘটনা। কিন্তু সেই ঘটনা যখন সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয় তখন সাহিত্যিককে সেই প্রাণহীন ঘটনার মধ্যে কোন বিশেষ ভাবাদর্শ সঞ্চার করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে হয়। ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে যদি মানুষী রাজ্যের কোন চিরন্তন আশা ও বেদনার পরিচয় না পাওয়া যায়, তবে সাহিত্যের চরিত্র হিসাবে তাহার কোন মূল্য নাই। যাক, নাট্যকার কথিত 'চিরন্তন মূল ভাবটি' লইয়া এখন আলোচনা করা যাক। নাদিরের চরিত্রে কোন মূলভাব আবিষ্কার করা সত্যই কঠিন। কারণ নাদিরের জীবনে আগাগোড়া একটা

অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন খেয়ালের রাজত্ব চলিয়াছে। যিনি আত্যন্তিক খেয়ালের বশীভূত হইয়া এক মুহূর্তের কাজ পরমুহূর্তে ওলটপালট করিয়া দিতেছেন তাঁহার মধ্য হইতে কিভাবে একটি সুনির্দিষ্ট মূলভাব নির্ণয় করা যায়? কিন্তু তবুও এই খেয়ালী স্বভাবের কথা বাদ দিলে বোধ হয় একটি মূলভাব আবিষ্কার করা চলে। তাহা নাটকের একমাত্র পদ্যছন্দে বর্ণিত সংলাপে ব্যক্ত হইয়াছে—

দয়া নহে প্রকৃতি নিয়ম—
শক্তিমাত্র আশ্রয় জগতে!
শক্তি যার যতটুকু
অধিকার ততটুকু তার
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—
মানবের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা

এই শক্তিদর্প ও তাহার শোকাবহ পরাজয়কেই নাটকের মূলভাব বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি। সেই হিসাবে 'দিগ্বিজয়ী' নামটির মধ্যেই একটা বড় রকমের শ্লেষাত্মক সঙ্কেত আছে। যিনি অমানুষী শক্তিবলে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া দিগ্বিজয়ী আখ্যা লাভ করিয়াছেন, তিনি কি অসহায় ভাবে পারিবারিক অন্তর্বিরোধের কাছে পরাজয় স্বীকার করিলেন! যিনি প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বরের দোহাই দিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেই প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বরের বিধানেই মৃত্যু বরণ করিতে হইল! প্রতিকূল ঘটনা-গত শক্তি, নিয়তি, ঈশ্বর— যে কোন শক্তিই হউক, তাহার কাছে বারে বারে অতিমানবদের শক্তি এইভাবেই ব্যর্থ হইয়াছে।

নাদিরের চরিত্র সম্বন্ধে নাট্যকার বলিয়াছেন যে, তিনি এক হাতে গড়িয়াছেন আবার এক হাতে ভাঙ্গিয়াছেন। এই কথার সার্থকতা পাওয়া যায় বাহিরের জগতে। তিনি যে রাজ্যগুলি গড়িয়াছেন সেগুলি আবার তিনিই ভাঙ্গিয়াছেন। সাফাভী বংশের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়া ইরানকে তিনি নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন, আবার তিনিই ইরানের উপর দিয়া অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষকে সহস্র-রাজকতার হাত হইতে উদ্ধার করিতে তিনি আসিয়াছিলেন, অবশেষে তিনিই নৃশংস উৎপীড়ন ও নর-হত্যার দ্বারা ভারতবর্ষের আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ ভাঙ্গাগড়া তো বাহিরের ব্যাপার। আসল ভাঙ্গাগড়া তাঁহার নিজেকে লইয়া। তিনিই নিজেকে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করাইয়া সেখান হইতে নির্মমভাবে ভূপাতিত করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার যথার্থ ট্রাজেডি এই খানে। তিনি অনেকের সঙ্গে অনেক শত্রুতা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা কঠিন শত্রুতা নিজের সঙ্গে। এই শত্রুতার ফলেই তাঁহার পতন হইয়াছে - হিন্দু জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু নাদিরের অনেক কাজই নিছক খেয়ালের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছে, কোন অন্তর্নিহিত ভাববৃত্তির সুস্পষ্ট প্রেরণায় হয় নাই, সেজন্য ট্রাজেডির নিরুপায় অনিবার্যতা অনেকস্থলেই

ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সিরাজীর প্রতি অকারণ অপমান তাঁহার নিষ্ঠুর খেয়ালের অন্যতম অন্যায় কর্ম। সিতারার প্রতি সন্দেহ ও তাহার বহিষ্কার এবং আপন সন্তানের চক্ষু উৎপাটন প্রভৃতি ব্যাপারগুলিও মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতজনিত কোন সুচির-পোষিত দুর্দমনীয় হৃদয়ভাবের পরিণতি নহে। সেগুলি যেন কোন আকস্মিক নিষ্ঠুর খেয়ালী প্রবৃত্তিরই পরিণতি। হিন্দু রমণী অভিশাপ দিয়াছিল - 'স্ত্রী. পুত্র, কন্যা - পারিবারিক জীবন বিষাক্ত হবে,' কিন্তু আসলে সিরাজী ছাড়া তাঁহার পরিবারের আর কেহ বিষাক্ত হয় নাই। নাদিরের অমূলক সন্দেহ ও ঈর্ষাই সকলকে বিষাক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিল। নাদিরের পারিবারিক জীবনের অশান্তি ও পরাজয়ের মূলে একটি চরিত্র রহিয়াছে, সে হইল সিরাজী। দিল্লীর সৈন্য বিদ্রোহ ও ইরানের অভিজাত-বিদ্রোহের মূলে সিরাজীর ন্যায় একটি নারী চরিত্রের এতখানি প্রভাব ছিল কিনা ইতিহাস তাহার বিচার করিবে। কিন্তু নাটকের মধ্যে সিরাজীও তাহার ভ্রাতা আলি আকবরকেই নাদিরের ভিতর ও বাহিরে মূল বিরোধী শক্তিরূপে দেখান হইয়াছে। অথচ সিরাজীকে একেবারে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করিয়া দূরে ঠেলিয়া দেওয়াও চলে না। কারণ তাহার প্রতিহিংসার পশ্চাতে একটি অপমানিতা, প্রেমবঞ্চিতা নারীর তীব্র বেদনা সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যখন সে নিজের কাজের ভয়াবহ অমঙ্গলজনক রূপ দেখিতে পাইল, তখন ভয়ে আশঙ্কায় বিহ্বল হইয়া সেই তাহার প্রিয় স্বামীর কাছে যাইয়া মুক্তকণ্ঠে তাহার দোষ স্বীকার করিল।

নাট্যকার লিখিয়াছেন, 'নাটক এবং উহার অভিনয় সম্পূর্ণরূপে নবযুগোপযোগী করিবার নিমিত্ত আমি আধুনিক নাট্য-রচনা রীতি ( Ibsenian Technique ) অবলম্বন করিয়াছি।' ইবসেনের বাস্তবতা ও সমাজদ্বন্দ্বের সহিত এই নাটকের কোন মিল নাই, তবে ইবসেন দৃশ্যসংস্থাপনার মধ্যে আধুনিক যুগোপযোগী যে সব রীতি প্রবর্তন করিয়াছেন সেগুলির কিছু কিছু প্রভাব আলোচ্য নাটকে দেখা যায়। ইবসেনীয় নাটকের ন্যায় এই নাটকেও দৃশ্য-বিভাগ নাই, শুধুমাত্র অঙ্ক বিভাগ রহিয়াছে। ইহাতে যেমন সময় সংক্ষেপের ব্যবস্থা হইয়াছে তেমনি অকারণ দৃশ্যবাহুল্য হইতে নাটকখানি মুক্তি লাভ করিয়াছে। একই অঙ্কের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্র পর পর সন্নিবেশিত করিয়া নাটকের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন গতিবেগ আনিবার চেষ্টা হইয়াছে।

## (ঘ) সামাজিক নাটক

বর্তমান সময়ে সামাজিক নাটকের বহুল ব্যাপ্তি এবং সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, এবং ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কারণ, জীবনধারণ-প্রণালীর জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমে ক্রমে সমাজ-সচেতন হইয়া উঠিতেছে। আগেকার জীবন ছিল নিতান্ত সহজ ও সরল, জীবিকা অর্জন তখন কষ্টসাধ্য ছিল না, এবং তখন লোকে সুনির্দেশিত নীতি ও ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী নিজেদের জীবন চালিত করিত, সেইজন্য নানা প্রশ্ন সমস্যা ও জটিলতার উদ্ভব তখন হইত না। কিন্তু এখন আর্থিক সংকট ও কৃচ্ছ্রতার জন্য যেমন মানুষের মন

অসন্তুষ্ট ও সন্দেহশীল হইয়া উঠিতেছে, তেমনি নানা অভিনব মতবাদ ইহাকে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, রীতিনীতির প্রতি বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছে। মানুষের জীবনের শান্তিপূর্ণ সুখ এবং নিশ্চিন্ত আরাম বুঝি অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা-বিক্ষোভের ঘূর্ণিবাত্যায় ইহা যেন অনির্দিষ্টভাবে কেবল ঘূর্ণিত হইয়াই চলিয়াছে। বার্ণার্ড শ, গলসওয়ার্দি প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকারের নাটকে এই সমস্যাসংক্ষুব্ধ সমাজজীবনের পরিচয়ই আমরা পাই। পরিবার-সমস্যা, বিবাহ-সমস্যা, ধনী-দরিদ্র সমস্যা প্রভৃতি ইঁহাদের নাটকে নানা-ভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে। নাটকের ধর্ম বিষয়সর্বস্বতা, নাট্যকার সাধারণত তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে অদৃশ্য। কিন্তু বর্তমান নাট্যকার এত সমাজসচেতন হইয়া উঠিতেছেন যে তিনি নিজেকে নাটকের মধ্যে প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন, নাট্যকারের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বা মত এখন নিতান্তই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।[১] আধুনিক নাটক-রচয়িতাদের মুখপাত্র বার্ণার্ড শ বলিয়াছেন—'I do not write a single line except for teaching something.' নানা প্রশ্নতর্কের অবতারণা করিয়া বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারা কোন মত প্রতিপাদন করাই আধুনিক নাট্যকারের উদ্দেশ্য। অবশ্য সাময়িক এবং স্থানিক সমস্যা অতিক্রম করিয়া শাশ্বত, বিশ্বজনীন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা না হইলে সাহিত্য চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আধুনিক অনেক সাহিত্যিক স্বল্পতোয়া নদীবক্ষে বিক্ষোভময় আবর্ত সৃষ্টি করিতেছেন বটে, কিন্তু অনন্ত-স্রোত পারাবারে তাঁহারা পৌছিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

বর্তমান সাহিত্যে খুব তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া অতি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের অবতারণা হইয়া থাকে ইহা আমরা দেখিতেছি। অনেক সময়েই এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয় যে, পাঠকের পক্ষে যোগসূত্র অনুসরণ করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করাই দুরূহ হইয়া পড়ে। উপন্যাসে আলোচনা এবং বিশ্লেষণের সুযোগ বেশি, নাটকে অভিনয়ের উপযোগিতার উপর লক্ষ্য থাকে বলিয়াই অত বিস্তৃত আলোচনা ও বিশ্লেষণ সম্ভবপর হয় না। কিন্তু তবুও ইহাতে অনেক স্থলেই মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাত ও আপাতদুর্বোধ্য বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। ইহার কারণ সন্ধান করিলে বুঝা যাইবে, বর্তমান জগতের যুগান্তকারী মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড ও তাঁহার অনুগামিগণের প্রভাবের ফলেই এইরূপ হইতেছে। ফ্রয়েড মানুষের মনোরাজ্যের দুজ্ঞে'য় রহস্যরাজি আবিষ্কার করিবার পর বর্তমান চিন্তাজগতে তাঁহার গভীর প্রভাব পতিত হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যিকের সাহিত্যেও সেইজন্য সজ্ঞান ও নিজ্ঞ'ান মানসিক স্তরের বৈষম্য, সংস্কার-বিরোধী বাসনা-কামনার অস্তিত্ব প্রভৃতি দেখানো হইয়াছে।

* 'Another tendency of the serious modern dramatist is to over-emphasize the interpretative side of his art. It is a noble fact that a large mass of the best modern drama is obtrusively didactic.'

*Tendencies of Modern English Drama* by A. E. Morgan, P. 5

বাংলার উপন্যাস-সাহিত্য বর্তমানে বিশেষ সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট, আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার যোগ গভীর এবং নিবিড়। শরৎচন্দ্র এবং তাঁহার পরবর্তী সাহিত্যিকদের সাহিত্যে আধুনিক সমাজের বিভিন্ন সমস্যার উপর অভ্রান্ত আলোকপাত করা হইয়াছে। সত্যনিষ্ঠ বাস্তবতা এবং বলিষ্ঠ মতবাদের ফলে তাঁহাদের সাহিত্য বাঙালী মন ও মতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। কিন্তু আধুনিক বাংলা নাটকে এইরূপ সমাজচেতনা এবং বাস্তব সমস্যালোচনা দেখা যায় না। বর্তমান কালের অধিকাংশ নাটকে দর্শকের রুচি ও চাহিদার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া হয়তো কোথাও বা কোনো সমস্যা সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত মাত্র করিয়া পরিশেষে একটা নিতান্ত সস্তা ও সুলভ মিলনান্তক পরিণতির মধ্যে নাটকের শেষ করা হইয়া থাকে। প্রশ্ন সমস্যা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি হইলেও শেষে মিলন একটা করিতেই হইবে, তাহা না হইলে বাঙালী দর্শক যে সন্তুষ্ট হয় না। আমাদের দর্শকবৃন্দ নাটক দেখিতে চান না; নাচ-গান, স্থূল রোমাঞ্চকর দৃশ্য এবং তরল ভাবোচ্ছ্বাসই তাঁহারা চান, সেইজন্য গুরুতর সমস্যার আঘাতে পীড়াগ্রস্ত মন লইয়া রঙ্গালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। ইঁহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নাট্যকারবৃন্দ খাঁটি সমস্যামূলক নাটক লেখেন না। যে দুই একখানা সমস্যামূলক নাটক লিখিত হইতেছে, সেইগুলিও নাটকীয় রসোত্তীর্ণ হয় না বলিয়া তেমন মূল্য ও মর্যাদা লাভ করিতে পারিতেছে না।

## (১) বিধায়ক ভট্টাচার্য

বয়সে নবীন হইলেও বিধায়কবাবুই আধুনিক সামাজিক নাট্যপ্রণেতাদের মধ্যে অগ্রণী, সেইজন্য প্রথমে তাঁহার নাটকের আলোচনা করা হইতেছে। বিধায়কবাবুর নাটকে গভীর সমাজচেতনার সহিত সুনিপুণ নাট্যকলার নিখুঁত সংমিশ্রণ হইয়াছে। আধুনিক বাঙালী পরিবার যে সমস্ত সমস্যা দ্বারা বিচলিত হইয়াছে, তাহার বাস্তব চিত্র তিনি আমাদের দেখাইয়াছেন। সমস্যাকে তিনি কেবল স্পর্শ করিয়া যান নাই, সমস্যার অন্তস্তলে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার অনুভূতিরসে সমস্ত সমস্যা অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত সমাজ-সমস্যার অবতারণা থাকিলেই কোনো নাটক শ্রেষ্ঠ স্তরে উন্নীত হয় না, যদি না ইহা শ্রেষ্ঠ কলার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। বিধায়কবাবুর নাটকে সেই শ্রেষ্ঠ নাট্য-কলা বিদ্যমান। এমন সুকৌশলে তিনি ঘটনা সংস্থাপন এবং পাত্রপাত্রীর সমাবেশ করিয়াছেন যে তাঁহার নাটকের ক্রিয়া দ্রুত তালে জমাট পরিস্থিতির মধ্য দিয়া ঘটিয়া যায়। এক কেন্দ্রাভিকর্ষণী শক্তি দ্বারা তিনি দৃঢ়ভাবে সমস্ত চরিত্রগুলি বাঁধিয়া দেন, সেই শক্তির প্রভাবে এতটুকু শিথিলতা, এতটুকু বিক্ষিপ্ততা তাঁহার নাটকে নাই। অবিরাম ক্রিয়ার মধ্য দিয়া নাটকের সমস্যা অব্যর্থভাবে দর্শকের হৃদয়ে আঘাত হানিয়া রসে দ্রবীভূত করিয়া ফেলে।

॥ মাটির ঘর ॥ বিধায়কবাবুর শ্রেষ্ঠ নাটক 'মাটির ঘর'। ইহা আধুনিক সমস্ত নাটকের

মধ্যেও শ্রেষ্ঠ একথা বলিলে অতিরঞ্জন হয় না। বাংলা নাটকের গতানুগতিকতা ইহাতে নাই, বাঙালী দর্শকের রুচির অধীনও ইহাকে করা হয় নাই। ইহার মধ্যস্থ সমস্যা বাংলা নাটকের ন্যায় দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া ফস করিয়া নিভিয়া যায় নাই। শমীবৃক্ষের অন্তরস্থ আগুনের ন্যায় ইহা অনির্বাণভাবে জ্বলিয়া সব নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। নাটকের কাহিনী এক মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারকে লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কাহিনীর মধ্যে কোনো উদ্ভট অভিনবত্ব নাই, কোনো অসাধারণ বৈশিষ্ট্যও নাই ; কিন্তু এইরূপ সচরাচরদৃষ্ট পরিবার ও চরিত্রের মধ্যে বর্তমানে যে সব সমস্যা দেখা দিতেছে নাট্যকার সুগভীর দরদ ও সীমাহীন সহানুভূতির দ্বারা তাহা উপস্থাপন করিয়াছেন। নাট্যকার ভ্রান্ত, স্খলিত জীবনের কঠোর সমালোচক নহেন, আঘাতে শাস্তিতে তাঁহার উল্লাস নাই, সেইজন্য তিনি তাঁহার সর্বব্যাপী সহানুভূতি দ্বারা সব অন্যায়-অপরাধ ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। অলকের গুরুতর অপরাধ সেই কারণেই মার্জিত হইয়াছে। নাটকখানির দৃশ্য সংস্থাপনে অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছয়টি মাত্র দৃশ্যে নাটকের শেষ, অথচ এই অল্প কয়টী দৃশ্যের মধ্যে একটা অতি জটিল, বিভিন্নমুখী কাহিনীকে রূপ দেওয়া হইয়াছে। নাটকের ক্রিয়ার একটুও ফাঁক নাই, একটুও বিরাম নাই। তন্দ্রা, নন্দা ও ছন্দা ইহাদের তিনটী স্বতন্ত্র বৃত্তান্ত এমন সুনিপুণভাবে পরস্পরের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মনে হয় তাহারা একই অবিচ্ছিন্ন কাহিনী প্রকাশ করিতেছে। তিন ভগ্নীর মধ্যে শুধু যে নামের সাদৃশ্য আছে তাহা নহে, তাহাদের দুঃখময়, করুণ জীবনেরও সঙ্গতি আছে। তন্দ্রার ট্র্যাজেডি সর্বাপেক্ষা করুণ, তাহার সমস্যা মৌলিক এবং চিরন্তন—টমাস হার্ডির শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'তে, শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে' যে সমস্যার আলোচনা হইয়াছে, ইহা সেই সমস্যা। উদার, ক্ষমাশীল স্বামী এবং আবেগময়, প্রেম-পাগল প্রণয়ীর মধ্যে তাহার দ্বিধাবিভক্ত চিত্ত নিরুপায়, নিঃসহায়ভাবে দুলিয়াছে। নন্দার ট্র্যাজেডি নির্যাতিত, ভাগ্যলাঞ্ছিত, হতভাগিনী বাঙ্গালী ললনার ট্র্যাজেডি, জীবনপাতের মধ্য দিয়া সে আমাদের সমাজব্যবস্থার প্রতি যে বাক্যহীন অভিযোগ জানাইয়া গেল তাহা আমাদিগকে চাবুক মারিতে থাকে। কনিষ্ঠ ভগ্নী ছন্দার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মধ্যে কারুণ্যের পাত্র কানায় কানায় ভরিয়াছে। তিন ভগ্নীই ব্যক্তিত্বশালিনী, স্বাতন্ত্র্যময়ী, অথচ তিনজনেই প্রতিকূল অবস্থার চক্রান্তে নিরুপায় দুঃখ লাভ করিয়াছে, ইহা দেখিয়াই আমাদের চিত্ত সমবেদনায় আপ্লুত হইয়া উঠে। তিন কন্যার পিতা সত্যপ্রসন্নের ট্র্যাজেডি শুধু শোচনীয় নয়, ইহা অসহনীয়। এক একটী কন্যার জীবনের ব্যর্থতার সহিত তাঁহার এক একখানা বক্ষের হাড় খসিয়া যাইতেছে, অথচ তাঁহার শূন্য বক্ষপঞ্জরের মধ্যে তাঁহার প্রাণটা তবুও ধক ধক করিতেছে ; ইহার যেন মুক্তি নাই, নিষ্কৃতি নাই, ঐখানে বাঁচিয়া থাকিয়া যেন তাহাকে লক্ষ কোটী পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বাংলা নাটকে সাধারণত পরিণতি মিলনান্তক করিয়া যেমন সমস্যার গুরু মেঘ ফস করিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়, এই নাটকে তেমন হয় নাই। এখানে জমাট কান্না বুকে চাপিয়া

রঙ্গালয় হইতে বিদায় লইতে হয়। যথার্থ ট্র্যাজেডির গৌরব ইহাতে আছে। নাট্যকারকে অভিনন্দন না জানাইয়া পারা যায় না।

॥ মেঘমুক্তি ॥ 'মেঘ-মুক্তি' নাটকে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহের সঞ্চার এবং অবশেষে সেই সন্দেহের নিরসন দেখানো হইযাছে। প্রদ্যোত এক মৃত অধ্যাপকের কন্যার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করে, এবং প্রদ্যোতের বন্ধু স্বপন তাহাদের পরিবারে প্রবেশ করিয়া প্রদ্যোতের স্ত্রী অণিমাকে তাহার কামকুটিল পঙ্কে নিমজ্জিত করিতে চেষ্টা করে। গীতা প্রদ্যোতের বাড়িতে আসিবার পর মেঘমুক্তি হয় এবং প্রদ্যোত ও অণিমার মধ্যে পুনর্মিলন হয়। পারিবারিক জীবনের সমস্যাসঙ্কুল বিষয় লইয়া নাটখানি রচিত। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাত ইহাতে ভালোভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। তবে সমস্যার সমাধান যেন লঘু ও অতর্কিতভাবে করা হইয়াছে। দাদু অতুল ঘোষের ভূমিকা অপ্রয়োজনীয়, নাটকখানির বাঁধুনি বিশেষ উৎকৃষ্ট।

॥ তাই তো ॥ 'তাই তো' হাস্যরসবহুল কমেডি। নাট্যকার তাঁহার বক্তব্যে বলিয়াছেন— 'যদি এই সঙ্কট-সঙ্কুল জীবনের কয়েকটি মুহূর্তেও কিছুমাত্র আনন্দের আদান-প্রদান করিতে পারেন, তা হ'লে কৃতার্থ হব'। জীবনময়ের দুই কন্যা মল্লিকা এবং বল্লিকা - সাহসিকা, আধুনিকা তরুণী। সমর হঠাৎ বড় লোক হইয়া বিধবা বিবাহ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সে বিষয়ে হতাশ হয়। মল্লিকা উপযাজিকা হইয়া সমরকে বিবাহ করিতে চায়, এবং উভয়ের বিবাহ হয়। বিধায়কবাবুর নাট্যকলার চমৎকারিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে সংলাপের মধ্যে ; সেই সংলাপ রসস্নিগ্ধ, কৌতুকোজ্জ্বল, প্রাণময়।

॥ বিশ বছর আগে ( ১৩৪৬ ) ॥ বিশ বছর আগে যে শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাই বিশ বছর পরে নায়কের পুনরায় ঘটনা-স্থলে আগমন উপলক্ষ্যে বর্ণিত হইয়াছে : এই নাটকের সমস্যাও মূলত সেই চিরন্তন ত্রিকোণাকার সমস্যা, অর্থাৎ এক নায়িকাকে লইয়া দুই নায়কের দ্বন্দ্ব। দুই নায়ক আবার এখানে দুই বন্ধু, সেজন্য সংঘাত বাঁধিয়াছে প্রণয় ও বন্ধুত্বের মধ্যে। কিন্তু এই সংঘাতটি নাটকের গোড়াতে যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে এবং বিশ বছর পরবর্তী নায়কের অনুতপ্ত চিত্তে যেমন উজ্জ্বল করিয়া তোলা হইয়াছে, নাটকের ঘটনা পরিণতির মধ্যে অনিবার্য শক্তিরূপে তেমন দেখান হয় নাই। প্রদীপের চরিত্রে যেমন বন্ধুর প্রতি একটা অকারণ নিষ্ঠুরতা দেখা গিয়াছে, দীপকের চরিত্রেও তেমনি একটা উদাসীন অবজ্ঞা এবং অন্তিম প্রতিহিংসা স্থান লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে উভয়ের প্রীতির সম্পর্কটি একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। নাটকের বিচিত্র উত্তেজনাজনক সংলাপ ও পরিস্থিতি এবং ক্ষিপ্র গতিবেগ ইহার নাট্যরস জমাইয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘটনার সম্ভাব্যতা ও চরিত্র বিকাশের স্বাভাবিকতা অনেকস্থলেই উপেক্ষিত হইয়াছে। সেজন্য নাটকীয় উত্তেজনা অনেকস্থলেই চরিত্রের আভ্যন্তরীণ ভাবের সহিত যুক্ত না হইয়া 'স্টান্ট'-সর্বস্ব রোমাঞ্চকরতায় পরিণত হইয়াছে। শেষ দৃশ্যের গোলাগুলির ব্যাপারে ইহা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। যে তন্বীহরণ লইয়া নাটকের এমন অপ্রত্যাশিত ও দুঃখজনক পরিণতি ঘটিল

তাহার পিছনে যেন কোন অনিবার্য কারণ নাই। প্রদীপের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যদি সে তমসাকে প্রতারণা করিয়া থাকে, তবে দীপকও তো সেই প্রতারণার অপরাধে অপরাধী। তাহা হইলে প্রদীপ এরূপ ঘৃণ্য-চরিত্র আর দীপক 'A tale of two cities'এর সিডনি কার্টনের ন্যায় প্রেমের আত্মোৎসর্গে মহৎ হইয়া উঠিল কিভাবে? প্রদীপের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা তাহারই বিরুদ্ধে রিভলভার দিয়া সাহায্য করা, তন্বীর আকস্মিক আত্মহত্যা, প্রদীপের আকস্মিক হত্যা প্রভৃতি উত্তেজনাজনক অসঙ্গতি নাটকের শিল্পায়নে ত্রুটি ঘটাইয়াছে।

## (২) শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শচীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রসিদ্ধ হইলেও তিনি কয়েকখানা উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটকও লিখিয়াছেন। সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে 'স্বামী-স্ত্রী', 'তটিনীর বিচার,' 'সংগ্রাম ও শান্তি', 'প্রলয়', 'নার্সিং হোম', 'জননী', 'মাটির মায়া', 'ঝড়ের রাতে' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শচীন্দ্রনাথের নাটকে খুব জটিল, চিত্তচাঞ্চল্যকারী সমস্যার প্রাধান্য নাই। কোনো কোনো নাটকে সামাজিক সমস্যার অবতারণা থাকিলেও তাহাতে সমস্যার উগ্রতা শান্ত ও গৌণ হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার সংলাপ প্রখর এবং প্রাণবন্ত, এবং তাঁহার নাটক আধুনিক রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে।

॥ স্বামী স্ত্রী ॥ 'স্বামী-স্ত্রী' রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। কোনো দৃশ্যের অবতারণা না করিয়া কেবলমাত্র অঙ্কের মধ্য দিয়া একখানা বড়ো নাটকের action সৃষ্টি করা কৃতিত্বের বিষয় সন্দেহ নাই। ললিত ও লিলির মধ্যে যে বিরোধ তাহা কোনো গূঢ় সমস্যাজাত নহে, বাপ মায়ের উপর আকর্ষণের জন্য স্ত্রী স্বামীর সহিত মিলিতে পারিতেছে না, ইহা খুব জোরালো সমস্যা নহে। নাট্যকার লিখিয়াছেন যে, পরিচালক দুর্গাদাসের দাবি অনুসারে তিনি শেষ অঙ্কটী রচনা করিয়াছেন। অবশ্য অভিনয়ের সময় সু-অভিনয় এবং দৃশ্যপটের সমবায়ে দৃশ্যটি জমে ভালো. কিন্তু নাটকের দিক দিয়া ইহা মূল্যহীন।

॥ তটিনীর বিচার ॥ 'তটিনীর বিচার'ও রঙ্গালয়ে দর্শকদের মধ্যে অশেষ চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়াছিল। নাটকের ডাঃ ভোসের ভূমিকাটী অভিনব। এই ভূমিকায় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

॥ মাটির মায়া ॥ 'মাটির মায়া'তে লেখকের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য, মাটিও চাই, মেশিনও চাই। জাতি যদি মাটির মায়া একেবারে কাটিয়ে মেশিন নিয়ে মত্ত হয়, তা হ'লেও যেমন এ জাতির কল্যাণ হবে না—তেমন মেশিনের জন্যে খানিকটা মাটি যদি আজ ছেড়ে দিতে না পারে তা হ'লেও কল্যাণের পথের সন্ধান পাওয়া যাবে না।' নাটকের মধ্যে জীবন্ত পল্লী-প্রকৃতির সরস প্রাণবানতা উচ্ছল নৃত্যে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, ইহার রোমান্টিক সুর উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু যে মাধব মোড়ল যন্ত্রের উপাসক অরবিন্দের সহকারী হইয়াছিল, শেষ মুহূর্তে মাটির জন্য তাহারই এরূপ মমত্বপূর্ণ ব্যাকুলতা সামঞ্জস্যহীন।

## (৩) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁহার 'কালিন্দী', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি' প্রভৃতি উপন্যাসের তুলনা নাই। সম্প্রতি তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাসের প্রতিভা নাটকে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারে নাই। নাটকের জগৎ স্বতন্ত্র ; ইহার ধরণ, রীতি, ভাষা ভিন্ন ; শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক চেষ্টা করিলেই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হইতে পারেন না, তারাশঙ্করও পারেন নাই। উপন্যাসে তিনি জীবন্ত গ্রাম্য প্রকৃতির পটভূমিকায় যে সরস, বাস্তব, প্রাণবান জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন, নাটকে তাহার সুযোগ নাই। তারাশংকরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায়, সংলাপে নয়, অথচ এই সংলাপই নাটকের প্রাণ। নাটকীয় গতি সঞ্চার করিতে তিনি অনেক সময়েই অকারণ দ্রুততা এবং অনাবশ্যক উত্তেজনাময় দৃশ্যের আমদানী করিয়াছেন। নাটকের উৎকর্ষ যে আরও সূক্ষ্ম, আরও কৌশলপূর্ণ টেকনিকের উপর নির্ভর করে তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

॥ দুই পুরুষ ॥ তারাশংকরের 'দুই পুরুষ' নাটকখানি উচ্চ প্রশংসায় ভূষিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাটকীয় উৎকর্ষ নাই ইহা সত্যের খাতিরে বলিতে হয়। পিতা ও পুত্রের মধ্যে মন ও মতের সংঘাত স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। শিবনারায়ণের চরিত্র অপরিপূর্ণ ও অপরিস্ফুট। সুশোভন চরিত্রটী বিশেষ দরদের সহিত অংকিত হইয়াছে, এবং দর্শকের সহানুভূতিশীল আগ্রহ সর্বক্ষণ ইহার উপর নিবদ্ধ থাকে। নাটকের সংলাপ সাধারণ ও বৈশিষ্ট্যহীন।

॥ কালিন্দী ॥ 'কালিন্দী' নাটক ঐ নামীয় উপন্যাস হইতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু বৃহদায়তন উপন্যাসের রস নাটকের স্বল্প পরিসরের মধ্যে বেমানান ও খাপছাড়া হইয়াছে। রামেশ্বর ইন্দ্ররায়ের ভগ্নীপতি, সে নিজের পুত্র ও স্ত্রীকে হত্যা করে। যেভাবে সে হত্যা করিয়াছে তাহাতে তাহাকে নৃশংস পাপী বলিয়াই মনে হয়। তাহার মুখে রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাসের কবিতার প্রসন্ন আবৃত্তি শোভা পায় না। মহীনের গুলি করিয়া হত্যা করার ব্যাপারটা অত্যন্ত cheap হইয়াছে। নাট্যকার অহীনকে নাটকের মধ্যে বড়ো বেশি আদর্শায়িত করিয়া ফেলিয়াছেন।

॥ পথের ডাক ॥ 'পথের ডাকে' আধুনিক যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। মহান আদর্শবাদ ও সুগভীর দেশাত্মবোধের পরিচয় এই গ্রন্থের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। ডাঃ চ্যাটার্জী আমাদের দেশের জাতীয় ভাব ও সংস্কৃতির বাহক, নিখিলেশ বিবেকানন্দের সেবাধর্মের আদর্শে দীক্ষিত ব্রতধারী যুবক। রমা নিখিলেশের সহকর্মিণী এবং সুনন্দাও মনে মনে নিখিলেশের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবতী, অপরদিকে রায় বাহাদুর ও অতুল আধুনিক শিল্পযুগের লক্ষ্মীবান, কর্মিষ্ঠ ও আত্মবিশ্বাসী মানব। নাটকের ক্রিয়া সঞ্চার করিতে যাইয়া নাট্যকার শেষের দিকে কতকগুলি অকারণ ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। ডাঃ চ্যাটার্জী ও সুনন্দার মৃত্যু নাটকের ঘটনার দিক দিয়া

অপরিহার্য নয়। নিখিলেশের প্রতি রমার আকর্ষণ বরাবর চাপাই রহিয়াছে, এবং সুনন্দার দুর্বলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

## (৪) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ বন্ধু ॥ শরদিন্দু শক্তিমান সাহিত্যিক, তাঁহার নাটকেও এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নাটকে কোনো ঘোরালো সমস্যা নাই, স্নিগ্ধ কৌতুক, এবং রোমান্সরসপূর্ণ ঘটনায় তাঁহার নাটক প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'বন্ধু' নাটকখানি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব আছে সন্দেহ নাই। ইহার দুই একটি চরিত্র একটু অপ্রাকৃত মনে হইতে পারে। সেই সম্বন্ধে লেখকের কৈফিয়ৎ উল্লেখ্য—'আর্টের ক্ষেত্রে সত্যকে ধরিতে হইলে সম্ভবকে কতদূর অতিক্রম করা যাইতে পারে, তাহার সীমা এখনও নির্দিষ্ট হয় নাই। এক্ষেত্রে চার্লস ডিকেন্স ও চার্লি চ্যাপলিন আমার নজির।' আত্মভোলা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানাঞ্জন, ফ্রয়েড-শিষ্য প্রেমকুমার, জুয়ার আড্ডার কেবলরাম এবং গজানন ইহারা প্রত্যেকেই অশেষ কৌতুকময় ও চমকপ্রদ। প্রণয়ী-যুগল হেমন্ত ও অশনির সহিত প্রণয়িনীদ্বয় ঊর্মিলা এবং মন্দার কৌতুকপূর্ণ ভুল ভ্রান্তি এবং প্রণয়ের আদান-প্রদান উপভোগ্য, অশনির প্রতি গুণ্ডার আক্রমণের অংশটুকু দুর্বল ও ইহার পরবর্তী ব্যাপার—ঊর্মিলার উদ্বেগ এবং সেবাও বৈচিত্র্যহীন ভাবতারল্যপূর্ণ।

॥ ডিটেকটিভ ॥ 'ডিটেকটিভ' নাটকখানির ঘটনার মধ্যেও নূতনত্ব আছে। তরুণ জমিদার অনন্ত চৌধুরীর ডিটেকটিভ হওয়ার ভারি সখ। পিতৃবন্ধু জগদীশের নিরুদ্দিষ্ট কন্যা মহামায়ার সন্ধান করিতে সে কলিকাতায় আসে, এবং কেয়া ওরফে মহামায়ার সহিত পরিচিত এবং প্রেমে পতিত হয়। কেয়ার বন্ধু নলিনীকে সে মহামায়া বলিয়া ভুল করাতে সামান্য জটিলতার সৃষ্টি হয়। কেয়া এবং অনন্তের রোমান্টিক প্রেমই কাহিনীর মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। নলিনীর প্রণয়ী তোৎলা সমরেশ বিশেষ সরস ও হাস্যকর চরিত্র।

## (৫) অয়স্কান্ত বক্সী

॥ ভোলা মাষ্টার ॥ শ্রীযুক্ত অয়স্কান্ত বক্সীর 'ভোলা মাষ্টার' নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইলেও নাটক হিসাবে ইহার তেমন কোনো গুণ ও মূল্য নাই। ভোলা মাষ্টার একজন গ্রাম্য স্কুল মাষ্টার—আদর্শ শিক্ষক। তাঁহার একমাত্র আশা ছেলেকে হাকিম করিবেন, একদিন স্কুল ফণ্ডের আট হাজার টাকা তাঁহার হাতে পড়িল। সেই টাকা লইয়া তিনি কলিকাতায় গেলেন, এবং পাঁচ হাজার টাকা পুত্রের শিক্ষার জন্য আত্মসাৎ করিলেন। গ্রামের লোক জানিল ভোলা মাষ্টার আততায়ীর হস্তে হত হইয়াছেন। কালক্রমে তাঁহার পুত্র সমরেন্দ্র জিলা জজ হইল, একদিন ইস্কুলের উদ্বোধন-উৎসবে পৌরোহিত্য করার জন্য তাহার নিমন্ত্রণ হইল। ভোলা মাষ্টার ভিখারী মৃত্যুঞ্জয়ের ছদ্মবেশে পুত্রের গৌরব দেখিয়া আত্মপ্রসাদ বোধ করিলেন। স্ত্রীর কাছে তিনি নিজেকে

প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ছেলের কাছে ধরা দিলেন না। ভোলা মাষ্টারকে খুব আদর্শ শিক্ষক বলা হইয়াছে, কিন্তু পুত্রকে হাকিম করার স্বপ্ন শিক্ষকের আদর্শের সহিত সঙ্গতিহীন। তাঁহার ছদ্মবেশের বেদনাও কোনো আদর্শজনিত নহে। সুতরাং এই আত্ম-ত্যাগ তেমন কোনো মাহাত্ম্যপ্রকাশক নহে। হেড মাষ্টারের বড় বড় বক্তৃতাও নাটকের মূল কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন অনর্থক আদর্শবাদ। নাটকের সংলাপ দুর্বল ও বৈশিষ্ট্যহীন।

॥ ডক্টর মিস কুমুদ ॥ 'ডক্টর মিস কুমুদ' আটটী দৃশ্যে সমাপ্ত। প্রথম দিক দিয়া ঘটনার বৈচিত্র্যে নাটকখানি জমিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু শেষে একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে। ঘটনা সংস্থাপনের নূতনত্ব ও বৈচিত্র্যের অভাবেই এই একঘেয়েমি আসিয়াছে। সমীরণ এবং মিস কুমুদের কথাগুলি বেশ ঝলসানো এবং চমকপ্রদ। কাণাকড়ি গাঁটকাটার ছোট ভূমিকাটীও বিশেষ সরস ও কৌতুকাবহ। নাটকের সংলাপ witty এবং ধারালো।

## (৬) প্রমথ নাথ বিশী

প্রমথবাবুর নাটকে তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপের কটুরসের সহিত তীক্ষ্ণ কথাবার্তার অম্লরস সংমিশ্রিত হইয়াছে। তাঁহার নাটকের রস আস্বাদনকালে ওষ্ঠাধর বিকৃত ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কুঞ্চিত হইয়া আসে। অমৃতলালের প্রতিভার উত্তরাধিকারী তিনি। সেইজন্য তাঁহার নাটকে কেবল আঘাতের পর আঘাত, সেখানে বিন্দুমাত্র ক্ষমাসিক্ত সহানুভূতির স্থান নাই। তিনি বার্ণার্ড শকে গুরু বলিয়া মানিয়াছেন এবং গুরুর আত্মম্ভরিতা ও বিশ্ববিদ্বেষ নকল করিতে চাহিয়াছেন। 'ঘৃতং পিবেৎ' নাটকের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—'বিধাতার দুইটী মূর্তিমান ভূমিকা। বিধাতা পুরুষ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া বুঝিতে পারিলেন কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা ব্যতীত ইহা দুর্বোধ্য তাই তিনি জি, বি, এস ও প্র-না-বি নামধেয় দুই ভূমিকাপন্থী লেখককে সৃষ্টি করিয়াছেন।' প্রমথবাবু বুঝিয়াও বুঝেন নাই যে জি, বি, এস-এ যাহা শোভা পায়, প্র-না-বিতে তাহা শোভা পায় না। লোকে অসাধারণ মননশীল বার্ণার্ড শ-এর প্রতিভার কাছে নতি স্বীকার করে, কিন্তু প্রমথবাবুর অশোভন আত্মসর্বস্বতা মানিয়া লইতে পারে না! প্রমথবাবুর লজ্জা ও খেদ মূর্খ বাঙালী এ পর্যন্ত তাঁহার লেখাকে আদর করিতে পারে নাই। কিন্তু এই মূর্খদের কেহ কেহ বুঝিয়াছে যে তাঁহার লেখা মলিয়েরের ও অমৃতলালের বিশ্বস্ত এবং সক্ষম অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি যে অনেক স্থলেই মলিয়েরের ভাব ও ভঙ্গি আত্মসাত করিয়াছেন তাহা দৃষ্টিশীল সমালোচকের কাছে অস্পষ্ট নহে।

॥ ঋণং কৃত্বা ॥ 'ঋণং কৃত্বা' নাটকের মধ্যে একটা ভারী কৌতুকময় ব্যাপারের সমাবেশ করা হইয়াছে। সনৎকুমার ঋণ শোধের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, সে নিজে এবং তাহার ছাত্রগণ মহাজনদের ঠকাইবার নানা নীতি ও পন্থা শিখিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই সরস, অভিনব ব্যাপারটি নাটকের মধ্যে অকস্মাৎ শেষ হইয়া গিয়াছে। কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা-স্রোতের মধ্যে ইহার কোনো স্থান নাই। ইহা নাটকখানির একটি ত্রুটি। সনৎ-মঞ্জরী এবং ললিত-মণিকার প্রেমঘটিত কৌতুকময় জটিলতা ও তাহার সমাধানের মধ্যে মলিয়েরের প্রভৃতি নাট্যকারদের

অনেক নাটকের কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে। মলিয়েরের মত যুগল চরিত্রের ক্রিয়া এবং কথার যুগপৎ সমাবেশের দ্বারা নাট্যকার বিচিত্র কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছেন; ডাক্তার, উকীল প্রভৃতির প্রতি শ্লেষ অমৃতলালের 'খাসদখল' প্রভৃতি নাটকের কথা মনে করাইয়া দেয়।

॥ ঘৃতং পিবেৎ ॥ সর্বেশ্বর সিংহ নগেন্দ্রনাথের সহায়তায় প্রতারণার ফাঁদ্ পাতিয়াছে। ধনী এবং সংস্কৃতিমান বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য সে নানারকম ছলনা ও কৌশলের আশ্রয় লইয়াছে, এবং কন্যা প্রমীরাকেও সেভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে। অন্যদিকে ত্রিদিবনারায়ণ তাঁহার আত্মীয় বিজয়নারায়ণের সহযোগে অনুরূপভাবে রাজা বলিয়া নিজেকে জাহির করিয়াছে। নাটকের আর একটী রহস্যঘন উপকাহিনী আছে। নীরজা এবং মালবিকা, ইহারা স্বামী-স্ত্রী হইয়াও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, এবং নানা রহস্যমধুর পরিস্থিতির মধ্য দিয়া পুনরায় নিজেদের পরিচয় প্রাপ্ত হয়। নাটকের মধ্যে তীক্ষ্ণধার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ফলাগুলি ঝলসাইতে থাকিলেও ইহার পরিণাম রসাল কৌতুকের কোমল রসে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। লেখক কৃত্রিম বিষাদের বাষ্প দিয়া নাটকের সর্বব্যাপী সরস প্রসন্নতার দীপ্তি মাঝে মাঝে ঢাকিয়া আমাদের অমূলক উদ্বেগ লইয়া কৌতুক করিয়াছেন। নাটকখানির মধ্যে মলিয়েরের 'The Cit Turned Gentleman' নাটকের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। মলিয়েরের অনুরূপ প্রমথবাবুও নাটকের মধ্যে দুই ঘটনার সাদৃশ্য (Parallelism) এবং বৈপরীত্য (Contrast) দেখাইয়াছেন। ডাক্তার, কমরেড প্রভৃতির প্রতি শ্লেষ সুস্পষ্ট।

॥ মৌচাকে ঢিল ॥ 'মৌচাকে ঢিলে'র মধ্যে উদ্ভট (Grotesque) বিষয়ের অবতারণা খুব বেশি। এই নাটকেও তিনি নিজেকে ছাড়া আর সকলকে লইয়াই উপহাস করিয়াছেন। তবে অনেক সময়েই মনে হয় যে তাঁহার উপহাসের মধ্যে যেন অনিবার্যতা নাই। এই উপহাস আমাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়া তোলে।

॥ পরিহাস বিজল্পিতম্ (দ্বি-স—১৩৫৩) ॥ আমাদের বর্তমান সমাজের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতিগুলি প্রমথবাবুর বক্র ও শাণিত দৃষ্টিতে যেমন ধরা পড়িয়াছে এমন আর কাহারও দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। সেজন্য তাঁহার নাটকে হৃদয়ের আবেগ অপেক্ষা মননের খরদীপ্তি অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আলোচ্য নাটকেও তিনি শিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন বাঙালী সমাজের কোন শ্রেণীকেই তাঁহার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ হইতে নিষ্কৃতি দেন নাই। সেই বিদ্রূপে জ্বালা আছে, কিন্তু তাহাতে না হাসিয়াও পারা যায় না। কারণ লেখকের গোঁড়ামি নাই, আর নাই কোন পক্ষপাতিত্ব। অবশ্য তর্ক-বিতর্ক, মত ও মন্তব্যের সংঘর্ষের অন্তরালে মিনি ও মিনির প্রণয়ীর সঙ্কোচ-ভীরু প্রণয়ের হাস্যমধুর দৃশ্য এক অনিবার্য আকর্ষণে আমাদের রসায়িত চিত্তকে কৌতূহলী করিয়া রাখে। নাটকটি শুধু অভিনেতব্য নহে, পাঠ্যও বটে। কারণ লেখক ঘটনা ও চরিত্রের বর্ণনা দিবার সময় এমন সব মন্তব্য করিয়াছেন যেগুলি নাটকের অন্যতম রসসম্পদ।

## (৭) মনোজ বসু

আধুনিক কথাসাহিত্যকে যাঁহারা উত্তুঙ্গ গৌরবশিখরে উন্নীত করিয়া তুলিয়াছেন মনোজ বসু সেই অগ্রণী কথাশিল্পীদের অন্যতম। বাংলার চরে বিলে, প্রান্তরে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যিনি গল্প ও উপন্যাসের জীবনরস সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছেন পরিণত বয়সে তিনিই মাঝে মাঝে মঞ্চপ্রদীপের সম্মুখে আসিয়া নাট্য-ভারতীর বন্দনায় নিরত হইয়াছেন। কিন্তু শিল্পের শ্রেণী বদলাইলেও শিল্পী-মানস তো বদলাইতে পারে না। সেজন্য তাঁহার নাটকে আমরা তাঁহাকেই পাইয়াছি—সেই দরদী, স্বপ্ন-বিলাসী, বিদ্রোহবহ্নিবাহী একই সাহিত্যিককে। বাংলার দক্ষিণী প্রত্যন্ত প্রদেশের খরসলিলা নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মনোজবাবুর কল্প-মানস বিচরণ করিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল ভৈরবের বিচিত্র প্রকৃতির সহিত হাতীপোতা আর গলাকাটার চরের কত রহস্যজটিল ইতিহাস জড়িত হইয়া আছে আজ তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। কালের ভ্রূকুটি-কৌতুকে প্রকৃতির দৃশ্যপট অতি দ্রুত সরিয়া যাইতেছে, প্লাবনের প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে পুরাতন জীবন তলাইয়া যাইতেছে আর নূতন জীবন ভাসিয়া উঠিতেছে। লেখক যুগসন্ধিক্ষণে ভাঙ্গাগড়ার এই বিচিত্র অভিনয় করুণ অথচ আশাবাদী দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রাচীন জীবনের প্রতি একটু দুর্বল মমতা থাকিলেও নবজীবনের প্রাণময় বৈতালিকই তাঁহার কণ্ঠে প্রধানত ধ্বনিত হইয়াছে। সেই জীবন এখনও হয়তো আসে নাই, কিন্তু তাহা সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে জায়মান, তাহার অরুণ-লিখন আকাশের পূর্বপ্রান্তে ভাসিয়া উঠিয়াছে। স্বপ্নসন্ধানী লেখকের আদর্শ দৃষ্টি সেইদিকে নিবদ্ধ—তাঁহার রোমাঞ্চিত বক্ষ ভেদ করিয়া উদ্বেলিত ভাবতরঙ্গ উদ্গত হইয়া আসিতেছে। যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন মুক্তি-পাগোল দেশের হৃদয়কে তীব্রভাবে বিচলিত করিয়াছে লেখক তাহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগ রাখিয়াছেন। মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিকদের আত্মত্যাগ যেমন তাঁহার লেখনীর মুখে অনন্য গৌরব লাভ করিয়াছে, তেমনি আবার বিশ্বাসঘাতক, সমাজদ্রোহী স্বার্থপরের চরিত্র তাঁহার কাছে পাইয়াছে অতি সুকঠিন আঘাত। কিন্তু কচিৎ শ্লেষ ও বিদ্রূপের শাসন থাকিলেও স্নেহ ও করুণার আসন কথনো তাঁহার টলে নাই। নীলাম্বর ও হিরণ্ময়ের মত চরিত্র সমাজের অবজ্ঞা কুড়াইলেও লেখকের সহৃদয় সহানুভূতিতে তাহারা অতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের মূল্যবোধ ও ন্যায়ের ধারণা যে কত অসার ও মিথ্যা লেখক তাহা বহুস্থলেই চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

নাটকের মধ্যে মনোজবাবুর যে জীবনদৃষ্টির স্বাক্ষর রহিয়াছে তাহা উপরে আলোচিত হইল। তাঁহার নাটক নাটকত্বের উর্ধ্বে একটি বিশেষ জীবন বাণী বহন করিতেছে। সুতরাং সেই নাটক আলোচনায় শিল্প অপেক্ষা বাণীর প্রাধান্য স্বীকার করিতেই হইবে। অবশ্য নাট্য-রচনায় তিনি আধুনিক নাট্যশিল্পের সক্ষম অবতারণা করিতে চাহিয়াছেন। বর্তমান নাট্যমঞ্চের প্রয়োজনে অঙ্ক ও দৃশ্যসংখ্যা কমাইয়া একই সেটে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীকে সুকৌশলে আনিয়া তিনি নাটকের গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছেন। নাটকের

মধ্যে বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ মঞ্চ-নির্দেশ দিয়া তিনি স্রষ্টার সীমানা হইতে বহুদূর আগাইয়া যাইয়া প্রয়োগকর্তার সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। তবে নাট্য-জগতে প্রবেশ করিলেও তাঁহার স্থান যে যবনিকার অন্তরালে ইহা তিনি অনেক ক্ষেত্রেই ভুলিয়া গিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার নাটকে নাট্যকারের বস্তুনিষ্ঠার স্থলে কথাকারের আত্মবিলাস বহু জায়গাতেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

॥ প্লাবন (১৩৪৮) ॥ মনোজ বাবুর প্রথম নাটক। এক প্লাবনে নাটকের সূচনা এবং আর এক প্লাবনে ইহার সমাপ্তি। প্লাবন যে খেত-খামার ডুবাইয়া ঘর-বাড়ি ভাসাইয়া দেয় তাহা নহে, ইহা মানুষের স্বচ্ছন্দ গৃহজীবন ছিন্ন করিয়া আনিয়া নূতন অজানা দ্বীপে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। এই ভাবেই নিশারাণীর জীবন স্বামীর কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শেখরের জীবনের সহিত যুক্ত হইয়া গেল। নিশারাণী পুনরায় স্বামীকে পাইল, কিন্তু তখন তাহাদের প্রয়োজন ফুরাইয়া আসিয়াছে। নূতন জীবন আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রকৃতির এই অমোঘ, অনিবার্য নিয়ম মানিয়া লইয়াই তাহারা প্রলয় পয়োধি জলে নিজেদের নিমজ্জিত করিয়া দিল। কিন্তু একটি খটকা থাকিয়া যায়। যে শেখরের প্রতি সে দুর্বলতা বোধ করিয়াছে ১; পনেরো বৎসর ধরিয়া যাহার স্মৃতি সে হৃদয়ে বহন করিয়া তাহার কন্যাকে নিজের কন্যার ন্যায় পালন করিয়াছে স্বামীকে হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া সে কি তাহাকে একেবারেই হৃদয় হইতে নিঃশেষে নির্মূল করিতে পারিল? সামান্য কোন দ্বন্দ্ব, ক্ষণিকের কোন দুর্বলতা কি তাহার চিত্তকে বিচলিত করিল না? শেখরের আশ্রয়ে আসিবার পর সে দীর্ঘকাল তাহাকেই একমাত্র অবলম্বন করিয়া দিন কাটাইয়াছে সেই সত্য কি তাহার হঠাৎ-দেখা স্বামীর প্রভাবে একেবারেই গুঁড়াইয়া গেল? নাটকের মধ্যে শেখরের দুর্বার, সুকরুণ প্রেমাবেগ বোধ হয় পাঠক ও দর্শকের মনে সর্বাপেক্ষা বেশি করুণা ও চাঞ্চল্য উদ্রেক করে। এই উদার, মহাপ্রাণ যুবক প্রেমের পাষাণ-বেদীতে মাথা ঠুকিতে যাইয়া নিষ্ঠুর ঘাতকের হাতে প্রাণ হারাইল—এই দুঃখময় স্মৃতি কখনো ভুলিবার নহে। কমলেশ ও নীলাম্বরের সহিত নিশারাণীর যে সংঘাত বাধিয়াছে তাহার কারণ খুব স্পষ্ট ও জোরালো নহে। তাহারা দুইজন দুঃখী প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে কিন্তু নিশারাণীও তো অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক জমিদার নহে। সে সম্বলহীন, সহায়হীন নারী মাত্র; তাহাকে ভয় দেখাইয়া কৌশলে চার হাজার টাকা হস্তগত করা কমলেশের পক্ষে এমন কি পৌরুষের কার্য হইয়াছে? নিশারাণীর অসহায়তার সুযোগ লইয়া সদ্যপ্রাপ্ত অধিকারের ফলে তাহারই বাড়ি হইতে তাহাকে তাড়াইবার আয়োজনের মধ্যেও বা ন্যায়ধর্মের পরিচয় কোথায়? সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক হইয়াছে সবিতার আচরণ। নীলাম্বরের প্রতি আকস্মিক সহানুভূতির ফলে সে মাতার এত দীর্ঘকালের স্নেহঋণ মুহূর্তের মধ্যেই বিসর্জন দিয়া তাহারই বিরুদ্ধে দাঁড়াইল? ইহা এক হৃদয়হীন অকৃতজ্ঞতার চরম দৃষ্টান্ত। নাট্যকারের লক্ষ্য ও সহানুভূতি নিশ্চয়ই

১। নিশারাণী। আমার মন দুর্বল। আর বলবেন না—বলবেন না আমায়। পৃঃ ১৩

কমলেশ এবং নীলাম্বরের উপর, কিন্তু আসলে নিশারাণীই প্রকৃত অনুকম্পা ও সহানুভূতির পাত্রী হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের মধ্যে চমকপ্রদ ঘটনার দ্রুত গতিবেগ সঞ্চার করা হইয়াছে, সেজন্য রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

॥ নূতন প্রভাত (১৩৫০) ॥ নূতন প্রভাতের আলোকচ্ছটা কবে পূর্ব দিগন্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে ভাগ্যহত সর্বহারা মানুষ সেদিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকে, কিন্তু তাহার পূর্বে দুঃখনিশার দুর্গম পথে তাহাকে চলিতে হয়। সেই পথের বাঁকে বাঁকে রহিয়াছে 'কণ্টকের অভ্যর্থনা' ও 'গুপ্তসর্পের গূঢ় ফণা', 'পণ্ডিতের মূঢ়তা, ধনীর দৈন্যের অত্যাচার আর সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপ'। সেই ক্লেশাকীর্ণ পথের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে দরদী লেখকের করুণাসিক্ত লেখনীর মুখে। যুগ যুগ ধরিয়া মহেশ্বরের বজ্রমুষ্টি কান্তরাম ও রহিমের ক্ষীণ, বুভুক্ষু উদরগুলিকে পিষিয়া ধরিয়াছে, পুরুষানুক্রমে রায়সাহেবের দল চিত্তের বিনিময়ে বিত্তের পাহাড় খাড়া করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু একদিন আসে যেদিন তাহাদের মুষ্টি শীতল হইয়া পড়ে, পাহাড়ের চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়। সেদিন তাহাদের পুত্রকন্যা পর্যন্তও তাহাদের বিরুদ্ধে চলিয়া যায়, এ কথা অলঙ্ঘ্য নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক নিয়ম। পুরাতন তন্ত্র তাহার উদ্ধত শির লইয়া লুটাইয়া পড়িতেছে আর এক নবতন্ত্র তাহার স্বপ্নমণ্ডিত চূড়া ধীরে ধীরে উন্নত করিয়া তুলিতেছে। ইহার জন্য শশাঙ্কের ন্যায় কত নির্ভীক তরুণ প্রাণের নিবেদন প্রয়োজন হয় কে তাহার হিসাব রাখিবে? নাট্যকার তাঁহার শ্লেষশাণিত সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন সমাজের বিভিন্ন আনাচে কানাচে—হলধরের ন্যায় পদলেহী পিশাচ আর আমিনুলের ন্যায় বিভেদকারী সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক—কেহই তাঁহার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। গোর্কির 'মা' চরিত্রের প্রভাবে এই নাটকের মা অঙ্কিত হইয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু এই রকম মা যেদিন দেশের ঘরে ঘরে আবির্ভূতা হন সেদিন আর তাহার মুক্তির বিলম্ব থাকে না।

॥ বিপর্যয় (১৩৫৫) ॥ সংসারে আমরা ভুল করি, ভুল বুঝি, সেই ভুলের নেশায় দিশাহারা হইয়া আমরা যে শুধু পরের অপকার করি তাহাই নহে, আমরা নিজেদের জীবনেও চরম ক্ষতি টানিয়া আনি। তারপর একদিন ভুল ধরা পড়ে, তখন অপচিত জীবনের জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠে, কিন্তু তাহা যে বহুদূরে, নাগালের বাহিরে। সমাজ জীবনে এই ট্র্যাজেডি বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, আলোচ্য নাটকেও এই ট্র্যাজেডির একটি করুণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। নলিনী তাহার স্বামী হিরণ্ময়ের মিথ্যা অপবাদ বিশ্বাস করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যে বিচ্ছেদ সামান্য বোঝাপড়ায় মিটিয়া যাইত তাহাই তাহাদের জীবনে চিরন্তন হইয়া রহিল। হিরণ্ময় নলিনীকে ছাড়া জীবনে আর কাহাকেও ভালোবাসে নাই, নলিনীও কপালের সিঁদুর মুছিয়া ফেলিলেও পাতিব্রত্যের অক্ষয় সিঁদুরে তাহার হৃদয় চিরদিন রাঙাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তবুও তো তাহারা পরস্পরকে আর পাইল না, তাহাদের ভুলের জাল বাহিরের চক্রান্তে আরো জটিল হইয়া তাহাদের বাঁধিয়া ফেলিল, উদ্ধারের আর কোনই উপায় রহিল না। এক নৌকায় তাহারা জীবন ভাসাইয়াছিল কিন্তু হঠাৎ একটি নিষ্ঠুর ঝড় আসিয়া তাহাদিগকে পরস্পরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া

দুরবর্তী দুইটি দ্বীপে ফেলিয়া দিল, চতুর্দিকে অথৈজল, মিলিবার আর কোন উপায় নাই। লেখক যদি পরিশেষে তাহাদের মিলন ঘটাইয়া দিতেন তাহা হইলে তাহা রঙ্গমঞ্চের দিক দিয়া জনপ্রিয় হইত বটে কিন্তু তাহা কখনো জীবনের সমস্যাটিকে এভাবে আমাদের হৃদয়ের দ্বারে পৌছাইয়া দিতে পারিতেন না। হিরণ্ময় ও নলিনীর জীবনের মাঝে আর একটি জীবন শুভ্র সুন্দর এক পুষ্পের ন্যায় ফুটিয়া ঝড়িয়া গেল। ইহা আরো করুণ, আরো দুঃখময়। নলিনী তো হিরণ্ময়ের ভালোবাসা ষোল আনাই পাইয়াছিল বিধাতা তাহার মাতৃ-হৃদয়ের অভাবও পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মলয়া পাইল কি? গৌরীর তপস্যা অবশেষে সফল হইয়াছিল, কিন্তু মলয়ার তপস্যা তো শেষ পর্যন্ত তপস্যাই রহিয়া গেল। নিজের জীবনটিকে প্রদীপের সলিতার ন্যায় জ্বালাইয়া রাখিয়া সে তাহার প্রাণের দেবতার নীরব আরতি করিয়াছে। কিন্তু যেদিন সে আবিষ্কার করিল দেবতা সত্যই পাষাণ, তাহার হৃদয়ে এতটুকু দাগ পড়ে নাই সেদিন তাহার জীবনের দীপ্তিও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। অন্যায় বিচার ও হৃদয়হীন শাস্তি লইয়া যে সমাজের বেসাতি সেই সমাজের প্রতি লেখকের প্রচ্ছন্ন শ্লেষ নাটকের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। সমাজ অভিশাপের টিকা আঁকিয়া দেয় হিরণ্ময় ও নলিনীর জীবনে, কিন্তু অরুণকিশোরের ন্যায় ভণ্ড চরিত্রহীনের পায়ে লুটাইয়া পড়ে। স্তাবক ধনীপদলেহী সমাজের ইহাই এক বাস্তব রূপ। নাটকের ঘটনা বিন্যাসের কৌশল প্রশংসনীয়। একই দৃশ্যের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের পর পর আগমন ও নিষ্ক্রমণ ঘটাইয়া নাট্যকার নাটকের গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়াছেন ও আমাদের নাট্যকৌতূহল উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছেন। নাটকের সংলাপ বুদ্ধি-মার্জিত, ব্যঞ্জনাময় ও অনেক স্থলেই গূঢ় সাঙ্কেতিকতায় রহস্যময়। নাটকের ঘটনার অন্তরালে যে রহস্য-যবনিকা আছে দর্শকদের কাছে তাহা প্রকাশিত নয় বলিয়া অনেক সময় সাঙ্কেতিকতাপূর্ণ আলাপ ও মন্তব্য তাহাদের কাছে দুর্বোধ হইয়া পড়ে। অরুণকিশোরের চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদের গোড়া হইতে ধারণা থাকে না বলিয়া হিরণ্ময়ের ব্যঙ্গোক্তি এবং তাহার আচরিত ভণ্ডামির রস গ্রহণ করিবার পথে ব্যাঘাত ঘটে।

॥ রাখিবন্ধন (১৩৫৬) ॥ রাখিবন্ধন হৃদয়-দ্বন্দ্বজটিল নাটক নয়, ইহা আমাদের দেশের রাজনৈতিক চক্র-পরিক্রমার আংশিক ইতিহাস। ইহার দুই অঙ্কে বাংলার মুক্তি-সংগ্রাম ও তাহার পরিণতির দুইটি অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে যে সব তরুণ যুবক মুক্তির স্বপ্নে মাতাল হইয়া 'ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান' গাহিয়া গেল ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে তাহারাই পরিণত বয়সে স্বাধীন রাষ্ট্রক্ষেত্রে খণ্ডিত বাংলার অভিশপ্ত আশ্রয়প্রার্থীরূপে সকলের অবজ্ঞা ও করুণা কুড়াইবার জন্য বাঁচিয়া রহিল। জাতির স্বপ্ন ও সাধনার কি শোচনীয় পরিণতি! স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি বটে কিন্তু ইহার জন্য যে মূল্য আমরা দিয়াছি তাহা প্রতি-নিয়ত আমাদের এই বিকলাঙ্গ স্বাধীনসত্তাকে কঠোর পরিহাসে জর্জরিত করিতেছে। লেখক এই তথাকথিত স্বাধীন জাতির লজ্জাকর মর্মবেদনা মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন, সেই অনুভূতির রূপ দিতে যাইয়া তিনি অনেক সময় তাঁহার উচ্ছ্বাস-প্রবাহে আর্টের প্রয়োজন ভাসাইয়া দিয়াছেন, অনেকস্থলেই নাট্যরস রাজনীতির বালুচরে হারাইয়া গিয়াছে।

তিনি অদম্য আশাবাদী, সেজন্য খণ্ডিত বাংলার মধ্যে রক্তরাঙা রাখিবন্ধনের স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছেন, যদিও এ স্বপ্ন বোধ হয় চিরদিন স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। নাটকের মধ্যে রাজনীতির সমষ্টিগত বহির্মুখী রূপই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, ব্যক্তিজীবনের সূক্ষ্ম অন্তরসংঘাত ইহাতে তেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবে আমাদের রাষ্ট্রজীবনের বিভিন্ন স্তরে সমাজের বিশেষ বিশেষ চরিত্র কি রকম বিচিত্র মনোবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছে নাট্যকার পর্যবেক্ষণশীল লেখনীর মুখে তাহার সার্থক রূপ দান করিয়াছেন।

## (৮) যোগেশ চৌধুরী

স্বর্গত নট ও নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীর নাটকে আধুনিক ভাব ও লক্ষণ পরিস্ফুট নহে। বর্তমান কালের নাটকে যেমন জটিল মনস্তত্ত্বের সংঘাত, নূতন সমস্যা ও ভাবের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার নাটকে তেমন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর জমিদার-প্রধান সমাজ লইয়া তাঁহার নাটক রচিত। পুরাতন সামাজিক ও ধর্মনৈতিক আদর্শের প্রতি নাট্যকারের মোহ এবং আনুগত্যও খুব স্পষ্ট। গিরিশচন্দ্রের নাটকের ন্যায় তাঁহার নাটকে স্থূল ও মোটা মোটা দৃশ্যের সমাবেশ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্রকে আদর্শ করিয়াই তিনি যে নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা সহজে বুঝা যায়।

'পরিণীতা'র মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রীপতি এবং তাঁহার প্রতিবেশী বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী রমানাথের ভিতর শক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবার উপক্রম হইলেও এই দুই প্রবল শক্তির সংঘর্ষ সারদেশ্বরী দ্বারা কুৎসা প্রচারের চেষ্টায় হঠাৎ উবিয়া গেল। কোথাও নাটকের দ্বন্দ্ব তীব্র ও আবেগবান হয় নাই। শ্রীপতি একজন imbecile জমিদার, কোনো জায়গাতেই তাঁহার শক্তির প্রকাশ হয় নাই। ললিতার বংশের কলঙ্কের জন্য যে ঈর্ষা ও সন্দেহের ধূম সঞ্চিত হইয়া আসিয়াছিল তাহার দূরীকরণও হইয়া গেল বিনা কারণে। রমানাথের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন একমাত্র প্রাণবান চরিত্র। নাটকের সংলাপ দুর্বল ও নিরাবেগ।

সত্য অথবা মিথ্যা খুনখারাপিজনিত জটিলতা যাহা আমাদের অধিকাংশ সামাজিক নাটকে পরিস্ফুট তাহা 'পতিব্রতা' নাটকেও বিদ্যমান। রণেনের জন্মরহস্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, অথচ তাহা লইয়া কোনো সমস্যার সৃষ্টি করা হয় নাই। কালীনাথ চরিত্রটি জীবন্ত।

## (৯) জলধর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকখানা নাটক রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের অসামান্য প্রশংসা ও সমাদর অর্জন করিলেও তাঁহার নাটকের মধ্যে কোনো লক্ষণীয় উৎকর্ষ নাই। দুই একটী অভিনব ভূমিকার জন্যই সাধারণত তাঁহার নাটক জনপ্রিয় হইয়াছে। তাঁহার নাটক প্রাচীন ধারার অনুসারী, কোনো সংস্কারমূলক চিন্তা অথবা বিপ্লবী মতবাদ তাঁহার মধ্যে নাই। বর্তমান

সমাজ সমস্যার কোনো আলোচনাও তিনি করেন নাই। সূক্ষ্ম কলাকৌশল, অথবা আধুনিক নাটকের সুসংহত টেকনিকও তাঁহার নাটকে দেখা যায় না।।

॥ রীতিমত নাটক ॥ 'রীতিমত নাটক' রঙ্গালয়ে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যকর উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল। শান্তা ও সান্ত্বনা —এই দুই পত্নী লইয়া বসন্তের যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, সেই সমস্যা-বিব্রত নাট্যকার স্থূল রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেইজন্য সান্ত্বনাকে রিভলভারের গুলিতে হত্যা করা হইয়াছে। অথচ তাহার পূর্বে এমন উত্তেজনাময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই যাহাতে এই রিভলবারের গুলি অবশ্যম্ভাবী মনে হইতে পারে। খুন করিয়া পলায়ন এবং পরিশেষে পুনরাগমন এবং মিলন ইহা বাংলা নাটকের সনাতন ব্যাপার, ইহাতে নূতনত্ব নাই। নাটকের শ্রেষ্ঠ অংশ প্রফেসার দিগম্বর মজুমদারের অসংলগ্ন অথচ বৈদগ্ধ্যপূর্ণ উক্তিসমূহ। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের চিত্তচমৎকারী অভিনয় এবং আবৃত্তি এই ভূমিকাকে অমর করিয়া দিয়াছে। Fountain Pen এবং Hypodermic Syringeদ্বয়কে লইয়া তাঁহার সরস ব্যঙ্গ-পরিহাস দর্শকের হৃদয় আমোদিত করিয়া রাখে।

॥ পি-W-ডি ॥ অতি সাধারণ স্তরের নাটক অভিনয়-দক্ষতায় কি রকম অসাধারণ হইয়া উঠিতে পারে 'পি-W-ডি' নাটক তাহার উদাহরণ। ইহাতে সঙ্গতিপূর্ণ ঘটনা সংস্থাপন অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের একান্ত অভাব। অসলগ্ন ক্রিয়ার ফলে চরিত্রগুলির বিশেষত্ব স্পষ্ট রেখাপাত করে না। সৌমেন এবং সনৎ সম্বন্ধে নাট্যকারের ধারণা অস্ফুট এবং অস্পষ্ট। অভিনয়ের সময় সেন সাহেবের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিত্র এবং রঙ্গ-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা দুর্গাদাস এই ভূমিকাকে জ্বালাইয়া' দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তবুও একথা বলিতে হয় যে নাটকে এই ভূমিকা অকারণ এবং অপ্রয়োজনীয়। রিভলবারের মুখে সৌমেনের মুখ দিয়া শ্যামলীর নির্দোষিতা আদায় করিবার ব্যাপার অতি নাটকীয় এবং হাস্যকর। স্ত্রী চরিত্রগুলির পক্ষে অতি মাত্রায় প্রণয়নিষ্ঠা এবং আত্মসমর্পণের ভাব হীনতামূলক ও বিরক্তিকর।

॥ পথের শেষে ॥ নিশিকান্ত বসু রায়ের সামাজিক নাটক 'পথের শেষে' এককালে খুব জনপ্রিয় ছিল। এই নাটকখানিও পুরাতন ধারার অনুবর্তী। জমিদারপ্রধান সমাজ লইয়া ইহার কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। 'নীলদর্পণ' এবং গিরিশচন্দ্রের নাটকের মত করুণ রসের অত্যধিক আতিশয্য ইহার মধ্যে পরিস্ফুট।

॥ মানময়ী গার্লস স্কুল ॥ রবীন্দ্রমোহন মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' বিশুদ্ধ হাস্যরসোজ্জ্বল রহস্যস্নিগ্ধ কমেডি। মানস এবং নীহারিকা দুইজন গ্র্যাজুয়েট, স্বামী স্ত্রী রূপে পরিচয় দিয়া তাহারা মাষ্টারী গ্রহণ করে। দামোদর চৌধুরী এবং অন্যান্য সকলের কাছে তাহারা কিভাবে অভিনয় করিয়াছে তাহাই দর্শকের কাছে পরম উপভোগ্য ব্যাপার হইয়াছে। নীহারিকা দায়ে ঠেকিয়া প্রথমত বিরক্তির সহিত যে অবস্থা স্বীকার করিয়াছিল তাহাই ক্রমে ক্রমে সে কি রকম গোপনভাবে বরণ করিয়া লইল তাহার বর্ণনা যথেষ্ট কলাকৌশলপূর্ণ ও প্রীতিকর হইয়া

উঠিয়াছে। প্রেম-পাগোল রাজেন্দ্র বাড়রীর ঐকান্তিক প্রেম-সাধনাও অশেষ কৌতুকপূর্ণ হইয়াছে। নাটকের মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের গ্লানি নাই, রহস্যঘন রোমান্সের রসে ইহা ভরপুর।

আধুনিক কালের প্রসিদ্ধ সহিত্যিক 'বনফুল' কয়েকখানি নাটক লিখিয়াছেন। মাইকেল এবং বিদ্যাসাগরের জীবন বৃত্তান্ত লইয়া তিনি যে দুইখানি নাটক লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ অভিনব এবং প্রশংসীয় সন্দেহ নাই। জীবননাট্য লিখিতে হইলে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ কোনো প্রসিদ্ধ লোক সম্বন্ধে কিছু লিখিতে কল্পনাশ্রয়ী হওয়ার সুযোগ কম। নাট্যকারকে বিশেষরূপে জানাশোনা তথ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। জীবন-নাট্যের অভিনয় আরও দুরূহ ব্যাপার। অভিনেতা যদি তাহার আকৃতি এবং অভিনয়ের দ্বারা কোনো ভূমিকাকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে না পারেন তবে তাহা অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। কারণ বিসদৃশ আকৃতি এবং দুর্বল অভিনয়ের দ্বারা খ্যাতনামা ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ও শ্রদ্ধাকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়া থাকে। নাট্য পরিচালকদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

॥ শ্রীমধুসূদন (১৯৩৯)॥ জীবন ও নাটক একরূপ মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহারা এক নহে। জীবন বিধাতার অনিয়ন্ত্রিত খেয়াল আর নাটক শিল্পীর সজ্ঞান সৃষ্টি। জীবন মাঝে মাঝে নাটকীয় হইলেও পূরাপূরি নাটক হয় না। তেমনি নাটক জীবনকে অবলম্বন করিলেও জীবনকে ছাড়াইয়া যাওয়াই তাহার লক্ষ্য। এক কথায় বলা চলে, নাটক জীবনের অনুকৃতি নহে, প্রতিকৃতি। জীবন-নাট্য রচনায় নাট্যকারের শিল্পমুক্তি প্রতি পদে পদে জীবনের সীমার দ্বারা ব্যাহত, সেই সীমা লঙ্ঘন করা সহজ নহে, কারণ তাহা হইলে সত্যের অপলাপ ঘটে। সেজন্য জীবননাট্যে সাধারণত জীবনই আমরা দেখি, কিন্তু নাট্য দেখি না। লেখক বলিয়াছেন, 'ইহা ইতিহাস অথবা জীবন-চরিত নহে- নাটক। ইহার সমস্ত কথোপকথন ও অধিকাংশ দৃশ্য-পরিকল্পনা কাল্পনিক।' কিন্তু কাল্পনিক হইলেও মধুসূদন ও অন্যান্য চরিত্রগুলির কথোপকথনে অনেক প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ উক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে এবং দৃশ্যগুলিও বাস্তব জীবন হইতেই পরিকল্পিত হইয়াছে। বস্তুত নাট্যকার মধুসূদনের জীবনচরিতের প্রতি এতখানি সত্যনিষ্ঠ যে, কোন স্থলেই তিনি অসত্য ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা করেন নাই। অবশ্য এত নিকটবর্তী অতীতের জীবনকাহিনীতে শিল্পের অনুরোধেও সত্যের অপলাপ অথবা বিকৃতি কখনই পাঠক ও দর্শক বরদাস্ত করিতে পারেন না। কিন্তু জীবন-কাহিনীর প্রকৃত ঘটনাগুলির প্রতি বিশ্বস্ত নিষ্ঠার ফলেই আলোচ্য নাটকখানি বিচ্ছিন্ন ঘটনার গ্রন্থন হইয়াছে, অবিচ্ছিন্ন রসচেতনার সুষ্ঠু শিল্পায়ন হইতে পারে নাই। জীবন-নাট্য রচনার একটা প্রধান অন্তরায় এই যে,—দীর্ঘ-বিস্তৃত জীবনের রূপায়নে সময় ও স্থানের কোন শিল্পসম্মত ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। আলোচ্য নাটকেও মধুসূদনের মাদ্রাজ ও ইউরোপ প্রবাসের দৃশ্যও বিক্ষিপ্ত ও মূল-বিচ্ছিন্ন মনে হয়। নাটকের

মধ্যে বিভিন্ন দৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু দৃশ্যগুলি অদূরবিস্তৃত ও পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত না থাকিলে আমাদের রস-সম্ভোগে ব্যাঘাত ঘটে। সময়ের ব্যবধান এরূপভাবে দেখান দরকার যে একটি সময়ের ভাব ও সংঘাত অনিবার্যভাবে যেন পরবর্তী সময়ের মধ্যে পরিণত রূপ লাভ করে।

কাল্পনিক অথবা কল্পনাশ্রিত নাট্যকাহিনীর মধ্যে নাট্যকার একটা মূলভাবের পরি-কল্পনা করিয়া অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত ও চরিত্র-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া তাহার শিল্পরূপ দান করেন। কিন্তু সত্য জীবনকাহিনীর মধ্যে এরূপ কোন মূলভাবের রূপায়ণ সহজ নহে, কারণ জীবনের ঘটনাগুলি অনেকটা এলোমেলো ছন্দহীনভাবে ঘটিয়া থাকে। তবে 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে একটি মূলভাব যে আবিষ্কার করা যায় না তাহা নহে। মধুসূদনের জীবন একটা ট্র্যাজেডি এবং যথার্থ ই মর্মবিদারী ট্র্যাজেডি। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁহাকে তাঁহার সৃষ্ট রাবণ চরিত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনা সর্বতোভাবে সার্থক। কীর্তিমান ও সর্বক্ষমতাবান রাবণ যেমন অদৃশ্য দৈবের নিষ্ঠুর তাড়নায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছেন মধুসূদনও তেমনি বোধ হয় এক অলক্ষ্য বিধাতার নির্মম খেয়ালে মানুষের সর্বোত্তম আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ লাভ করিয়াও সর্বহারা পরিণামে আত্মবিসর্জন করিলেন। বোধ হয় তাঁহারও শূন্যবক্ষ ভেদ করিয়া ক্লেশাক্ত অনুযোগ উৎসারিত হইয়াছে—

কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে
বামতম মম প্রতি; তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে!

কিন্তু দৈবপীড়ন সত্ত্বেও রাবণের দুঃখময় পরিণতি তো তাঁহারই অন্যায় ও অপরিণামদর্শিতার জন্য ঘটিয়াছিল। মধুসূদনের পরিণতিও যতই ক্লেশকর হউক তাহার মূলেও কিন্তু তিনিই ছিলেন প্রধান। অসংযম, অমিতাচার, সমাজ ও ধর্মদ্রোহিতা প্রভৃতি স্বকৃত ভ্রান্তি ও অন্যায়ের জন্যই তো তাঁহাকে এরূপ শোচনীয় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। এই কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার উন্নতি ও পতনের একটি মূলসূত্র আবিষ্কার করা যায়, এবং তাহা হইল তাঁহার অদম্য উচ্চাশা। ম্যাকবেথের কথায়—

'Vaulting ambition, which o'er leaps itself
And falls on the other'—

যাঁহাদের আশা অনন্ত, দৃষ্টি যাঁহাদের সুদূর দিগন্তনীলিমায় নিবদ্ধ তাঁহারা পারিপার্শ্বিক জগতের নিয়ম ও প্রয়োজন লঙ্ঘন করিয়া চলেন। ছোট সুখ ও ছোট আশার মধ্যে তাঁহারা ধরা দেন না বলিয়া তাঁহাদের জীবন অশান্ত ও আলোড়িত। তাঁহারা অগ্নি-পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় ঊর্ধ্বে অনন্তপথে বিদ্যুৎগতিতে ধাবিত হইতে হইতে হঠাৎ নিঃশেষ হইয়া যান। তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে অলব্ধ কিন্তু নীল আকাশের বুকে তাঁহারা অম্লান আলোর

লেখা রাখিয়া যান। ম্যাথ্যু আর্নল্ড শেলি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা মনে পড়ে—'Ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain.' কবি শেলির সহিত কবি মধুসূদনের জীবনের অনেক দিক দিয়াই মিল দেখিতে পাওয়া যায়। শেলি হ্যারিয়েটকে লইয়া সুখী হইতে না পারিয়া পরে মেরি গডউইনকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মধুসূদনও তেমনি রেবেকার পর হেন্‌রিয়েটার মধ্যে তাঁহার যোগ্য সহধর্মিণীকে লাভ করিয়াছিলেন। শুধু কেবল এই দিক দিয়া নহে, পাঠ্যাবস্থা হইতেই উভয়ের স্বাধীন চিন্তা ও মতবাদ, পিতৃবিরোধ, স্বপ্নচারিতা ও দুঃখময়তার দিক দিয়া উভয় কবির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শেলি ও মধুসূদনের ন্যায় যাঁহারা পুরাতন অন্ধকার পথ ত্যাগ করিয়া নূতন আলোকের পথে যাত্রা করেন তাঁহারা দুঃখের কঠিনতম আঘাত লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দুঃখক্ষত জীবনের উপর অনশ্বর আলোকের প্রসন্ন আশীর্বাদ বর্ষিত হইতে থাকে।

'বনফুল' প্রথম দৃশ্যেই মধুসূদন চরিত্রের মূল শক্তি এই উচ্চাশার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন—'I can not rest half way—I must soar up and up and up till I am tired and even then I shall soar.' এই উচ্চাশার ফলেই তিনি পিতার ইচ্ছা মানিয়া লইতে পারিলেন না, এবং পারিবারিক জীবনের সংঘাত এখান হইতেই আরম্ভ হইল। যে খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করিবার ফলে পিতা ও পরিবারের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল তাহার মূলেও একটি উচ্চাশার অস্তিত্ব রহিয়াছে; মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গৌরদাস লিখিয়াছেন—'He rode roughshod through his patrimony, for the sake of an idea—the fulfilment of his life's dream—a visit to England.' একদিকে এই উচ্চাশা অন্যদিকে পিতামাতা, বিশেষভাবে মাতার প্রতি সুগভীর আকর্ষণ—এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের দ্বন্দ্ব মধুসূদনের চরিত্রে খুব জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণের মধ্যেও সুকঠোর বংশমর্যাদা ও আত্মাভিমানের সহিত পুত্রস্নেহের ফল্গুস্রোতের একত্রিত সমাবেশ হওয়াতে চরিত্রটি বিশেষ নাটকীয় ও রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আর অভিমানী পিতা ও অভিমানী পুত্রের মাঝে জাহ্নবী দেবীর নীরব, নিরুপায় অশ্রুসিক্ত মূর্তি সব তর্কবিতর্ক, জ্বালা ও উত্তাপের উপর এক সকরুণ, ক্ষমাশীতল প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত পিতা ও পুত্রের মধ্যে হৃদয় ও বুদ্ধিগত আদর্শ লইয়া স্নেহ ও অভিমান-ভরা যে সংঘাত চলিয়াছে তাহাতে জীবননাট্য নাট্যজীবনের শিল্পসম্মত পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু তারপর আলোচ্য নাটকে জীবনের ধারা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে বটে কিন্তু নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ চরিত্রগত সংঘাত এবং দ্বিভাবিভক্ত সত্তার বিক্ষেপ ও বেদনা একমাত্র বিংশ দৃশ্য ছাড়া আর কোথাও জমিয়া উঠে নাই। 'বনফুলে'র সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁহার প্রাণবন্ত সংলাপে। মধুসূদনের সংলাপে তিনি যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যের শুধু যে পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই নহে, সেই সংলাপ বাক্যপ্রয়োগ-কৌশলে অত্যন্ত সরস ও আবেগময় হইয়া উঠিয়াছে। মধুসূদনের জীবনীতে

কবি ও কীর্তিমান মধুসূদনকে জানিয়াছি আর 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে আমরা মানুষ মধুসূদনকে চোখের সম্মুখে দেখিলাম।

॥ রামমোহন (১৩৫৯) ॥ কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নবজাগ্রত বাঙালী জাতির অগ্রদূত রামমোহনের অলোকসামান্য প্রতিভা ও প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এই নাটক রচনা করিয়াছেন। নারায়ণ বাবু চিত্রনাট্য রচনায় অভিজ্ঞ কিন্তু মঞ্চনাট্য রচনাতেও যে তিনি সিদ্ধহস্ত তাহার পরিচয় এই নাটকে পাওয়া গেল। প্রাণময় সংলাপ ও নাটকীয় গতিবেগ সৃষ্টি করিয়া তিনি আলোচ্য নাটকে ঘনীভূত নাট্যরসের ধারা সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। নাটকে চিরসংগ্রামশীল রামমোহনের এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামী রূপ দেখিলাম। এই সংগ্রামের আরম্ভ তাঁহার পরিবারে এবং সর্বব্যাপী বিস্তার সমাজ ও দেশের সর্বাঙ্গীণ ক্ষেত্রে। সেজন্য নাটকের মধ্যে মোটামুটি ভাবগত ঐক্য বজায় রহিয়াছে, যদিও বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনুধাবন করা অনেক সময় কষ্টকর হইয়া পড়ে। তবে লেখক রামমোহনের বিলাত যাইবার পূর্বেই নাটকের উপসংহার টানিয়াছেন বলিয়া মোটামুটি স্থানগত কোন দূরবিস্তৃত অনৈক্য রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে নাই। রামমোহন অনেকের সহিতই সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা কঠিন সংগ্রাম করিতে হইয়াছে নিজের গর্ভধারিণী মাতার সহিত। মাতা ও পুত্রের এই সংগ্রামের মধ্যে কঠোর আদর্শবতী, স্বধর্মপরায়ণা জননী তারিণীর যে চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা কখনও মন হইতে মুছিবার নহে। প্রকৃতপক্ষে এক অজ্ঞান, অসহায় নারীর দৃঢ়নিষ্ঠার কাছে মহাজ্ঞানী, মহাবল রামমোহনের নিষ্ঠাও যেন ম্লান হইয়া যায়। মাতার সহিত রামমোহনের আচরণের মধ্যে তাঁহার কঠিন আদর্শ জয়লাভ করিল বটে, কিন্তু স্নেহশীল সন্তানের দুর্বলতা বাঁচিতে পারিল না। আলোচ্য নাটকে রামমোহনের বাহিরের অতিমানবটিকে যতখানি পাইয়াছি, ভিতরের হৃদয়বান মানবটিকে ততখানি পাই নাই।

## যুদ্ধোত্তর নাট্যসাহিত্য

নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় বটে, কিন্তু সেই রঙ্গমঞ্চের বাহিরে আর একটা বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চ আছে। বস্তুশক্তির নিয়ত-প্রবল সংঘাত ও বিপর্যয় সেই জীবন-রঙ্গমঞ্চে ঘটিতে থাকে। তাহার প্রেরণা বাহিত হয় শিল্পীর মানসলোকে এবং সেই মানসলোক হইতে পুনরায় পাদপ্রদীপের সম্মুখে তাহার শৈল্পিক প্রকাশ। সুতরাং নাট্যকারের কল্পনা ও নাট্যশিল্পীর অভিনয়ে জীবনের যে শৈল্পিক রূপ প্রাণবন্ত হইয়া উঠে তাহার মূলে রহিয়াছে বৃহত্তর বস্তুজীবনের অকাট্য অস্তিত্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হইতে পৃথিবীর মানসজীবনে অনেক ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। আমাদের জীবনও সুস্থ ও নিরাপদ থাকিতে পারে নাই। বস্তুত ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৭ পর্যন্ত একদিকে বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাবে ও অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্র-বিপ্লবে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিদারুণ

বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নাট্যজীবনের আলোচনা করিবার পূর্বে বাস্তবজীবনের পটভূমি সম্বন্ধে একটু সচেতন হওয়া দরকার।

যে যুদ্ধে আমরা নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টার ভূমিকা মাত্র অভিনয় করিয়াছিলাম তাহা আমাদের সুস্থিত জীবনধারাকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল কেন? ইহার উত্তরে হয়তো বলা হইবে বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসিতা, শাসকজাতির ভাগ্যের সহিত শাসিত জাতির বাধ্যতামূলক সহযোগিতা। তবুও বলিব যে, একটি নিরীহ, নিরপেক্ষ জাতির পক্ষে ইহা একটা অতি নিষ্ঠুর দুর্দৈব। তাহা না হইলে এই যুদ্ধজনিত মন্বন্তরের কবলে আমাদের ত্রিশ লক্ষ দেশবাসীকে অসহায়ভাবে যাইতে হইত না। দেশের সর্বত্র অশান্তি ও অসন্তোষ—মানুষের জান্তব পরিণতি ও মনুষ্যত্বের শোচনীয় পরাজয়। জৈব অভাবের তাড়নায় ক্রমে ক্রমে চিরপোষিত নীতি ও সংস্কার জীবন হইতে খসিয়া পড়িল, অন্তরে-বাহিরে জুড়িয়া রহিল এক বিকৃত ক্ষুধার লোলায়িত জ্বালা। বিপর্যস্ত জীবনের বিক্ষুব্ধ অন্তর্দেশ হইতে রাষ্ট্রিক বিপ্লব ধূমায়িত হইয়া উঠিল। বিপ্লবের জ্বলদর্চিরেখায় ভাস্বর হইয়া উঠিল দুইটি অগ্নিবাণী—'ভারত ছাড়'। এই অন্তর্বিপ্লবের সহিত আর একটি বহির্বিপ্লব যুক্ত হইল. সেই বিপ্লবের নেতা এক বঙ্গসন্তান—তাঁহার অকম্পিত অঙ্গুলী প্রসারিত দিল্লীর দিকে—চলো দিল্লী। ভিতরে-বাহিরে এই যুগপৎ আক্রমণে শাসকশক্তি বিব্রত হইয়া পড়িল। শাসন ও অত্যাচার নিষ্ফল বুঝিয়া সে আপোষরফার ছক খুলিয়া বসিল। রাজনীতির সতরঞ্চখেলা বেশ কিছুকাল চলিল. ইহাতে কে হারিল কে জিতিল জানি না। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা যে ঘনাইয়া আসিল তাহাতে কোন সন্দেহ রহিল না। অতঃপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপর্ব। ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুর অর্থাৎ হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান আলাদা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যুদ্ধ থামিল না। ইহার পর—মহাপ্রস্থানের পথে? হ্যাঁ, তবে কয়েকজন পাণ্ডবের নহে, লক্ষ লক্ষ লোকের সেই পথে যাত্রা। জন্মজন্মান্তরের মাটির কোল ছাড়িয়া আসিল নিরুপায়, নিঃসহায়, ভাগ্যহীন, ভবিষ্যৎহীন অগণিত ছিন্নমূল নরনারী—তাহাদের নবজীবনের স্বপ্ন অন্ধকারের বুকে আর্তনাদ করিয়া মরিল।

ইহাই আমাদের দেশের যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর ইতিহাস। এই বিপ্লব ও বেদনা সমাজমনকে যেমন তার চিরবদ্ধ মূল হইতে উৎখাত করিয়া ফেলিল শিল্পীমনকে তেমন কোন নবায়িত ভাবোন্মাদনায় মাতাইয়া তুলিতে পারিল না। ইহার কারণ হয়তো বাহিরের প্রেরণার অভাব, হয়তো বা নাট্যকারের অন্তর-প্রেরণার দৈন্য। যাহাই হউক, যে সমসাময়িক সমাজ-চেতনা ও সমস্যা-প্রাণতা অন্তত আংশিকভাবেও আমরা গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে দেখি নাটকের মধ্যে তাহার কোন বিকাশ না দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। বস্তুত 'নবান্ন', 'ছেঁড়াতার', 'নতুন ইহুদী', 'বাস্তুভিটা', 'তরঙ্গ', 'অভ্যুদয়' এ রকম নিতান্তই স্বল্পসংখ্যক নাটকের নাম করা যাইতে পারে যেগুলি সমস্যাসচেতন হইয়াও জনসম্বর্ধনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ কি—সমস্যাপ্রবণতার প্রতি সাধারণের স্বাভাবিক অনাসক্তি, সমস্যামূলক নাটক রচনায় নাট্যকারদের ব্যর্থতা, রঙ্গমঞ্চে সুযোগের অভাব?

কারণ যাহাই হউক, তাহা লইয়া পরে আমরা বিচার করিব। আপাতত কয়েকখানি প্রসিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত নাটকের আলোচনা আমরা করিব।

॥ পথিক ( ১৩৫৮ ) ॥ কালের যাত্রা চলিয়াছে অব্যাহত বেগে। সেই যাত্রা-পথের পরিবর্তন হয়, পথিকেরও পরিবর্তন হয়. আজিকার সংশয় ও সংঘাতজড়িত পথে যে নূতন পথিকের চলা সুরু হইয়াছে তাহার পদে পদে বাধার উপলখণ্ড, বাঁকে বাঁকে অনিবার্য সংগ্রামের অশান্ত বিক্ষোভ। শ্রেণীতে শ্রেণীতে আর মিলিত শান্তি নাই, এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর নিদারুণ দ্বন্দ্ব-কোলাহলে নিশ্চিন্ত শান্তির পরিবেশ আজ নিষ্ঠুরভাবে পীড়িত। বর্তমান জীবনের এই তিক্ত অথচ একান্ত সত্য দিকটি আংশিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এই নাটকটিতে। কিন্তু ঘটনা সংস্থাপনা ও চরিত্রাঙ্কনের দুর্বলতার জন্য নাটকের উদ্দেশ্য জোরালো হইয়া উঠিতে পারে নাই। নাট্যকার সাহসের সঙ্গে একই 'সেটে' সমগ্র নাটকের কাহিনীটি স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে দৃশ্য-সংস্থাপনের বাহুল্য কমিয়াছে বটে, কিন্তু ঘটনার গতি ক্রিয়ার মধ্যে দেখাইবার অনেক সুযোগ নষ্ট হইয়াছে। কোলিয়ারীর অংশটুকু শুধু কেবল মৌখিক বিবৃতির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া নাটকত্বের দিক দিয়া মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। নাটকের সর্বাপেক্ষা দুর্বল চরিত্রটি হইল স্বয়ং নায়ক অসীম। সে যে কি ভাবে 'দুর্দিনের সহ-যাত্রী'দের উদ্বুদ্ধ ক'রে তাদের পথের দিশারী হ'য়ে সার্থক হ'ল' তাহা নাটকের মধ্যে একেবারেই অপরিস্ফুট। তাহার চারদিকের পরিবেশের সহিত তাহার ধীর-ললিত নায়কোচিত ভাব একেবারেই বেমানান ও অসহ্য। তাহার মৃত্যুও অসংলগ্ন রোমাঞ্চকর উপাদানের অংশীভূত হইয়াছে, এই মৃত্যু ঘটনা ও চরিত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নহে। খুনী ডাকাত সিংড়া সিঙের মুখে কৈফিয়তসূচক বড় বড় কথাও অত্যন্ত অসঙ্গত ও বিরক্তিকর।

॥ ছেঁড়াতার ॥ বহুরূপী সম্প্রদায়-অভিনীত 'ছেঁড়াতার' নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সম্বর্ধিত হইয়াছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রংপুর জেলার গ্রাম্য কৃষক সমাজকে লইয়াই নাটকখানি রচিত। এই সমাজের একটি বিশেষ পরিবারের দুঃখ-বেদনার কাহিনীই নাটকের মুখ্য বর্ণনীয় বস্তু। নায়ক রহিমুদ্দী তাহার স্ত্রী ফুলজানকে ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ হইয়া তালাক দিয়াছে। মন্বন্তর সে সাধারণ লোকের সুখীজীবনের মধ্যে কি ভয়াবহ সর্বনাশ ঘটাইয়াছিল এই ব্যাপারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ফুলজানের সহিত রহিমুদ্দীর পুনর্মিলনে মন্বন্তরের বাধা নাই, অন্য কোন সাময়িক অর্থনৈতিক সমস্যারও বাধা নাই, সেখানে বাধা হদিসের। নাটকের শেষ ভাগে যে মর্মান্তিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও করুণ আত্মদানের চিত্র রহিয়াছে সেখানে প্রেমার্ত হৃদয়ের প্রতিবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে ধর্মবিধানের বিরুদ্ধে। নাটকের ভাষা সম্বন্ধে একটি আপত্তি হইতে পারে। নাট্যকার যদিও মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্রের নজির দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই বিশেষ বিশেষ দৃশ্যে টাইপ চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুর্বোধ ভাষা গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত কোন নাটকে ব্যবহার করিলে তাহা সর্বসাধারণের মনে কোন সামগ্রিক

রস সঞ্চার করিতে পারে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। আবার এই ভাষা ব্যবহার না করিলেও চরিত্রগুলি অস্বাভাবিক হইয়া যায়। সমস্যা বটে।

॥ অভ্যুদয় (১৩৫৩) ॥ আলোচ্য গীতিনাট্যটি কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের দ্বারা বহু জায়গায় অভিনীত হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু ও রচনা-রীতি কিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' ও 'ভারতে যবন' নামক নাটিকা দুইটির কথা মনে করাইয়া দেয়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কয়েকটি স্তর গানের মধ্য দিয়া ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি অঙ্কের গোড়ায় সূত্রধারের দীর্ঘ উক্তি রহিয়াছে, অবশ্য ঐ সব উক্তি আর একটু সংক্ষিপ্ত হইলে নাটকের গতি ও চমৎকারিত্ব বোধ হয় বৃদ্ধি পাইত। স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রভাব নাটকের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে আমাদের মন পীড়িত হয়।

॥ নতুন ইহুদী (১৩৫৯) ॥ রাজনীতির উপরতলায় দেনাপাওনার দরকসাকসি চলে, কালির আঁচড়ে চুক্তির সাক্ষ্য থাকিয়া যায়। কিন্তু সেই কালির আঁচড় যে নীচেকার লোকগুলির হৃদয়ে রক্তের রেখা হইয়া উঠে তাহা প্রতিমুহূর্তেই তাহারা বিক্ষত জীবনের মধ্যে অনুভব করিতে থাকে। স্বাধীনতার রথ আসিল বটে, কিন্তু তাহা দেশের মাটিকে দুইভাগ করিয়া, আমাদের মিলিত জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা গুঁড়াইয়া দিয়া এক অনিশ্চিত অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে আমাদের সুস্থিত সংসারগুলিকে নিক্ষেপ করিল। ছিন্নমূল নরনারীরা মাটির মায়া ত্যাগ করিল কিন্তু পুনরায় স্বাধীন মাটির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিল না। তাহাদের সংসার ছিন্ন হইল, মনুষ্যত্ব লুপ্ত হইল, জীবনের সর্বপ্রকার আশাভরসা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এই ভাগ্যহীন উদ্বাস্তুজীবনের এক নিদারুণ বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে আলোচ্য নাটকটিতে। একটি মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবার এবং তাহারই সহিত স্নেহ-সম্পর্কিত একটি নমঃশূদ্র কৃষক পরিবারের কাহিনী নাটকের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই সুখে-শান্তিতে অবস্থিত একটি গ্রাম্য নীড় হিংস্র-কুটিল ঝটিকার মুখে পড়িয়া কি ভাবে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল তাহারই মর্মান্তিক বর্ণনা রহিয়াছে নাটিকাটির মধ্যে। ইহাতে একদিকে শাণিত ও মার্জিত নাগরিক সমাজের কুশ্রী ও কদর্য রূপ যেমন উদ্ঘাটিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি দারিদ্র্য ও প্রতিকূল পরিবেশের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে কি ভাবে মনুষ্যত্বের শোচনীয় পরাজয় ঘটিতে পারে তাহার অতি ক্লেশকর পরিচয় দেখান হইয়াছে। পণ্ডিতের পরিবার ধ্বংস হইল—দুইখ্যা মরিল, পরী গৃহত্যাগিনী হইল, স্বয়ং পণ্ডিত মরিল, পণ্ডিতের স্ত্রী বাঁচিয়াও মরিয়া রহিল। কিন্তু এই ধ্বংসের মধ্য দিয়া একটি তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ হাহাকার করিয়া উঠে—এই প্রতিবাদ নবলব্ধ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, এই প্রতিবাদ হৃদয়হীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

॥ পরিচয় (১৯৫১) ॥ মানুষের সম্মিলিত জীবনযাত্রাকে নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ করিবার জন্যই সমাজের সৃষ্টি। অথচ সেই সমাজের শৃঙ্খলা যেখানে শৃঙ্খল হইয়া উঠে, সংস্কার যখন শাসনের রূপ ধারণ করে তখনই সুরু হয় সমাজসত্তার সহিত ব্যক্তিসত্তার তীব্র সংঘাত। সেই সংঘাতের রূপ পরিস্ফুট হইতেছে আধুনিক উপন্যাস ও নাটকে। আলোচ্য নাটকেও

সেই সংঘাতের পরিচয় দিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল শিল্পকৌশলের ফলে তাহা ব্যর্থতায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। প্রেমের চেয়ে বিবাহ বড়, না বিবাহের চেয়ে প্রেম বড়, —এই সমস্যা বহুতর নরনারীর জীবনে মৌনবেদনায় আলোড়িত হয়, এই সমস্যা নীরদ, লতা, নরেশ ও নিভার জীবনকেও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ইহাই নাটকের একমাত্র সমস্যা নহে। শশাঙ্ক ও আলি এবং নীরদ ও নিবারণকে অবলম্বন করিয়া স্নেহ-অভিমান জড়িত পিতা পুত্রের সমস্যাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে এবং তারপর নরেশ ও আভাঘটিত একটি কুৎসিত সামাজিক সঙ্কট এবং সেই সঙ্কটের ত্রাণকর্তারূপে আলীর ইসলামী উদারতা বইয়ের সমস্যাকে বহুমুখী করিয়া তুলিয়াছে। নাটকের মধ্যে হিন্দু সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে বিস্তর নালিশ ও গালাগালি আছে, কিন্তু সেই সমাজ ও ধর্মের কোন অনিবার্য হৃদয়-হীনতার দিক অকাট্যরূপে উদ্ঘাটিত হয় নাই। আলির মুখে নাট্যকার অনেক বড় বড় কথা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহার হিন্দুধর্ম বিদ্বেষ ও আভাকে লইয়া পলায়নের চেষ্টার মধ্যে কোন মহত্ত্বের লক্ষণই আমরা খুঁজিয়া পাই না। স্বধর্মদ্রোহিতাকে অনেকে উদারতা বলিয়া গর্ব করেন, সেই গর্ব অবশ্য নাট্যকার করিতে পারেন। নাটকখানির প্রকাশিত সংস্করণে এত মুদ্রণ-প্রমাদ ও বানানের ব্যভিচার রহিয়াছে যে ইহা প্রায় অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে।

॥ জীবনটাই নাটক (১৯৫২) ॥ শিল্পী জীবনের আনন্দকে রূপে রসে অনবদ্য করিয়া আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন, আমরা সেই আনন্দ লাভ করিয়া মুগ্ধ হই, ক্ষণকালের জন্য শিল্পীকে বাহবা দিয়া আমাদের কর্তব্য শেষ করি। শুধু তাহাই নহে, আনন্দের মত্তভোগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দাবী ও চাহিদাও অনন্ত মাত্রায় বাড়িয়া যায়, নিত্য নূতন পানপাত্রে নূতন নূতন পানীয় না হইলে আমাদের ক্ষোভ ও নালিশের আর অন্ত থাকে না। অথচ আমাদের করতালি-সম্বর্ধিত রঙ্গভূমির অন্তরালে আমাদের লুব্ধ কামনাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য যে দুঃসহ বেদনা সহিয়া যে প্রাণান্তকর সাধনা শিল্পীকে ক রয়া যাইতে হয তাহার খবর কে রাখি? অথচ তাহারাও মানুষ। মানুষের কামনা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ তাহাদের জীবনেও আছে। মঞ্চশিল্পীর সেই নেপথ্যবর্তী জীবনের হাস্য-করুণ দিকটি আলোচ্য নাটকের মধ্যে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে মঞ্চের অন্তরালে শিল্পীদের যে দারিদ্র্য ও মালিন্যপীড়িত বাস্তব জীবন-লীলা চলিতে থাকে তাহাই সহানুভূতির রসে আলোচ্য নাটকে উজ্জ্বল করিয়া তোলা হইয়াছে। মঞ্চের প্রয়োজনে তাহাদিগকে যে কতখানি সাংসারিক ক্ষতি ও বিপর্যয় সহ্য করিতে হয় তাহারও পরিচয় নাটকখানির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। নাটকের মধ্যে শিল্পীদের অভিনেতৃ-জীবন ও বাস্তবজীবনের দুই রূপ পাশাপাশি দেখান হইয়াছে। কিন্তু অভিনেতৃজীবনের পৌরাণিক অংশটুকু অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করাতে একটা স্বতন্ত্র নাট্যরসের সৃষ্টি করে এবং তাহার ফলে দর্শকের চিত্তও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। পৌরাণিক অংশটুকু যদি আধার কিম্বা পটভূমি করিয়া তাহার মধ্য দিয়া শিল্পীর আসল জীবনের ইঙ্গিতগুলি প্রধান করিয়া তোলা হইত তাহা হইলে নাটকখানি বোধ হয় আরও অধিক সার্থক হইত।

## দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক নাট্যকারদের মধ্যে যাঁহারা বাংলা নাটককে ভাববিলাসহীন বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রণী। যুদ্ধোত্তর বাঙালী জীবনে যে সব প্রশ্ন ও সমস্যার আবর্তবিপ্লব দেখা দিয়াছে সেইগুলিই তাঁহার নাটকের পটভূমিতে বলিষ্ঠ রূপরেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। সেজন্য আর্থিক সংকট, শ্রমিক ও মালিক বিরোধ, মেকি জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বন্দ্ব প্রভৃতি অনিবার্যরূপেই তাঁহার নাটকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ দিয়া তিনি সমস্যাগুলিকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন সে সম্বন্ধে মতভেদ ও আপত্তি উঠিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বচ্ছ ও অকুণ্ঠ মতবাদ, অকৃত্রিম বস্তুনিষ্ঠা ও অপরিসীম দরদীদৃষ্টি সকলেরই অন্তর স্পর্শ করে। নাটক রচনা তাঁহার পক্ষে আর্টের ললিতবিলাস নহে, তাহা দুঃখব্রত সত্যসন্ধিৎসা। পরিবেশ রচনা, বাস্তবানুগ সংলাপ-প্রয়োগ, আবেগদ্বন্দ্বের বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্য এবং ক্ষিপ্রগতিশীল ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার নাটকে সার্থক নাট্যরস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

॥ অন্তরাল (১৯৪৫) ॥ মানুষের প্রচলিত নীতি ও বিধিব্যবস্থার অন্তরালে অবাঞ্ছিত সন্তানের যে অনুত্তরিত জিজ্ঞাসা প্রাচীনতম কাল হইতে জাগিয়া রহিয়াছে লেখক সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কানীন পুত্রের সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে নীতিঘটিত প্রশ্নটির মূলে হয়তো অর্থনীতি রহিয়াছে, কিন্তু আলোচ্য নাটকে মিলের মালিক ও শ্রমিক-দ্বন্দ্বের সহিত মাধবী ও ঝরণার সমস্যাটির অনিবার্য যোগ নাই। কিন্তু নাট্যকার সুবিনয়ের জন্য ঝরণার সুগভীর অনুতাপ, মাধবীর চিরতৃষিত মাতৃত্ব ও ভবতোষের দুর্নিবার আত্মদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া সমস্যাটিকে হৃদয়ের বেদনারক্তিম রসে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

॥ তরঙ্গ (১৯৪৬) ॥ জনসমুদ্রের উদ্বেলিত তরঙ্গ-সংঘাতের বাস্তব চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে আলোচ্য নাটকে। নাট্যকার ক্রমবিবর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের দুইটি স্তর এখানে দেখাইতে চাহিয়াছেন, প্রথমত কংগ্রেসী অহিংস সত্যাগ্রহ এবং দ্বিতীয়ত সাম্যবাদী সহিংস সংগ্রাম। নাটকের প্রথম দুই অঙ্কে তোলাবন্ধ আন্দোলনের নায়ক আদর্শবাদী দেশসেবক শশী এবং শেষ দুই অঙ্কে প্রধানত পুলিশের সহিত সংগ্রামের নায়ক তাঁহার পুত্র অমর। শশী ও অমরের পথ বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু সত্যসন্ধ, ত্যাগব্রতী শশীর অকৃত্রিম দেশানুরাগ সম্বন্ধে সংশয়ের কোনই কারণ থাকিতে পারে না। এই শশীর প্রতি অমর ও গোপাল প্রভৃতি যে ব্যবহার করিয়াছে তাহা নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। শশী চরিত্রটি শেষদিকে নাট্যকারের কাছে কোন মূল্য ও মর্যাদাই পায় নাই। নাটকের পরিবেশ ও সংলাপের মধ্যে প্রত্যক্ষ বাস্তবের জীবন্ত স্পর্শ রহিয়াছে। তীব্রগতি ঘটনাবেগ ও প্রতিবোধী শক্তিসমূহের প্রচণ্ড সংঘাতে নাটকখানি যথেষ্ট নাট্যরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে।

॥ বাস্তুভিটা (১৯৪৭) ॥ দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে হিন্দুদের কি বিষম সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহা একটি গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিতের পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া দেখানো হইয়াছে। একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, ধর্মের ভিত্তিতেই যখন দেশ দুই

ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল তখন একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে অন্য ধর্মাবলম্বীর পক্ষে নিশ্চিন্ত সুখ শান্তির আশা লইয়া বাস করা সত্যই সুকঠিন। কফিলদ্দি ও আমীন মুন্সী মিলনের পথ দেখাইয়াছে বটে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার সময় তাহাদের প্রভাব যে নগণ্য তাহা ভুক্তভোগীমাত্রই স্বীকার করিবেন। বাস্তুভিটা ত্যাগ করা মর্মচ্ছেদের মতই ক্লেশকর। কিন্তু যে সব লক্ষ লক্ষ লোক বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন তাঁহারা শুধু হুজুগ কিংবা মিথ্যা আতঙ্কে মাতিয়া আসিতেছেন না, নিরুদ্বেগ শান্তি লইয়া সমাজ গঠনের আশা নিঃশেষ হইয়াছে বলিয়াই তাঁহারা চলিয়া আসিতেছেন।

॥ মোকাবিলা (১৯৪৯)॥ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া নাটকখানি রচিত। অভাব-অনটন এবং বাহিরের রাজনৈতিক সংঘাত মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের সুখ ও শান্তি বিপর্যস্ত করিয়া কি ভাবে পরিবারের লোকগুলিকে সর্বরিক্ত বিপ্লবের পথে টানিয়া আনে তাহারই বাস্তব আলেখ্য ফুটিয়াছে নাটকের মধ্যে। তবে নাটকের মধ্যে দুই বিরোধী সংঘাত স্পষ্টভাবে রূপায়িত হয় নাই। সমস্ত মত ও পথের দ্বন্দ্বের উপরে একটি চরিত্র ব্যাকুল ও অসহায়ভাবে পরিবারের সকলকে তাঁহার স্নেহ ও মমতার পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি হইলেন গৃহকর্ত্রী সুভদ্রা।

॥ মশাল (১৯৫৪)॥ সাম্প্রদায়িক সমস্যা লইয়া নাটকখানি রচিত। কিন্তু নাট্যকার এই সমস্যার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা খুব নির্ভরযোগ্য মনে হয় না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ শুধু কেবল পুঁজিবাদী মালীকদেরই সৃষ্টি ইহা বিশ্বাস করিতে গেলে বাস্তব ঘটনার প্রতি উপেক্ষা করিতে হয়। নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি জিলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে যে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব ঘটিয়া গেল তাহার পিছনে কি কতিপয় স্বার্থান্বেষী মিল মালিকদের প্ররোচনা ছিল, না যুগ যুগসঞ্চিত ঘোর সাম্প্রদায়িক ঘৃণারই প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল? লেখক শুধু কেবল হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার চিত্রই অঙ্কন করিয়াছেন, সেজন্য সাম্প্রদায়িকতার অপর দিকটি অবর্ণিত হইয়া রহিল এবং তাঁহার নাটকও আংশিকতা ও পক্ষপাত-দোষযুক্ত হইয়া পড়িল। মতির বোন ললিতার মানসদ্বন্দ্ব নাটকের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত অংশ।

॥ দুঃখীর ইমান (১৩৫৪)॥ ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের পটভূমিতে তুলসী লাহিড়ী আলোচ্য নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। নাট্যকারের 'নিবেদনে' বলা হইয়াছে—'ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চরম পরিণতি মন্বন্তরের দিনে এই চিরবঞ্চিত ও অবজ্ঞাতের দল, যাঁরা ধনলোভীর লোভের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল তাদের ছবি আঁকতেই এই নাটকের সৃষ্টি।' বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধের দুরন্ত ক্ষুধার আক্রমণে আমাদের দেশের খাদ্য গেল, সম্পদ গেল, জীবনধারণের সামান্যতম দ্রব্যও নিমেষের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল, সাধারণ মানুষ অন্নবস্ত্রহীন প্রেতের মত পথে প্রান্তরে ঘুরিতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে. মানুষের চিরপোষিত নীতি, ধর্ম, সংস্কার দুর্যোগের ঝড়ে জীর্ণ পত্রের মত খসিয়া পড়িল। সমাজের এই অসহনীয় বাস্তব

অবস্থা নাটকে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু নিকষ-কালো মেঘের প্রান্তেও শুভ্র রজতরেখার চকিত স্ফুরণ। মানুষের মৃত্যু-শ্মশানেও তাই মনুষ্যত্বের জয়ের আসন পাতা। সেজন্য ধর্মদাস ও বিলাতীর ভালোবাসা অন্ধকারের বুকে তারার মত ফুটিয়া উঠে, জামালের শোচনীয় দুর্ভাগ্যও পিতৃস্নেহের আলোকে গৌরবান্বিত হইয়া উঠে। ধর্মদাস চুরি করিল কিন্তু এ চুরি চোরকে মহৎ করিল এবং তথাকথিত সাধুলোকদের অন্তরও পরিবর্তন করিয়া দিল। মনুষ্যধর্ম যেখানে আপন মর্যাদায় আসীন সেখানে মানুষের নীতিনিয়ম, সংস্কার ও শাসন তাহাদের সব হাঁকডাক থামাইয়া পরাজয় স্বীকার করিতে যে বাধ্য। আলোচ্য নাটকেও মানুষীনীতির পরাজয় হইল বটে, কিন্তু জয় হইল মানুষের, মানুষীহৃদয়ের।

যে সব নাটকের আলোচনা আমরা করিলাম, সেগুলি রঙ্গমঞ্চে দর্শকের দ্বারা কিছুকালের জন্য সম্বর্ধিত হইলেও একথা কখনই বলা চলে না যে, জাতীয় মনের উপর তাহারা কোন সুদূরপ্রসারী ও সামগ্রিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অবশ্য বর্তমানকালের সিনেমা ও অন্যান্য বহুবিধ আমোদ প্রমোদের আকর্ষণের মধ্যে কোন নাটকের অনন্য-প্রভাব আমরা ক্বচিৎ আশা করিতে পারি। সে কথা যাক। নাটকগুলির সীমায়িত আবেদন লইয়া আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় যে, শুধু কেবল সমাজের বাস্তব সমস্যা ও যথার্থ প্রাণরূপ অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিলেই হয় না, সেই সমস্যা ও প্রাণরূপ যতক্ষণ শিল্পসম্মত উপায়ে রসোত্তীর্ণ না হইয়া উঠে ততক্ষণ নাটক জনগণের চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হয় না। মানুষের মতের পরিবর্তন হয়, মানুষের পথের পরিবর্তন হয়, কিন্তু অপরিবর্তিত থাকে মানুষ। এই চিরন্তন মানুষটি যদি নাটকের মধ্যে ধরা না পড়ে তবে তাহার মূল্য ও প্রয়োজন সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। অনেক আধুনিক নাট্যকার মানুষকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থের কোঠায় ফেলিয়া তাহার সমগ্র রূপটি দেখিতে ভুলিয়া যান। আমাদের দেশের কোন কোন লেখক ও নাট্যসম্প্রদায় নাটক রচনায় সোভিয়েট নাট্যকারদের সমাজ-বাস্তবতা ও বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।১ বাস্তবতা নিশ্চয়ই ভালো এবং কোন প্রগতিমূলক মতবাদেও কখনই আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু সেই বাস্তবতাকে যেমন শৈল্পিক ভাবকল্পনায় অনুরঞ্জিত করা প্রয়োজন, মৌখিক মতবাদকেও তেমনি জীবন্ত হৃদয়রসে সঞ্জীবিত করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে নাটক সংবাদপত্র ও তত্ত্বকথায় পর্যবসিত হয়। নাটকে জীবনের শিক্ষা আমরা লাভ করি, কিন্তু সে শিক্ষা স্কুলমাষ্টার অথবা ভাড়াটে বক্তার

১। ১৯৩২ সালে All-Union Congress of Soviet Writers যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে আছে, 'Above all, the truthfulness and historical concreteness of the artist's representation of actuality must be united with the problem of the spiritual fashioning and educating of the workers in the concept of socialism.

শিক্ষা নয়। সে শিক্ষা আমাদের কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করে ও আমাদের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করে।১

নাটকের অনুৎকর্ষ ও ক্ষয়িষ্ণুতার আর একটি কারণ দর্শকদের শৈথিল্য ও অনাসক্তি। আধুনিক সমাজ-সচেতন নাটকের প্রতি তাহাদের কোন লক্ষণীয় উৎসাহ ও আনুকূল্য না দেখিয়াই নাট্যকারগণ এরূপ নাটক লিখিতে প্রেরণা পান না। যে কয়জন মুষ্টিমেয় শক্তিশালী নাট্যকার এখনও নাটক রচনা করিতে সক্ষম তাঁহারা দর্শকদের এই মানসিক অসহযোগিতা লক্ষ্য করিয়াই দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত সমাজ-বাস্তবতাকে অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। অবশ্য বাস্তব সমস্যার প্রতি বীতরাগ হইয়া দর্শকগণ যে অপর কোন নাট্যধারার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন তাহাও বলা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের নাট্য-আন্দোলন সমসাময়িক কঠোর বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া শেকসপীয়রের নাটক ও কাব্যনাট্যের পুনঃপ্রবর্তনের দিকে একটি বিশেষ প্রবণতা দেখাইয়াছে। কিন্তু এরূপভাবে অতীতের কোন গৌরবান্বিত নাট্যরস পুনরানয়নের চেষ্টা বাংলা নাটকে দেখা যায় নাই। বহু-অভিনীত কোন নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া, অথবা তরল, বহিঃসর্বস্ব কোন নিকৃষ্ট নাটকের প্রতি অনুচিত আসক্তি দেখাইয়া দর্শকগণ তাঁহাদের নিম্নগামী নাট্য-চেতনার পরিচয় দিয়াছেন; অবশ্য শক্তিমান ও দৃঢ়নিষ্ঠ নাট্যকার তাঁহার সমসাময়িক দর্শকদের চাহিদা সম্বন্ধে অবহিত হইয়াও সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের অনুগত হইয়া পড়েন না। দর্শকদের রুচি ও মনোযোগ উদ্বোধিত করিবার জন্যই তাঁহাদের দৃষ্টি অনাগত ও বৃহত্তর রসিক-সমাজের প্রতি সম্প্রসারিত হয়।২ দুঃখের বিষয়, এরূপ নাট্যকারের অভাব বর্তমানে আমরা বোধ করিতেছি।

বর্তমান নাটকের দৈন্য ও দুর্দশার বোধ হয় সর্বপ্রধান কারণ,—রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় ব্যবস্থার শোচনীয় দুর্যোগ এবং সঙ্ঘবদ্ধ নাট্য-আন্দোলনের আত্যন্তিক অভাব। নাটক লেখা হয় অভিনয়ের উদ্দেশ্যে, নিছক পাঠের জন্য নহে। সেজন্য অভিনয়ের সুব্যবস্থা না থাকিলে নাট্যকারগণ নাটক লিখিতে উৎসাহ বোধ করিবেন না, জনসাধারণও উৎকৃষ্ট নাট্যরস ভোগ করিবার সুযোগ পাইবেন না। বাংলার সাধারণ নাট্যশালাগুলির অবস্থা এত করুণ

১। অধ্যাপক নিকলের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—'The enduring theatre is educative not in the manner of the political orator; it is educative only in the sense that it arouses our interests and stimulates our imagination, that it penetrates deep into the heart of humanity and draws the very gods from the height of heaven or the depth of hell to walk upon tbe boards.'

*World Drama* by A. Nicoll, P. 940.

২। অধ্যাপক নিকলের মন্তব্য পুনরায় উদ্ধৃত করা হইল—'The truth, of course is that the really strong playwright is the man who is in tune with his audience, bnt who may perhaps desire to play some melodies for the reception of which the audience is nearly, but not quite ready.'

*World Drama* by Nicoll, P. 937.

যে, একটি স্বাধীন জাতির রসবোধ দেখিয়া সত্যই লজ্জা হয়। যে সব নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণ দর্শকদের অসংস্কৃত রুচি অনুযায়ী কেবল কয়েকখানি সুপ্রতিষ্ঠিত নাটকের সম্মিলিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করিতেছেন, নব আঙ্গিকসমৃদ্ধ নবভাবান্বিত নাটকের অভিনয়ের সুযোগ সেই সব নাট্যশালায় কোথায় ? অবশ্য নাট্যশালার পরিচালকদিগকে শুধু দোষ দেওয়া চলে না। কারণ গুরুতর ঋণভারে পীড়িত ও নানা সঙ্কট-জালে জড়িত হইয়া নিরুপায়ভাবে তাঁহাদিগকে কেবল অর্থাগমের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। নূতন নাটকের অভিনয়ে যে অনিশ্চয়তা ও ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার জন্য কিরূপে তাঁহারা প্রস্তুত থাকিতে পারেন ? পেশাদার রঙ্গমঞ্চের বাহিরে বর্তমানে অনেক ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিভিন্ন নাট্যসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে। তাঁহারা নবদৃষ্টি লইয়া নূতন নাটকের অভিনয়-ধারা প্রচলন করিতে আগ্রহশীল। কিন্তু সে সুযোগ কোথায় ? তাঁহাদের নিজস্ব কোন রঙ্গমঞ্চ নাই,। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের আয়োজন করিতে হইলে এত অধিক অর্থের প্রয়োজন যে তাহা সংগ্রহ করা অনেক স্থলেই অসাধ্য হইয়া পড়ে, এবং তাঁহাদের নাট্যোদ্দীপনাও অপূর্ণ ও অপরিস্ফুট থাকিয়া যায়। এই সব বাধা ও অসুবিধা দূরীকরণের জন্য বর্তমানে নাট্যামোদী ব্যক্তিদের দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ নাট্য-আন্দোলনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের সাম্প্রতিক নাট্য-আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে আগে বিশ্বের সমসাময়িক নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে একটু সন্ধান লওয়া যাক।

আমাদের দেশের নাট্য আন্দোলনের সহিত যখন পাশ্চাত্য জাতিগুলির নাট্য আন্দোলনের তুলনা করি তখন অবাক হইয়া যাই। অবাক হইয়া যাই এই দেখিয়া যে ইতিহাসের ভীষণতম যুদ্ধের মধ্যে জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াও তাহারা নাটক ও নাট্যশালাকে এত সজীব করিয়া রাখিয়াছে। বারুদের ধোঁয়া ও বোমার গর্জন উপেক্ষা করিয়া ইংলণ্ডের নরনারী নিশ্চিন্ত চিত্তে শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডি দেখিয়া আনন্দ-বেদনা লাভ করিয়াছে। নাট্য আন্দোলনকে ব্যাপক ও শক্তিশালী করিবার জন্য তাহারা Arts Council স্থাপন করিয়াছে, সাধারণ লোক ও নাট্যশালার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। নাট্যাভিনয়ের প্রসারে Unity Theatreএর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডের ন্যায় আমেরিকাতেও জনগণের হৃদয়ে নাট্যচেতনা জাগ্রত করিবার জন্য নানা চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। এই বিষয়ে National Theatre Conferenceএর উদ্যম বিশেষভাবে স্মরণীয়। আমেরিকার আধুনিক নবীন নাট্যকারগণ ও'নিলকে অনুসরণ করিয়া বাস্তব নাট্যধারা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমসাময়িক সমস্যা বিশেষত নিগ্রো সমস্যা লইয়া নাটক রচনা করিয়াছেন। জার্মান অধিকারেও ফরাসীদের নাট্যোদ্দীপনা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইংলণ্ড ও আয়র্লাণ্ডের ন্যায় ফরাসীদেশেও বাস্তবতার বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ লেখক Jean Anouilhএর নাটকে জাগতিক জীবনের দুঃখময়তা ও ভাগ্যের অলঙ্ঘ্যলীলার সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

Anouilh-এর ন্যায় অতখানি ট্র্যাজিক না হইলেও Jean Paul Satre জীবনের পঙ্কিল ও কুৎসিত দিকটিই তাঁহার নাটকে উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। আধুনিক কালে ফরাসী দেশেই বোধহয় নাটকের নব নব বৈচিত্র্য ও রসসমৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা বেশি দেখা গিয়াছে। বর্তমান বিশ্বে নাট্য-আন্দোলনের সমৃদ্ধতম রূপ আমরা দেখি সোভিয়েট রাশিয়ায়। ১৯৩৬ সালে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, শ্রমিকদের কয়েকশত রঙ্গালয় বাদ দিলেও সমগ্র দেশের মধ্যে সাড়ে ছয় শতেরও অধিক রঙ্গালয় স্থাপিত ছিল। সোভিয়েট সরকারের ন্যায় কোন সরকারই এমন অধিক পরিমাণে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেন না। সোভিয়েট জনগণের অদম্য প্রাণশক্তি অফুরন্ত ভাবে তাঁহাদের নাট্যআন্দোলনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু নাটক ও নাট্যমঞ্চের এত সমৃদ্ধি হইলেও নাট্যশিল্পের দিক দিয়া সোভিয়েট নাট্যকারদের কোন অসাধারণ উৎকর্ষ ও দূরবিস্তৃত প্রভাব লক্ষ্য করা যায় নাই।১

উপরিলিখিত দেশগুলির নাট্য-আন্দোলনের পিছনে উহাদের সরকারের সক্রিয় আনুকূল্য আছে বলিয়াই উহাদের নাটক ও নাট্যশালা প্রাণবন্ত আনন্দ ও শিক্ষার স্থল হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে আমরাও স্বাধীন, সুতরাং বিদেশী শাসকদের দোহাই এখন আমরা দিতে পারি না। কিন্তু আমাদের সরকার অর্থনৈতিক সম্পদবৃদ্ধির দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়াছেন, সাংস্কৃতিক সম্পদবৃদ্ধির দিকে তাঁহারা ততখানি আগ্রহশীল নহেন। কিন্তু মানুষের মুক্তি তো শুধু কেবল অভাব পূরণের মধ্যে নহে, সে মুক্তি যে প্রাণের আনন্দ-জাগরণে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের আকাশ-বাতাস, জল ও মাটির অণুতে অণুতে রূপে-রসে-সুরে-ছন্দে সে সুন্দরের আসন রচিত হইয়াছে তাহা যদি স্বাধীন ভারতের চিত্ত ধরিতে না পারে তাহা হইলে এই স্বাধীনতার মূল্য কি? কিছুকাল পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার একটি নৃত্য-সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমি স্থাপন করিয়াছেন। সুখের কথা। কিন্তু এই আকাদেমি যে কিভাবে এই বিরাট দেশের সর্বস্থানে নৃত্য, সঙ্গীত ও নাটকের সহিত জনসাধারণের সংযোগ ঘটাইতে পারিবেন তাহা দেখিতে এখনও বাকি আছে। অন্য প্রদেশের কথা থাক, কলিকাতার প্রসিদ্ধ নাট্যালয়গুলি যে ক্রমে ক্রমে অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছে তাহা প্রতিরোধ করিতে কি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কোন দায়িত্বই নাই? সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়গুলি যে উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চের অভাবে তাহাদের পরিকল্পিত অনেক নূতন নাটকের অভিনয় দেখাইবার সুযোগ পাইতেছেন না তাহাদের উৎসাহ দান করাও সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

---

১। সোভিয়েট নাট্য-আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অধ্যাপক নিকল উপসংহারে বলিয়াছেন, 'It may be that in the future the many theatres of the Union will stimulate a great dramatic impulse : at the moment, however, all we can say is that, unless some master-pieces have appeared so recently as to be yet unavailable outside the U.S.S.R. the thirty years of the Revolution have succeeded in producing little more than a series of informative and doctrinaire dramas, realisitically and melodramatically old-fashioned in technique. So far the tale of the Soviet stage has been six hundred theatres in search of an author,

*World Drama by* Nicoll, P. 816

আশার কথা, নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া এবং বহু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অনেক নাট্য-সম্প্রদায় বাংলা দেশের নাট্য-আন্দোলনকে সম্মুখের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করা উচিত ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের। এই সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নাটক বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'। 'নবান্নে'র অভিনয়ে ইঁহারা রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যসজ্জা ও শব্দ-নিয়ন্ত্রণে অনেক সাহসিক নূতনত্ব আনয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পরবর্তী নাটক 'জবানবন্দী' ও 'দলিল' এবং নৃত্যনাট্য 'রাণার' ও 'অহল্যা' উল্লেখযোগ্য। বহুরূপী সম্প্রদায়ের 'পথিক, 'ছেঁড়াতার', 'উলুখাগড়া' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে। নাটকের মধ্য দিয়া সংগ্রামশীল সমাজ-বাস্তবতার রূপ উদ্‌ঘাটন করাই ইঁহাদের উদ্দেশ্যে। মঞ্চের উপকরণ ও সাজসজ্জা যথাসম্ভব সরল ও বাস্তবানুগ করার দিকেই ইঁহাদের লক্ষ্য। জাতীয়তাবাদী নাট্য-আন্দোলনের সম্প্রসারণে অগ্রণী হইয়াছেন কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ। ইঁহাদের প্রসিদ্ধ গীতিনাট্য 'অভ্যুদয়' বার বার জাতীয় ভাবোদ্দীপিত দর্শকদের দ্বারা সম্বর্ধিত হইয়াছে। লিটল থিয়েটার ও বঙ্গীয় শেক্‌সপীয়র পরিষৎ বর্তমানে বাঙালী দর্শকের কাছে শেক্‌সপীয়রের নাট্যরস নূতন করিয়া পরিবেষণ করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। অন্যান্য নাট্যসম্প্রদায়ের মধ্যে লোক ও নাটক ( ইঁহারা 'আজকের নাটক ৩', 'ভাঙ্গন' 'পথ' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করিয়াছেন ), অশনি চক্র, ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ, উত্তর সারথি, লোক সংস্কৃতি সঙ্ঘ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি ভবনের অধ্যাপকদের দ্বারা গঠিত রবীন্দ্র-নাট্য-পরিষদের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা উচিত। নাট্যাভিনয় যে অপরাধের নহে, অসম্মানের নহে, সংস্কারমুক্ত অধ্যাপকগণ সাহসের সঙ্গে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। নাট্যআন্দোলনের সহিত তাঁহাদের সক্রিয় সংযোগের ফলে এই আন্দোলন দেশের সর্বশ্রেণীর সম্মিলিত জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে।

দেশের মধ্যে এই সব বিভিন্ন নাট্যসম্প্রদায়ের দ্বারা নাট্য-আন্দোলনের বিচ্ছিন্ন শক্তি সমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুশৃঙ্খল সংগঠনের অভাবে সেই শক্তিগুলি এক সম্মিলিত মহাশক্তি হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিছুকাল পূর্বে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন সেনগুপ্তের উদ্‌যোগে একটি নাট্য সম্মেলনের আয়োজন হইতেছিল। কিন্তু নানা কারণে সেই আয়োজন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এখনও মাঝে মাঝে নাট্যসংগঠনের প্রস্তাব ও প্রচেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু এখন পর্যন্তও ঘটিয়া উঠে নাই। তবে আমরা আশা ছাড়ি নাই, কখনও আশা ছাড়িব না। বর্তমানে নাটকের দৈন্য, নাট্যালয়ের দুরবস্থা, কিন্তু ইহা কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কারণ আমাদের জীবনকে বাঁচাইতে হইবে—সুন্দর, সানন্দ জীবন,—নাট্য ভারতীর প্রসন্ন আশীর্বাদ আমাদের চাই। Sheldon Cheney তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'The Theatre'-এ যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্তমান

হইতে আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া রহিলাম—'Gauge only the failure, not the hope? No, the possibility of new splendors is there for all to see—limited only by the aspirations of the human soul. If the world stage has been petty or cramped or sordid, it is because the vision, the thinking, the living of the age have been so. There is a cycle in the life of the human soul. Humanity wakes from one epoch, one horizon to another, returns to splendor.

# পরিশিষ্ট

## (ক) বাংলা নাটক ও নাট্যশালা

বাংলা নাটকের অবনতি ঘটিয়াছে, ইহার পূর্ব গৌরব নাই, পূর্ব প্রভাবও নাই। এককালে এক একখানা নাটক দেশের মধ্যে সর্বব্যাপী চাঞ্চল্যতরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া তুলিত, দর্শকদের চিন্তা-জগৎ ও কর্ম-জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। 'নীলদর্পণ', 'চৈতন্যলীলা', 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' ইত্যাদি নাটকের বিস্ময়কর জনপ্রিয়তার কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এখন রঙ্গালয়ে নাটকের অভিনয় অন্যান্য শত প্রকার চিন্তা ও কর্মের মধ্যে একটা সামান্য ব্যাপার মাত্র; নাট্যকারগণ এখন অজ্ঞাত ও অবহেলিত। ইহার কারণ আমরা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে একটা কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহা সব দেশের বর্তমান সাহিত্য সম্বন্ধে বলা চলে; তাহা এই যে, আধুনিক কালের অধিকাংশ শক্তিমান লেখক নাটক অপেক্ষা গল্প উপন্যাস রচনায় অনেক বেশি আগ্রহবান ও তৎপর হইয়াছেন। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং জটিল সমস্যার অবতারণার পক্ষে নাটক অপেক্ষা গল্প ও উপন্যাসের জগৎ অধিকতর উপযোগী। জেমস জয়েস অথবা ভার্জিনিয়া উলফের মত ঔপন্যাসিক নাটকের মধ্য দিয়া কখনই এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিতে পারিতেন না। নাটক রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং ইহাতে বাহ্য ক্রিয়া অত্যাবশ্যক। সেইজন্য নাটকের মধ্যে আধুনিক সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্য সম্যকভাবে সিদ্ধ হয় না।[১] জগতের অন্যান্য দেশের সাহিত্যিকের মত বাংলা সাহিত্যেও সেই কারণে অধিকাংশ সাহিত্যিক গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিতেছেন। বাংলা নাটকের অবনতির দ্বিতীয় এবং প্রধান

---

১। A. Nicoll তাঁহার 'The English Theatre' নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন—'The theatre will always be compelled to subsist on bold effects; always will the stage call for physical action; the characters, whatever subtlety be introduced, must always be delineated in a manner alien to that which has created such a revolution i the modern novel. There can be no doubt thal an appreciation of these limitations has restrained many modern men of letters from experimenting in dramatic form.
*The English Theatre* by Nicoll, P. 194.

কারণ বাংলার রঙ্গালয়। ইহা পূর্বে বহুবার বলা হইয়াছে যে, নাটক প্রধানত রঙ্গালয়ের উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়া থাকে, রঙ্গালয়ের চাহিদা অনুসারেই নাটকের রূপ গড়িয়া উঠে। এমন একদিন গিয়াছে যখন রঙ্গালয়ের প্রয়োজন মিটাইতে পারে এমন নাটক ছিল না, বাধ্য হইয়া অভিনেতাদের নাটক লিখিতে হইত। আর এখন এমন দিন আসিয়াছে যে নাটক লেখা হইলেও তাহা পড়িয়া থাকে, খুব কম নাটকই মঞ্চস্থ হইবার সৌভাগ্য পাইয়া থাকে। লেখকগণ রঙ্গমঞ্চের অনুযায়ী, বিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী নাটক লিখিয়া নাট্যপরিচালক ও নামজাদা অভিনেতাদের অনুগ্রহের প্রত্যাশায় ঘুরিতে থাকেন, এবং এইরূপ চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল না পাইয়া ক্রমে ক্রমে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন।

রঙ্গালয়গুলি যে বর্তমান নাট্যসাহিত্যকে পোষণ করিতে পারিতেছে না তাহার কারণ ইহাদের ক্ষীয়মাণ ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা। ইহারা কোনো ক্রমে এখন টিঁকিয়া রহিয়াছে, ইহাদের বিকাশ ও প্রসারের পথ যেন অবরুদ্ধ হইয়াই গিয়াছে। ইহার একটা কারণ অবশ্য কলাকৌশলময়ী সিনেমা। বর্তমান বিশ্বের আমোদ-প্রমোদের প্রধান উপায় এই সিনেমা। আমাদের দেশেও এই সিনেমা শুধু কলিকাতায় নয়, বড় বড় সহরে নয়, সুদূর পল্লীগ্রামে পর্যন্ত অভিযান চালাইয়াছে। সিনেমার এই অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ, ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিস রহিয়াছে যেগুলি আধুনিক সর্বসাধারণের পক্ষে উপযোগী। প্রথমত ইহাতে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার সহজ ও সুলভ, থিয়েটার অপেক্ষা ইহার প্রবেশমূল্য অনেক কম বলিয়াই লোকে এত অধিক পরিমাণে ইহাতে যায়। দ্বিতীয়ত বর্তমান যুগ গতি ও দ্রুততার যুগ। এই বেতার এরোপ্লেন যুগে লোকে স্বল্প সময়ের মধ্যে কোনো অবিরাম আনন্দ উপভোগ করিতে চায়, সিনেমা তাহার সেই ইচ্ছা পূরণ করিতে পারে। থিয়েটারের বহু সংস্কার সত্ত্বেও ইহাতে একেবারে অবিচ্ছিন্ন ধারা বিধান করা সম্ভবপর হয় নাই। তৃতীয়ত সিনেমাতে সর্বরকম চাহিদা অনুযায়ী অসংখ্য রকম উপাদান সমাবেশ করা যায়। সিনেমা প্রধানত আলোকচিত্রের কল-কায়দার উপর নির্ভর করে; সেইজন্য ইহাতে নাচ-গান, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য, উত্তেজক রোমাঞ্চকর ঘটনা ইত্যাদি দেখাইয়া দর্শকের মন ভুলানো খুব সহজ। আলোক-চিত্রের কারসাজিতে অনেক সাধারণ ব্যাপারও অসাধারণ হইয়া দেখা দেয়, ইহাতে দর্শকের মনে অল্পেই বিভ্রম জাগাইয়া তোলা যায়। সিনেমার এত সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও ইহা উচ্চাঙ্গ ললিতকলা রূপে কোনোদিন পরিগণিত হয় নাই, এবং হইতে পারে না। ইহার কারণ প্রত্যেক শিল্পকলার প্রতিষ্ঠা হয় শিল্পীর সহৃদয় চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা, কিন্তু সিনেমাতে যন্ত্রের রাজত্ব, এখানে শিল্পীর স্থান গৌণ। রঙ্গালয়ে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীকে পরিচালক ও মঞ্চ-ব্যবস্থাপকের সহযোগিতায় বইএর নিষ্প্রাণ ভূমিকায় প্রাণরসের সঞ্চার করিতে হয়। এখানে শিল্পী গৌরব ও আত্মপ্রসাদ বোধ করিতে, সৃষ্টির আনন্দে চঞ্চল ও মত্ত হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সিনেমায় বহুতর যন্ত্র ও যন্ত্রীর আজ্ঞাবাহী সে, সেখানে

জড়ের লীলা, প্রাণের সৃষ্টি সেখানে নাই।১ আধুনিক যন্ত্রযুগে লোকের মন সম্পূর্ণ যন্ত্রময় হইয়া পড়িয়াছে। সারাদিন যন্ত্রের মত চলিয়া সে সিনেমায় যায় বিকৃত যন্ত্রময় আনন্দ উপভোগ করিতে। ইহা তামসিক বিকৃত মনোভাবের লক্ষণ, ইহা আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ করিয়া তোলে। আমরা যন্ত্রের উপাসনা করিতে যাইয়া প্রাণের সাধনা হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছি। আমাদের থিয়েটার আজ অনাদৃত ; যাত্রা, কবিগান, পাঁচালী, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি মৌলিক আনন্দের উপায়সমূহ উপেক্ষিত ; আর আমরা আবালবৃদ্ধবনিতা সিনেমার এক অসার ছবি দেখিবার জন্য ভিড় জমাইয়া তুলিতেছি। আমাদের রসবোধের কি চমৎকার অধোগতি হইতেছে তাহা দেখিবার বিষয় !

বর্তমানে যন্ত্রচালিত সিনেমার প্রসার এবং থিয়েটারের বিলোপ ঘটিতেছে, ইহাতে আমরা বর্তমান যুগের যন্ত্রমুখিতাকে দায়ী করিয়াছি, কিন্তু ইহার জন্য থিয়েটারের আভ্যন্তরীণ দোষত্রুটিও কম দায়ী নহে। সেইগুলি লইয়াই এখন আমরা আলোচনা করিব। প্রথমেই থিয়েটারের দর্শকদের কথা বলিব। দর্শকদের রুচি ও সংস্কৃতি অনুযায়ী রঙ্গমঞ্চে নাট্যরস পরিবেষিত হয়। কিন্তু একটা অপ্রিয় সত্য কথা না বলিয়া পারি না যে, বাংলা দেশের দর্শকগণের রুচির কদর্যতা এবং শিল্পবোধের নিম্নতার জন্য অনেক সময়েই যথার্থ উচ্চশ্রেণীর নাটকের বিকাশে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। নাট্যকার নাটক লেখেন রঙ্গমঞ্চের জন্য, এবং রঙ্গমঞ্চের পরিচালক নাটক মঞ্চস্থ করেন দর্শকগণকে আকর্ষণ করিবার জন্য, কিন্তু যখন তাঁহারা দেখেন যে রঙ্গমঞ্চে আসল অপেক্ষা মেকির চাহিদা বেশি, তখন তাঁহারা স্থূলরুচি ক্রেতাদের সম্বন্ধে অলক্ষ্যে মৃদু হাস্য করিয়া ঢাক রাজাইয়া এই মেকি চালাইতে তৎপর হন। আমাদের রঙ্গমঞ্চে চিরকাল এই মেকি নাটকের রাজত্ব চলিয়াছে। দর্শকগণ রঙ্গমঞ্চে যাইয়া ভানুমতীর খেলের মত কয়েকটী অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখিয়া, কিছু অনাবশ্যক গান এবং অশোভন নৃত্যে মোহিত হইয়া নাটকের দোষগুণ বিচার করিয়া বসে। যাহাদের শিল্পবোধ নাই, প্রকৃত রসজ্ঞতা নাই, তাহাদের দ্বারা নাটক ও নাট্যমঞ্চ পরিপোষিত হইতে পারে না। বাংলা নাট্যমঞ্চের দুর্গতির ইহা অন্যতম কারণ।

রঙ্গালয়ের প্রযোজক এবং পরিচালকবৃন্দও সাধারণত নিছক ব্যবসা-বুদ্ধির দ্বারা চালিত

১। রঙ্গমঞ্চের অসাধারণ শক্তিমান নট ও চিত্রজগতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অভিনেতা স্বর্গত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চ ও চিত্রের অভিনয় সম্বন্ধে যে অতি সারগর্ভ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল —'অভিনেতৃজীবনের চরম সার্থকতাই হচ্ছে অভিনয়-শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা—আর্টের বেদীমূলে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করা। পর্দায় আমাদের যে সকল গতিবিধির ভেতর দিয়ে চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কোরতে হয় তা' একেবারে ভুয়ো। রঙীন চশমা পরলে যেমন সবই রঙীন দেখায়—এও সেরূপ মেকী। মঞ্চে আমাদের দেখতে পাওয়া যায় জীবন্তরূপে। বহু লোকের হুকুমের ভেতর দিয়ে কেউ আমাদের দেখে না। আমাদের দোষ গুণ জড়িত প্রতিভা প্রকাশ পায় এখানে—যা' দেখে লোকে সহজেই আমাদের বুঝতে পারে। আর পর্দায় আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে কলের পুতুলের মত অভিনয় কোরে চলেছি। সে অভিনয়ে আমরা যে নিন্দাস্তুতি পাই তা আমাদের প্রাপ্য কতটা আমি জানি না। তবে এইটুকু আমি বলতে পারি যে এ অভিনয় আমাদের কঙ্কালমাত্র।'

'দুর্গাদাস'— কালীশকুমার মুখোপাধ্যায়।

হইয়াই নাটক মঞ্চস্থ করেন। নাট্যভারতীর সাধনায় নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা অপেক্ষা ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের হিসাব তাঁহাদের অনেক বেশি। যাঁহারা সত্যকারের আদর্শবাদী এবং শিল্পনিষ্ঠ মন লইয়া রঙ্গজগতে আসেন তাঁহাদের অনেককেই সর্বস্ব দিয়া শিল্পপ্রীতির প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। এইরূপ অনেক ধনী, নাট্যানুরাগীদের ইতিহাস আমরা জানি।১ রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যদি কেবল অর্থের অংকের দিকেই দৃষ্টিপাত করেন তবে তাঁহাদের দ্বারা নাট্য-শিল্পের স্থায়ী প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। এই কারণেই বাংলার নাট্যশিল্প ক্ষয় পাইতেছে। অনেকেই সিনেমা অধিকতর লাভবান বলিয়া সেই দিকে ঝুঁকিতেছেন, এবং ফলে অর্থবান ব্যক্তির আগ্রহ ও পরিপোষণের অভাবে অনেক রঙ্গশালা উঠিয়া যাইতেছে, অথবা সিনেমায় পরিণত হইতেছে।

রঙ্গালয়কে আধুনিক যুগে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে আধুনিক যুগোপযোগী সংস্কার ও পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। অবশ্য বর্তমানে রঙ্গমঞ্চের বহু নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য দান করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে Edward Gordon Craig এবং Adolphe Appia—এই দুই ব্যক্তি পুরাতন রঙ্গমঞ্চের আমূল সংস্কার করিয়া সম্পূর্ণ নূতন রীতিতে মঞ্চসজ্জার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। Revolving, Wagon, Sinking Stage প্রভৃতি প্রবর্তিত হওয়ার পরে বর্তমানে রঙ্গমঞ্চের মধ্যে বহু পরিমাণে বাস্তবতা আনয়ন করা সম্ভব হইয়াছে। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চেও পাশ্চাত্য রীতি ও টেকনিক অনেক অনুসৃত হইতেছে। কিন্তু দুই এক বিষয়ে আধুনিক রীতি পদ্ধতি প্রবর্তন করিলেই রঙ্গালয়কে সমৃদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। রঙ্গালয়ের সমৃদ্ধির জন্য খাঁটি শিল্পপ্রাণ লইয়া নিষ্ঠা ও যত্নের সহিত সকলের আন্তরিক চেষ্টার মধ্যে সমবায় স্থাপন করিতে হইবে। বাংলা রঙ্গালয়ে ইহারই একান্ত অভাব।

নাটক এবং রঙ্গমঞ্চের সাফল্য প্রধানত নির্ভর করে অভিনয়-শিল্পের পরে, কিন্তু এই অভিনয় শিল্প আমাদের দেশে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। আজকাল অভিনেতাদের ঝোঁক সিনেমার দিকে। সিনেমায় অভিনয়-শিল্পের বিকাশের কোনোই সুযোগ নাই; রঙ্গজগতে যাঁহারা অভিনয় করেন তাঁহাদের মধ্যেও এই শিল্পের সমৃদ্ধ বিকাশ হইতেছে না। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অসাধারণ প্রতিভাবান অভিনেতাদের লীলা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি অদ্বিতীয় অভিনেতৃবৃন্দের স্মৃতি বক্ষে রাখিয়া বাংলার নাট্যশালা গৌরবান্বিত হইয়াছে। আধুনিক কালে যুগপ্রবর্তক নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অভিনয় লীলায় রঙ্গমঞ্চের দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ, চমৎকৃত হইয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের সকলেরই বয়স হইয়াছে, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ আর বহুদিন ইঁহাদের দ্বারা সমৃদ্ধ থাকিতে পারিবে না। কিন্তু ইঁহাদের পরে ইঁহাদের স্থান অধিকার করিতে পারেন এমন অভিনেতা বর্তমানে দেখা যাইতেছে না। আজকাল বাঙালী দর্শকদের

১। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'থিয়েটারের গুপ্ত কথা' নামক সরস গ্রন্থে থিয়েটারের উদগ্র নেশার পরিণতি এবং থিয়েটারের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

মধ্যে রঙ্গালয়-প্রীতি বজায় আছে ইঁহাদের জন্যই, ইঁহাদের অভিনয় দেখিতেই রঙ্গালয়ে এখনও ভিড় জমিতেছে। ইঁহাদের অভাব ঘটিলে রঙ্গালয় হইতে দর্শকদের মন সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত হইবে। অভিনয়নৈপুণ্য শিক্ষাসাপেক্ষ ; অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষকবৃন্দ সুনিপুণ শিক্ষাদ্বারা কত সাধারণ লোককে উৎকৃষ্ট অভিনেতারূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা আমরা জানি। কিন্তু আধুনিক কালে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ অভিনয়-শিক্ষক বর্তমান থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত শিক্ষার্থীরই একান্ত অভাব। এখনকার তরুণ অভিনেতৃবৃন্দ একাগ্র নিষ্ঠা এবং আগ্রহ লইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন, অভিনয়কলার উন্নতিসাধন করিতে তাঁহারা প্রাণবান নহেন, আগ্রহবানও নহেন।১ বর্তমান রঙ্গমঞ্চের পরিচালকদের একটী প্রধান ত্রুটি এই যে তাঁহারা নাটকের সর্বত্র সমান দৃষ্টি রাখেন না। প্রধান অভিনেতা সম্বন্ধে তাঁহারা ঢক্কা নিনাদে প্রচার করেন বটে, কিন্তু ছোট ছোট ভূমিকাগুলি সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারেই উদাসীন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, নাটকের সাফল্য নির্ভর করে সকলের সম্মিলিত চেষ্টা এবং নিষ্ঠার ফলে, একটি অভিনেতার নিকৃষ্ট অভিনয়ে সমগ্র নাটকটীর উচ্চাঙ্গের রস একেবারে মাটি হইয়া যাইতে পারে।২ অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী সম্বন্ধে শুনা যায় যে তিনি ছোট ভূমিকাগুলির উৎকর্ষের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাখিতেন, কিন্তু তাঁহার সেই রীতি আজকাল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইতেছে। এখন যে কোন রঙ্গালয়ে গেলে শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অপূর্ব অভিনয়নৈপুণ্যে আমাদের হৃদয়ে রসের সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু অপ্রধান চরিত্রগুলির অসঙ্গত চেহারা, কুৎসিত হাবভাব এবং কদর্য অভিনয় আমাদের সেই রসতন্ময়তাকে মুগুরাঘাতের দ্বারা নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। পরিচালকগণ আরও একটি বিষয়ে অমনোযোগী। তাঁহারা অনেক সময়েই চরিত্র অনুযায়ী অভিনেতা নির্বাচন করেন না, অনেক সময়েই অভিনেতা অথবা অভিনেত্রীর বয়স এবং আকৃতি কোনো ভূমিকার রস সৃজনে গুরুতর পরিপন্থী হইয়া উঠে, অথচ সেদিকে কাহারও খেয়াল নাই। কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পড়িয়া তাহার চরিত্রগুলি সম্বন্ধে আমাদের যে রসানুভূতি হয় হয়তো সেই গ্রন্থের অভিনয়ের সময়

১। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'অভিনয়-শিক্ষা" নামক গ্রন্থে আধুনিক অভিনয়-কলার ক্রমাবনতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'তরুণ অভিনয়ার্থীগণ গুরুজনকে অভিনয় শিক্ষার গ্রাহ্য না করিয়া নিজেরা নিজেদের সকলের অপেক্ষা বড় বিবেচনা করাতে,—ক্রমে শিশিরবাবু, নরেশবাবু, অহীন্দ্র চৌধুরী, রাধিকা মুখুয্যে প্রভৃতি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিমেয় নটবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রঙ্গালয় লুপ্ত হইবে,—একথা লিখিয়া রাখিয়া দিন।"

'অভিনয় শিক্ষা'—ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১৮।

২। 'অনেক সময় সুলিখিত নাটকও তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারে না—তার একটী প্রধান কারণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র চরিত্রগুলির প্রতি পরিচালক এবং অভিনেতা উভয়েরই অবহেলা। পরিচালকের অবহেলার দরুণ যাকে তাকে ছোট ভূমিকায় নামিয়ে দেওয়া হয়।

'মঞ্চে ও নেপথ্যে'—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ ৫৫।

সেই অনুভূতি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গেল। নাট্যপরিচালকদের এ সম্বন্ধে সজাগ এবং অবহিত হওয়া বিশেষ কর্তব্য। অভিনয়-কলার অবনতি সম্বন্ধে চিন্তা করিলে প্রত্যেক নাট্যানুরাগীর মন বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। রঙ্গমঞ্চের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের দ্বারা অভিনয়কলার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা যাহাতে হয় আমরা সেই আশা করিতেছি। আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শিশিরকুমারের কাছে আমরা আবেদন জানাইতেছি যে তিনি তাঁহার অনন্যসাধারণ অভিনয়-কলার পরিচয় তাঁহার পরবর্তী শিল্পীদের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করুন, অভিনয়-কলার অবলোপ হইতে ইহাকে রক্ষা করুন।

নাট্যশালা ব্যবসার স্থান ইহা সত্য, কিন্তু ইহা শিল্পসাধনার কেন্দ্রও বটে ইহা মনে না রাখিলে নাট্যশালার সত্যকারের উন্নতি হইবে না। দেশের নাট্যানুরাগী ধনশালী ব্যক্তিগণ যদি রঙ্গালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ না করেন তবে নাট্যশিল্পকে আর বাঁচাইয়া রাখা চলিবে না। রঙ্গালয়ের মধ্যে আভ্যন্তরীণ অভাব-অসুবিধা যাহা আছে চেষ্টা করিলে তাহার দূরীকরণ কিছুই অসম্ভব ব্যাপার নহে। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার গ্রন্থে ('মঞ্চে ও নেপথ্যে') কতকগুলি প্রতিকারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; যথা, থিয়েটারগুলির মধ্যে ব্যবসাগত ঐক্য, Provident Fund স্থাপন, রঙ্গালয়ের সহিত দেশের মনীষার সংযোগ রক্ষা, থিয়েটারের আভ্যন্তরিক সমিতি গঠন ইত্যাদি। একটু চেষ্টা করিলেই এইগুলি কাজে পরিণত করা যায় তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। রঙ্গালয় দেশের জাতীয় সম্পদ; দেশের ভাব, চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ন হয় রঙ্গালয়ে। রঙ্গালয়ের মধ্যেই জাতির যথার্থ পরিচয় পরিস্ফুট হয়, সুতরাং রঙ্গালয়কে রক্ষা এবং পোষণ করা জাতির সর্বসাধারণের কর্তব্য। রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা, পরিচালক এবং দর্শক সকলেরই চেষ্টা এবং উদ্যম হওয়া উচিত যাহাতে জাতির ভাবধারা ও সংস্কৃতির এই শ্রেষ্ঠ বাহককে তাঁহারা উন্নত এবং সমৃদ্ধ করিতে পারেন। রঙ্গালয় যেন আমাদের অতীত গৌরব, বর্তমান সাধনা এবং ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির পরিপূর্ণ প চয় দিতে পারে আমাদের সকলের সেই লক্ষ্যই হওয়া উচিত।

রঙ্গালয়গুলি বর্ধিষ্ণু অবস্থায় থাকিলে তাহাদের প্রয়োজনে নাট্য-সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতি সম্ভব হইবে। বর্তমানে নাটকের অবনতি একটা ক্ষণস্থায়ী অধ্যায় মাত্র, বাংলা নাটকের পূর্ণতর গৌরবের দিন ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, এই আশা করিয়াই আমরা আছি। দেশের শক্তিমান লেখকবৃন্দ নাট্যসাহিত্যের চর্চা দ্বারা ইহার সমৃদ্ধি সাধন করুন আমরা সেই আবেদনই করিতেছি। যে জাতি আনন্দরস হইতে বঞ্চিত সেই জাতি বড়ই হতভাগ্য। আমাদের দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ভগীরথের ন্যায় একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা নাট্যধারাকে আমাদের মধ্যে আনয়ন করুন; এই নিশ্চেষ্ট, নির্জীব, নিরানন্দ জাতি বাঁচিয়া উঠুক, ইহাই আমাদের কামনা।

## (খ) বাংলা নাটকের প্রাণধর্ম

অন্যান্য দেশের নাট্যকাহিনী সুদীর্ঘ কালের বিচিত্র ভাঙ্গাগড়া, উত্থান-পতনের ইতিহাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। কিন্তু বাংলা নাটকের ইতিহাসে কোন দীর্ঘকাল-ব্যাপী ঐতিহ্য নাই, মাত্র একশত বৎসরের স্বল্প-বিস্তৃত ক্ষেত্রে ইহার উদ্ভব ও বিবর্তন সীমিত হইয়া আছে। সেজন্য সুস্পষ্ট শিল্পায়ন ও ভাবচেতনা অনুযায়ী ইহাকে বিভিন্ন যুগে সুনির্দিষ্টরূপে বিভক্ত করা সম্ভব নহে। কিন্তু তবুও একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলা নাটকের ধারা ভাব ও আঙ্গিকের দিক দিয়া একটানা ও বৈচিত্র্যহীন নহে। সমাজের ভাবতরঙ্গ যেমন ইহার বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করিয়াছে, তেমনি রঙ্গালয়ের বিবর্তন ও নাট্যশিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার আঙ্গিকেরও লক্ষণীয় প্রসার ও পরিবর্তন দেখা গিয়াছে।

বাংলা নাটকের উৎপত্তি যাত্রা হইতে হয় নাই। পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের প্রবর্তন হইলে তাহারই প্রয়োজনে বাংলা নাটক আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে আঙ্গিকের দিক দিয়াও ইহা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য নাটকের অনুবর্তন করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিদেশী নাটকের কলাকৌশল ও রীতিনীতি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিলেও ইহার প্রাণবস্তু জাতীয় ধারা ও চেতনা দ্বারা অলক্ষিতভাবে গঠিত হইয়াছে। অবশ্য যিনি নাটক লিখিবেন তিনি যে নিজের দেশের ভাবচেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবেন তাহা স্বাভাবিক এবং তাহা হওয়াও উচিত।[১] কিন্তু যেখানে ভাববস্তু প্রবল হইয়া বিশিষ্ট শিল্পাদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে সেখানেই হয় সমস্যার উদ্ভব। ভাব ও আঙ্গিকের সুসমঞ্জস সঙ্গমের মধ্যেই সাহিত্যের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা ; বাংলা নাটকে দেশী ভাব ও বিদেশী আঙ্গিকের মধ্যে অনেকস্থলেই বিরোধ দেখা গিয়াছে, এবং তাহার ফলে নাট্যশিল্পের হানিও হইয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন, বাংলা নাটকের আলোচনায় বিদেশী আঙ্গিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার যুক্তিসহ নহে, সঙ্গতও নহে। বলা বাহুল্য নাটকবিচারে তাঁহারা আঙ্গিক ও কলাকৌশলের দিকে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন না। সংস্কৃত নাট্যশিল্পের প্রভাব যে বাংলা নাটকে বিশেষ নাই (অবশ্য প্রথম যুগের কয়েকখানি নাটক বাদ দিলে) সে বিষয়ে তর্কের তেমন কোন অবকাশ নাই এবং পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের প্রেরণা ও পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের প্রভাবে যে ইহার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে তাহাও অবিসংবাদিত। সেজন্য বাংলা নাটকের দোষগুণ নিধারণকালে শুধু ভাববস্তু নহে ইহার শিল্পরূপের প্রতিও সমান দৃষ্টি দিতে হইবে। কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর স্বদেশীভাব ও সংবেদনশীলতা দিয়া কোন নাটকের যথার্থ বিচার সম্ভব নহে। সেজন্য বাংলা

১ গিরিশচন্দ্রের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—'এজন্য যিনি নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে দেশীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব-শোভা. দেশীয় নায়ক নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিতক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয়-স্রোত তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে।'

—'নাট্যকার'

নাটকের মূল্য-নিরূপণে যেমন ব্যক্তিমানস ও সমাজপ্রেরণার দিক দিয়া বিষয়বস্তুর আলোচনা আবশ্যক তেমনি নাট্যশিল্পের রূপায়ণ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও প্রয়োজন।

নাট্যশিল্পের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে কল্পনার লীলা অপেক্ষা বাস্তবের ক্রিয়াকেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। নাটকের প্রথম ও প্রধান আবেদন হইল দর্শকের চোখে ও কানে। অবশ্য দর্শকের কল্পনামগ্ন মন নাট্যরস সম্ভোগকালে যে সক্রিয় থাকে না তাহা নহে, কিন্তু তবুও যে বিষয়বস্তু বাহ্য আচরণ ও অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়া প্রকাশযোগ্য তাহাই তাহার চিত্তে স্বতঃস্ফূর্ত রসতন্ময়তার উদ্রেক করে। যে জাতি জগৎ ও জীবনের বস্তুসত্তার বিচিত্র লীলার প্রতি কৌতূহলী ও অনুরাগী তাহাদের মধ্যেই নাট্যশিল্প বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাঙালী ভাবপ্রবণ বস্তুবিমুখ জাতি, সেজন্য তাহাদের মানস-ভূমিতে নাট্যজগতের প্রতি স্বাভাবিক অনুকূলতা নাই। বস্তুবিশ্বের কঠিন মৃত্তিকা অপেক্ষা ভাবলোকের কুহেলিমায়ায় তাহাদের চিত্তের আসক্তি অনেক বেশি, সেজন্য নাটকের নিয়ম-নিবদ্ধ রুক্ষ সত্য অপেক্ষা গীতিকাব্যের বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম বিলাস তাহাদের কাছে অধিকতর রুচিকর। একারণেই বাংলা নাটক আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, নাটকের পরিমিত পরিবেশ গীতিকাব্যের উচ্ছ্বাসতরঙ্গে অনেক স্থলেই ভাসিয়া গিয়াছে, বস্তুবিশ্লেষণ ফেনিল ভাবাবেগে তরল হইয়া পড়িয়াছে। কর্মে যেখানে পঙ্গুতা বাক্যে সেখানেই আবার অত্যধিক পটুতা। কর্মজীবনের প্রতি বাঙালীর একটা উদার বৈরাগ্য থাকিলেও বাগ্‌বীর্যে বাঙালীর কোথাও ন্যূনতা দেখা যায় নাই। এই জাতীয় প্রগলভতার চিহ্ন নাটকের মধ্যেও সুস্পষ্ট। সেজন্য বহু বাংলা নাটকে দেখা যায় কোন চরিত্র একবার বক্তৃতা আরম্ভ করিলে আর থামিতে চায় না, নাটকের নিয়ম ও শাসন ভাসাইয়া দিয়া তাহা অবিরাম অনর্গল বহিয়া চলে। বস্তুজীবনের প্রতি এই নিস্পৃহ নিরাসক্তির ফলে বাংলা নাটকে গতিবেগ ও ঘাতপ্রতিঘাত তেমন জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। বাহ্যজগতে গতির স্পন্দন আমরা অনুভব করিতে পারি, সেখানে সমাজ ও ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অহরহ নানা সংঘাত অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু কল্পনালোকে কোন গতিচাঞ্চল্য কিংবা বিরুদ্ধশক্তির সংঘাত নাই, সেখানে সব কিছুই এক সর্বব্যাপী সামঞ্জস্য-রসে নিশ্চল ও মধুর হইয়া আছে। বাংলা নাটকের রচয়িতাগণ তাঁহাদের নাটকের বিষয় অনেক স্থলেই ক্রিয়াময় বস্তুজগতের উর্ধ্বে নিষ্ক্রিয় ভাবজগতে উন্নীত করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদের নাটকের বস্তুদ্বন্দ্ব নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়া এক আত্মগত শান্তরসে সমাহিত হইয়া গিয়াছে। যেখানে ইহলোকের উপর পরলোকের আধিপত্য, পুরুষকার অপেক্ষা দৈবই প্রধান সেখানে মানুষের গতি ও সংগ্রামের মূল্য কোথায়?

এই সংগ্রামশীলতা ও জীবনশক্তির অভাবে বাঙালীর নাট্য সাহিত্যে খাঁটি ট্র্যাজেডির বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। ট্র্যাজেডিতে মানুষের ইচ্ছার বিফলতা ও সংগ্রামের ব্যর্থতা দেখা যায় বটে কিন্তু তবুও ইহা আলোচনা করা প্রয়োজন যে জীবনের মূল্য সম্বন্ধে গভীর

ভাবে সচেতন না হইলে ট্র্যাজেডি রচনা ও উপভোগ করা সম্ভব নহে। ট্র্যাজেডি মায়াবাদ নহে, নৈরাশ্যবার্তাও নহে।১ কিন্তু ইহা বিফলীকৃত মানুষের হৃদয়জ্বালার অগ্নিপত্র। এই জ্বালা তাহাকেই সহিতে হয় যে জীবনকে নিবিড় ভাবে ভোগ করিতে চায়। জীবনকে যে ফাঁকি দিল, জীবনের সমস্যাকে যে এড়াইয়া গেল সে এই জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পরম আস্বাদ হইতেও বঞ্চিত হইল। ট্র্যাজেডির এই বিষাদ-মধুর রূপ বাঙালী সমগ্র চিত্তকে উন্মুখ করিয়া উপভোগ করিতে পারে নাই। পুরুষকারের ব্যর্থ সংগ্রামের প্রতি আমাদের কোন স্পৃহা নাই, বিশ্বাসও নাই। কিন্তু একটা তর্ক এখানে উঠিতে পারে যে, ট্র্যাজেডির মধ্যে অনেক স্থলেই দৈবশক্তির আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং দৈববাদী বাঙালী জীবনে তো ট্র্যাজেডি ভালো লাগিবারই কথা। এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে একটু ভালো ভাবে বিচার করা দরকার। দৈবশক্তির নিরঙ্কুশ শাসনে কোন ট্র্যাজেডি নাই, কিন্তু যেখানে এই শাসনের বিরুদ্ধে মানুষ সক্ষম প্রতিরোধ জানাইয়া ব্যর্থ হইয়াছে সেখানেই ট্র্যাজেডি। অ্যাগামেমনন, ইডিপাস, ম্যাকবেথ, লিয়র প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক চরিত্রের জীবনে এই ট্র্যাজেডিই দেখা গিয়াছে।২ নিষ্ক্রিয়ভাবে নিষ্ঠুর ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে কোন ট্র্যাজিক দুঃখের গরিমা নাই। অ্যারিস্টোটল সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, ট্র্যাজেডি ক্রিয়াশীল মানবজীবনকেই অনুকরণ করে।৩ কিন্তু বাংলা নাটকে এরূপ ক্রিয়াশীল চরিত্রের ট্র্যাজেডি খুব কমই লেখা হইয়াছে। আমাদের ট্র্যাজেডির আদর্শ 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশ, যে হাত পা গুটাইয়া নিশ্চিন্তভাবে দুঃখের আঘাত মানিয়া লইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা নাটকে ভীমসিংহ, নূরজাহান, বিক্রমদেব, ক্ষেমঙ্করী এরকম খুব অল্প কয়েকটি চরিত্রের নাম উল্লেখ করা যায় যেগুলি সংগ্রামশীল ট্র্যাজিক চরিত্রের মহিমা লাভ করিয়াছে। অধিকাংশ বিষাদান্তক নাটক হয় দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে আর না হয় করুণরসের প্রাবল্যে তরল হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুত বাঙালীর কোমল চিত্তবৃত্তিতে ট্র্যাজেডির রুক্ষ-কঠোর দু:খ অপেক্ষা করুণ রসের আবেগ-বেদনা অধিক সম্বর্ধনা লাভ করে। সেজন্য অধিকাংশ নাট্যকার দুঃখের সংহত, নিরুদ্ধ রূপ অপেক্ষা ইহার উচ্ছ্বাসপ্লাবিত স্নিগ্ধ রূপই তাঁহাদের নাটকে দেখাইতে চাহিয়াছেন। 'নব-

১। F. L. Lucasএর মত উল্লেখযোগ্য—But if we had to find a phrase for the mood most generally induced by great tragedy, it would certainly not be the resignation nor contempt of existence. Life seems at such times infinitely sad, but not worthless; infinitely fragile, yet never more intensely ours.'

—*Tragedy, ( Hogarth Press, 2nd. imp.,* ) P. 46.

২। 'The heroes of tragedy, both ancient and modern, have always stood for a vigorous zest in life and heroic struggle against fate, and they have asserted rather than denied the will to live.'

*Tragic Relief* by P. K. Guha, P. 14-15.

৩। 'Tragedy is an imitation of action and primarily on that account, of persons acting.' *Aristotle's Poetics*—translated by E. S. Bouchier P. 21.

নাটক', 'নীলদর্পণ', 'প্রফুল্ল', 'পথের শেষে' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিয়োগান্তক নাটক করুণরসাত্মক হইলেও খাঁটি ট্র্যাজেডি নহে। ট্র্যাজেডির মায়ামমতালেশহীন নিষ্ঠুর অনিবার্যতা ইহাদের মধ্যে নাই! এই সব নাটকের অভিনয় দর্শনে হয়তো আমরা কাঁদি, কিন্তু সেই কান্না দুঃখের নিষ্করুণ কাঠিন্য ধুইয়া মুছিয়া মনের মধ্যে এক স্নিগ্ধ সান্ত্বনার উদ্রেক করে।

ট্র্যাজেডির স্বল্পতার জন্য যদি আমরা মনে করি বাংলা নাটকে কমেডির যথেষ্ট প্রাচুর্য রহিয়াছে তবে তাহা ভুল হইবে। খাঁটি ট্র্যাজেডির ন্যায় খাঁটি কমেডিও বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি লেখা হয় নাই। জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝাট এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া ইহার নিয়ত-চঞ্চল রঙীন বুদ্‌বুদ্‌গুলি হাল্কা প্রাণে উপভোগের মধ্যেই কমেডির জগৎ নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু সেই জগৎ বাঙালী দৃষ্টির বহির্ভূত। আমরা সোজা জিনিষকে বাঁকাইয়া লই, ফাঁকা জিনিষকে ফেনাইয়া ফেলি। সেজন্য আমাদের হাসির বাষ্প কারুণ্যের শীতলতায় জমিয়া যায়। হাল্কা কথা দার্শনিক মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে গুরুত্ব লাভ করে। একমাত্র দীনবন্ধু মিত্র ও অমৃতলাল বসু ছাড়া বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর কমেডি রচয়িতা আর কেহ নাই। কমেডি বলিতে আমরা বুঝিয়াছি একমাত্র প্রহসন, হাসি ব্যতীত যাহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। সেই হাসিও অনেক স্থলেই চিন্তাপ্রসূত ও বুদ্ধিমার্জিত নহে, তাহা নিতান্তই নিম্নস্তরের কৌতুক ও ভাঁড়ামিতে পরিপূর্ণ। দীনবন্ধুর Humour এবং অমৃতলালের Satire বাংলা নাটকে সুলভ নহে। প্রহসনগুলি বহুক্ষেত্রে মূলনাটকের প্রত্যঙ্গ স্বরূপ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত; তাহাদের কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃত হইত না। পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে আদ্যন্ত রহস্যজটিল হাস্যরসের স্নিগ্ধ প্রবাহ ঢালিয়া যে উচ্চশ্রেণীর কমেডি রচনা করা যাইতে পারে আমাদের নাট্যকারগণ সেদিকে তেমন নজর দেন নাই। 'খাসদখল' ও 'চিরকুমার সভা'র মত কমেডি বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি লিখিত হয় নাই।

ট্র্যাজেডির বিষাদ ও কমেডির প্রসাদ উভয়কেই পরিহার করিয়া বাংলা নাটক সাবধানী মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। অর্থাৎ তাহার গতি হইয়াছে প্রধানত tragi-comedy ও melodramaর দিকে। সংস্কৃত নাটকে যেমন দেখা যায় অনেক নাট্যকাহিনীর অনিবার্য বিয়োগান্তক পরিণতি থাকিলেও নাট্যকার জোড়াতালি দিয়া সেগুলি মিলনান্তক করিয়া তুলিয়াছেন বাংলা নাটকেও তেমনি বহুস্থলে স্বাভাবিক ট্র্যাজিক পরিণতি আকস্মিক মিলনান্তক রূপ লাভ করিয়াছে। বিয়োগান্তক সমাপ্তি দর্শকদের কাছে রুচিকর হইবে না বলিয়া অনেক স্থলেই নাট্যকারগণ একটি মিলনমধুর উপসংহার জুড়িয়া দিয়া রঙ্গমঞ্চে তাঁহাদের নাটকের জনপ্রিয়তা বজায় রাখিয়াছেন অথচ এরূপ করিতে যাইয়া তাঁহারা যে উচ্চাঙ্গের নাট্যশিল্পকে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছেন সেদিকে তাঁহারা দৃষ্টি দেন নাই। 'শাজাহান', 'আলমগীর' প্রভৃতি নাটক খাঁটি ট্র্যাজিক ভাবাপন্ন হইলেও উহাদের শেষ পরিণতি সামঞ্জস্য ও মিলনের পরিবেশে অনেকখানি শান্ত ও কোমল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের নাটকে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'র প্রমাণ অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। নাট্যকারগণ আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া বহুক্ষণ ভয় দেখাইয়া যখন শেষপর্যন্ত গুলি ছোঁড়েন তখন দেখা দেখা যায় শুধুই ধোঁয়া

আর আওয়াজ, গুলি তাহাতে নাই। সংহত নাট্যসংঘাতের অভাব থাকিলেও বাংলা নাটকে action-এর কোন অভাব নাই। দৌড়ঝাঁপ, বক্তৃতা-চীৎকার, মারামারি, মূর্চ্ছা, পতন প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণেই আমাদের নাটকে রহিয়াছে। 'কীর্তিবিলাস' ও 'বীরবালা'র ন্যায় সস্তা বীরত্ব এবং 'শরৎ-সরোজিনী','সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র ন্যায় রোমাঞ্চকর ক্রিয়াচাঞ্চল্য অনেক নাটকেই প্রচুর পাওয়া যাইবে।

জনসাধারণের রুচি ও প্রবৃত্তি নাট্যবস্তু ও নাট্যশিল্পকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। নাট্যকার যখন নাটক রচনা করেন তখন তিনি তাঁহার পারিপার্শ্বিক জনগণের চিত্তবৃত্তির কথাই স্মরণ করিয়া থাকেন।১ ড্রাইডেন একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—

'The dramas' laws the dramas' patrons give,
For we that live to please, must please to live'

বাঙালী দর্শকদের রুচি ও চাহিদার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই নাট্যকারগণ তাঁহাদের নাটকে আলগা, অসংলগ্ন ও অসঙ্গত ঘটনা ও চরিত্রের আমদানী করিয়া থাকেন। পাঁচমিশেলি উপাদানের বৈচিত্র্য না থাকিলে রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটক জমে না তাহা ভাবিয়াই নাট্যশিল্পের বিধিনিষেধ সব বিসর্জন দিয়া কতকগুলি সামঞ্জস্যহীন চমৎকারী ঘটনা জুড়িয়া তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন। গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের ন্যায় সুবিখ্যাত নাট্যকারদের নাটকেও এরূপ ঘটনা ও চরিত্রের অসংগতি ও অসম্ভাব্যতার মোটেই অভাব নাই। অভিনয়-গুণে ও পরিচালনা-নৈপুণ্যে এসব নাটকের অনেকগুলিই হয়তো রংগালয়ে জনসম্বর্ধনা লাভ করিয়াছে, কিন্তু তবুও কখনো চিরকালীন নাট্যবিচারক্ষেত্রে তাহাদের মূল্য স্বীকৃত হইবে না।২ উচ্ছ্বাস ও আতিশয্যপ্রিয় দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য আমাদের অনেক নাটকেই সুদীর্ঘ সংলাপ ও অসম্বৃত ভাবাবেগের অতি তরল অবতারণা রহিয়াছে। সংলাপের দীর্ঘতার ফলে অনেক নাটক, যেমন—'শর্মিষ্ঠা,' 'পদ্মাবতী,' 'লীলাবতী' প্রভৃতির নাট্যরস ব্যাহত হইয়াছে। অনেক নাট্যকার তাঁহাদের নাটকের করুণ রস বৃদ্ধি

১। 'Moreover, since the dramatist must ever adjust his conceptions to the theatre of his own time, it follows that he must seek to pen his works in such a way as to make appeal, not vaguely to 'an audience in general, or to some imagined audience of after times, but to the only audience he knows—that of his own period Thus to a very large extent he is dependent upon the kind of players frequenting the theatre during the years that he is writing.'

*World Drama by* A. Nicoll, P, 936

২। Elizabeth Drew এ বিষয়ে খুব সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন—'If, for the sake of theatrical effect or incident, character is falsified or emotion distorted ; if part of the play is in one key and part in another ; if, in a realistic environment, people behave as if they were in the worlds of farce or of romance ; if the whole thing is humanly unconvincing and superficial no amount of brilliant acting, effective individual episodes and polished production will turn it into a good play.'

—*Discovering Drama* ( *Jonathan Cape* ), P. 109.

করিবার জন্য অকারণ করুণ ঘটনা ও অত্যধিক মৃত্যু ঘটাইয়াছেন। 'কীর্তিবিলাস,' 'কৌরব-বিয়োগ,' 'নীলদর্পণ,' 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি নাটকের নাম এ প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য এরূপ অসংগত আতিশয্যের ফলে নাট্যকারদের ঈপ্সিত উদ্দেশ্যের বিপরীত প্রতিক্রিয়াই দর্শকদের হৃদয়ে জাগরিত হইয়াছে।

বাঙালী দর্শকদের মানসপ্রকৃতি অনুযায়ী বাংলা নাটক আঙ্গিক ও ভাবের দিক দিয়া কি রকম বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে সে সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা হইল। কিন্তু জাতিগত ও স্বভাবজাত প্রকৃতি ছাড়াও দর্শকদের একটি সমাজচেতনা আছে এবং নাটকে তাহারও অবশ্য-ম্ভাবী প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে। বস্তুত সমাজরূপ নাটকে যতখানি প্রতিফলিত হয় কবিতা এমন কি গল্প-উপন্যাসের মধ্যেও ততখানি হয় কিনা সন্দেহ। বাংলা নাটকের গোড়া হইতেই এই সমাজচেতনার বিচিত্র রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলার সমাজমন নানা ভাবতরঙ্গ ও সমস্যাবিক্ষোভে আলোড়িত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক আন্দোলন সমাজের ব্যবস্থিত ভিত্তিকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করিয়াছে। এই সব আন্দোলনের ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানুষের মনের মধ্যে নানা ক্রিয়া-বিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলা নাটকের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে অনুধাবন করিলে সমাজের এই রহস্যজনক গতি ও প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যাইবে। আমরা দেখিব যে, এই সমাজ নিশ্চল নহে নিয়তচঞ্চল, কিন্তু তাহার গতি শুধু প্রগতি নহে পরাগতিও হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সমর্থন করিয়া লেখা হইল 'বিধবা-বিবাহ,' 'বিধবা বিরহ,' 'চপলাচিত্তচাপল্য,' 'আনন্দময়' প্রভৃতি নাটক আর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে গিরিশযুগে এই বিধবা বিবাহ নিন্দা করিয়া 'শাস্তি কি শান্তি,' 'তরুবালা' প্রভৃতি নাটক রচিত হইল। ব্রাহ্মধর্মের নবপ্রতিষ্ঠার সময় সেই ধর্ম প্রশংসিত হইল দীনবন্ধু দ্বারা আবার নবহিন্দুজাগরণের সময় সেই ব্রাহ্মধর্ম নিন্দিত হইল অমৃতলাল বসুর নাটকে। সমাজ, ধর্ম ও ও রাষ্ট্রসম্বন্ধে বিভিন্ন চেতনার মধ্যে এক একটি এক এক সময়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং তখন সেই চেতনাপ্রসূত নাটকের প্রাধান্য আমরা দেখিয়াছি। প্রথম যুগে সমাজচেতনাই নাটকের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তখন বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ, মদ্যপান, লাম্পট্য প্রভৃতি সমস্যা রামনারায়ণ, মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতির নাটকে রূপায়িত হইয়াছে। গিরিশযুগে আবার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্মাবতারের প্রভাবে ধর্মাদর্শই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, সেজন্য রাজকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি নাট্যকার তখন বেশির ভাগ পৌরাণিক নাটক রচনা করিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতে রাজনৈতিক ভাবোদ্দীপনা দেশের হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছিল, সে কারণে বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে জাতীয় ভাবপ্রাণিত ঐতিহাসিক নাটকের পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে ইহার প্রমাণ সুপরিস্ফুট। বাংলা সমাজের এই ত্রয়ী চেতনা অনুযায়ী বাংলা নাটকের সামাজিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক এই ত্রিধারা প্রবাহিত হইয়াছে।

## বাংলা নাট্য-সমালোচনার আদর্শ

বাংলা নাট্যসাহিত্যের সমালোচনা শেষ করিলাম, কিন্তু এখন বোধহয় সেই সমালোচনার একটা কৈফিয়ত প্রয়োজন। সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থে নাটকের পাঠ্য দিক অপেক্ষা অভিনেতব্য দিকের উপরেই নজর দেওয়া হইয়াছে বেশি; সেজন্য রসবিচারে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োগরীতিকৌশলের কথা সব সময়েই মনে রাখা হইয়াছে। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে সমালোচক তাঁহার বুদ্ধি ও বিচারশক্তি লইয়া একক আসনে অধিষ্ঠিত কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তিনি প্রেক্ষাগৃহের রসমগ্ন দর্শকদেরই একজন। Sarcey বলিয়াছেন, A play without an audience is inconceivable." রঙ্গমঞ্চের আলোকসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা ও আবহ-সঙ্গীতের সহযোগিতায় বিশেষ বিশেষ রূপসজ্জা গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ যে বিশিষ্ট নাট্যরস সৃষ্টি করিয়া দর্শকচিত্তে তাহা সঞ্চার করিতে সক্ষম হন তাহারই গুণাগুণ লইয়া নাটকের বিচার করিতে হইবে। এজন্য নাটকের ইতিহাস নাট্যশালার ইতিহাসের সহিত গভীরভাবে জড়িত। গ্রীসে কুড়ি হাজার দর্শকের সম্মুখে নাটকের অভিনয় হইত, সেজন্য গ্রীক নাটকে শাণিত সংলাপ-সংঘাত ও সূক্ষ্ম ভাব-বৈচিত্র্য অপেক্ষা উদাত্ত-গম্ভীর দূরশ্রাব্য আবৃত্তির উপরেই জোর দেওয়া হইত। এলিজাবেথের যুগে রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট ব্যবহৃত হইত না বলিয়াই শেক্‌সপীয়ারকে বহু ছোট ছোট অবান্তর দৃশ্য এবং সংলাপে নিসর্গ-বর্ণনার অবতারণা করিতে হইত। আধুনিক দ্রুত-গতিশীল যুগে দর্শকের চলিষ্ণু চিত্তবৃত্তির সহিত সমতা রাখিবার জন্য, বিশেষ করিয়া চলচ্চিত্রের সহিত প্রতিযোগিতার জন্যই ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে, এবং সেই সব রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনেই নাটকের আঙ্গিক পরিবর্তিত হইতেছে এবং সংক্ষিপ্ত অথচ ক্ষিপ্রক্রিয়াশীল নাটক রচিত হইতেছে। দর্শকের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রযোগরীতি ও কলাকৌশলের পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নাটকেরও নব নব আঙ্গিক ও রূপরেখার বিকাশ। নাট্যকারকে নাটক লিখিবার সময় এই দর্শক ও রঙ্গমঞ্চের কথা সর্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। বার্নার্ড শ-এর কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হয়। তিনি বলিয়াছেন, 'I do not select my methods, they are imposed upon me by a hundred considerations : by the physical consideration of theatrical representation, by the laws devised by the municipality to guard against fires and other accidents to which theatres are liable, by the economical commerce, by the nature and limits of the art of acting, by the capacity of the spectators for understanding what they see and hear, and by the accidental circumstances of the particular production in hand, যে সব বিষয়ের বিবেচনা নাট্যকারের সৃষ্টিশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে সেগুলি নাট্যসমালোচক

উপেক্ষা করিতে পারেন না, করিলে তাঁহার সমালোচনা ভ্রান্তিবিলাস হয় মাত্র, সত্যবিচার হয় না।

এখানে একটি কথা উঠিতে পারে যে, এমন তো অনেক নাটক আছে যেগুলির অভিনয় আমরা দেখি নাই, কিংবা উহাদের রঙ্গমঞ্চে প্রযোগরীতির কথাও আমরা কিছু জানি না, অথচ উহাদের শাশ্বত সাহিত্য-গুণের জন্য চিরকাল আমরা ঐ সব নাটক পড়িয়া আসিয়াছি। সফোক্লিস, ইউরিপিডিস, অ্যারিস্টোফ্যানিস, এমন কি শেক্‌সপীয়ার ও শেকভ, শেরিডান ও শ-এর নাটক তো প্রধানত পাঠের মধ্য দিয়াই আমাদের মনে চিরকালীন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, নাটক পাঠ করিলেও তাহার একটি অভিনেতব্য রূপ আমাদের ক্রিয়াচঞ্চল কল্পনায় জাগরূক করিতে না পারিলে কখনও তাহার যথার্থ রস হৃদয়বেদ্য হইবে না। সেজন্য মনে মনে একাকী পড়িলে চলিবে না। সম্মিলিত শ্রোতাদের মধ্যে স্বরসংযোগে অভিনয়ের ঢঙে অল্পবিস্তর অঙ্গসঞ্চালনের মধ্য দিয়া নাটক পড়া দরকার। তাহা না হইলে নাটকের রস নাটকের মধ্যেই অন্তঃশীল হইয়া থাকিবে, পাঠক ও শ্রোতাদের হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা আর প্রবাহিত হইতে পারিবে না। আর একটি কথা। নাটক সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চ ও দর্শকদের উদ্দেশ্য করিয়া রচিত হয় বটে, কিন্তু তাহা শুধু আমোদের উপাদান নহে, তাহা সাহিত্য। সাহিত্যের মূল্য নির্ভর করে তাহার মানবসত্য ও জগৎসত্যের সুগভীর অনুভূতির উপরে, তাহার রূপ ও রসের সুষ্ঠু সহযোগের উপরে। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তাঁহার নাটককে সাহিত্যের এই উত্তুঙ্গ স্তরে লইয়া যাইতে উৎসুক, অথচ তিনি সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চ ও দর্শকদেরও অবহেলা করেন না। তিনি সমকালের ভূমিতে দাঁড়াইয়া চিরকালের আকাশ পানে তাকাইয়া থাকেন। সফোক্লিসের ইডিপাস ও ইউরিপিডিসের মিডিয়া কি সর্বকালের মানুষের প্রতিনিধি নহে? শেক্‌সপীয়ারকে এলিজাবেথীয় দর্শক আপনার ভাবিয়াছিল আবার আমরাও আমাদের আপনার ভাবিতেছি। মলিয়েরের নাটকেও কি ফরাসী দেশের মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বকেই আমরা দেখিতেছি না? সেজন্য নাট্যসমালোচককেও নাটকবিচারে দর্শক ও দ্রষ্টা দুই-ই হইতে হইবে। তিনি নাটকে সন্ধান করিবেন মৃত্যুশীল মানুষ ও মৃত্যুহীন মানুষ—উভয়কেই।

নাটকের এই সাময়িক ও চিরকালীন উপাদানের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া আমাদের বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হয়। আলোচ্য গ্রন্থে বাংলা নাটকের আলোচনায় পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্রের রীতিনীতিগুলিই প্রধানত প্রয়োগ করিয়াছি। অনেকে আপত্তি তুলিয়া বলিতে পারেন, আমাদের নাট্যসাহিত্যে আমাদের সমাজের বিশিষ্ট জীবনধারা চেতনা ও আদর্শ প্রতিফলিত, সুতরাং সেই সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণে পাশ্চাত্য সমালোচনা-রীতি প্রযোজ্য নহে। কিন্তু বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে বিদেশী প্রভাবের অবিচ্ছিন্ন ধারাই তো আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। অবশ্য প্রাথমিক অনুবাদ-যুগের নাটক-গুলিতে সংস্কৃত প্রভাবই প্রধান ছিল একথা সত্য। কিন্তু এই প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্বনাট্য সাহিত্যের সর্বজনীন ধারার সহিত যুক্ত হওয়ার দিকেই আত্মপ্রতিষ্ঠ বাংলা নাটকের

লক্ষ্য ছিল গোড়া হইতেই। সেজন্য প্রথম দুইজন মৌলিক নাট্যরচয়িতাই, অর্থাৎ তারাচরণ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র পাশ্চাত্য নাটকের রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। মধুসূদন তো স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'Besides, remember that I am writing for that portion of my country men who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking.' গিরিশচন্দ্রও স্বীকার করিয়াছেন যে, মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তারপর দ্বিজেন্দ্রলালও যে পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। বস্তুত তাঁহার ন্যায় পাশ্চাত্য-নাট্যধর্মী বাংলা নাটক আর কেহই লিখিতে সক্ষম হন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সমকালীন দেশায় ভাবাশ্রিত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদও বলিয়াছেন, যাঁহাদের দ্বারা বঙ্গে রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা, এবং সেই সময় হইতে আজও পর্যন্ত যাঁহারা বঙ্গভাষায় নাটক লিখিয়া আসিতেছেন, সকলেই অল্পবিস্তর ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ, সকলেই পাশ্চাত্য নাটকাদির কিছু না কিছু রস গ্রহণ করিয়াছেন।'১ এখন জিজ্ঞাস্য এই, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ যখন সচেতন ভাবে পাশ্চাত্য নাটকের ধারা অনুসরণ করিয়া নাটক রচনা করিয়াছেন তখন তাঁহাদের নাটকের সমালোচনায় পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্রের নিয়মকানুনগুলি প্রয়োগ না করিলে কিভাবে চলে?

কেহ কেহ বলেন, বহিরঙ্গের মিল থাকিলেও পাশ্চাত্য নাটকের সহিত বাংলা নাটকের প্রাণবস্তুর দিক দিয়া কোন মিল নাই। তাঁহারা যুক্তি প্রয়োগ করেন যে, পাশ্চাত্যজীবন বস্তুবাদী, সেজন্য জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ট্র্যাজিক পরিণতি সেখানে স্বাভাবিক; কিন্তু ভারতীয় জীবন অধ্যাত্মবাদী, ইহলোকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এখানে কখনও প্রধান হইয়া উঠে নাই, সেজন্য পাশ্চাত্য ট্র্যাজিক ভাবকল্পনা এখানে নিরর্থক ও অসঙ্গত। এই বিষয়টি একটু বিচার করা দরকার। আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি যে, নাটকের মধ্যে সমকালীন ও চিরকালীন দুইরকম উপাদানই বর্তমান থাকে। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, ইহাতে দেশজনীন ও বিশ্বজনীন দুইরকম ভাবই সমাবেশিত হয়। দেশীয় লোকের ভাব, স্বভাব ও সমাজরূপ যেমন ইহাতে উদ্‌ঘাটিত হয়, তেমনি বিশ্বের সাধারণ মানুষ ও বিশ্বনীতির একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপও ইহাতে আভাসিত হয়। যাঁহারা বাংলা নাটককে শুধু কেবল বাঙালীর নাটক বলিতে চান, তাঁহারা ইহাকে অত্যন্ত ছোট করিয়া দেখেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, উনবিংশ শতাব্দী হইতে বাঙালী যে নবসাহিত্য রচনা করিতে আরম্ভ করিল তাহাতে বাংলার চিত্তবৃত্তির সহিত বিশ্ব-চিত্তবৃত্তির যোগ ঘটিয়া গেল, বাঙালী তাহার সীমান্বিত মৃত্তিকার আবেষ্টনী হইতে বিশ্বের উদার আঙ্গিনায় মুক্তিলাভ করিল। তখন হইতে তাহার কাব্য, উপন্যাস, নাটকের ক্ষেত্রে পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনীর সঙ্গম ঘটিয়া গেল। সেই সঙ্গমের বিপুল জলোচ্ছ্বাস ও উল্লসিত কলরবের মধ্যে সে তাহার নবজাত বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করিল। বাঙালী বাংলা নাটক

১ রঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি—নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭।

দেখিল, কিন্তু সে ভীমসিংহ ও সাজাহানকে রাজা লীয়ারের সহিত তুলনা করিল, কৃষ্ণকুমারী ও সরোজিনীর সহিত গ্রীক নায়িকা ইফিজেনিয়ার সাদৃশ্য দেখিতে পাইল, 'নীলদর্পণ'কে Uncle Tom's Cabin-এর সমতুল্য মনে করিল, মলিয়েরের সহিত অমৃতলাল ও মেটারলিঙ্কের সহিত রবীন্দ্রনাথকে মিলাইয়া দেখিল এবং দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তুলসী লাহিড়ীর নাটকে পাশ্চাত্য সমাজবিপ্লবের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইল।

দেশে দেশে সাহিত্যের ভাবপরিবেশের পার্থক্য ঘটে সত্য, কিন্তু সাহিত্যের রূপ ও রসচেতনার মধ্যে সব দেশেই মোটামুটি সমতা লক্ষ্য করা যায়। একটি রসোত্তীর্ণ কবিতার কলাকৌশল সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সেই কলাকৌশল সকল দেশের শ্রেষ্ঠ কবিতাতেই প্রযোজ্য। তেমনি নাটকের বেলাতেও বলা চলে যে, ইহার আঙ্গিক ও রসের উপাদানের মধ্যেও একটা দেশনিরপেক্ষ সাধারণত্ব আছে। অভিনেতব্য গুণ, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, চরিত্রদ্বন্দ্ব, আকস্মিকতা, জীবন্ত গতিবেগ—এগুলি নাটকের সাধারণ ধর্ম, এগুলি না থাকিলে কোন দেশের নাটকই নাটকপদবাচ্য নহে। সংস্কৃত নাটক ও যাত্রার কথা প্রতিবাদ স্বরূপ অনেকেই উল্লেখ করিবেন। কিন্তু সভয়ে বলিতে চাই যে, সংস্কৃত নাটকের মধ্যে কাব্যগুণ যতখানি প্রধান, নাট্যগুণ ততখানি নহে এবং যাত্রার মধ্যেও সঙ্গীত ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি যতখানি লক্ষ্য, নাটকত্বের প্রতি কখনও ততখানি লক্ষ্য দেওয়া হয় নাই। বাক্যের সহিত বাক্য ও মনের সহিত মনের সংঘর্ষের ফলে যে বিশিষ্ট রসের উদ্রেক হয়, তাহার সহিত উনবিংশ শতাব্দীতে নবরচিত নাটকের মধ্যেই আমাদের প্রথম পরিচয় হইল। অবশ্য জীবনের সংঘাতময় রূপ অনেক বাংলা নাটকেই সুষ্ঠুভাবে পরিস্ফুট হয় নাই, তাহা আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাহা নাটকের ত্রুটি, সমর্থনীয় গুণ নহে। বাংলা সাহিত্যে সার্থক ট্র্যাজেডি বেশি নাই ইহা আমরা দেখাইয়াছি, কিন্তু ট্র্যাজেডির বিশিষ্ট রস যে বাঙালীর পক্ষে সৃজ্য ও আস্বাদ্য নহে ইহা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিব না। দুঃখের যে সমাধানহীন, প্রতিকারহীন রূপের মধ্যে জীবনের সর্বোত্তম উপলব্ধি তাহা নিশ্চয়ই আমরা বাংলা নাটকে সন্ধান করিতে থাকিব। অনেকে বাঙালী জীবনের প্রকৃতি ও আদর্শের দোহাই দিয়া বাংলা নাটকে পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির অনধিকারপ্রভাব সম্বন্ধে জোর দিয়া বলেন। কিন্তু আমরা ইডিপাস, অরিস্টিস, মিডিয়া, ম্যাকবেথ, লীয়ার, ওথেলো, নোরা ও হেড্ডা গ্যাবলারের ট্র্যাজেডি দেখিয়া অভিভূত হইব, অথচ সেরকম ট্র্যাজেডি আমাদের ভাষায় আশা করিব না? আমাদের আদিকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে জীবনের গভীরতম ট্র্যাজিক রূপ প্রকাশিত, অথচ সেই রূপ আমাদের সাহিত্যের মধ্যে অসম্ভব ভাবিব, ইহা কিরূপ বিচারনীতি? বাংলা নাটকে ট্র্যাজেডির স্বল্পতা আছে, কিন্তু যেখানে সেই ট্র্যাজেডির প্রকাশ, সেখানেই কি আমরা শ্রেষ্ঠ নাট্যধর্মের পরিচয় পাই নাই? ভীমসিংহের অসহায় অন্তর্দ্বন্দ্বে, নিমচাঁদের বিফলীকৃত জীবনের অন্তর্মৌন বেদনায়, জনার বিক্ষুব্ধ অন্তর্জ্বালায়, নুরজাহানের দুঃসহ অন্তঃসংঘাতে, চাণক্যের ঊষর হৃদয়বুভুক্ষায়, বিক্রমদেবের সুকঠিন

আত্মনিপীড়নে, রঘুপতির শোকাবহ পরাজয়ে, আলমগীরের দুর্বল স্বপ্নবিলাপে, এবং কর্ণের ভাগ্যলাঞ্ছিত পরিণতিতেই তো নিত্যকালের ট্র্যাজিক রূপ আত্মবিকাশ করিয়াছে। সমালোচনা করিবার কালে ইহাদিগকেই আদর্শরূপে স্থাপন করিয়া অন্যান্য নাট্যচরিত্রের ট্র্যাজিক গুণাগুণ বিচার করিব। বাংলা নাটকে ট্র্যাজেডির অভাব ও মেলোড্রামার আধিক্য থাকা সত্ত্বেও ট্র্যাজেডিকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিব, মেলোড্রামাকে নহে ; না, বাঙালী জীবনের দোহাই দিলেও নহে।

আর একটি কথা। পূর্ববর্তী প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, কিভাবে সমাজ-মনের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে নাটকের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। নাট্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে সেজন্য সমাজমনের পরিচয় ও নাট্যবিচার অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। শিল্পী আপন অন্তরে অনুভূত কোন বিশেষ সত্যকে রূপায়িত করেন বটে, কিন্তু তিনিও সামাজিক মানুষ, পারিপার্শ্বিক সমাজ তাঁহার মানস-অনুভূতিকে বিশেষভাবে গঠিত ও চালিত করে। সুতরাং নাটকের ভাববস্তু বিশ্লেষণে শিল্পীর অন্তরগত ও বহিরাগত উভয় প্রকার প্রেরণাই নিরীক্ষা ও নির্ণয় করা উচিত। নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, সেই ইতিহাসে নাট্যশিল্পের ক্রমসমৃদ্ধ বিবর্তনই শুধু পরিস্ফুট নহে, তাহাতে শতবর্ষকাল ধরিয়া বাংলার নবজাগ্রত সমাজ কিরূপ আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়া তাহার বিচিত্র যাত্রাপথে অগ্রসর হইয়াছে তাহার স্বরূপও প্রকাশিত। আলোচ্য বাংলা নাটকের ইতিহাসে বাঙালীর নাট্যসাধনার পরিচয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নাট্যসাধনার মধ্য দিয়া বাঙালীর পরিচয় জানিবারই চেষ্টা করা হইয়াছে।

# গ্রন্থ-পঞ্জী

## (ক) সাধারণ

১। Aristotle's Poetics—Tr. by Bouchier
[ নাট্যশাস্ত্রীদের গুরু আজও পর্যন্ত নাট্যবিচারের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক ]

২। The Theory of Drama by A. Nicoll
[ নাট্যসমালোচনার অদ্বিতীয় গ্রন্থ। নাটকের সমস্ত দিক ইহাতে আলোচিত। ]

৩। Dramatic Art and Literature by Schlegel
[ জার্মান সমালোচকের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে গ্রীক নাটক হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন যুগের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের আলোচনা আছে ]

৪। European Theories of Drama by Barret A. Clark
[ অ্যারিস্টোটল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত নাট্য-সমালোচনার ইতিহাস। ]

৫। Tragedy by W. M. Dixon
[ ট্র্যাজেডির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে দার্শনিকতাপূর্ণ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি। ]

৬। Tragedy by A. H. Thorndike
[ ইংরাজী ট্র্যাজেডির ধারাবাহিক ইতিহাস ]

৭। Dramatic Essays by Dryden
[ নাটক সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক-সমালোচকের প্রবন্ধগুলি বিশেষ তথ্যপূর্ণ ও প্রামাণ্য। ]

৮। An Introduction to the Study of Literature by Hudson
[ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে সরস ও মনোরম আলোচনা ]

৯। An Essay on the Idea of Comedy byMeredith
[ সংক্ষিপ্ত হইলেও সরস সমালোচনা ]

১০। Principles of Criticism by Worsfold
[ সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধসহ নাটক সম্বন্ধে একটি উপাদেয় নিবন্ধ ]

১১। Shakespearean Tragedy by Bradley
[ শেক্‌সপীয়ারের প্রধান চারখানি বিয়োগান্তক নাটক অবলম্বন করিয়া ট্র্যাজেডির অতি গম্ভীর ও সুনিপুণ বিশ্লেষণ ]

১২। Shakespeare as a Dramatic Artist by R. G. Moulton
[ শেক্‌সপীয়ারের কয়েকখানি নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে নাটকের অতি সূক্ষ্ম টেকনিকের অবতারণা ও বিশ্লেষণ। ]

১৩। World Drama by A. Nicoll
[ বিশ্বের সমগ্র নাট্যসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। নাট্যসমালোচনার মহাভারত।]

১৪। The Theatre by Sheldon Cheney
[ বিশ্বের নাট্যশালার বিস্তৃত ইতিহাস ]

১৫। Tragedy by F. L. Lucas
[ ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব লইয়া সূক্ষ্ম ও সারগর্ভ আলোচনা ]

১৬। British Drama by A. Nicoll
[ ইংরাজী নাটকের প্রামাণ্য ইতিহাস ]

১৭। The Tragic Drama of the Greeks by A. E. Haigh
[ গ্রীক ট্র্যাজেডির সব দিক লইয়া সুনিপুণ বিশ্লেষণ ]

১৮। Specimens of English Dramatic Criticism by A. C. Ward
[ প্রসিদ্ধ নাটকের অভিনয় ও অভিনয়-প্রথা সম্বন্ধে মূল্যবান নিবন্ধ-সংকলন ]

১৯। Discovering Drama by Elizabeth Drew
[ নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিচার ও ব্যাখ্যা ]

২০। On Poetry in Drama by Harley Granville Barker
[ নাটকে কাব্যের স্থান লইয়া আলোচনা ]

২১। Tragic Relief by P. K. Guha
[ ট্র্যাজেডির আনন্দন-তত্ত্ব লইয়া চিত্তাকর্ষক আলোচনা ]

২২। Sanskrit Drama by Keith
[ সংস্কৃত নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিষয়ক বিখ্যাত প্রামাণিক গ্রন্থ ]

২৩। Encyclopaedia Britannica

২৪। বিশ্বকোষ

২৫। Bengali Literature in the Nineteenth Century by Dr. S. K. De
[ ১৮০০-১৮২৫—এই ২৫ বৎসরের কবি, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি রচয়িতাদের তথ্যপূর্ণ ইতিহাস। ]

২৬। Western Influence in Bengali Literature by P. R. Sen
[ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব লইয়া আলোচনা ]

২৭। The Bengali Theatre by S. P. Mookerjee
[ রঙ্গশালার ইতিহাস সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা ]

২৮। The Indian Stage by Hemendranath Das Gupta (Vols. I, II, III, IV )
[ হিন্দু রাজত্ব হইতে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস। ]

২৯। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[ পুরাতন সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করিয়া সাবধানতার সহিত লিখিত ]

৩০। নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা—বিভাস রায় চৌধুরী

[ বাংলা ভাষায় নাটকের রীতি ও রস লইয়া মনোজ্ঞ আলোচনা ]

৩১। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন

[ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম আদি ও প্রসিদ্ধ ইতিহাস ]

৩২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডাঃ সুকুমার সেন ( ২য় খণ্ড )

[ ঊনবিংশ শতাব্দীর সমুদয় বিখ্যাত ও বিস্মৃত সাহিত্যিকদের রচনাবলী সম্বন্ধে অশেষ তথ্যপূর্ণ প্রামাণ্য ইতিহাস ]

৩৩। সাহিত্যসাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

নির্ভুল সন ও তারিখসহ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের জীবনী ও রচনাবলীর বিবরণ ]

৩৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী

[ ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার নানা জ্ঞাতব্য তথ্য-সম্বলিত বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ]

৩৫। সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু

[ নানা সংবাদসমৃদ্ধ সুরসাল পুস্তিকা ]

৩৬। The Bengali Drama by Dr. P. C. Guha Thakurta

[ বাংলা নাটকের সর্বপ্রথম ইতিহাস ]

৩৭। নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার—সাধনকুমার ভট্টাচার্য ( ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড )

[ নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সারগর্ভ বিচার এবং কয়েকখানি প্রসিদ্ধ নাটকের সুবিস্তৃত বিশ্লেষণ ]

## (খ) মাইকেল মধুসূদন

৩৮। মাইকেল মধুসূদনের জীবন চরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু

[ মধুসূদনের জীবনী ও সাহিত্যালোচনাসহ সমসাময়িক বহু বৃত্তান্তে সমৃদ্ধ অতুলনীয় গ্রন্থ। ]

৩৯। মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম

[ বহু তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী-গ্রন্থ ]

৪০। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত মধুসূদনের গ্রন্থাবলী

## (গ) দীনবন্ধু মিত্র

৪১। দীনবন্ধু জীবনী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[ দীনবন্ধু-সমালোচনার পথ-প্রদর্শক ]

৪২। দীনবন্ধু মিত্র—ডাঃ সুশীলকুমার দে
[ দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সরস ও মৌলিক আলোচনা ]

## ( ঘ ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
[ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মুখে তাঁহার জীবনের স্মৃতিকথা বর্ণিত হইয়াছে ]

৪৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—মন্মথনাথ ঘোষ
[ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনী ও সাহিত্য সমালোচনা ]

## ( ঙ ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৪৫। গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
[ গিরিশচন্দ্রের চরিত ও নাট্যালোচনার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ]

৪৬। গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য—কুমুদবন্ধু সেন
[ গিরিশচন্দ্রের সহিত কুমুদবাবুর কথোপকথনের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের নীতি ও মত ব্যক্ত হইয়াছে ]

৪৭। গিরিশচন্দ্র—কুমুদবন্ধু সেন

৪৮। গিরিশ—প্রতিভা—হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
[ গিরিশ-সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা ]

৪৯। গিরিশ নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য—অমরেন্দ্রনাথ রায়

৫০। গিরিশচন্দ্র—দেবেন্দ্রনাথ বসু

৫১। আমার কথা—বিনোদিনী দাসী

৫২। অর্দ্ধেন্দুশেখর—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ.

৫৩। বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

## ( চ ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৫৪। দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী
[ দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু দেবকুমারের দ্বারা তাঁহার জীবনচরিত ও সাহিত্যপ্রতিভা সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে ]

৫৫। দ্বিজেন্দ্রলাল—নবকৃষ্ণ ঘোষ

৫৬। বঙ্গবাণী—শশাঙ্কমোহন সেন

৫৭। উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল—দিলীপকুমার রায়
[ সরস কথোপকথনের ভাষায় রচিত কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অপরূপ আলেখ্য ]

## (ছ) রবীন্দ্রনাথ

৫৮। Rabindranath : Poet and Dramatist by Edward Thompson
[ টমসন সাহেব প্রকৃত নাটকত্বের দিক দিয়াই রবীন্দ্রনাথের নাটকের অতি সার্থক সমালোচনা করিয়াছেন ]

৫৯। রবিরশ্মি ( ১ম ও ২য় খণ্ড )—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
[ রবীন্দ্রনাথের স্বীয় বক্তব্য এবং বহু প্রবন্ধ ও পত্র উদ্ধার করিয়া কবির অন্যতম অন্তরঙ্গ সমালোচক অশেষ সারগর্ভ সমালোচনা করিয়াছেন ]

৬০। রবীন্দ্রজীবনী ( ১ম ও ২য় খণ্ড )—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
[ কবির একমাত্র প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ জীবন চরিত ]

৬১। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়
[ রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন দিক লইয়া সূক্ষ্ম ও রসপূর্ণ বিশ্লেষণ ]

৬২। রবীন্দ্রনাথ—ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্ত
[ রবীন্দ্রপ্রতিভার বিভিন্নধারা আলোচিত হইয়াছে ]

৬৩। কাব্য-পরিক্রমা—অজিতকুমার চক্রবর্তী
[ রবীন্দ্র-সাহিত্যালোচনার পথপ্রদর্শক ]

৬৪। রবীন্দ্রনাট্য-প্রবাহ ( ১ম ও ২য় খণ্ড )—প্রমথনাথ বিশী
[ রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক সম্বন্ধে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচনা-গ্রন্থ ]

৬৫। রবীন্দ্রনাথ ( দ্বিতীয় পর্ব )—অশোক সেন
[ সাঙ্কেতিকতা ও সাঙ্কেতিক নাটক লইয়া বিচার ]

৬৬। রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
[ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকের আলোচনা ]

৬৭। রবীন্দ্রগ্রন্থ-পরিচয়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
[ রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর নির্ভুল সন ও তারিখ ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে ]

৬৮। Symbolist Movement in Literature by A. Symons
[ সাঙ্কেতিকতা ও সাঙ্কেতিক সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ]

৬৯। Ideas of Good and Evil by W. B. Yeats
[ রূপক ও সাঙ্কেতিকতা লইয়া সারগর্ভ বিচার ]

## (জ) সাম্প্রতিক যুগ

৭০। Modern Drama by J. W. Marriott
[ আধুনিক নাটকের গতি ও প্রবণতা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট আলোচনা ]

৭১। Tendencies of Modern English Drama by A. E. Morgan
[ বর্তমান ইংরাজী নাট্যকারদের সমালোচনা ]

৭২। Twentieth Century Literature by A. C. Ward

[ বর্তমানকালের বিভিন্ন সাহিত্য-ধারার বিশ্লেষণ ]

৭৩। The Twentieth Century Drama by Lynton Hudson

[ আধুনিক ইংরাজি নাট্যধারা ও কয়েকখানি নাটকের নির্বাচিত অংশ-সংকলন )

৭৪। Drama since 1939 by Robert Speaight

[ যুদ্ধকালীন নাটকের আলোচনা ]

## ( ঝ ) পরিশিষ্ট

৭৫। The English Theatre by A. Nicoll

[ লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্য-সমালোচক আধুনিকতম কাল পর্যন্ত ইংরাজী-রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ]

৭৬। অভিনয়-শিক্ষা—ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[ বহু চিত্রে শোভিত এই গ্রন্থখানাতে অভিনয়, সাজসজ্জা, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য বর্ণিত হইয়াছে। ]

৭৭। মঞ্চে ও নেপথ্যে—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

[ রঙ্গমঞ্চের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া মহেন্দ্রবাবু যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহাই বইখানাতে ব্যক্ত হইয়াছে। ]

৭৮। রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

[ খ্যাতনামা নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র রঙ্গালয়, অভিনেতা ও অনেক প্রসিদ্ধ নাটক সম্বন্ধে সরস আলোচনা করিয়াছেন। ]

৭৯। নাট্যমন্দির ( ৩ খণ্ড )

[ রঙ্গালয়, অভিনয়, অভিনেতা ও নাটক সম্বন্ধে বহু মূল্যবান প্রবন্ধের সংকলন ]

৮০। বঙ্গীয় নাট্যশালা—ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

[ রঙ্গালয়ের অভিনয়, অভিনেতা-অভিনেত্রী, দর্শক, সমালোচক প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা সরস আলোচনা ]

৮১। রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

[ রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে ঘটিত বহু রসাল ও হাস্যজনক ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে ]

# নির্দেশিকা

## (ক) সাধারণ

## বাংলা নাটক ও নাট্যকার

সমাপ্ত